গণতন্ত্র ও শিক্ষা

জন্ ডিউই'র "ডিমক্র্যাসি এ্যাণ্ড্ এডুকেশন্" গ্রন্থের
সম্পূর্ণ ও আক্ষরিক অনুবাদ

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ রায়, এম. এস্-সি.

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত]

প্রাক্তন অধ্যাপক : এড্ওয়ার্ড কলেজ, পাবনা, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা, সেইন্ট জোসেফ্স্ কলেজ, নাইনিতাল ; দুর্গাপুর ইস্পাত পরিকল্পনা বিদ্যালয়, দুর্গাপুর, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।

পরিবেশক :

দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড্ কোং প্রাইভেট্ লিঃ

৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট্,

কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ - ১৩৫৮

প্রকাশক :
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ রায়
৬৬এ, প্রতাপাদিত্য প্লেস
কলিকাতা-২৬

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও,
৭২/১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পরিবেশক :
দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড্ কোং প্রাইভেট্ লিঃ
৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট্,
কলিকাতা-১২

পূর্বাচার্যগণের
স্মরণে

প্রাককথন

মার্কিন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ জন্ ডিউইর নাম আজ সর্বদেশে বহুল প্রচারিত। তাঁহাকে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার (progressive education) জনকরূপে অভিহিত করা হয়। দেশে দেশে আধুনিক শিক্ষার ধারাকে যাঁহারা আগাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে ডিউই ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম পথিকৃৎ। আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে তিনি এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছেন।

ডিউই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং শিক্ষা ও দর্শন বিষয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া অর্ধশতাধিক মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'গণতন্ত্র ও শিক্ষা' (Democracy and Education) নামক পুস্তকখানিই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক হিসাবে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এই মহৎ গ্রন্থের বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ ও আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া পাঠকবর্গের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। এই দুরূহ কার্য যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। এই কার্য সম্পাদন করিয়া অনুবাদক যশস্বী হইলেন, সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে নিবদ্ধ চিন্তাধারা এবং দার্শনিক ও শিক্ষাবিষয়ক ভাবনা চিন্তার সোনার কমল হিসাবে যে নির্যাস আমরা পাই তাহা হইল—জীবনে শিক্ষার অপরিহার্যতা, শিক্ষার নূতন সংব্যাখ্যান, দর্শনের সহিত শিক্ষার মিলন সাধন, শিক্ষার সামাজিক ও গণতান্ত্রিক স্বরূপ ও প্রক্রিয়া, বিদ্যালয় ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দ্বন্দ্বের অবসান, স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খলা, শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলা ও আগ্রহের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা, নূতন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন, শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ, পরিবর্তনশীল মানব-সভ্যতায় গণতন্ত্র, শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন, জ্ঞানের তত্ত্বাবলী, নীতির তত্ত্বাবলী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সকল সমস্যার সমাধানের আলোচনায় ও নির্দেশনায় ডিউই তাঁহার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। এই জন্য সর্বদেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় জন্ ডিউইর শিক্ষানীতি ও দার্শনিক চিন্তাধারা সাদরে গৃহীত হইতেছে।

জন্ ডিউই প্রয়োগবাদী দার্শনিক (Pragmatist) ছিলেন। প্রয়োগবাদ বস্তুর কোন চিরন্তন মূল্য বা চিরন্তন সত্যে বিশ্বাস করে না। বস্তুর যাহা কিছু মূল্য তাহা নির্ভর করে—ইহার ব্যবহার বা প্রয়োজনের উপর। ডিউই তাঁহার এই দার্শনিক নীতিকে বিশ্বের বাস্তব সমাজের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার উপর এবং শিক্ষার উপর প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং শিক্ষা দর্শনে তিনি প্রয়োগবাদী।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ডিউইর মতে দর্শন ও শিক্ষা সমার্থক, অভিন্ন। দুই শাস্ত্রেই মানুষ নিজেকে, সমাজকে এবং যে মানব-বিশ্বে সে বাস করে সেই মানব-বিশ্বকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অধ্যয়ন করে। সুতরাং এই দুই-এর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও সারা বিশ্বকে 'অধ্যয়নের পাঠশালা' বলিয়াছেন—

"বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর—
আমি সবার ছাত্র।"

ডিউইর এই প্রয়োগমূলক নীতি হইতেই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার জন্ম। শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য এবং বাস্তবজীবনের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা

থাকা চাই। এই জন্য তিনি ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-লব্ধ ক্ষমতার উপর তাঁহার শিক্ষানীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। ডিউইর শিক্ষায় এই প্রয়োগ-বাদনীতির সহিত গান্ধীজির ব্যবহারিক শিক্ষানীতির কিছুটা মিল দেখা যায়। গান্ধীজিও হাতে-কলমে কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন।

ডিউইর মতে, জীবন একটি অখণ্ড, অবিভাজ্য সত্তা। প্রতিনিয়ত জীবন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে তাহা কেবলমাত্র কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নহে বরং এই অভিজ্ঞতা প্রবাহই জীবন এবং এই অভিজ্ঞতাই শিক্ষা। তাঁহার মতে, শিক্ষা কোন অপ্রাকৃত বা অবাস্তব দর্শনের তত্ত্বকথার 'ফুলঝুরি' নহে—বরং, যেহেতু ইহা জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্য ও নিবিড় বন্ধনে জড়িত, সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতাই ইহার ভিত্তি।

জর্জ ওয়াশিংটন ও আব্রাহাম লিঙ্কনের দেশের মানুষ হিসাবে যে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে জন্ ডিউই বড় হইয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষাদর্শনেও সেই কাঠামোর ছায়াপাত আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হইল —শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সার্থক প্রয়োগ ও বাস্তব রূপায়ণ। বহু বৎসর পূর্বে আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "গণতন্ত্র হইতেছে একপ্রকার জনগণের শাসন ব্যবস্থা, যাহা জনগণের দ্বারা রচিত এবং জনগণের জন্যই অভিপ্রেত।" আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার গণতান্ত্রিক মূল্যায়ন করিতে গিয়া ডিউই উপরোক্ত মন্তব্যটিকে কিছুটা পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, "শিক্ষা হইল অভিজ্ঞতার জন্য, অভিজ্ঞতার দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।" এই গ্রন্থের 'জীবনে শিক্ষার অপরিহার্যতা' অনুচ্ছেদে 'অভিজ্ঞতা' সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ও সহজ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"সমাজ-জীবন শুধু তার স্থায়িত্বের জন্যই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দাবী করে না; পরন্তু একসঙ্গে বসবাস করার প্রণালীটাই শিক্ষাপ্রদ। এতে অভিজ্ঞতা পরিবর্ধিত হয়, অভিজ্ঞতার উপর নতুন আলোকপাত হয়, কল্পনা উদ্দীপ্ত ও সমৃদ্ধ হয়। তাছাড়া, নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এবং বক্তব্য চিন্তাকে সুস্পষ্ট ও মূর্ত করতেও এর প্রয়োজন। যে ব্যক্তি দেহ ও মনে একা একা বাস

করে, তাঁর পক্ষে অতীত অভিজ্ঞতার তাৎপর্য বের করার জন্য কোনো বিচার-বিবেচনার দরকার হয় না। পরিণত ও অপরিণত লোকদের কর্ম-ক্ষমতার অসমতা কেবল যে অপরিণতদের শিক্ষাদানের আবশ্যকতা সূচিত করে তা নয়, পরন্তু এই আবশ্যকতাই অভিজ্ঞতাকে এমন একটি রূপ ও শৃঙ্খলা দিতে উদ্বুদ্ধ করে যে, তাতে করে অভিজ্ঞতার সহজতম প্রকাশ ও সর্বোত্তম ব্যবহারও ঘটে।"

এই গ্রন্থের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়া জন্ ডিউই এই সত্যটিকেই তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন যে, মানুষ হইতেছে সামাজিক জীব এবং ধারাবাহিক সমাজজীবনই শিক্ষা। শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া (Education is a social process)। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সামাজিক পটভূমিকায় মানুষ তাহার জীবনকে পুনর্গঠন করে—নূতন করিয়া আরম্ভ করে। 'The aim of education is more education.' শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার বাহিরে কোন শিক্ষা নাই এবং শিক্ষার বাহিরে শিক্ষার কোন লক্ষ্য নাই। শিক্ষা হইল—পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার মত একটি পরিবর্তনশীল ও গতিশীল (dynamic) প্রক্রিয়া। ইহা হইল একটি চিরপ্রবাহী প্রক্রিয়া যাহার গতি ব্যক্তির শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী প্রবাহমান। আমাদের গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।" ডিউই বলিয়াছেন, "Education is, therefore, a process of living, not a preparation for future living." শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য 'অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য' সিদ্ধির প্রস্তুতি নহে। ইহা বর্তমান জীবনধারারই অঙ্গ বিশেষ।

জন্ ডিউই শিক্ষাকে সর্বপ্রথম বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখিতে চাহিয়াছেন। কমেনিয়াস্ হইতে স্পেনসার পর্যন্ত তাঁহার পূর্বসূরীরা প্রত্যেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত ও আদর্শের কথা বলিলেও শিক্ষাকে সামাজিক তথা গণতান্ত্রিক পটভূমিকার মত বৃহত্তর কোন পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেন নাই। ইহা ছাড়া, শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদের মত পার্থক্য থাকিলেও তাঁহারা সকলে এ-বিষয়ে একমত ছিলেন যে জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষা ছাড়া উহা অসম্ভব। ডিউই ছিলেন ইহার

ব্যতিক্রম। তাঁহার মতে, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য শিক্ষা উপকরণ মাত্র নয়, পরন্তু শিক্ষাই জীবন। আবার এই সত্য তো প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না যে, জীবন ও ব্যক্তি-মানুষ, এবং ব্যক্তি-মানুষ ও মানুষের সমাজ প্রতিদিনই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। সুতরাং মানুষকে কেন্দ্র করিয়াই জীবন ও সমাজ আবর্তিত হইতেছে। এইভাবেই ব্যক্তি-মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে যে ভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি করিয়াই শিক্ষার মাধ্যমে বর্তমান সমাজও ভাবী সমাজকে প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং জীবন-দর্শন ও শিক্ষা একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

শিক্ষার এই ধারণা সমূহ পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিউই বিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও নূতন করিয়া চিন্তা করিলেন। এতদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র গড়িয়া উঠে নাই। বরং শিক্ষাকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই এত কাল দেখা হইয়াছে। কিন্তু ডিউই যখন বলিলেন যে শিক্ষা হইবে সমাজকেন্দ্রিক, তখন স্বাভাবিক-ভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও তিনি বলিলেন যে এগুলিও সমাজের ধ্যান ধারণা লইয়াই গড়িয়া উঠা দরকার। তিনি আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, বিদ্যালয়কে সমাজের 'ক্ষুদ্র সংস্করণ' (society in miniature) হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। তিনি বলিলেন,—"The school is a simplified, purified and better balanced society." বাহিরের সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয় সমাজের কিছুটা পার্থক্য থাকা দরকার। বর্তমান সমাজজীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আবর্তসঙ্কুল। শত সহস্র অনাচার, অবিচার, পাপ ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বাঁধিয়াছে। ইহা ব্যতীত, বাস্তব সমাজে ধন, জন, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি লইয়া কতই না বিভেদ! এই কারণেই বিদ্যালয়-সমাজকে এই সকলের উর্ধ্বে থাকিতে হইবে, অন্যথায় ভাবীকালের সমাজকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিতে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা কোন কাজেই আসিবে না। সুতরাং বিদ্যালয়-সমাজকে হইতে হইবে—সমাজের একটি সরল, বিশুদ্ধ ও মার্জিত প্রতিরূপ মাত্র।

ডিউইর এই অমূল্য গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গিয়া লেখক শ্রীযুক্ত

সৌরীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম, ধৈর্য, সাহস ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। যে সকল পাঠকেরা ইংরাজী ভাষার উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে (বর্তমানে যাঁহাদের সংখ্যা অনেক বেশী) এই বিরাট ও মহৎ গ্রন্থের স্বাদ আস্বাদনে বঞ্চিত; আশা করি, তাঁহাদের নিকট এবং অন্য সকলের নিকটও এই অনুবাদ সাহিত্য যথেষ্ট সমাদরের সহিত গৃহীত হইবে।

ইহা ব্যতীত, বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ শাখাতেও এই গ্রন্থ, আশা করি, একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনের মর্যাদা লাভ করিবে। ইংরাজীর নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের বাংলা ভাষায় বহু অনুবাদ হইলেও বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থ সমূহের এখনও পর্যন্ত সেরূপ উল্লেখযোগ্য কোন অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমার বিশ্বাস, লেখকের প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিকতা অবশ্যই পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে, এবং এই গ্রন্থ জন্ ডিউই সম্বন্ধে বাংলা দেশের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের আরও অধিক সচেতন করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে।

কে. কে. মুখার্জি
প্রফেসর অ্যানড্ হেড্ অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট
অব্ এডুকেশন্ ও ডীন্ অব্ দি ফ্যাকাল্টি
অব্ এডুকেশন্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩৫৮

গ্রন্থকারের ভূমিকা

গণতান্ত্রিক সমাজ যে ধারণাবলীর ইঙ্গিত আনে, তার অনুসন্ধান ও বর্ণনা করার পরে শিক্ষা অভিযানের সমস্যাগুলিতে সেই ধারণাবলীকে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জনশিক্ষার গঠনমূলক উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির যে রূপটি নজরে আসে, এবং প্রাচীন সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার অধীনে জ্ঞান ও নৈতিক বিকাশের যে সমস্ত তত্ত্ব সূত্রবদ্ধ করা হয়েছিল, পরন্তু যেগুলি এখনকার নামেমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজগুলির মধ্যেও সক্রিয় থেকে গণতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ ব্যাহত করছে, এই গ্রন্থে সে সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের মধ্যেই দেখা যাবে যে, এতে যে দর্শনটির বর্ণনা করা হয়েছে সেটিতে গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি, জীববিজ্ঞানের প্রগতিমূলক ধারণাবলী এবং শ্রমশিল্পীয় সংগঠনের বিভিন্ন যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে; এবং এই সমস্ত পরিস্থিতি বশে শিক্ষার বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতিতে যে সকল পরিবর্তন এসেছে, দর্শনটি তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তৎপর রয়েছে।

শিক্ষক কলেজের ডক্টর গুড্‌সেলের কাছে তাঁর সমালোচনার জন্য আমি কৃতজ্ঞ; ঐ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক কিল্‌প্যাট্রিকের সমালোচনা এবং বিষয় সমাবেশ সম্বন্ধে উপদেশের জন্য আমি কৃতজ্ঞ; আমি সচ্ছন্দে তার সাহায্য নিয়েছি। বহু সমালোচনা ও উপদেশের জন্য আমি মিস্‌ এল্‌সি রিপ্‌লির কাছেও কৃতজ্ঞ। প্রথমোক্ত দু'জনের কাছে আমি প্রুফ্‌ দেখার জন্যও কৃতজ্ঞ। পর পর অগণিত ক্লাশের বহু শিক্ষার্থীর কাছেও আমি আত্যন্তিকভাবে ঋণী।

অনুবাদকের নিবেদন

গণতন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্রের অগভীর ব্যাখ্যা এই যে, যারা নির্বাচন করেন তারা যদি শিক্ষিত না হ'ন তাহলে জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার সফলকাম হতে পারে না। কিন্তু এর গভীর ব্যাখ্যা এই যে, গণতন্ত্র হ'ল আদান-প্রদানমূলক অভিজ্ঞতা সূত্রে এক রকমের সঙ্ঘবদ্ধ ও সম্প্রসারণশীল জীবনযাত্রা—সম্প্রসারণশীল, কারণ গণতান্ত্রিক গুণ সেই সমাজেরই প্রয়োজন যারা "সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে উন্নতিগামী হতে থাকে, এবং যাদের সাথে অন্য যে সব সমাজ তাদের রীতিনীতির সংরক্ষণের প্রতিই লক্ষ্য রাখে তাদের পার্থক্য থাকে" (এই গ্রন্থে)। অভিজ্ঞতা শব্দটিকে প্রচলিত ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হল।

সমাজে নবাগতদের ক্রমবর্ধমান অন্তর্ভুক্তির ফলে একদিকে যেমন বিচিত্র ব্যক্তিগত মেধা ও সামর্থ্য দেখা দেয়, অন্যদিকে তেমনি জীবিকার ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে নানাবিধ অনুধাবনও দেখা দেয়। ফলে অভিজ্ঞতা বাড়তে ও বদলাতে থাকে। সেই সঙ্গে সমষ্টিগত আদান-প্রদান এবং জীবনযাত্রার গুণ ও মানও বদলাতে ও বাড়তে থাকে। ব্যক্তিগত সামর্থ্যের বিকাশ এবং সমষ্টিগত আদান-প্রদান সূত্রে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করাই গণতান্ত্রিক সমাজের দু'টি বিশিষ্ট গুণ। এরূপ সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাকে তার প্রতি-পাল্যদের মধ্যে এই দু'টি গুণেরই বিকাশ সাধন করাতে হয়।

জন্ ডিউই প্রয়োগবাদী দার্শনিক। দর্শনে প্রয়োগবাদের অর্থ এই যে, কোনো ধারণার যথার্থতাকে সেটির ব্যবহারিক মূল্য বা কার্যকরতা দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে—ফলাতে হবে। তাঁর দর্শনে "গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষমূলক পদ্ধতি, জীববিজ্ঞানের প্রগতিমূলক ধারণা-বলী এবং শ্রমশিল্পীয় সংগঠনের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে" (গ্রন্থকারের

ভূমিকা এবং ৪৩৭-৪৪০ পৃঃ)। উল্লিখিত যোগসূত্রাদির মূলকথা "নিরবচ্ছিন্নতা"। তাঁর শিক্ষাব্যবস্থাতেও নিরবচ্ছিন্নতার ধারণাটি পরিস্ফুট। "আমাদের তত্ত্বটি নিরবচ্ছিন্নতাকে স্বীকৃতি দেয়। অন্য তত্ত্ব ক'টি কোনো মৌলিক বিভাজন, বিচ্ছেদ ও বিরোধাভাসের উল্লেখ বা ইঙ্গিত করে। কারিগরি ভাষায় এদের দ্বৈতবাদ বলা হয়। যে সুকঠিন ও সুদৃঢ় প্রাচীর বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এবং একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীকে চিহ্নিত করে তার মধ্যেই আমরা এই ভাগবিভাগের উৎপত্তি দেখেছি···। এ সব প্রতিবন্ধকের অর্থ দাঁড়ায় স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত আদান-প্রদানের অভাব" (এই গ্রন্থে, ৪৩৩পৃঃ)। নিরবচ্ছিন্নতার ধারণা নতুন নয়। তবে প্রয়োগবাদী দার্শনিকের নিরবচ্ছিন্নতা স্থান ও কাল নির্বিশেষে জগৎ ও জীবনের গতি-প্রগতির সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত। নিম্নের তিনটি উদ্ধৃতিতে নিরবচ্ছিন্নতার অর্থব্যাপকতা আরও স্পষ্টরূপে দেখা যাবে। এর প্রথমটি ব্যক্তি ও সমাজ প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়টি বিজ্ঞান ও সমাজ প্রসঙ্গে, এবং তৃতীয়টি প্রকৃতি, ব্যক্তি, সমাজ ও শিক্ষাকে জড়িয়ে :

(১) "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, এর ব্যতিক্রমে মৃত্যু, পালনে অমরত্ব" (স্বামী বিবেকানন্দ : বর্তমান ভারত, ৩০ পৃঃ)।

(২) "কিন্তু বিজ্ঞান যে ধরনে সমাজকে প্রভাবিত করে তা কেবল বৈষয়িক নয়। দার্শনিক ও রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও শিল্পীয়, অন্যান্য সকল মানবীয় চিন্তা ও কর্মের উপরেও বিজ্ঞানের ধারণাবলীর গভীর প্রভাব থাকে। বিজ্ঞানের ধারণাবলী কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক যুক্তির সহজ ফলটিই নয় ; প্রথমে, পূর্বকালীন সামাজিক ও বৌদ্ধিক পশ্চাদ্ভূমি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে, এবং অনেক সময় কেবল আংশিক রূপান্তরিত হয়ে, যা-কিছু আসে বিজ্ঞানের ধারণাবলী তার থেকেই আহৃত হয়। নিউটন্ আবিষ্কৃত বিশ্ব-প্রাকৃতিক নিয়মটির ধারণার ক্ষেত্রে এইরূপই হয়েছিল ; সে ধারণাটি কোনো প্রভুত্বব্যঞ্জক সরকারের স্থানে বিধানসম্মত সরকার

গঠনের প্রতিবিম্ব ছিল; কিম্বা ডারউইন্ আবিষ্কৃত অভিব্যক্তিবাদের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ও 'স্থিতির সংগ্রাম' তত্ত্বের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল, এ ধারণাটি চরম পুঁজিবাদী যুগের অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিবিম্ব ছিল। কিন্তু যদিও এই ধারণাবলী পূর্ববর্তী সমাজ কাঠামোর থেকেই জাগে. এরা একবার বিজ্ঞানে এলে এবং বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হলে, নব বলে বলীয়ান ও রূপান্তরিত হয়ে সামাজিক প্রথাকে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি দেয়, এ্যারিস্টোটেলের বিশ্বচিত্র থেকে আরম্ভ করে ইতিহাসে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত মেলে" (বার্ণ্যাল, জে, ডি, : সাইন্স্ ইন্ হিস্টরি, ৮৭৬ পৃঃ)।

(৩) "জীবনবিকাশ তত্ত্ব এই দর্শনেরই সাক্ষ্য দেয়—দেখিয়ে দেয় যে, মানুষ বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গেই নিরবচ্ছিন্নরূপে চলমান, সে বার থেকে প্রকৃতির মধ্যে ঢুকে পড়েনি। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি দেখিয়ে দেয় যে, সামাজিক প্রয়োগের স্বার্থে বস্তু নিয়ে কাজ করার ফলে যে সব ধারণা আসে সেই সব ধারণা অনুযায়ী ভৌত শক্তিপুঞ্জকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা থেকেই জ্ঞান আসে।...সমাজ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপ—ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বলিত বিদ্যা - দেখিয়ে দেয় যে, সামাজিক প্রশ্নগুলির সঙ্গে বুদ্ধিমানের মতো সেই মাত্রাতেই যোঝা যায় যে মাত্রায় আমরা তথ্য সংগ্রহ, অনুমান গঠন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের পন্থা অনুযায়ী এই অনুমানকে কার্যত পরীক্ষা করি, এবং যে মাত্রায় আমরা পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের কারিগরি জ্ঞানকে সমাজ-কল্যাণের উন্নতিবিধান কল্পে কাজে লাগাই।...শিক্ষাব্যবস্থার উচিত কাজ হল, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্বলিত বিভিন্ন মানবিক বিষয়কে আড়া-আড়ি রেখে উভয়বিধ পাঠকেই সমৃদ্ধ করা।" (এই গ্রন্থে, ৩৭১-৩৭২ পৃঃ)।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নিরবচ্ছিন্নতার ধারণাটি সক্রিয় এবং সদর্থক। এটি দূর দূর বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করার আবেদন জানিয়ে প্রাসঙ্গিক অতীতানুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্ররোচিত করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ তথ্যাবলী মূর্ত অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। অভিজ্ঞতায় চিন্তনের প্রয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতার উপাদানগুলির যোগসূত্রাদি

আবিষ্কৃত হয়। অভিজ্ঞতা ও যোগসূত্রাদিকে বিমূর্ত ও সামান্যীকৃত করে যা পাওয়া যায় তাই জ্ঞান। এরূপ "জ্ঞানের ধর্ম হ'ল কোনো একটি অভিজ্ঞতাকে আর একটি অভিজ্ঞতার মধ্যে স্বচ্ছন্দরূপে প্রাপ্তব্য করা" (এই গ্রন্থে)। এরূপ জ্ঞান যেমনই সক্রিয় তেমনই নিরন্তর আবিষ্কার, প্রয়োগ ও বিকাশধর্মী।

এই গ্রন্থের 'প্রাক্‌কথনে' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ-প্রধান এবং বিভাগীয় পরিচালক অধ্যাপক কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুবাদের মূল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের আপেক্ষিক মূল্যায়ন করেছেন। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে তিনি একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। প্রাক্‌কথনে তিনি লিখেছেন, "তাঁহার (ডিউইর) রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'গণতন্ত্র ও শিক্ষা'...নামক পুস্তকখানিই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।" তিনি আরও লিখেছেন, "...সর্বদেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় জন্ ডিউইর শিক্ষানীতি ও দার্শনিক চিন্তাধারা গৃহীত হইতেছে।" আমি স্বীকার করছি যে, এই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি শেষ হওয়ার পরেও আমার এ দু'টি কথা জানা ছিল না। মূল ইংরাজি গ্রন্থে প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়ের, জীবিকা ও সংস্কৃতির, বৃত্তি ও তত্ত্বের অপূর্ব, আমার জ্ঞানে অভূতপূর্ব,—সমন্বয় দেখেই আমি এর অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছি। এবং তার প্রথম উৎস ছিল গ্রন্থকারের বক্তব্যকে অধিকতর সুসঙ্গতরূপে হৃদয়ঙ্গম করার প্রবল আগ্রহ। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি কথা মনে এসে এই সঙ্কল্পকে দৃঢ় করেছে। সেগুলি এইরূপ :

(১) এই গ্রন্থে বর্ণিত প্রাচীন ঐতিহ্যিক ভাবধারার সঙ্গে আমাদের সমাজের কোনো কোনো সনাতন প্রথার বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায় (এই গ্রন্থের ১১৭-১১৮ পৃঃ, ৩২৯-৩৩২পৃঃ ; ৩৪২-৩৪৭পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

(২) এই গ্রন্থে যে শিক্ষা সমস্যাটি তুলে ধরা হয়েছে সেটি যেন আমাদেরই বর্তমান শিক্ষাসমস্যা : "বর্তমানে যদি শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের বিশেষ প্রয়োজনবোধ হয়ে থাকে, যদি এই প্রয়োজনবোধ চিরাচরিত দার্শনিক তন্ত্রগুলির পুনর্বিবেচনাকে ত্বরান্বিত করে থাকে, তার কারণ হল, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শ্রমশিল্পীয় বিপ্লব এবং গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে

জীবনের সর্বব্যাপী পরিবর্তন" (৪৩০ পৃঃ)। বাঞ্ছিত পরিবর্তনের স্বরূপটিও যেন পরোক্ষভাবে এই কথার মধ্যে নিহিত রয়েছে: "যে সমাজ শ্রমশিল্পীয় অনুধাবনে ব্যাপৃত হয়েছে, ব্যবসাবাণিজ্য সক্রিয় হয়েছে, তারা জীবনের প্রয়োজন ও সম্ভাবনাদির যে রূপটি দেখবে, উচ্চমানের সৌন্দর্যবোধীয় কৃষ্টিসম্পন্ন আর একটি দেশ, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে যন্ত্রকৌশলী তহবিলে পরিণত করার প্রচেষ্টা যাদের খুব কমই আছে, তারা তার সে রূপটি দেখবে না" (৪২৬ পৃঃ)।

(৩) মহাত্মা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন প্রমুখ "নয়া তালিমের" শিক্ষাব্যবস্থার, বিশেষ করে গান্ধীজির প্রথম শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে, জন ডিউইর শিক্ষাচিন্তার মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায় (এই গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়, ২৫৪-২৭০পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে সে ব্যবস্থার পেছনে তাত্ত্বিক সমর্থন ও সরকারী উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও সেটি যে কেন সফল হয়নি, এবং "বেসিক স্কুলের" গোড়ার গলদ্ কোথায় তার খবরও পাওয়া যায় এই গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে। ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের গাদা-গাদি করে বা নতুন ধরনের বিদ্যালয় করে বর্তমান ব্যর্থতার প্রতিকার-চেষ্টার সমালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মৌলিক প্রশ্নটি দেখা যাবে, ৩২১-৩২৪ পৃষ্ঠায়।

(৪) রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিও এই অনুবাদে উৎসাহ যুগিয়েছে: "অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন—দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক; বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক" (রবীন্দ্রনাথ: শিক্ষা, ৩২৬ পৃঃ)।

ডিউইর শিক্ষাব্যবস্থায় বিকাশের মূলনীতি নিম্নলিখিত বাক্যে কেন্দ্রীভূত: "যখন তরুণেরা কোনো সমাজভিত্তিক ও ব্যবহারিক কর্মতৎপর নিয়োজন নিয়ে শিক্ষা আরম্ভ করে, এবং বৃহত্তর অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদত্ত ধারণা ও তথ্যাবলী তরুণদের অধিকতর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে আত্মীকৃত হয়ে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও নিয়মের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত

সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখনই সদর্থক মূলনীতি বজায় থাকে" (এই গ্রন্থে, ২৫৩ পৃঃ)। (আরও দেখুন, ৪৬৫-৪৬৬ পৃঃ)

এই অনুবাদে সাহিত্য সংসদের ইংরাজি-বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা অভিধান এবং চলন্তিকা ব্যবহার করা হয়েছে। পারিভাষিক শব্দও এদের থেকেই নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের বদলে অন্য শব্দ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে ভূতাপেক্ষ'র বদলে অতীতানুসন্ধানী, প্রতিন্যাসের বদলে ভঙ্গি বা দৃগ্‌ভঙ্গি, আবিষ্কারের অন্যতম অর্থে উদ্‌ঘাটন্, অস্মিতার বদলে ব্যক্তিত্ব, তত্ত্বের অন্যতম অর্থে মূলনীতি, সংপ্রত্যক্ষ'র বদলে সম্বোধি। কয়েকটি নতুন বাক্যাংশ প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে, শেখা প্রসঙ্গে "চেষ্টা ও ত্রুটি পদ্ধতি", শেখানো প্রসঙ্গে "ঝোল-রসই পদ্ধতি", রাষ্ট্র-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে "প্রতিরোধ-প্রতিমান তত্ত্ব", শারীরবৃত্ত-প্রসঙ্গে "সংজ্ঞাবহ ও ক্রিয়াবাহী অঙ্গ," এবং সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞান প্রসঙ্গে "সংজ্ঞাবহ বেদন ও ক্রিয়াবাহী প্রতিবেদন।" পুস্তকের শেষাংশের অনুক্রমণীতে এদের খোঁজ মিলবে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধরাম চক্রবর্তী মহাশয় প্রচুর ধৈর্য সহকারে এই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করেছেন। এ জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রফেসার অ্যান্‌ড্ হেড্ অব্ দি ডিপারটমেণ্ট অব্ এডুকেশন ও ডীন্ অব্ দি ফ্যাকাল্‌টি অব এডুকেশন", কে. কে. মুখার্জি মহাশয় তাঁর বিদ্বজ্জনসুলভ প্রাক্‌কথন্ দিয়ে এই অনুবাদকে সমৃদ্ধ ও অলংকৃত করেছেন। তিনি এর পক্ষে স্বাগত ভাষণও দিয়েছেন। আমি নতশিরে তাঁকে প্রণতি জানাই।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ রায়

গণতন্ত্র ও শিক্ষা

সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষাতত্ত্বে লক্ষ্য সন্ধান :

নবম অধ্যায়

লক্ষ্য হিসাবে স্বাভাবিক বিকাশ ও সামাজিক কৃতিত্বের স্থান :

দশম অধ্যায়

স্বার্থবোধ ও শৃংখলা :

একাদশ অধ্যায়

অভিজ্ঞতা ও চিন্তন :

দ্বাদশ অধ্যায়

শিক্ষায় চিন্তন পদ্ধতি :

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পদ্ধতির স্বরূপ :

চতুর্দশ অধ্যায়

বিষয়-বস্তুর স্বরূপ :

পঞ্চদশ অধ্যায়

পাঠক্রমে খেলাধূলা ও কাজকর্ম :

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

উনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

বুদ্ধিগম্য ও ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয় :

একবিংশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পাঠ্য বিষয় : প্রকৃতিবাদ ও মানবতাবাদ :

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ব্যক্তি ও জগৎ :

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শিক্ষার বৃত্তিগত রূপ :

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শিক্ষা দর্শন

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জ্ঞানের তত্ত্বাবলী :

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

নীতি-তত্ত্বাবলী :

"জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। * * * যাহা পরিচিত, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থরূপে আয়ত্ত করিতে শিখিলে, তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।"

—রবীন্দ্রনাথ

১৩৫৮

শিক্ষা দর্শনের সংক্ষিপ্ত ধারা

প্রথম অধ্যায়

জীবনে শিক্ষার অপরিহার্যতা

১। **প্রবহণের মাধ্যমে জীবনের নবীকরণ**

জড় ও জীবনের মধ্যে সর্বাধিক লক্ষণীয় পার্থক্য হ'ল এই যে, জীবন নবীকরণের মাধ্যমে নিজ সত্তা বজায় রাখে। পাথরে ঘা দিলে প্রতিরোধ আসে। কিন্তু যদি তার প্রতিরোধ-শক্তি ঘা-মারার শক্তি থেকে বেশী হয়, তা হ'লে সেটি বাহ্যতঃ অপরিবর্তিত থাকে। অন্যথায়, তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। পাথর কখনো সে রকমের প্রতিক্রিয়া করতে চেষ্টা করে না, যাতে করে সে আঘাতের বিরুদ্ধে নিজের সত্তা বজায় রাখতে পারে। আর ঐ আঘাতকে তার স্থিতিশীল সহায়ক উপাদানে পরিণত করার চেষ্টার তো কথাই ওঠে না। অন্যদিকে একটি জীবন-সত্তা কোনো এক বৃহত্তর শক্তির প্রভাবে সহজে নিষ্পেষিত হওয়া সত্ত্বেও, সে ঐ শক্তিকে নিজের অধিকতর স্থায়িত্বের উপায়রূপে পরিবর্তিত করতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। তা না করতে পারলে, সে কেবল খণ্ডে খণ্ডেই বিভক্ত হয় না, পরন্তু জীবন-বস্তু হিসাবে তার সত্তাই লোপ পায়। অন্ততঃ উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই কথাই খাটে।

জীবন আজীবন পারিপার্শ্বিক শক্তিপুঞ্জকে নিজ স্বার্থে প্রয়োগ করতে সংগ্রাম করে। সে,—জল, মাটি, আলো ও বাতাস, তার ব্যবহারে লাগায়। এর অর্থ এই যে, সে ঐ জিনিসগুলোকে নিজের সংরক্ষণের অবলম্বনরূপে পরিবর্তিত করে। একটি জীবন-সত্তা যতোদিন ধরে বাড়তে থাকে ততোদিনই সে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কাজে লাগায়। এবং তার জন্য যে পরিমাণ শক্তি সে খরচ করে, সে খরচের তুলনায়, অনেক গুণ বেশী শক্তি, সে তার জমার ঘরে সঞ্চিত করে। ফলে সে পুষ্টিলাভ করে। নিয়ন্ত্রণ করাকে এই অর্থে ধরলে আমরা বলতে পারি যে, যে শক্তিপুঞ্জ অন্য অবস্থায় একটি

জীবনকে নিঃশেষ করে ফেলত, জীবনের গতিশীল সক্রিয়তা বজায় রাখার জন্য যা-কিছুই *সেই শক্তিপুঞ্জকে নিজের ক্ষমতার বশবর্তী করে এবং নিয়ন্ত্রিত* করে, তাই হ'ল জীবিত-সত্তা। সুতরাং জীবন হ'ল, পারিপার্শ্বিকের উপরে ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্ম-নবীকরণ।

উচ্চতর প্রাণীদের পক্ষে এই প্রণালীকে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না। কিছুকাল পরে তারা হার মানে,—মরে যায়। একটি জীবন অনির্দিষ্ট কাল ধরে আত্ম-নবীকরণের গুরুভার বহনে অসমর্থ। কিন্তু জীবন-প্রবাহ কোনো একটি বিশেষ জীবনের দীর্ঘস্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে না। অন্যান্য প্রকারের জীবন-প্রজনন অবিচ্ছেদ্য ধারায় চলতে থাকে। যদিও ভূ-বিদ্যা বলে যে শুধু ব্যষ্টিই নয়, একটি গোটা সমষ্টিও বিলোপ হয়ে যায়, তবুও জীবনধারা ক্রমাগতই জটিল থেকে জটিলতর আকারে পরিবর্তিত হয়ে চলতে থাকে। যে সব বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে কোনো কোনো প্রজাতি যেমন একদিকে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তেমনি সেই সব বাধাবিঘ্নকেই কাজে লাগানোর উপযুক্ত অধিকতর উন্নত ধরনের আকৃতিসম্পন্ন জীবের উদ্ভব হ'ল। জীবনের নিরবচ্ছিন্নতার অর্থ হ'ল, জীবিত-সত্তার প্রয়োজনে পারিপার্শ্বিকের নিরন্তর অভিযোজন।

এতক্ষণ আমরা জীবনের নিম্নতম পর্যায়ের কথা,—জীবনের ভূত-বস্তুর কথা বলেছি। কিন্তু আমরা জীবন শব্দটি প্রয়োগ করি অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ ক্ষেত্র নির্দেশ করতে,—ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত উভয় ক্ষেত্রেই। আমরা যখন "লিঙ্কনের জীবনী" নামক গ্রন্থখানি দেখি, তখন তার মধ্যে দেহ-তত্ত্বের অবতারণা দেখবার আশা করি না,—আশা করি পূর্ববর্তী সামাজিক অবস্থা, তাঁর বাল্যাবস্থার পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা দেখবার; তাঁর পরিবারের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও কর্ম-জীবন; তাঁর চরিত্রের ক্রমবিকাশের অন্তর্গত প্রধান প্রধান অনুকাহিনী, তাঁর সুচিহ্নিত সংগ্রাম ও কৃতকার্যতা। দেখবার আশা করি, ব্যক্তি হিসাবে লিঙ্কনের নানা আশা, রুচি, আনন্দ ও ক্লেশ। ঠিক এই ভাবেই আমরা বর্ণনা করি একটি আদিম সমাজের কথা,—এথেন্সের জনগণের কথা, আমেরিকার জাতীয় অধিবাসীদের কথা ইত্যাদি। "জীবনী" শব্দটির ব্যাপ্তির মধ্যে এসে পড়ে নানাবিধ রীতিনীতি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, জয়-পরাজয়, অবসর-বিনোদন, বৃত্তি—সব কিছুই।

অভিজ্ঞতা শব্দটিকেও আমরা অনুরূপ গূঢ় অর্থে প্রয়োগ করি এবং নবীকরণের-মাধ্যমে-নিরবচ্ছিন্নতা নিয়মটি, জীবনের নিছক "দৈহিক" অর্থে যেরূপ প্রযোজ্য, অভিজ্ঞতার অর্থেও তেমনি। মানুষের ক্ষেত্রে, দৈহিক নবীকরণের সঙ্গে নানাবিধ বিশ্বাস, আদর্শ, আশা, সুখ, দুঃখ, কাজকর্ম ও পুনর্গঠন করাও জড়িত থাকে। সমাজ-সমষ্টির পক্ষে, নবীকরণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার অবিরাম গতিশীলতা কথাটি, আক্ষরিকভাবে সত্য। ব্যাপকতম অর্থে, শিক্ষাই হল এই সামাজিক গতিশীলতার সুনির্দিষ্ট মাধ্যম। যেমন আধুনিক নগরাঞ্চলে, তেমনি আদিম উপজাতিদের মধ্যে, সমাজ-সমষ্টির প্রতিটি মৌলিক সত্তাই জন্মগ্রহণ করে,—একটি অনভিজ্ঞ, অপারগ, ভাষাহীন, নীতিজ্ঞানহীন অবস্থা নিয়ে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক অংশ, জীবন-অভিজ্ঞতার বাহকরূপে, পরিশেষে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু জীবন-প্রবাহ চলতেই থাকে।

একটি সমাজের সভ্যদের প্রত্যেকেরই জন্ম-মৃত্যু আছে। এই মুখ্য ও অকাট্য সত্যই সমাজের সভ্যদের শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্যতা নির্দেশ করে। সমষ্টিগত জীবনের একমাত্র বাহক, নবজাত সভ্যদের অপরিণত অবস্থা, এবং সমষ্টিগত জ্ঞান ও রীতিনীতির ধারক, বয়স্ক সভ্যদের পরিণত অবস্থার, একটা বিশেষ পার্থক্য থাকে। অন্যদিকে, উপযুক্ত পরিমাণ অপরিণত সভ্যদের শুধু দৈহিক সংরক্ষণ করলেই চলে না। পরিণত বয়স্ক সভ্যদের বিভিন্ন স্বার্থ, উদ্দেশ্য, জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মসংস্থার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাবার আবশ্যকতাও থাকে। অন্যথায় সমষ্টি তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন হারিয়ে ফেলে। এমন কি একটি আদিম উপজাতির ক্ষেত্রেও, অপরিণত লোকদের যদি কেবল প্রকৃতির উপরেই ফেলে রাখা হয় তা হ'লে তারা কোনো কালেই বড়োদের ক্রিয়াকাণ্ড করার উপযুক্ত হবে না। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরিণত লোকদের প্রাথমিক সামর্থ্য এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের রীতিনীতি ও মানদণ্ডের মধ্যের ব্যবধান ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। এ রকম অবস্থায় কেবল দৈহিক পুষ্টি ও জীবনধারণ করার উপযুক্ত প্রয়োজনগুলি কোনো রকমে মেটাবার ক্ষমতাই সমষ্টিগত জীবন পুনর্গঠন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হয়, সুবিবেচিত প্রচেষ্টা ও চিন্তাশীল প্রযত্নের। যারা জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসে, সেই নবজাতকদের দল, গোষ্ঠীর বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও আচরণ সম্বন্ধে কেবল যে অজ্ঞই থাকে তা নয়, তারা সেগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনও থাকে।

কাজেই তাদিকে ঐ সব উদ্দেশ্য ও আচরণবিধি জানাতে হয় এবং ঐগুলির প্রতি তাদের উদ্‌যোগ এবং অনুরাগও জাগাতে হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা—একমাত্র শিক্ষাই,—এই দীর্ঘ ব্যবধানের দুই প্রান্ত জুড়ে দিতে পারে।

একটি জৈবিক প্রাণের মতো, একটি সমাজের প্রাণও প্রবহণ-প্রণালীর মাধ্যমেই বজায় থাকে। প্রাচীন এবং নবীনের সঙ্গে কর্ম, চিন্তন ও বোধশক্তি প্রভৃতি অভ্যাসগুলির প্রকাশ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমেই এই প্রবহণ সংসাধিত হয়। সমাজ থেকে যারা অপসারিত হয়ে যান, তাদের নানাবিধ লক্ষ্য, আচরণ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, মতামত ও ধারণাবলী, সমাজের মধ্যে যারা আসতে থাকেন তাদের কাছে জ্ঞাপন করা না হ'লে সমাজ জীবন্ত থাকে না। যাঁরা সমাজ পত্তন করেন, তাঁরা যদি চিরদিন বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে হয়ত তাঁরা নবজাতকদের শিখিয়ে নিতেন, কিন্তু সে কাজ চলত ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য,—সমাজের প্রয়োজনে নয়। এ অবস্থায় শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

যদি কোনো মহামারী একটি সমাজের সকলকেই ধুয়ে মুছে নিয়ে যেত, তা হ'লে স্পষ্টতঃই সে গোষ্ঠী চিরতরে বিলুপ্ত হতো। যে কোন সমাজের প্রতিটি সভ্যের মৃত্যুও মহামারী-আক্রান্ত একটি গোষ্ঠীর জীবনধারার আকস্মিক বিলুপ্তির মতোই সুনিশ্চিত। কিন্তু বয়সের ক্রমপর্যায়ে, কিছু লোক যেমন মরে, কিছু লোক তেমন জন্মায়। এ জন্য কর্ম ও কল্পনার প্রবহণ-সূত্রে, বস্ত্রের মতোই, সমাজেরও অবিরাম পুনর্বয়ন চলতে থাকে। কিন্তু এই নবী-করণ স্বয়ংক্রিয় নয়। যদি এই প্রবহণকে বিশুদ্ধ ও ব্যাপক করার জন্য যত্ন ও শ্রম না করা হয়, তাহলে কোনো উন্নত সমাজও প্রথমে বর্বরতার এবং ক্রমে পাশবিকতার স্তরে নেমে যাবে। বস্তুতঃ, মানবশিশু এতই অপরিণত ও অক্ষম যে, এদের না চালালে, বিপদ-আপদ থেকে এদের রক্ষা না করলে, এরা দৈহিক-সত্তা বজায় রাখার মতো ন্যূনতম সামর্থ্যও অর্জন করতে পারে না। নিম্নস্তরের বহু প্রাণীর তুলনায় মানবশিশুর সহজাত যোগ্যতা এতই ক্ষীণ যে, এমন কি, শুধু ভৌত জীবনটি রক্ষা করার জন্য যে সব প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকা দরকার, তাও তাদের শিখিয়ে দিতে হয়। যদি, মাত্র জীবনটি রক্ষা করার জন্যেও এ রকমটি করতে হয়, তা হলে কারিগরি কাজ, শিল্প-কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য এবং মানব সমাজের নৈতিক কৃতির জন্য মানুষের কত কিছুই না শেখবার দরকার হয়!

২। শিক্ষা ও আদান-প্রদান

কোনো সমাজের প্রবহমান স্থিতির জন্য শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের আবশ্যকতা এত প্রত্যক্ষ যে, মনে হতে পারে যেন আমরা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যকেই অনাবশ্যক জোর দিয়ে প্রকাশ করছি। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে অযথা পণ্ডিতী ও ছকে-বাঁধা ধারণাগুলো থেকে অব্যাহতি পেতে হ'লে, এ বিষয়ে এভাবে জোর দেওয়ার একটা সার্থকতাও আছে। অপরিণতদের ধাতস্থ করতে যে সব প্রবহণ-প্রণালীর প্রয়োজন, বিদ্যালয় আসলে তাদেরই অন্যতম। কিন্তু তা কেবল একটি প্রণালী ; এবং অন্যান্য প্রবহণ প্রণালীর তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অগভীর। যখন আমরা শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত অন্যান্য মৌলিক ও স্থায়ী পদ্ধতিগুলির অপরিহার্যতা হৃদয়ঙ্গম করব, কেবল তখনি আমরা পণ্ডিত-সমুচিত পদ্ধতিগুলির স্বরূপ নির্দেশ করতে সমর্থ হব।

সমাজ কেবল প্রবহণ ও যোগাযোগ "দ্বারাই" সচল থাকে না, পরন্তু প্রবহণ ও যোগাযোগের "মধ্যেই" তার অবস্থিতি। সমত্ব, সংস্থা এবং সংযোগ, —এই শব্দ কটির মধ্যে আক্ষরিক সম্বন্ধ ছাড়াও, আর একটি গভীর সম্বন্ধের দ্যোতনা রয়েছে। যে সব জিনিসে মানুষের সম-অধিকার আছে, তাই নিয়েই মানুষ সম্প্রদায়ে বাস করে ; এবং আদান-প্রদানই হল সেই পন্থা, যা অবলম্বন করে তারা সকলেই সে অধিকার পায়। একটি সমাজ বা সম্প্রদায় গঠন করার জন্য যে সব "জিনিসে" লোকের সম-অধিকার থাকা দরকার তাহ'ল —লক্ষ্য, বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান, পারস্পরিক বোঝাপড়া। সমাজ-বিজ্ঞানীর মতে একে বলা চলে সদৃশ-মানসতা। এ সব জিনিসকে কতকগুলো ইষ্টক খণ্ডের মতো প্রত্যক্ষভাবে হস্তান্তর করা যায় না। পিঠে ভাগ করে কয়েক জনকে অংশ দেওয়া চলে, কিন্তু সদৃশ-মানসতার ক্ষেত্রে সে নিয়ম খাটে না। বস্তুতঃ, পারস্পরিক বোঝাপড়ায় যা মানুষকে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে, এ হল সেই ধরনের আদান-প্রদান। এর কাজ হ'ল, একই ধরনের বুদ্ধিগত প্রবণতা সৃষ্টি করা এবং প্রয়োজন ও প্রত্যাশার প্রতি একই ধরনের সাড়া জাগানো।

গজ ও মাইলের মাপে দূরে অবস্থান করেও ব্যক্তি যেমন নিজের সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হতে বিরত থাকে না, তেমনি, কাছাকাছি অবস্থান করলেই জনতা

যে একটা সমাজে পরিণত হবে;—তা বলা চলে না। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত লোকের মধ্যেও, একখানি গ্রন্থ বা একখানি চিঠি যতোটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ আনতে পারে, হয়ত বা একই ছাতের নীচে বাস করেও, তাদের মধ্যে ততোটা সংযোগ না থাকতে পারে। আবার, সকলে মিলে একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে বলেই যে তারা একটা সমাজ সংগঠন করে,—তাও নয়। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলোও তো একটা মাত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাধিক সহযোগিতা সহকারে কাজ করে; কিন্তু তা বলে কি তারা একটা সমাজ রচনা করে? যদি ওরা সর্বজনীন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকত এবং সকলেই যদি তাতে স্বার্থের খাতিরে নিজ নিজ বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ন্ত্রিত করত, তা হলে তারা একটা সম্প্রদায়ে পরিণত হতো। কিন্তু তার মধ্যে থাকতে হতো, আদান-প্রদান। প্রত্যেককেই জানতে হতো,—অন্যে কি করছে, এবং অপরকেও জানতে হতো,—তার উদ্দেশ্য ও অগ্রগতি কোন পথ ধরে চলছে। সমাজে ঐক্যমত আনতে গেলে আদান-প্রদান চাই-ই। কাজেই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, অতি নিবিড় সম্পর্কান্বিত সমাজ-গোষ্ঠিতেও এমন অনেক সম্পর্ক আছে যা এখনো সামাজিক রূপ ধারণ করেনি। বস্তুতঃ, যে কোনো সমাজ-সমষ্টির মধ্যেই এখনো বহু সম্পর্ক রয়েছে, যেগুলো যন্ত্রের স্তর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সেখানে মানুষ বাঞ্ছিত ফললাভের জন্য একজনে আর একজনকে ব্যবহার করে। কিন্তু যাদের কাজে লাগান হয়, তাদের না নেওয়া হয় সম্মতি,—না ধরা হয় তাদের মন ও মস্তিষ্কের প্রবণতাকে। এ ধরনের ব্যবহারে দেহ, পদ-পটুতা ও পেশাগত প্রাধান্য সূচিত হয়,—সূচিত হয় যন্ত্রপাতি, কল ও অর্থের হুকুমনামা। পিতা-মাতা ও সন্তান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, মনিব ও কর্মচারী, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক যতোদিন এই স্তরে থাকে, ততোদিন যথার্থ সমাজ-সমষ্টি গড়ে ওঠে না,—তা সে একজনের ক্রিয়াকলাপ আর একজনকে যতো নিবিড়ভাবেই প্রভাবিত করুক না কেন। হুকুম দেওয়া আর হুকুম তামিল করা, কর্ম ও ফলের রূপান্তর ঘটায় বটে, কিন্তু কেবল এই করলেই উদ্দেশ্য সাধনে একজনে আর একজনকে অংশদান করতে পারে না,—পারে না, স্বার্থের আদান-প্রদানে যোগ ঘটাতে।

আদান-প্রদান ও সামাজিক জীবন কেবল যে অভিন্ন তা নয়, পরন্তু সকল

আদান-প্রদান এবং সেইহেতু সকল যথার্থ সমাজ-জীবনই শিক্ষাপ্রদ। আদান-প্রদানের গ্রহীতা হওয়ার মানে একটি পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এ ক্ষেত্রে একজনে যা-কিছু ভেবেছেন, যা অনুভব করেছেন, অন্যজনে তার অংশীদার হন এবং আনুপাতিকরূপে শেষের জনের মনোভাবের কম-বেশী রূপান্তর ঘটে। যিনি জানান, তিনিও নির্বিকার থাকেন না। কোনো অভিজ্ঞতা, বিশেষতঃ কোনো জটিল অভিজ্ঞতা সঠিক ও সম্পূর্ণরূপে কারও কাছে জ্ঞাপন করার সময় পরীক্ষা করে দেখুন: দেখতে পাবেন যে, আপনার নিজ অভিজ্ঞতার প্রতি আপনার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীও বদলে যাচ্ছে। এ যদি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, আপনি কেবল বাক্‌চাতুরি ও পাদপূরণ করার কাজটাই নিয়েছেন। আসলে, নিজের অভিজ্ঞতা অপরকে জানাতে হলে, তাকে সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত রূপ দিতে হয়; এটিকে অন্যে যেভাবে দেখবে সেইভাবে দেখতে হয়; বিবেচনা করে দেখতে হয় যে, অন্য জনের জীবনের সাথে কোথায় এর যোগসূত্র রয়েছে; বিচার করতে হয়, কি অবলম্বন করে একে এমন একটি রূপ দেওয়া যায়, যাতে অন্য লোকটিও এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। গতানুগতিক কথা বা বাক্‌-চাতুরির কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে যে, একজনকে যদি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বুদ্ধিগ্রাহ্য করে আর একজনের কাছে বলতে হয়; তা হ'লে তাঁকে কল্পনায় সেই লোকটির অভিজ্ঞতার অন্ততঃ কিছুটা উপলব্ধি করতেই হবে। সকল প্রকারের ভাব বিনিময়ই কোনো কলা বিশেষ। কাজেই মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রাণবন্ত, যার কাজে তার অধিবাসীরা মনে-প্রাণে অংশগ্রহণ করে, সেই সমাজ-ব্যবস্থাই তাদের কাছে শিক্ষাপ্রদ হয়। অন্যদিকে যখনই তাকে এক ছাঁচে ঢেলে নিত্যকর্ম-পদ্ধতিতে পরিণত করা হয়, তখনই তার শিক্ষাপ্রদ শক্তি লোপ পায়।

শেষ কথা হল এই যে, সমাজ-জীবন শুধু তার স্থায়িত্বের জন্যই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দাবী করে না; পরন্তু একসঙ্গে বসবাস করার প্রণালীটাই শিক্ষাপ্রদ। এতে অভিজ্ঞতা পরিবর্ধিত হয়, অভিজ্ঞতার উপর নতুন আলোকপাত হয়, কল্পনা উদ্দীপ্ত ও সমৃদ্ধ হয়। তা ছাড়া, নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এবং বক্তব্য চিন্তাকে সুস্পষ্ট ও মূর্ত করতেও এর প্রয়োজন। যে ব্যক্তি দেহ ও মনে একা একা বাস করে, তাঁর পক্ষে অতীত অভিজ্ঞতার তাৎপর্য বের করার

জন্য কোনো বিচার-বিবেচনার দরকার হয় না। পরিণত ও অপরিণত লোকদের কর্মক্ষমতার অসমতা কেবল যে অপরিণতদের শিক্ষাদানের আবশ্যকতা সূচিত করে তা নয়, পরন্তু এই আবশ্যকতাই অভিজ্ঞতাকে এমন একটি রূপ ও শৃঙ্খলা দিতে উদ্বুদ্ধ করে যে, তাতে করে অভিজ্ঞতার সহজতম প্রকাশ ও সর্বোত্তম ব্যবহারও ঘটে।

৩। বিধিবদ্ধ শিক্ষার স্থান

অতএব অন্য সকলের সঙ্গে বসবাসের ফলে,—মাত্র বেঁচে থাকার ফলে নয়,—প্রত্যেকেই যে শিক্ষা-লাভ করে, তার সঙ্গে ছোটোদের নিয়মানুগ শিক্ষাব্যবস্থার একটা বিশেষ প্রভেদ রয়েছে। পূর্বোক্তরূপে শিক্ষালাভ ঘটে আনুষঙ্গিকভাবে। এ শিক্ষা স্বাভাবিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা মেলা-মেশার প্রকাশ্য কারণ নয়। অত্যুক্তির আশ্রয় না নিয়েই এটা বলা চলে যে, অভিজ্ঞতার পরিবর্ধন ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে যে পরিণতি ঘটে তা বিবেচনা করেই কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং আইন ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের মূল্যায়ন করা হয়। তবুও এ কথা ঠিক যে, ঐ পরিণতিই প্রতিষ্ঠান-বিশেষের মৌলিক উদ্দেশ্য নয়; এর উদ্দেশ্যটি থাকে সীমাবদ্ধ এবং অব্যবহিতরূপে ব্যাবহারিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল দেব-দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য এবং অপদেবতার নিগ্রহকে প্রতিহত করার জন্য। পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং বংশরক্ষার আশায়; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, নিয়মাবদ্ধ শ্রমব্যবস্থা আরম্ভ হয়েছিল অপরের কাছে ক্রীতদাসত্বের জন্য। অতঃপর, ক্রমে ক্রমে একটা প্রতিষ্ঠানের উপজাত ফল,—অর্থাৎ সচেতন জীবনের গুণধর্ম ও ব্যাপকতার উপরে এর ফলাফল,—পরিলক্ষিত হয়েছে; এবং আরও ধীরে ধীরে, সেই উপজাত-ফলই সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান পরিচালনায় নির্দেশ যুগিয়েছে। এমন কি, একালেও শ্রমশীলতা ও মিতব্যয়িতা প্রভৃতি কতিপয় মূল্যের কথা বাদ দিলে, আমাদের শিল্প-জীবনে উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায়, নানাবিধ মানব-সাহচর্যজাত যে সমস্ত প্রক্ষোভ ও বুদ্ধিগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বশে পৃথিবীর নানাবিধ কাজকর্ম পরিচালিত হয়, সেগুলির উপর খুব কম মূল্যই দেওয়া হয়।

কিন্তু ছোটোদের নিয়ে কাজ করতে গেলে সাহচর্যের সত্যটিই একটি অব্যবহিত মানবিক সত্যরূপে গুরুত্বলাভ করে। যদিও আমাদের সঙ্গে তাদের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে তাদের মানসতার উপরে আমাদের ক্রিয়াকলাপের ফলাফল উপেক্ষা করা সহজ, কিংবা ঐ শিক্ষাজাত ফলাফলকে কোনো একটা বাহ্য ও সহজবোধ্য উপলক্ষ বলে অনায়াসে উড়িয়ে দেওয়া আরও সহজ, তবুও, বড়োদের বেলায় তা যতো সহজ, ছোটোদের বেলায় তা ততো সহজ নয়। হাতে-কলমে শেখাবার আবশ্যকতা খুবই স্পষ্ট। ছোটোদের দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাসগুলির পরিবর্তন সাধন করার কাজটি এত জরুরী যে, পরিণামকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করার কোনো অবকাশই নেই। যেহেতু যৌথ জীবন-যাত্রায় ওদের অংশীদার করে তোলাই ওদের সম্পর্কে আমাদের প্রধান করণীয় বিষয়, সেইহেতু আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে আমরা ওদের ঐ যোগ্যতা অর্জনের ক্ষমতা গঠন করছি কি না। যদি মানব সমাজ এই উপলব্ধির পথে কিছুটা অগ্রসর হয়ে থাকে যে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হয় তার মানবিক গুণে অর্থাৎ যে গুণ তাঁর সচেতন অভিজ্ঞতার উপরে ফল ফলায়, তা হলে আমরা এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, সমাজের এই শিক্ষা প্রধানতঃ ছোটোদের নিয়ে কাজ করার সূত্রেই আমরা লাভ করেছি।

শিক্ষার যে প্রশস্ত ক্রিয়া-প্রণালী আমরা এতক্ষণ ধরে বিবেচনা করছি, তার মধ্যে আমরা একটি অধিকতর বিধিবদ্ধ শিক্ষার, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা ইস্কুল-শিক্ষার স্থান চিহ্নিত করতে পারি। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিধিবদ্ধ শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ খুব কমই দেখা যায়। কোন অসভ্য সম্প্রদায় তার গোষ্ঠীর আনুগত্য রক্ষা করতে বয়স্কদের জন্য যে ধরনের সঙ্গ ও সাহচর্যের ব্যবস্থা রাখে, ছোটোদের মানসতা গড়ে তোলার জন্যও সেই ধরনের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে চায়। যে সমস্ত ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা অল্প-বয়স্কদের গোষ্ঠীভুক্ত হতে দীক্ষিত করা হয়, সে সব অনুষ্ঠান ছাড়া শিক্ষাদানের জন্য অন্য কোনো বিশেষ পরিকল্পনা, বিষয়বস্তু বা প্রতিষ্ঠান তাদের থাকে না। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বড়োরা যা যা করে তার মধ্যে অংশ নিয়েই ছোটোরা বড়োদের রীতিনীতি শিখুক এবং বড়োদের ভাবাবেগ ও ধারণাবলী আয়ত্ত করুক,—এটাই তারা চায়। বড়োদের পেশাদারী কাজে যোগান দিয়ে এবং তাদের কাছে শিক্ষানবিসি করে

ছোটোরা অংশত এতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে থাকে। আবার এই কাজটাই করা হয়, অংশত পরোক্ষভাবে,—অভিনয় ইত্যাদির ভিতর দিয়ে। এতে ছোটোরা বড়োদের ক্রিয়াকলাপের পুনরাবৃত্তি করে এবং সেই সূত্রে তাদের ধরন-ধারন বুঝতে পারে। শিক্ষার জন্য একটি জায়গা খুঁজে নেওয়া দরকার, আবার তা হবে এমন জায়গা যেখানে শেখবার জন্য বিদ্যালাভ করা ছাড়া আর কোনো কাজই করা হবে না, এসব ধারণা আদিম অবস্থার লোকদের কাছে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

কিন্তু সভ্যতা যতোই এগোতে থাকে, ছোটোদের সামর্থ্য ও বড়োদের কাজ কর্মের মধ্যে ব্যবধান ততোই বেড়ে চলে। ছোটখাটো বৃত্তি ছাড়া, বড়োদের কাজ-কর্মের মধ্যে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে শিক্ষালাভ করা, ক্রমে-ক্রমেই ছোটোদের পক্ষে কঠিন হতে থাকে। বড়োদের বেশীর ভাগ কাজ-কর্মই স্থান ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে ছোটোদের নাগালের এত বাইরে যে, সাবলীল অনুকরণ দ্বারা ওগুলোর মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। কাজেই বড়োদের কাজকর্মে কার্যকর অংশ নেওয়ার যোগ্যতা নির্ভর করে এই দিকটির প্রতি আগে থেকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়ার উপরে। ফলে প্রয়োজন হয় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রতিনিধিত্বের,—গড়ে ওঠে বিদ্যালয় এবং তার সুস্পষ্ট পাঠ্যসূচী। এ অবস্থায় কতকগুলি বিষয় শেখাবার ভার অর্পণ করা হয় একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকের উপরে।

এ রকম বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া, কোনো জটিল সমাজের সকল সঙ্গতি ও কৃতি প্রবাহিত করা সম্ভব হয় না। অন্যান্যের সঙ্গে অনিয়মিত মেলামেশা করে ছোটোরা যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করতে অসমর্থ, বিধি-বদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা তার পথ খুলে দেয়। কারণ এই ব্যবস্থায়, সে পাঠ্য-পুস্তকের বিষয়-বস্তু আয়ত্ত করে এবং জ্ঞানের প্রতীকগুলির সঙ্গে তার নিবিড় পরিচিতি ঘটে।

কিন্তু পরোক্ষ শিক্ষা থেকে বিধিবদ্ধ শিক্ষায় পদক্ষেপ করার পথে কতকগুলো লক্ষণীয় বিপদ এসে পড়ে। প্রত্যক্ষভাবেই হোক, আর অভিনয়াদির মাধ্যমেই হোক, একটি আসল বৃত্তি অনুসরণের মধ্যে অংশ গ্রহণ করা অন্ততঃ নিজস্ব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই সব গুণ, সম্ভাব্য সুযোগের অভাব কিছু মাত্রায় পুরণ করে। সাধারণতঃ তাচ্ছিল্য করে বলা হয় যে, বিধিবদ্ধ

শিক্ষণ সহজেই দুর্জ্ঞেয়, প্রাণহীন,—বিমূর্ত পুঁথি-সর্বস্ব হয়ে পড়ে। নিম্নমানের সমাজগুলোর মধ্যে যে জ্ঞান সঞ্চিত রয়েছে, তা অন্ততঃ তাদের ব্যবহারিক কাজে লাগে, চরিত্রের মধ্যে তা রূপান্তরিত হয় এবং তাদের অতি প্রয়োজনীয় নিত্যনৈমিত্তিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে এক গভীর তাৎপর্য দ্যোতিত করে।

কিন্তু কোনো সমুন্নত সংস্কৃতিতে, যা কিছু শিক্ষণীয় তার বেশীর ভাগই প্রতীকরূপে সঞ্চিত থাকে। এ রকমের জ্ঞানকে নিত্যকার কাজে ও উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার আশা সুদূরপরাহত। এ জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ভাসা-ভাসা ও পেশাগত। বাস্তবিকতার সাধারণ মানদণ্ডের পরিমাপে এ হ'ল কৃত্রিম জ্ঞান। কারণ এই পরিমাপ করা হয় ব্যাবহারিক কাজে প্রয়োগের দিক থেকে। এ জাতীয় উপাদানের অস্তিত্ব তার নিজ জগতে,—চিন্তন ও প্রকাশভঙ্গীর স্বাভাবিক রীতির অঙ্গীভূত সে নয়। বিধিবদ্ধ শিক্ষার মালমশলা মাত্র স্কুলের পাঠ্যবিষয় হয়ে থাকবে,—থাকবে জীবন-অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে,—এটাই হল স্থায়ী বিপদ। এ অবস্থায় চিরস্থায়ী সামাজিক স্বার্থগুলি দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে চায়। যে সমস্ত বিষয়বস্তু সমাজ-জীবনের কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, পরন্তু কারিগরি খবরাখবরকে প্রতীকায়িত করে রাখে, বিদ্যালয়ে সেই বিষয়-বস্তুগুলিই মূর্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে আমরা শিক্ষার মামুলী ধারণা পাই। সে ধারণা শিক্ষার সামাজিক অপরিহার্যতাকে উপেক্ষা করে—উপেক্ষা করে সেই সমস্ত মানবিক অনুষঙ্গের সহিত শিক্ষার একাত্মতাকে,—যা চেতনাময় জীবনকে প্রভাবিত করে এবং অতিপরোক্ষ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংবাদ জ্ঞাপনের, আক্ষরিক সঙ্কেতের মাধ্যমে জ্ঞানদানের এবং স্বাক্ষরতা অর্জনের সঙ্গে শিক্ষাকে একাত্ম করে।

কাজেই শিক্ষা-দর্শনকে যে সমস্ত গুরুভার সমস্যার সঙ্গে যুঝতে হয় তার মধ্যে অন্যতম হ'ল,—সাবলীল ও বিধিবদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক ও পরিকল্পিত শিক্ষাপ্রণালীগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। যেখানে জ্ঞান এবং সুনিপুণ দক্ষতা অর্জনের ফল সমাজ-মানস গঠনে প্রভাব বিস্তার করে না, সেখানে সাধারণের প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা,—যাকে বলে "তুখর ব্যক্তি", অর্থাৎ দাম্ভিক বিশেষজ্ঞ, তাই সৃষ্টি করে। বিশেষ ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রতিটি ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন "বিশেষজ্ঞের কাজ" শিখছি বলে বিদ্যার্থীর একটা বিশেষ

চেতনা সদা জাগরূক থাকে, অন্যদিকে তেমনি পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে স্বভাব গড়ে ওঠার সময় যে জ্ঞান সে অর্জন করে, সেটি বিদ্যার্থীর অজ্ঞাতসারেই তার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এখন এই দু'দিকের মধ্যবর্তী ফাঁক ভরাট করা একটি ক্রমবর্ধমান জটিল সূক্ষ্ম সমস্যা।

সারাংশ

জীবনের ধর্মই হল নিজ সত্তা প্রসারে সচেষ্ট থাকা। যেহেতু কেবল অবিরাম নবীকরণ দ্বারাই এই স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা যায়, সেইহেতু জীবনযাত্রা হল কোনো আত্ম-নবীকরণশীল ক্রমাগ্রসরণ। শরীরতাত্ত্বিক জীবনে পুষ্টি ও প্রজননের যে স্থান, সমাজবদ্ধ জীবনে শিক্ষাও সেই স্থানের অধিকারী। মূলতঃ আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে প্রবহণের অন্তরেই এই শিক্ষাধারা বিরাজ করে। আদান-প্রদান হল, অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়া। এইভাবেই অভিজ্ঞতা সর্বজনীন সম্পদে পরিণত হয়। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যারা অংশীদার, তাদের দু'পক্ষেরই মানসতা পরিবর্তিত হয়। অভিজ্ঞতার উৎকর্ষ সাধনে মানব সাহচর্য যে অংশটি দান করে, তার মধ্যে সাহচর্যের প্রত্যেক অবস্থায় যে গূঢ় অর্থ নিহিত থাকে, অপরিণতদের নিয়ে কাজ করার সময়ে তা অতি সহজেই উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ যদিও প্রতি সমাজ-ব্যবস্থাই পরিণামে শিক্ষাপ্রদ, তথাপি বড়োদের সঙ্গে ছোটোদের মেলামেশার সম্পর্কে শিক্ষাজাত ফলাফলই সর্বাগ্রে মেলামেশার উদ্দেশ্যটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। সংগঠন ও সঙ্গতির দিক দিয়ে সমাজ-সমষ্টি যতো বেশী জটিল হতে থাকে, বিধিবদ্ধ ও পরিকল্পিত শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তাও ততো বেশী বাড়তে থাকে। আবার, বিধিবদ্ধ শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ যতো ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে, ততোই সার্থক সাহচর্যজাত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিদ্যালয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার একটা অবাঞ্ছিত ব্যবধান গড়ে ওঠবার আশঙ্কা দেখা দেয়। বিগত কয়েক শতকে, জ্ঞান ও কল-কৌশলের দ্রুত উন্নতির ফলে বর্তমানে এই যে বিপদ শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে, ইতিপূর্বে তা এমন ব্যাপকভাবে আত্ম-প্রকাশ করেনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষার সামাজিক রূপ ও প্রক্রিয়া

১। পরিবেশের স্বরূপ ও অর্থ

আমরা দেখেছি যে, কোনো সমাজ বা সম্প্রদায় নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-নবীকবণের মাধ্যমে নিজ সত্তা বজায় রাখে এবং নাবালকদের শিক্ষামূলক উন্নতি সাধন করতে গিয়ে এই নবীকরণ ঘটে। অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বাহন করে, সমষ্টি তার অদীক্ষিত এবং আপাতদৃষ্টিতে বহিরাগত সভ্যগণকে নিজ নিজ সঙ্গতি ও আদর্শের ধারক হতে শেখায়। কাজেই শিক্ষার কাজ হ'ল লালন, পালন ও কর্ষণ। এর অর্থ এই যে, শিক্ষা ক্রমোন্নতির শর্ত সাপেক্ষ। শিক্ষা যে যে স্তর পূরণ করতে চায়, ভরণ-পোষণ, পরিপুষ্টি ও পরিণতি প্রভৃতি শব্দ সেগুলোরই পার্থক্য প্রকাশ করে। শব্দ-প্রকরণ অনুসারে "এডুকেশন্" শব্দটির অর্থ হ'ল পরিচালন বা পরিণত করা। এই ক্রিয়া-প্রণালীর ফল মনে রেখেই আমরা বলি যে, শিক্ষা কর্মতৎপরতাকে আকৃতি দেয়, তাকে গঠন করে এবং ছাঁচে ঢালাই করে। অর্থাৎ তাকে সামাজিক কাজকর্মের আদর্শ গড়নটির আকৃতি দেয়। যে পদ্ধতিতে গোষ্ঠী তার কাঠামোর মধ্যে তার নাবালকদের অনুপ্রবেশ ঘটায়, এই অধ্যায়ে তার সাধারণ বিশিষ্টতাগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাক।

যেহেতু নাবালকেরা যে পর্যন্ত গোষ্ঠীর প্রচলিত স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ না করে, সে পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টি থাকে তাদের অভিজ্ঞতার গুণের রূপান্তর ঘটানো, সেইহেতু সমস্যাটি কেবল বহির্গঠনমূলক নয়। বস্তুকে স্থানান্তরিত করা যায়, তাকে বহন করে নেওয়াও চলে। কিন্তু বিশ্বাস ও আশা-আকাঙ্খাকে উদ্ভিদের মতো তুলে নিয়ে অন্য স্থানে রোপন করা যায় না। তা হলে প্রশ্ন,—এখন কি করে এগুলো সংস্থাপিত করা যায়? প্রত্যক্ষ সংক্রমণ বা আক্ষরিক অনুক্রমণ দ্বারা যদি তা করা অসম্ভব হয়, তা হ'লে সমস্যা হ'ল এই যে, এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে যাকে অবলম্বন করে ছোটোরা বড়োদের দৃষ্টিভঙ্গী অঙ্গীভূত করতে পারে, অথবা বড়োরা ছোটোদের নিজের মনের মতো করে গড়ে নিতে পারে।

সূত্র বলে —বেশ তো পারিপার্শ্বিকের ক্রিয়া থেকে বাঞ্ছিত সাড়াগুলো আস্থক। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিশ্বাসগুলি হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে বসানো যায় না; আবশ্যকীয় ভঙ্গীগুলোর প্রলেপন চলে না। কিন্তু ব্যক্তি যে বিশিষ্ট মাধ্যমকে আশ্রয় করে থাকে তা তাকে একটি জিনিস না দেখিয়ে বরং আর একটি জিনিস দেখতে ও অনুভব করতে এগিয়ে দেয়। অন্যান্যের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে এই মাধ্যম তাকে কিছু কিছু পরিকল্পনা করে নিতেও পরিচালিত করে। অন্যান্য লোকের অনুমোদন লাভের শর্তরূপে এই মাধ্যমে তার কোনো কোনো বিশ্বাস যেমন দৃঢ়মূল হয় তেমনি কানো কোনো বিশ্বাস শিথিলও হয়ে যায়। এইভাবে এই মাধ্যমটিই তার মধ্যে ক্রমে ক্রমে এক ধরনের আচরণবিধি ও কর্ম মানসতা সৃষ্টি করে। যে পরিবেষ্টনী ব্যক্তিকে ঘিরে থাকে, "পারিপার্শ্বিক" ও "মাধ্যম" শব্দ দু'টি তার থেকে বেশী অর্থবহ— ঐ পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সক্রিয় প্রবণতার নিরবছিন্নতা সূচিত করে। অবশ্য নিষ্প্রাণ সত্তাও পরিবেষ্টনী থেকে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু রূপালঙ্কার ব্যতীত পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি পরিবেশ গঠন করে না। কারণ যে সব প্রভাব জড়-সত্তাকে সংক্রমণ করে জড়-সত্তা সে গুলোর ধার ধারে না। অন্যদিকে, স্থান ও কাল হিসাবে বহুদূরে অবস্থিত কোনো জিনিসও একটি জীবিত-সত্তার, বিশেষ করে একটি মানব-সত্তার, পরিবেশ গঠন করতে পারে। এমন কি কাছের জিনিসগুলো যে পরিবেশ গঠন করে, তার থেকেও সে পরিবেশটি অধিক বাস্তব হতে পারে! যে সব জিনিসের অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অবস্থান্তর ঘটে, সেই সব জিনিসই হ'ল তাঁর খাঁটি পরিবেশ। জ্যোতির্বিদ্ যে সমস্ত নক্ষত্রের গতির উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, অথবা যে যে নক্ষত্রের বিষয় তিনি পরিগণনা করেন, তাদের অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যেমন অবস্থান্তর ঘটে, এ যেন তাই। তাঁর সম্যক পরিবেষ্টনীর মধ্যে তাঁর দূরবীনটিই তাঁর ঘনিষ্টতম পরিবেশ। পুরাতত্ত্ববিদ্ হিসাবে, একজন পুরাতত্ত্ববিদের পরিবেশের মধ্যে থাকে মানুষের জীবনের এক সুদূর অতীত যুগ। এ নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকেন। এবং সে যুগের নানাবিধ লিপি ও ধ্বংসাবশেষই সেই যুগের সঙ্গে তাঁর বিবিধ যোগসূত্র স্থাপন করে।

সংক্ষেপে, যে সব অবস্থা কোনো জীবিত সত্তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ বর্ধিত বা ব্যাহত করে, উদ্দীপিত বা নিষিদ্ধ করে, সেই সব অবস্থাই তার

পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। মৎসের পরিবেশ জল। কারণ তার কর্মতৎপরতার জন্য, তার জীবনের জন্য, জল আবশ্যক! মেরু-অঞ্চলে অভিযানকারীর পরিবেশ বলতে উত্তর মেরুকে একটি বিশেষ উপাদান হিসাবে ধরা যায়,—তা তিনি সেখানে পৌঁছাতে পারুন আর নাই পারুন। কারণ ঐ প্রদেশই তার ক্রিয়া-কলাপকে সংজ্ঞা দেয় এবং তাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে। অবশ্য, কল্পনায় জীবনের স্থিতাবস্থার স্থান থাকলেও, যেহেতু জীবন কোনো নিছক নিষ্ক্রিয় স্থিতি নয়, পরন্তু জীবন হ'ল এক ধরনের ক্রিয়াশীলতা, সেইহেতু যা-কিছুই এই ক্রিয়াশীলতার পোষকতা করে, বা, তার ব্যর্থতা আনে, পরিবেশ বা মাধ্যম শব্দে তা-ই বোঝায়।

২। সামাজিক পরিবেশ

যে সত্তার ক্রিয়াকলাপ অপরের সঙ্গে যুক্ত, তার একটা সামাজিক পরিবেশ থাকে। সে যা-কিছু করে বা করতে পারে তা অন্যান্যের প্রত্যাশা, দাবি, অনুমোদন ও অনুমানের উপর নির্ভরশীল। যে সত্তা অপরের সঙ্গে যুক্ত, সে অন্যান্যের ক্রিয়াকলাপ হিসাবের মধ্যে না ধরে নিজের কাজকর্মও করতে পারে না, কারণ তার নিজের প্রবণতা সার্থক করার ক্ষেত্রে অন্যান্যের ক্রিয়াকলাপ যে অপরিহার্য শর্ত। তার গতিও যে অপরকে গতি দেয়। অবশ্য এর বিপরীতটাও ঘটে। একজনের ক্রিয়াকলাপকে বিচ্ছিন্ন কাজ বলে ধারণা করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে এটাও কল্পনা করা চলে যে, একজন ব্যবসায়ী নিজে নিজেই ব্যবসায় অর্থাৎ কেনা-বেচা করছেন। অধিকন্তু একজন শিল্পপতি কাঁচামাল ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের সময় যেভাবে সমাজবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হ'ন, নিজের নির্জন গণনাগারে ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করতে বসেও তিনি অনুরূপ কর্মতৎপরতা দ্বারাই পরিচালিত হ'ন। যে চিন্তন ও অনুভূতি অন্যান্যের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার সাথে সংশ্লিষ্ট, তাও সবচেয়ে প্রকাশ্য সহযোগী বা বিরোধী কাজের মতোই আচরণের একটি সামাজিক ধরন।

আমাদের যেটি বিশেষ করে দেখাতে হবে সেটি এই যে, সমাজ-মাধ্যম কি করে তার অপরিণত সভ্যদের লালন-পালন করে। সমাজ-মাধ্যম যে ভাবে তার ছোটোদের কাজের বাহ্যিক অভ্যাসকে আকৃতি দেয়, তা দেখা খুব কষ্টকর নয়। মানুষের সংশ্রবে, এমন কি, কুকুর এবং ঘোড়ার অভ্যাসও বদলে

যায়। ওরা যা করে তার সঙ্গে মানুষ থাকে বলেই ওদের অন্য রকমের অভ্যাস হয়। যে স্বভাবসুলভ উদ্দীপনা ওদের প্রভাবিত করে তা নিয়ন্ত্রণ করেই মানুষ প্রাণীদের নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যভাবে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, কোনো বিশিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি করেই এ রকম করা হয়। ঘোড়ার স্বভাবসুলভ বা সহজাত সাড়াগুলি যে ভাবে আসে,—খাদ্য, খাদ্যাংশ, লাগাম, হট্টগোল, যানবাহন ইত্যাদির সাহায্যে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। অটলভাবে একই কাজ বার বার করা হলে, এমন অভ্যাস গঠিত হয় যাতে করে স্বাভাবিক উদ্দীপকগুলির মতোই সত্তা বাঁধা নিয়মে কাজ করে। যদি একটি ইঁদুরকে গোলকধাঁধার মধ্যে রাখা হয় এবং তাকে একই ধারায় কয়েকবার ঘুরে ঘুরে খাদ্য পেতে হয়, তাহলে তার ক্রিয়াশীলতা ক্রমে ক্রমে এতদূর পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, তার ক্ষুধা পেলেই সে অভ্যাস বশতঃ অন্যান্য পথ ছেড়ে ঐ পথটিকেই বেছে নেয়।

মানুষের কাজকর্মও এই ভাবেই রূপান্তরিত হয়। যে শিশুর আগুনে সেকা লেগেছে, সে আগুন ভয় করে। যদি পিতামাতা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেন যে, শিশু যখনই একটা খেলনা স্পর্শ করে তখনই তার তাপ লাগবে, তাহলে শিশু আগুনের ছোঁয়া যেমন ভাবে এড়িয়ে যায়, খেলনাটাকেও তেমনি স্বচ্ছন্দগতিতে এড়িয়ে যেতে শিখবে। যা হোক আমরা এতক্ষণ গড়ে-তোলা শিক্ষার সঙ্গে প্রভেদ রেখে গড়ে-ওঠা শিক্ষা নিয়ে বিবেচনা করছিলাম। এতে যে পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রক্ষোভগত প্রবণতাগুলিকে না ধরে, বরং বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপই ধরা হয়েছে। এ-দু'য়ের মধ্যের প্রভেদটি অবশ্য প্রকট নয়। এটা ধরে নেওয়া চলে যে, কিছুকাল পরে ঐ শিশুটির কেবল ঐ বিশেষ খেলনাটির উপরেই নয়, ঐ সাদৃশ্যভুক্ত সকল শ্রেণীর খেলনার উপরেই দারুণ বিদ্বেষ জন্মিবে। প্রথম সেকা লাগার কথাটা ভুলে গেলেও, তার বিদ্বেষটা কিন্তু থেকেই যেতে পারে। এমন কি, পরে সে তার আপাত-যুক্তিহীন বিদ্বেষের ব্যাখ্যা হিসাবে কোনো কারণও সৃষ্টি করে নিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কর্ম-উদ্দীপনাকে প্রভাবিত করার জন্য পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাহ্যিক কর্মাভ্যাস পালটে দিলে, ঐ কাজের পিছনে যে মানসতা থাকে তাও বদলে যায়। কিন্তু সব সময় এ রকম হয় না। একজনকে একটা আসন্ন আঘাত এড়িয়ে যেতে অভ্যস্ত

করালে, সংশ্লিষ্ট চিন্তা বা প্রক্ষোভের উদ্রেক না হয়েই সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ আঘাত এড়িয়ে যায়। কাজেই আমাদিকে গড়ে-তোলা শিক্ষার সঙ্গে গড়ে-ওঠা শিক্ষার একটা জাতিগত পার্থক্য বের করতে হবে।

এর সূত্র মেলে কোনো একটি শিক্ষাপ্রাপ্ত ঘোড়ার কাজে। যে সামাজিক প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগানো হয়, প্রকৃতপক্ষে সে তার অংশীদার নয়। অন্যজন তার নিজের সুবিধাজনক ফল পাবার জন্য ঘোড়াটা যাতে ঐ কাজটি ভালোভাবে করতে পারে তাই করে দেয়,—ঘোড়াটাকে সে খাবার দেয়। কিন্তু এটা ঠিক যে, কাজটিতে ঘোড়া কোনো নতুন উৎসাহ পায় না। তার স্বার্থ থাকে খাদ্যে, যে কাজটি সে করে দিচ্ছে, তাতে নয়। সে কোনো যৌথ কাজের অংশীদার নয়। যদি সে তার অংশীদার হতো, তাহলে যৌথ কাজে নিযুক্ত হয়ে ঐ কাজটি সম্পূর্ণ করার মধ্যে অন্যান্যের যে স্বার্থবোধ থাকে তারও সেই স্বার্থবোধ থাকতো—অংশীদার হতো সে অন্যান্যের প্রক্ষোভ ও ধারণাবলীর।

অনেক ক্ষেত্রে, কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই,—কোনো অপরিণত লোকের মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তার কর্মতৎপরতা নিয়ে ছলা-কলা করা হয়। তাকে মানুষের মতো শিক্ষা না দিয়ে নিম্ন-প্রাণীর মতো অভ্যস্ত করানো হয়। তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলি বেদনা বা আনন্দের আদিম বিষয়-বস্তুর সঙ্গেই জড়িত থাকে। কিন্তু আনন্দ পাবার জন্য, বা, বেদনা এড়ানোর জন্য তাকে অন্যান্যের মনোমত কাজ করতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, সে যৌথ কাজকর্মের মধ্যে প্রকৃতই ভাগ বা অংশ নেয়। এ সব ক্ষেত্রে তার আদিম আবেগের রূপান্তর ঘটে। সে শুধু অন্যান্যের মনোমত কাজই করে না, পরন্তু এই কাজ করার সময় যে সমস্ত প্রক্ষোভ ও ধারণাবলী অন্যান্যকে অনু-প্রাণিত করে, তার মধ্যেও সেগুলি জাগ্রত হয়। একটা যুদ্ধপ্রিয় সম্প্রদায়ের কথা ধরা যাক। যেসব ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা লাভের জন্য তারা চেষ্টা চালায়, যে সব কীর্তিকে তারা অতিশয় মূল্য দেয়,—সেগুলি যুদ্ধ করার এবং যুদ্ধে জয়লাভ করার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই মাধ্যমটি বা পরিবেশ থাকার দরুন, এদেরই কোনো ছেলে, প্রথমে খেলাধুলার ছলে এবং শক্তিমান হয়ে ওঠার পরে, কার্যতঃই, যুদ্ধ-প্রিয় আচরণে উদ্দীপিত হয়। সে যতোই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, ততোই অনুমোদন পায় এবং প্রাধান্যও লাভ করে। আবার, সে যখন যুদ্ধে বিমুখ হয়, তার

লোকেরাও তার প্রতি বিমুখ হয়; তারা তাকে বিদ্রূপ করে এবং সমাজের স্বীকৃতি থেকে তাকে বঞ্চিত করে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, তার আদিম দ্বন্দ্বপ্রিয় আবেগ-প্রবণতা তার অন্যান্য আবেগ-প্রবণতাগুলোকে দেউলে করে দিয়ে নিজেকেই শক্তিশালী করে তোলে এবং তার ধারণাবলী যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত বিষয়ের দিকেই ছুটে চলে। কেবল এই পথ অবলম্বন করেই সে তার গোষ্ঠীর একজন পূর্ণ-স্বীকৃত সভ্যরূপে পরিণত হয়। আবার এইভাবেই তার মানসিক বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলি তার গোষ্ঠীর চেতনার সঙ্গে একীভূত হয়।

এই দৃষ্টান্তের মূল নীতিকে বিমূর্ত করলে আমাদের উপলব্ধি হবে যে, সমাজ-মাধ্যম কতিপয় ধারণা ও বাসনাকে প্রত্যক্ষভাবে রোপণ করে না। আবার সহজপ্রবৃত্তিজাত, যেমন চোখের পাতা ফেলা, ঘুষি এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদির মতো, অবিমিশ্র পেশীজাত কর্মাভ্যাসও দাঁড় করায় না। এটি যা কিছু করে, তার প্রথম ধাপ হ'ল ব্যক্তিকে এমনভাবে সমষ্টিগত কাজের ভাগী বা অংশীদার করা যাতে সে অনুভব করে. যে, কাজটির কৃত-কার্যতাও তার এবং অকৃতকার্যতাও তার। যখনই সে সমষ্টির প্রক্ষোভগত মানসতার অধিকারী হয়, তখনই সমষ্টির বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য এবং তাদের সার্থক রূপায়ণের উপায়গুলিকে বুঝে নেবার জন্য সে তৎপর হয়ে ওঠে। অন্য কথায়, তার বিশ্বাস ও ধারণা সমষ্টির বিশ্বাস ও ধারণাবলীর সাদৃশ্য লাভ করে। ফলে, সে মোটামুটি ঐ একই জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী হয়, কারণ ঐ জ্ঞান তার আভ্যাসিক কার্যাবলীরই একটি উপকরণ।

প্রচলিত ধারণা এই যে, একজনের জ্ঞান আর একজনের জ্ঞানের মধ্যে সরাসরি চালান করা যায়। জ্ঞানলাভের সম্পর্কে ভাষার গুরুত্বই এ রকম ধারণার প্রধান কারণ। এ কথা খুব বেশী করে মনে হতে পারে যে, অপরের মনের মধ্যে কোনো একটা ধারণা চালান করতে আমাদের যা কিছু করা দরকার তার সবটাই যেন তার কানের মধ্যে কোনো ধ্বনি পৌছে দেওয়া। এই পন্থায় জ্ঞানদান একটা নিছক ভৌত প্রণালীর অনুরূপ। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করাও আমাদের পূর্বোক্ত তত্ত্বকেই দৃঢ় করে। সম্ভবতঃ এ কথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা যায় যে, অন্যান্য লোকে যেভাবে টুপি মাথায় দেয়, সেইভাবে টুপি ব্যবহার করেই একটি শিশু টুপির ধারণা পায়,—যেমন এটি দিয়ে মাথা ঢাকে, এটি অপরকে

পরতে দেয়, বাইরে যাবার সময় অন্যের সাহায্যে টুপিটি পরতে হয়, ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কথা বলা বা বই পড়ার মধ্যে দিয়ে ধারণা পেতে, অংশীদারী-কর্ম-তত্ত্বটি কি করে খাটে। ধরা যাক একটি গ্রীক্ শিরস্ত্রাণ বা হেলমেটের ধারণার কথা। এর মধ্যে তো সরাসরি অংশ নেবার কোনো কথাই ওঠে না। বই পড়ে আমেরিকা আবিষ্কারের কথা জানবার মধ্যে কোন্ অংশীদারী তৎপরতা থাকে।

যেহেতু ভাষা বহু বিষয় শেখবার মুখ্য যন্ত্র, সেহেতু দেখা যাক যে, ভাষা কি ভাবে কাজ করে। নবজাত শিশু অবশ্য জীবন আরম্ভ করে শুধু কতগুলো কলধ্বনি, কোলাহল ও অর্থহীন স্বর নিয়ে। এ সব দিয়ে কোনো রকমের কোনো ধারণার স্পষ্ট প্রকাশ হয় না। এ সব ধ্বনি সাড়া জাগানোর উদ্দীপক মাত্র। এর কোনোটা শান্তি আনে, কোনোটা বা অস্থির করে তোলে, আবার কোনোটা অন্য কিছু করে। যদি টু-পি, এই ধ্বনিটি, যে কাজের মধ্যে কিছু লোক অংশ গ্রহণ করে, সেই কাজের সূত্রে উচ্চারিত না হতো, তা হলে সেটি "ককৃট" শব্দের মতোই একটা নিরর্থক আওয়াজ হতো। মা যখন ছেলেকে নিয়ে বাইরে যান, তখন তিনি বলেন "টুপি"—আর সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মাথায় একটা কিছু পরিয়ে দেন। বাইরে যাওয়াটা শিশুর কাছে একটা পরম লোভনীয় বিষয় হয়ে ওঠে। মা ও শিশু কেবল নিজ নিজ শরীর নিয়েই বাইরে যান না,—এর মধ্যে দু'জনেরই নিবিড় সম্বন্ধ থাকে, এবং তারা একই সঙ্গে এটা উপভোগ করেন। এই কাজের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে একত্রিত হয়ে "টুপি" বলতে মা বা বাবা যা বোঝেন শিশুও শীঘ্রই সেই অর্থে তাকে গ্রহণ করে। এইভাবে, কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েই এটি সঙ্কেতে পরিণত হয়। পারস্পরিক বোধগম্য শব্দাবলী দিয়েই ভাষা গঠিত :—নিছক এই তথ্যই নিজবলে একথা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে, অংশীদারী অভিজ্ঞতার সম্বন্ধের উপরেই ভাষার অর্থ নির্ভর করে।

স্পষ্ট কথায়, "টুপি" শব্দটি এক ধরনে ব্যবহৃত হয়ে যেভাবে অর্থলাভ করে, "টু-পি" ধ্বনিটিও সেভাবেই অর্থলাভ করে। এবং বড়োদের কাছে ও-দুটির যে অর্থ ছোটোদের কাছেও তাই দাঁড়ায়। কারণ, দু-পক্ষই ও-দুটিকে একই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যবহার করে। এই একই ধরনে ব্যবহার করার অঙ্গীকার রয়েছে এই সত্যের মধ্যে যে, শিশু ও বয়ো-

জ্যেষ্ঠদের মধ্যে একটা সক্রিয় সংযোগ স্থাপনের উপায়রূপেই বস্তু ও শব্দকে প্রথমে একটি "সংযুক্ত" কর্মতৎপরতার মধ্যে ব্যবহার করা হয়। অনুরূপ অর্থ ও ধারণা জাগার কারণ এই যে, দু'জনেই অংশভাক্ হয়ে এমন একটা কাজে নিযুক্ত থাকে যে, একজনে যা কিছু করে, তা আর একজনের কাজের উপর নির্ভর করে, এবং তার কাজকে প্রভাবিত করে। যদি দু'জন আদিম লোক একত্র হয়ে শিকারের সন্ধানে যায়, এবং যদি কোনো সঙ্কেত, সঙ্কেতকারীর কাছে "ডান দিকে যাও" বোঝায়, আর শ্রোতার কাছে বোঝায়, "বা দিকে যাও" তাহলে তারা নিশ্চয়ই একত্রে শিকার করতে সক্ষম হবে না। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অর্থ এই যে, একত্র হয়ে কোনো-কিছুর অনুসরণ করতে গেলে, দু'পক্ষের কাছেই শব্দ ও বস্তুর একই মূল্যবোধ থাকা দরকার।

যৌথ কাজে ব্যবহৃত আনুষঙ্গিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দগুলি অর্থলাভ করলে, নতুন অর্থ বিকাশের জন্য সেগুলিই আবার অন্যান্য অনুরূপ শব্দাবলীর সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়। যে ভাবে বস্তু শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়, ঠিক সে ভাবেই শব্দও শব্দের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যেমন যে শব্দাবলী পড়ে শিশু কোনো একটা জিনিস,—ধরা যাক যেন,—গ্রীক হেলমেটের কথা শেখে, সর্বপ্রথমে সেই শব্দাবলীই কোনো যুক্ত স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজে ব্যবহৃত হয়ে অর্থলাভ করেছিল। এখন ঐ শব্দাবলী শুনলে বা পড়লে, যে সব কাজের মধ্যে হেলমেটের প্রয়োগ আছে, তাঁর মনে কল্পনাসূত্রে সেই সব কাজের মহলা উদ্দীপ্ত হয়; এবং ঐ শব্দাবলী একটি নতুন অর্থ জাগায়। যিনি গ্রীক্ হেলমেট শব্দাবলীর অর্থ বুঝতে পেরেছেন, তিনি সাময়িকভাবে, এবং মনে মনে, যাঁরা গ্রীক হেলমেট ব্যবহার করেছেন তাদেরই একজন অংশীদার হন। তাকে কল্পনাসূত্রে কোনো অংশীদারী ক্রিয়াশীলতায় নিবিষ্ট হতে হয়। শব্দের "পরিপূর্ণ" অর্থ পাওয়া সহজ নয়। সম্ভবতঃ অধিকাংশ লোক এই ধারণা নিয়েই তুষ্ট থাকে যে, হেলমেট কোনো অদ্ভুত রকমের শিরস্ত্রাণ; এটি গ্রীকেরা এককালে ব্যবহার করতো। কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ধারণাবলী দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োগ মানে এই তত্ত্বেরই সম্প্রসারণ ও পরিশোধন যে, অংশীদারী বা যৌথ কাজের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েই বস্তু ও বিষয় অর্থলাভ করে। কোনো অর্থেই ভাষা এই

তত্ত্বের ব্যতিক্রম ঘটায় না। যখন শব্দাবলী কোনো অংশীদারী ব্যবস্থার উপাদানরূপে প্রবেশ করে না,—তা সে প্রকাশ্যভাবেই হোক আর কল্পনাসূত্রেই হোক,—তখন ওগুলো কেবল অবিমিশ্র দৈহিক উদ্দীপকরূপেই কাজ করে; এবং তার কোনোরূপ অর্থ বা বুদ্ধিগম্য মূল্য থাকে না। তখন ওগুলো কোনো কুক্ষিগত ক্রিয়াশীলতা চালু করে; তার সাথে কোনো উদ্দেশ্য বা অর্থ থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একটি যোগচিহ্ন (+), কোনো সংখ্যার নীচে আর কোনো সংখ্যা রেখে যোগ করার উদ্দীপক হতে পারে; কিন্তু যিনি এ কাজটি করছেন, তিনি যদি তার কাজের তাৎপর্য উপলব্ধি না করে থাকেন তাহলে তিনি একটি কলের পুতুলের মতোই কাজটি করবেন।

৩। শিক্ষাদাতারূপে সমাজ-মাধ্যম

মোটের উপর, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ কোনো আবেগ জাগায় ও তাকে দৃঢ় করে, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে কোনো উদ্দেশ্য ও পরিণাম জড়িত থাকে,—সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তিকে সেই সব ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত করে তার ব্যবহারের মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক ধাত গঠন করে। সঙ্গীত-চর্চা-প্রিয় পরিবারে লালিত হলে, কোনো শিশুর মধ্যে যেটুকু সাঙ্গীতিক সামর্থ্য থাকে, তা নিশ্চিতরূপেই উদ্দীপিত হবে; এবং এই শিশুই অন্য কোনো পরিবারে প্রতিপালিত হলে, তাঁর মধ্যে অন্য যে সব আবেগ জাগার সম্ভাবনা থাকত, সেগুলো থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণেই তা উদ্দীপিত হবে। যদি শিশুটি সঙ্গীতে উৎসাহ না দেখায়, এবং তাতে কিছু পরিমাণ দক্ষতা অর্জন না করে, তাহলে সে ঐ পরিবারে "খাপ খায় না।" সে যে সমষ্টির অন্তর্গত, তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে অংশ নিতে পারে না। অথচ যাদের সঙ্গে সে যুক্ত তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে তার কিছু কিছু অংশ নেওয়া অপরিহার্য। এ অবস্থায় সামাজিক পরিবেশ তার অজ্ঞাতসারেই, এবং কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য [illegible]ই একটি শিক্ষামূলক ও গঠনমূলক প্রভাব বিস্তার করে।

আদি ও বন্য সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই ধরনের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণই তাদের নাবালকদের প্রতি সে সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকাণ্ড ও ধ্যান-ধারণার একমাত্র

প্রভাবরূপে কাজ করে। যে পরোক্ষ বা আনুষঙ্গিক শিক্ষার কথা আমরা বলেছি,—এ হল তাই। এমন কি, এ-কালের সব সমাজেও, যে সব তরুণকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাদের মধ্যেও এই ধরনের শিক্ষাই মৌলিক পুষ্টি যোগায়। সমষ্টির বিবিধ স্বার্থ ও বৃত্তি অনুযায়ী কতক কতক জিনিস উচ্চপ্রশংসার সামগ্রী হয়ে ওঠে, আর কতকগুলো হয়ে ওঠে বর্জনীয়। সঙ্ঘবদ্ধতা পছন্দ-অপছন্দের সৃষ্টি করে না, পরন্তু তা এমনি লক্ষ্যবস্তু যোগায়, যার সঙ্গে পছন্দ-অপছন্দ জুড়ে যায়। যেভাবে আমাদের সমষ্টি বা শ্রেণী নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম করে, তাই আমাদের মনোযোগের যথার্থ বিষয়বস্তু স্থির করে, এবং এইভাবে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও স্মৃতিশক্তির দিক ও সীমা বেঁধে দেয়। যা কিছু আগন্তুক বা অপরিচিত (অর্থাৎ সমষ্টির ক্রিয়াকলাপের বাইরে) তা-ই নীতির দিক দিয়ে নিষিদ্ধ হয়, এবং বুদ্ধির দিক দিয়ে সংশয় জাগায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য যে, একালে আমরা যে সমস্ত জিনিস খুব ভালো করে জানি, অতীতকালে সেগুলি দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারতো। আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতি জন্মগত স্থূল বুদ্ধি আরোপ করে, এবং আমাদের নিজেদের অধিকতর বুদ্ধিমান ধরে নিয়ে, এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এর আসল ব্যাখ্যা এই যে, সে-কালের জীবনযাত্রার ধরন-ধারন ঐ সব তথ্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। তাঁদের মন নিবদ্ধ ছিল অন্যান্য জিনিসের উপরে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করার জন্য যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জিনিসের প্রয়োজন, তেমনি, আমাদের পর্যবেক্ষণ, স্মৃতি ও কল্পনার শক্তিগুলিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে না, পরন্তু সেগুলি গতিশীল হয় চলিত সামাজিক বৃত্তিগুলির দাবীদাওয়ার ফলে। এই সব প্রভাবের বশেই মানসতার মুখ্য বুনানিটি গঠিত হয়, এবং এটা বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষা দিয়ে হয় না,—এ স্বতন্ত্র। এইভাবে যে সব সামর্থ্য অর্জিত হয়, সজ্ঞান, সচেতন ও সাবধানী শিক্ষা বড় জোর সেগুলিকে পূর্ণতর অনুশীলনের জন্য মুক্ত করতে পারে, তাদের স্থূলতা কিছুটা দূর করতে পারে এবং যাতে করে সে সামর্থ্যগুলির ক্রিয়াশীলতা অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে তার খোরাক যোগাতে পারে।

যদিও "পরিবেশের এই নির্জ্ঞাত প্রভাব" এত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক যে, তা চরিত্র ও মনের প্রতিটি তন্তু প্রভাবিত করে, তবুও এমন কয়েকটি

দিকের উল্লেখ করা সার্থক হবে, যেখানে তার ফল সর্বাপেক্ষা বেশী লক্ষণীয়। প্রথমে ধরা যাক ভাষণ, বা, কথন-অভ্যাস। মৌলিক বাক্‌ভঙ্গী ও আমাদের শব্দাবলীর অধিকাংশই গঠিত হয় জীবনযাত্রার সাধারণ মেলামেশার সূত্রে। এই বাক্‌ভঙ্গী কোনো বিধিবদ্ধ উপায়ে আসে না, আসে সামাজিক বাধ্যবাধকতা থেকে। আমরা সহজ করে বলে থাকি যে, শিশু "মাতৃ" ভাষা আয়ত্ত করে। যদিও এই অর্জিত ভাষণ-অভ্যাসকে সচেতন শিক্ষার দ্বারা শোধন করা, এমনকি বদলানও যায়, তবুও দেখা যায় যে, উত্তেজনার সময় যত্নার্জিত এই বাক্‌ভঙ্গী লোপ পায়; এবং আদি ও অকৃত্রিম মাতৃভাষাই আবার ফিরে আসে। দ্বিতীয়তঃ আদব-কায়দার কথা। বলে শেখানোর চেয়ে করে শেখানো অনেক কার্যকর; কথাটার মধ্যে শ্লেষ থাকলেও এটি প্রণিধান-যোগ্য। আমরা বলি যে, শিষ্টাচার আসে সুশিক্ষা থেকে, কিম্বা শিষ্টাচারই সুশিক্ষা। আবার সুশিক্ষা আসে আভ্যাসিক কাজের মাধ্যমে, আভ্যাসিক উদ্দীপকগুলির প্রতি সাড়ার মাধ্যমে,—সংবাদ জ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে নয়। জ্ঞাতসারে শোধন করার ও উপদেশ দেওয়ার অনেক ঘটা থাকলেও, পরিণামে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও ভাবভঙ্গীই শিষ্টাচার গঠনের প্রধান উপকরণ। এই শিষ্টাচারই ছোটখাটো নীতি বিশেষ। এ ছাড়া, প্রধান প্রধান নীতির ক্ষেত্রেও সংজ্ঞাত শিক্ষাদান কেবল সেই পরিমাণেই ফলপ্রসূ হতে পারে, যে পরিমাণে সেটি শিশুর সামাজিক পরিবেশভুক্ত সাধারণ মানুষের "চলন-বলন"-এর সঙ্গে খাপ খায়। তৃতীয়তঃ সুরুচি ও সৌন্দর্যানুভূতি। যদি মার্জিত রূপ ও বর্ণ-সমন্বিত সুসমঞ্জস সামগ্রীতে দৃষ্টি নিয়ত আকৃষ্ট হয়, তাহলে স্বভাবতঃই রুচির একটি মান গড়ে ওঠে। কোনো অকিঞ্চিৎকর ঊষর পরিবেষ্টনী যেরূপ সুন্দরের বাসনা বিলোপ করে, একটা কৃত্রিম, আড়ম্বর-বহুল, অবিন্যস্ত এবং অতিরঞ্জিত পরিবেশও তেমনি রুচির অবনতি ঘটায়। এ রকমের কোনো প্রতিকূল পরিবেশে, সুরুচি সম্বন্ধে সংজ্ঞাত শিক্ষাদান, অপরের ভাবনাকে জীর্ণ সংবাদ জ্ঞাপনের স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখে,—তার বাইরে আর কিছুই দিতে পারে না। এ-রকমে পাওয়া রুচিজ্ঞান কখনো স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যক্তিগতভাবে দানা বাঁধে না, পরন্তু যাদের অভিমতের প্রতি ব্যক্তিকে তাকাতে শেখানো হয়েছে, এ-জ্ঞান তাদের ভাবনারই গতানুগতিক স্মারক হয়ে থাকে। যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থায় মানুষ অভ্যস্ত হয়, সেগুলোর প্রভাবেই

যে তার মূল্য বিচারের সুগভীর মানদণ্ড গড়ে ওঠে,—এ কথা এ প্রসঙ্গে কোনো চতুর্থ প্রস্তাব নয়। বরং যে সব কথা পূর্বেই বলা হয়েছে এটি তাদের মধ্যেই মিশে আছে। কি যে লাভজনক, আর কি যে লাভজনক নয়, তার সংজ্ঞাত মূল্যানুমান যে কি পরিমাণে আমাদের অজ্ঞাত কোনো কোনো মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল, আমরা তা কদাচিৎ হৃদয়ঙ্গম করি। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, আমরা জিজ্ঞাসা বা অনুচিন্তন ছাড়াই যে সব বিষয় মেনে নেই, সেগুলিই আমাদের সংজ্ঞাত চিন্তাধারা স্থির করে এবং সিদ্ধান্ত ধার্য করে। যে সমস্ত অভ্যাসগত গঠন বিচার-বিবেচনা-স্তরের নীচে সুপ্ত থাকে, এবং অন্যান্যের সঙ্গে অবিরাম আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে—এ হল তাই।

৪। বিশিষ্ট পরিবেশরূপে বিদ্যালয়

শিক্ষণশীল ধারা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রস্তাবনার প্রধান গুরুত্ব এই যে, আমরা চাই, বা, না চাই,—এ ধারা বয়ে চলেছে। এ ধারা লক্ষ্য করতে বলে যে, ছোটোরা যে ধরনের শিক্ষা পায়, বড়োরা মাত্র একটি পন্থা অবলম্বন করেই তা সজ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত করে। এবং সে পন্থাটি হ'ল,—যে পরিবেশের মধ্যে ছোটোরা কাজকর্ম করে, এবং যার ফলে তাদিকে চিন্তা করতে হয়, অনুভব করতে হয়, সেই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা। আমরা কখনো প্রত্যক্ষভাবে শেখাইনা, শেখাই পারিপার্শ্বিকের সূত্র ধরে,—পরোক্ষভাবে। কোনো আকস্মিক পরিবেশকে শেখাবার কাজটা করতে দেব, না, এ জন্যে একটি পরিবেশ পরিকল্পনা করে নেব,—এ দুটো পথের মধ্যে অনেক প্রভেদ থাকে। এবং শিক্ষণশীল প্রভাব হিসাবে, যে কোনো পরিবেশই একটা আকস্মিক পরিবেশ, যদি না, তার শিক্ষামূলক ফলপ্রসূতা বিচার-বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি বুদ্ধি-বিবেচনাশীল পরিবারের সঙ্গে অপর একটি বুদ্ধি-বিবেচনাহীন পরিবারের পার্থক্য এই যে, শিশুদের ক্রমবিকাশের উপরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকটি বিবেচনা করেই প্রথম পরিবারটিকে জীবনচর্যা ও মেলামেশার অভ্যাস-প্রণালী নির্বাচন করতে হয়, বা অন্ততঃ তাকে নির্বাচন করার ভানও করতে হয়। কিন্তু মানসিক ও নৈতিক প্রবণতাকে প্রভাবিত করার সাথে

যে সব পরিবেশের সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে, তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ই হ'ল আদর্শ দৃষ্টান্ত।

মোটামুটি কথা হল এই যে, সামাজিক ঐতিহ্য যখন এমন জটিল হয়ে ওঠে যে, সমাজ-ভাণ্ডারের একটা বড়ো অংশ লিপিবদ্ধ করতে হয়, এবং সঙ্কেতাদির মাধ্যমে তা প্রবাহিত করতে হয়, বিদ্যালয় তখনি গড়ে ওঠে। লেখার সঙ্কেত, কথার সঙ্কেত থেকেও বেশী কৃত্রিম ও নিয়মাবদ্ধ। অন্যান্যের সঙ্গে আকস্মিক মেলামেশার ফলে ওগুলো আয়ত্ত করা যায় না। অধিকন্তু, লিখিত ভাষা এমন সব বিষয়বস্তু নির্বাচন ও লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করে, যেগুলি দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত। পুরুষানুক্রমে যে কীর্তি সঞ্চিত হয়েছে, এর মধ্যে তাকে ধরে রাখা হয়, যদিও এর কিছু অংশ সাময়িক ভাবে কাজে লাগে না। ফলে যখনি কোনো গোষ্ঠীকে তার নিজ অঞ্চল এবং বর্তমান গোষ্ঠীবহির্ভূত বিষয়বস্তুর উপর বেশ-কিছু পরিমাণে নির্ভর করতে হয়, তখনি গোষ্ঠীর যাবতীয় সঙ্গতি ও সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রবাহিত করার জন্য, গোষ্ঠীকে বিদ্যালয়ের নিয়মাবদ্ধ মাধ্যমের উপর ভরসা করতেই হয়। একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক : প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক্ জীবনধারা আমাদের জীবনধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে ; কিন্তু তাদের জীবন ধারা যেভাবে আমাদের উপর ক্রিয়া করে, আপাত দৃষ্টিতে আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতার মধ্যে তা দেখা যায় না। এই ভাবে, যে সব গোষ্ঠী এখনো বর্তমান, কিন্তু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে,—যেমন বৃটিশ, জার্মান, ইটালীয়,—তাদের সঙ্গেও আমাদের সামাজিক ব্যাপার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু যেভাবে আমাদের সঙ্গে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে, প্রকাশ্য বিবৃতি বা মনোযোগ ছাড়া, তা বোঝবার উপায় নেই। ঠিক এই রকমই, আমাদের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে, বহুদূরবর্তী ভৌত তেজোরাশি এবং দৃষ্টিবহির্ভূত ভৌত সত্তাগুলির যে ভূমিকা আছে, তা ছোটোদের কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্য, আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সাহচর্যের উপর ভরসা রাখা যায় না। কাজেই এ সব বিষয়ে যত্ন নিতে হলে সামাজিক আদান-প্রদানের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। এই প্রতিষ্ঠানই হল স্কুল বা বিদ্যালয়।

জীবনযাত্রার নিত্যনৈমিত্তিক অনুষঙ্গগুলির তুলনায় এই ধরনের অনুষঙ্গের তিনটি অতি নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে। প্রথমতঃ, কোনো জটিল সভ্যতা এত

বেশী জট-পাকানো যে, তা সামগ্রিকরূপে আয়ত্তে আনা যায় না। সে জন্যেই একে অংশে অংশে ভাগ করতে হয়, এবং ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে আয়ত্তে আনতে হয়। আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনের নানাবিধ সম্পর্ক সংখ্যায় এত বেশী, এবং এত বেশী জট-পাকানো যে শিশুকে সুষ্ঠুতম অবস্থায় রাখলেও, সে সহজে তার অতীব প্রয়োজনীয় অংশগুলির অনেকগুলির মধ্যেও অংশ নিতে পারবে না। আর অংশগ্রহণ না করার মানে—সেগুলোর তাৎপর্য সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকা। ফলে, ওগুলো তার নিজের মানসিক প্রবণতার অংশ-স্বরূপ হয় না। ফলে, বনের মাঝে গাছ যায় হারিয়ে। ব্যবসায়, রাজনীতি, কলা, বিজ্ঞান, ধর্ম, সবকিছুই যুগপৎ তাঁর মনকে টানবে, কিন্তু এর ফল দাঁড়াবে বিভ্রান্তি। সমাজের যে অঙ্গকে আমরা বিদ্যালয় বলি, তার প্রথম কাজ হ'ল একটি সরল পরিবেশ সৃষ্টি করা। যে লক্ষণগুলি স্পষ্টতঃ মৌলিক এবং যাতে ছোটোদের সাড়া জাগানো যায়, বিদ্যালয়ের কাজ হল সেগুলিকে নির্বাচন করা। পরে, যা আয়ত্ত করা হ'ল, তাকে কাজে প্রয়োগ করে, যাতে অধিকতর জটিল বিষয়গুলির মর্ম উপলব্ধি হয়, তার একটা ক্রমোন্নত ব্যবস্থা রূপায়িত করা।

দ্বিতীয়তঃ, স্কুল-পরিবেশের আর একটি কাজ হ'ল, মানসিকতার উপরে সমকালীন সামাজিক পরিবেশের অশোভন দিকগুলির প্রভাব যতোদূর সম্ভব দূর করা। এতে, কাজ করার একটা পরিশোধিত মাধ্যম স্থাপিত হয়। কেবল সরলীকরণ নয়, পরন্তু যা-কিছু অবাঞ্ছিত, তাকে সমূলে দূর করাই হ'ল নির্বাচনের লক্ষ্য। প্রত্যেক সমাজই কতগুলি তুচ্ছ বিষয়, অতীতের জঞ্জাল এবং বিকৃত ধারণাবলীতে ভারাক্রান্ত। পরিবেশ সৃজনে স্কুলের কর্তব্য হল, তার আবেষ্টনী থেকে ওসব জিনিস বাদ দেওয়া, এবং চলিত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ঐ সব জিনিসের প্রভাব প্রতিরোধে সম্ভাব্য সব কিছু করা। নিজ-ব্যবহারের জন্য সর্বোৎকৃষ্টকে নির্বাচন করেই, বিদ্যালয়, তার এই "সর্বোৎকৃষ্টের" ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

কোনো সমাজ সভ্যতার আলোকে যতোই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ততোই সে উপলব্ধি করে যে, সমাজের যাবতীয় পুঞ্জীভূত কীর্তি সংরক্ষিত ও প্রবাহিত করা তার দায়িত্ব নয়,—তার দায়িত্ব হল একটি শ্রেষ্ঠতর ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে যা কিছু প্রয়োজন তাই ধরে রাখা এবং তাকে পুরুষানুক্রমে চালু করা।

এই উদ্দেশ্য সাধনে ইস্কুলই হল সমাজের প্রতিনিধি।

অতঃপর, বিদ্যালয়-পরিবেশের তৃতীয় কাজ হল, সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা, এবং লক্ষ্য রাখা যে, প্রতিটি ব্যক্তিই যেন নিজ নিজ বংশগত বাধা-নিষেধের হাত থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পায়; এবং একটা প্রশস্ততর পরিবেশের সঙ্গে অধিকতর প্রাণবন্ত সংযোগে আসতে পারে। সমাজ, সম্প্রদায় প্রভৃতি সাদৃশ্য-মূলক শব্দগুলি বিভ্রান্তিকর। কারণ এ দিয়ে এই ধারণা হতে পারে যে, কোনো একটা শব্দ যেন কেবল একটা জিনিসেরই প্রতিরূপ। বস্তুতঃ একটা আধুনিক সমাজ বলতে কম-বেশী-শিথিলভাবে-যুক্ত, অনেকগুলি সমাজকে বোঝায়। প্রতিটি পরিবারই তাদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে এক একটি সমাজ রচনা করেন। একটি গ্রাম বা রাস্তার খেলার সঙ্গী-সাথীরাও এক একটি সমাজ। প্রত্যেক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সমিতিও এক একটি সমাজ। এই সমস্ত পরিচিত শ্রেণীর বাইরেও আমাদের দেশের মতো একটা দেশের মধ্যে, নানা ভাষাভাষী, নানা ধর্মপন্থী, নানা অর্থনীতিক ভাগ-বিভাগ রয়েছে। একটি আধুনিক মহানগরীর মধ্যে নামমাত্র রাষ্ট্রিয় ঐক্য থাকলেও, এখানে পুরাকালের কোনো মহাদেশ থেকেও অনেক বেশী সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন রাজনীতি, ঐতিহ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, শাসন বা নিয়ন্ত্রণ বিধি রয়েছে।

এর প্রতিটি সমষ্টিই তার সভ্যদের সক্রিয় মানস প্রবণতায় গঠনমূলক প্রভাব বিস্তার করে। এক একটি চক্রিদল, ক্লাব, দুর্বৃত্ত বা কয়েদীর দল, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ বা যৌথ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে,—ধর্মসঙ্ঘ, শ্রমিক সংস্থা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলের মতোই,—তাদের নিজ নিজ সভ্যদের জন্য শিক্ষামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে। কোনো পরিবার, শহর বা রাষ্ট্রের মতোই এরা প্রত্যেকে এক একটি সঙ্ঘবদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক জীবন। আবার, এমন সম্প্রদায়ও অনেক আছে, যাদের সভ্যদের মধ্যে কোনো সরাসরি যোগাযোগ থাকে না, এবং যদি বা থাকে তা খুবই কম,—যেমন দেখা যায় পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে-থাকা কলাবিশারদ, বিদ্যাবিশারদ বা বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে। এ সব দলেরও এক একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে। এদের একজনের কর্মধারা অন্য জনের কৃতির সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ফলে সরাসরি রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রাচীনকালে জনসমষ্টি সমূহের বৈচিত্র্য ছিল প্রধানতঃ কোনো ভৌগোলিক ব্যাপার। সমাজের সংখ্যা ছিল বহু, কিন্তু প্রত্যেক সমাজই তার নিজ নিজ অঞ্চলে বাস করত, এবং এর সভ্যদের প্রকৃতিও ছিল অভিন্ন। কিন্তু বাণিজ্য, পরিবহন, আন্তঃসংযোগ, স্থানান্তর যাত্রা ইত্যাদি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলি বিভিন্ন ঐতিহ্য ও রীতিনীতি সম্বলিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। সম্ভবতঃ অন্য কোনো একটি কারণ থেকে, এই পরিস্থিতিটিই এমন এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবী বলবৎ করেছে যে, তার ফলে নাবালকদের জন্য সম-সাম্য পরিবেশ সৃষ্টি হতে বাধ্য। কেবল এই পন্থা অবলম্বন করেই এক রাষ্ট্রনীতিসম্বলিত কোনো রাজ্যের মধ্যে পৃথক পৃথক গোষ্ঠী, স প্রদায় ও উপজাতির সান্নিধ্য-প্রসূত কেন্দ্রাতীগ শক্তিপুঞ্জের প্রভাব প্রতিহত করা সম্ভব। বিভিন্ন উপজাতি, বিভিন্ন ধর্ম ও বিসদৃশ রীতিনীতি সম্বলিত যুব-সম্প্রদায়ের একত্রে মেলামেশার ফলে, সকলের জন্যই একটি নতুন ও প্রশস্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে। সর্বজনীন বিষয়-বস্তু সকলকেই কোনো এক প্রশস্ত দিগন্তের প্রতি ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী পেতে অভ্যস্ত করে; এবং সে দৃগ্‌ভঙ্গী বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টির দৃগ্‌ভঙ্গী অপেক্ষা বৃহত্তর। আমেরিকার গণ-বিদ্যালয়ের আত্তীকরণ শক্তি এই সর্বজনীন ও সুষম দাবির যাথার্থ্য সম্বন্ধে উজ্জ্বল সাক্ষ্য দেয়।

ব্যক্তি যে সমস্ত বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের বিচিত্র প্রভাবগুলির মধ্যে এসে পড়ে, সেগুলি যাতে প্রতিটি ব্যক্তি-মানসে সমন্বিত হতে পারে,—বিদ্যালয়কে সে দায়িত্বও নিতে হয়। দেখা যায়,—পরিবারে এক নিয়ম, রাস্তায় এক নিয়ম, কারখানায় বা গুদামঘরে তৃতীয় নিয়ম এবং ধর্মস্থানে চতুর্থ নিয়ম। ব্যক্তি যখন এক পরিবেশ থেকে আর এক পরিবেশে যায়, তখন সে পরস্পরবিরোধী আকর্ষণের মধ্যে পড়ে। এবং তখন এই আশঙ্কা থাকে যে, বিচার-বুদ্ধির বিভিন্ন মানদণ্ডে, এবং বিভিন্ন উপলক্ষজাত প্রক্ষোভে, তার ব্যক্তিত্ব একটি খণ্ডিত সত্তায় পরিণত হতে পারে। এই আশঙ্কাই বিদ্যালয়কে দৃঢ় সঙ্কল্প ও সংহতি-সম্পন্ন কর্তব্যভার নিতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

সারাংশ।—

কোনো একটি সমাজের নিরবচ্ছিন্ন ও উন্নতিশীল জীবনধারার জন্য তরুণদের মধ্যে যে সব বৃত্তি ও প্রবণতার বিকাশ সাধন করা অত্যাবশ্যক, বিবিধ

বিশ্বাস, আবেগ ও জ্ঞানের সাক্ষাৎ পরিবহন দ্বারা তা সাধিত হয় না। তা সাধিত হয় পরিবেশের মাধ্যমে। কোনো জীবিত সত্তার বৈশিষ্ট্য হল তার কর্ম-সম্পাদনা। এই সম্পাদনায় যে সব অবস্থা-ব্যবস্থা, শর্ত ও নিয়ম সংশ্লিষ্ট থাকে, তার মোট যোগফলটিই হ'ল পরিবেশ। সমষ্টির যে-কোনো একজনের কাজকর্ম সম্পাদনে, সহযাত্রীদের যে-সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তার সঙ্গে যুক্ত হয় তাই দিয়ে গড়ে ওঠে সামাজিক পরিবেশ। ব্যক্তি যে-পরিমাণে সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে অংশগ্রহণ করে, সামাজিক পরিবেশও সেই-পরিমাণে শিক্ষাপ্রদ হয়। সমষ্টিগত কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে ব্যক্তি নিজ অংশটি সম্পন্ন করে, যে উদ্দেশ্যটি এই প্রচেষ্টার প্রেরণা যুগিয়েছিল, সেটিকে নিজেরই উদ্দেশ্য করে নেয়,—সুপরিচিত হয় সেটির কর্মপদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে,—অর্জন করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, এবং এ সব করতে গিয়ে, সে আবেগে অভিসিক্ত হয়।

তরুণেরা যে যে সমষ্টির অন্তর্গত, সেই সেই সমষ্টির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ক্রমে ক্রমে অংশ নেওয়ার ফলে, তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের মানসতায়, শিক্ষার আগ্রহ গভীর ও নিবিড় হতে থাকে। সমাজ যখন জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে তখন, যে বিশিষ্ট সামাজিক পরিবেশ অপরিণতদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি ধাত্রীসুলভ সজাগ দৃষ্টি দিতে পারে, তার প্রয়োজন ঘটে। এই বিশিষ্ট পরিবেশের অনেক গুরু কর্তব্যের মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হ'ল তিনটি :—এক, বাঞ্ছিত প্রবণতা বিকাশের জন্য তার উপকরণগুলির সরলীকরণ ও শৃঙ্খলা সাধন ; দুই, সমকালীন সমাজরীতির শোধন ও আদর্শায়ন, এবং তিন, ছোটোদের নিজ নিজ ভাগ্যের উপর ফেলে রাখলে যে রকমের সামাজিক পরিবেশে তারা প্রভাবান্বিত হতে পারে, তা থেকে একটি অধিকতর প্রশস্ত ও সুষম পরিবেশ গড়ে তোলা।

তৃতীয় অধ্যায়

নির্দেশরূপে শিক্ষা

১। নির্দেশকরূপে পরিবেশ

শিক্ষার সাধারণ প্রক্রিয়া যে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, এখন আমরা তার একটি রূপ বিচার করব। এটিকে বলা চলে নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালন। নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন এই তিনটি শব্দের মধ্যে শেষেরটি, সহযোগিতা সহকারে পরিচালিত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক সামর্থ্যগুলিকে সাহায্য করার ধারণাকে চূড়ান্তরূপে জ্ঞাপন করে। নিয়ন্ত্রণ শব্দটি যেন বাইরের কোনো শক্তির চাপ, এবং নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির দিক থেকে যেন কিছু পরিমাণ প্রতিরোধের আভাস-সূচক। নির্দেশ অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ শব্দ এবং এটি এই ইঙ্গিত করে যে, ক্রিয়া-শীল প্রবণতাগুলি যেন উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত না হয়ে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। নির্দেশ হ'ল একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। এর এক সীমায় আছে পরিচালনমূলক সহায়তা আর অন্য সীমায় রয়েছে নিয়মন বা শাসন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ শব্দটি সময় সময় যে অর্থ জ্ঞাপন করে, আমরা সর্ব ক্ষেত্রেই তা সযত্নে পরিহার করব। জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাত-সারেই হোক, কখনো কখনো ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যক্তির বিভিন্ন প্রবণতা স্বভাবতই অবিমিশ্র ব্যক্তিত্ববাদী বা অহংবাদী—কাজেই সমাজ বিরোধীও বটে। এ অবস্থায় যে ক্রিয়াপ্রণালী অবলম্বন করে ব্যক্তির আবেগ জন-সাধারণের উদ্দেশ্যের বশবর্তী করা হয়, নিয়ন্ত্রণ শব্দটি সেই অর্থই ব্যক্ত করে। যেহেতু ধরেই নেওয়া হয় যে, তার নিজ প্রকৃতি এই ক্রিয়া-প্রণালীর পরিপন্থী, এবং এটির সহায়তা না করে বরং বিরোধিতা করে, সেই হেতু নিয়ন্ত্রণের এই অর্থের সঙ্গে দমন বা বাধ্য-বাধকতার একটা গন্ধ থাকে। এই ধারণার ভিত্তিতে কতিপয় শাসন-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রতন্ত্র গঠিত হয়েছে, এবং এটি শিক্ষা বিষয়ক ধারণা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও গুরুতররূপে সংক্রমিত হয়েছে। কিন্তু এ রকমের মত পোষণ করার কোনো ভিত্তি নেই। এ কথা ঠিক যে, লোকে সময় সময় নিজ নিজ পথ অনুসরণ করতে ইচ্ছুক, এবং সে পথ অন্যদের পথের বিপরীত দিকেও যেতে পারে। কিন্তু এও

ঠিক যে, তারা অন্যান্যের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে আসতে এবং সম্মিলিত বা সহযোগী প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতেও ইচ্ছুক—হয় তো বা মোটের উপর মুখ্যভাবেই ইচ্ছুক। অন্যথায়, সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই সম্ভব হতো না, এমন কি, তার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য শাসন-ব্যবস্থা যোগাতেও কোনো লোক আগ্রহী হতো না। অবশ্য ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের জন্য যদি কেউ তা করে,—তাহলে সে আলাদা কথা। প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণের একমাত্র অর্থ হল সামর্থ্য নির্দেশ। এর মধ্যে নিজের চেষ্টায় নিয়মন লাভ করা যতোখানি থাকে, অন্যেরা অগ্রণী হয়ে যে নিয়মন সাধন করে তাও ততোখানি থাকে।

সাধারণতঃ প্রতিটি উদ্দীপকই কর্মতৎপরতা নির্দেশ করে। উদ্দীপক কেবল কর্মোন্মাদনা ও আলোড়নই আনে না, পরন্তু কর্মকে কোনো একটা লক্ষ্যও নির্দিষ্ট করে দেয়। অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় যে, সাড়া কেবল প্রতিক্রিয়া বা, আলোড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ নয়; শব্দটিই সূচিত করে যে, এটি কোনো প্রত্যুত্তর। সাড়া উদ্দীপকের সম্মুখীন হয়, এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। উদ্দীপক ও উদ্দীপনার মধ্যে পারস্পরিক উপযোগিতা থাকে। আলো চোখের উদ্দীপক, সে কিছু দেখতে বলে, এবং চোখের কাজ হল দেখা। যদি চোখ খোলা থাকে এবং আলো থাকে, তবেই দেখা ঘটে। উদ্দীপক হল অঙ্গের যথাযথ ক্রিয়া সম্পন্ন করার শর্ত, কোনো বাইরের ঝঞ্ঝাট নয়। কাজেই সকল নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণই কর্মতৎপরতাকে নিজ লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পথ প্রদর্শক রূপে কাজ করে। কোনো অঙ্গ যা করতে তৎপর, নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণ তা পুরা-পুরি সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।

কিন্তু এই সাধারণ উক্তিটি দুটি শর্ত সাপেক্ষ। প্রথমতঃ, মাত্র অল্পক'টি সহজ-প্রবৃত্তির কথা বাদ দিলে, একজন অপরিণত লোক যে সব উদ্দীপকের সম্মুখীন হয়, সেগুলি প্রথম অবস্থায় ঠিক ঠিক সাড়া জাগানোর পক্ষে পরিমিত নয়। সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি জাগে। এই শক্তি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে অপচায়িত হতে পারে, কৃতকার্যতার বিরুদ্ধেও যেতে পারে। আবার কাজের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে ক্ষতিও করতে পারে। বাই-সাইকেল চালাতে আরম্ভ করা একজনের সঙ্গে বাই-সাইকেল চালাতে দক্ষ, এ রকম একজনের তুলনা করলে, এটি বোঝা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে নিয়োজিত শক্তি দিক-বিদিকের ধার ধারে না; তার বেশীর ভাগই বিক্ষিপ্ত ও

কেন্দ্রাতীগ। নির্দেশের মধ্যে যাতে সঠিক সাড়া আসে, তার জন্য কাজের কেন্দ্রীকরণ ও স্থিরীকরণ থাকে, এবং অপ্রয়োজনীয় ও বিভ্রান্ত গতিবিধির দূরীকরণের প্রয়োজন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, যদিও এমন কোনো কর্মতৎপরতা জাগে না, যার মধ্যে ব্যক্তি কিছুমাত্র সহযোগিতা করে না, তবুও সাড়া এমন ধরনের হতে পারে, যা কাজটির ক্রম ও নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে খাপ খায় না। মুষ্টিযোদ্ধা বিশেষ একটা আঘাত এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু হয়তো তার সেই অব্যাহতি তাকে পরক্ষণেই আরও একটা কঠিনতর আঘাতের সম্মুখীন করবে। যোগ্য নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল, কর্মপরম্পরার মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা স্থির করা। প্রত্যেকটি কর্ম যে কেবল তার অব্যবহিত উদ্দী-পকের প্রয়োজন মেটায় তা নয়, পরন্তু পরবর্তী কর্মপ্রবাহকেও সাহায্য করে।

সংক্ষেপে, নির্দেশ একাধারেই যুগপৎ এবং পরম্পরাগত। সময়গত প্রয়োজন এই যে, যে সমস্ত প্রবণতা আংশিক ভাবে জেগে ওঠে, তার যেগুলি তৎকালীন প্রয়োজনীয়তার উপর কর্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করবে, সেগুলিকে নির্বাচন করা। আর পরম্পরাগত প্রয়োজন হ'ল, পৌর্বাপর্যের মধ্যে দিয়ে কর্মের একটা ভারসাম্য রক্ষা করা। এতে কর্মতৎপরতা "ক্রমানুবর্তী" হয়। সুতরাং নির্দেশের দুটো দিক :—কেন্দ্রীকরণ ও ক্রমানুবর্তন—একদিকে স্থানানু-বর্তিতা, অন্য দিকে সময়ানুবর্তিতা। প্রথমটি লক্ষ্যভেদে কৃতনিশ্চয়তা আনে, দ্বিতীয়টি পরবর্তী কাজের জন্য ভারসাম্য বজায় রাখে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ দুটি অংশকে ধারণায় যে ভাবে পৃথক করা যায়, কার্যতঃ সে ভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়। যে কোনো সময়েই ক্রিয়াশীলতাকে এমন ভাবে কেন্দ্রীভূত করতে হবে, যাতে পরবর্তীর জন্য যেন তার প্রস্তুতি থাকে। অবশ্য ভবিষ্যৎ ঘটনাক্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সাড়ার সমস্যাকে জটিল করে তোলে।

এই সব সাধারণ উক্তি থেকে দু'টি সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত আসে। একদিকে, অবিমিশ্র বাহ্যিক নির্দেশ অসম্ভব। সাড়া জাগানোর জন্য পরিবেশ বড় জোর কেবল উদ্দীপকই যোগাতে পারে। আসলে ব্যক্তির মধ্যে আগে থেকেই যে সব প্রবণতা থাকে, সাড়া জাগে তার থেকেই। এমন কি, যখন একজনকে ধমক দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কাজ করানো হয়, তখন তার দরুণ কেবল এই জন্যই কাজ হয় যে, তাঁর মধ্যে আগে থেকেই ভয়ের সহজ

প্রবৃত্তি থাকে। তা যদি তাঁর না থাকে, বা থাকলেও তা যদি তাঁর নিজের শাসনাধীনে থাকে, তাহলে যার চোখ নেই সে যেমন আলোর প্রভাবে কিছু দেখতে পাবে না, তেমনি ভয়ের প্রভাবেও কারও কাছ থেকে কোনও কাজ আদায় করা যাবে না। যদিও বড়োদের রীতিনীতি ছোটোদের কর্ম তৎপরতা নির্দেশ করতে ও জাগ্রত করতে উদ্দীপকের কাজ করে, তথাপি কিন্তু ছোটোরা তাদের কাজকর্ম পরিবেশে যে পথটি বেছে নেয় সেটি ধরেই কাজে অংশ নেয়। যথার্থভাবে বলতে গেলে দাঁড়ায় যে, তাদের উপরে বা তাদের মধ্যে জোর করে কোনো কিছু চাপানো যায় না। এই সত্যটিকে উপেক্ষা করার অর্থ মানুষের স্বভাবকে বিরূপ ও বিকৃত করা। নির্দেশ-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের উপস্থিত সহজ-প্রবৃত্তি ও অভ্যাস কোনো কাজকর্মে যে অংশ দান করে তা হিসাবের মধ্যে ধরার অর্থ হল, বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার সহিত নির্দেশ দেওয়া। নিখুঁতভাবে বলতে গেলে, সকল নির্দেশই পুনর্নির্দেশ—যে সব কর্মতৎপরতা আগে থেকে চলতে থাকে, সেগুলিকে আর এক প্রণালীতে চালু করা। যে তেজোরাশি আগে থেকেই কাজ করছে তা জানা না থাকলে, নির্দেশ প্রচেষ্টা প্রায় নিশ্চিতরূপেই ব্যর্থ হয়।

অন্য দিকে, অপর লোকের রীতি-নীতি ও আইন-কানুন যে নিয়ন্ত্রণ আনে তা অদূরদর্শীও হতে পারে। এতে তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পরবর্তী কাজের ভারসাম্য বিনষ্ট করেই এ রকম করা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, স্বাভাবিক ঝোঁকের বশে একজনে যা করে যাচ্ছে, হুমকির বলে অশুভ পরিণামের ভয় দেখিয়ে তাকে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করা যেতে পারে। কিন্তু সে হয়ত এমন অবস্থায় পৌঁছাবে যে, তাতে পরে অন্যান্য প্রভাবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আরও বেশী খারাপ করতে অগ্রসর হবে। এতে তার শঠ ও কপট প্রবৃত্তিগুলি জেগে উঠতে পারে। ফলে সে অন্য অবস্থায় যতোটা করত এখন থেকে হয়ত তার থেকে বেশী ছল-চাতুরির আশ্রয় নেবে। যারা অন্য লোকের কাজকর্মের নির্দেষ্টা, তাদের কাছে নির্দেশাধীনদের পর্যায়ক্রমিক বিকাশের গুরুত্ব উপেক্ষা করার বিপদ সব সময়েই খাড়া থাকে।

২। সামাজিক নির্দেশকরূপের ধরন।

বড়োরা যখন অন্যদের আচরণ নির্দেশ করার লক্ষ্যে উপনীত হতে চান, তখন স্বভাবতঃই তাঁরা সে বিষয়ে সর্বাধিক সচেতন থাকেন। সাধারণতঃ যখনই তাঁরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ দেখতে পান, তখনই সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠেন। ফলে অন্যেরা যা যা করছে ওঁরা চান না যে তারা তা করুক। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের অধিকতর স্থায়িত্ব ও প্রভাবের দিক বলতে এমন সব ব্যবস্থা বোঝায়, যা আমাদের সুচিন্তিত অভিপ্রায় ছাড়াই ক্ষণে ক্ষণে নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়া করে।

(১) আমরা যা করতে চাই, অন্যেরা যখন তা করে না, বা তাতে তারা অবাধ্য হবার উপক্রম করে, তখন তাদের নিয়ন্ত্রিত করার আবশ্যকতার, এবং যে সমস্ত প্রভাবের ফলে তারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, সেগুলোর প্রতি আমরা সব চেয়ে বেশী করে সচেতন হই। এ অবস্থায় আমাদের নিয়ন্ত্রণবিধি অতিশয় প্রত্যক্ষ ও মূর্ত হয়ে ওঠে, এবং ইতিপূর্বে যে সব ভুল-ত্রুটির কথা বলা হয়েছে এ হেন অবস্থাতেই সেগুলো ঘটবার উপক্রম হয়,— এমন কি, বেশী করে গায়ের জোরে আনা প্রভাবকেই আমরা নিয়ন্ত্রণ বলে ধরে নিতে চাই। এ কথা ভুলে যাই যে, একটা ঘোড়াকে জলে নামাতে পারলেও তাকে জল খাওয়ানো যায় না ; ভুলে যাই যে, একজনকে অপরাধ সংশোধন কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা গেলেও তাকে দিয়ে অনুতাপ করানো যায় না। অন্যের উপরে তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়ার এই সব ক্ষেত্রে দৈহিক ও নৈতিক ফলাফলের মধ্যের পার্থক্য বিচার করা প্রয়োজন। একজন লোক এমন অবস্থায় পড়তে পারে যে তারই ভালোর জন্য তাকে জোর করে খাওয়ানোর বা আটক রাখার দরকার হয়। যাতে একটি শিশুর আগুনের সেকা না লাগে সে জন্য তাকে আগুনের কাছ থেকে রূঢ়ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার দরকার হতে পারে। কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে তাতে তার মানসতার কোনো উন্নতি হবে, বা, সে কোনো শিক্ষাপ্রদ ফল পাবে। একটা কর্কশ ও হুকুমদারী কণ্ঠস্বর একটি শিশুকে আগুনের কাছ থেকে দূরে রাখতে কার্যকর হতে পারে, এবং সে ক্ষেত্রে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতোই বাঞ্ছনীয় দৈহিক ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এর এক ব্যবস্থার মধ্যে যে নীতি বাচক আনুগত্য

থাকবে, অন্যটির ক্ষেত্রে তার থেকে বেশী কিছু থাকবে না। কোনো লোককে আটক রেখে, তাকে অন্যের ঘর ভেঙে ঢুকে পড়া থেকে বিরত করা যেতে পারে। কিন্তু তার ফলে তার চুরি করার প্রবৃত্তিটা নাও বদলাতে পারে। আমরা যখন দৈহিক পরিণামের সাথে শিক্ষামূলক পরিণাম ঘুলিয়ে ফেলি, তখন সব সময়েই বাঞ্ছিত ফল পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অংশভাক্ মানসতাকে নিয়োজিত করার সুযোগ হারাই, এবং এর সঙ্গে তার মধ্যে একটা মজ্জাগত ও অব্যাহত নির্দেশের বিকাশ সাধনেরও সুযোগ হারাই।

যে সব কাজকর্ম আত্যন্তিক ভাবে সহজ-প্রবৃত্তি বা প্রবণতামূলক, এবং যারা এই জাতীয় কাজকর্ম করে অথচ তাদের পক্ষে ওগুলোর পরিণাম দেখতে পাওয়ার কোনো উপায় থাকে না, মাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ সচেতন নিয়ন্ত্রণকে সীমিত রাখা উচিত। যদি একজনে তার কাজের পরিণাম আগে থেকে দেখতে না পায়, এবং অভিজ্ঞ লোকেরা এর পরিণাম সম্বন্ধে যা বলেন তা বোঝবার ক্ষমতাও তার না থাকে, তা হলে তার পক্ষে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা অসম্ভব। এ হেন অবস্থায় তার কাছে সব কাজই এক জাতীয় বলে মনে হবে। যা কিছুই তাকে আলোড়িত করে, তাতেই সে আন্দোলিত হয়, এবং এটাই এর শেষ কথা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে নিজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে দেওয়া, এবং কাজের পরিণাম আবিষ্কার করতে দেওয়া ভালো, এতে সে অনুরূপ অবস্থায় পড়লে পরের বারে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কাজটির ধরন অন্যের কাছে এতো অশোভন ও আপত্তিকর যে সব সময়ে এ রকম করতে দেওয়া যায় না। এ রকম অবস্থায় দরকার সরাসরি আপত্তি। দরকার হয় লজ্জা দেওয়া, বিদ্রূপ করা, অসন্তোষ প্রকাশ করা, তিরস্কার করা ও শাস্তির ভয় দেখানোর। অথবা শিশুকে তার ব্যবহারের ধারা থেকে ফেরাবার জন্য তারই বিপরীত প্রবণতাগুলো আহ্বান করতে হয়। বাহবা পাওয়ার ইচ্ছা, শোভনীয় কাজ করে সুনজরে পড়বার ইচ্ছা ইত্যাদির সুবিধা নিয়ে তাকে অন্য পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করতে হয়।

(২) নিয়ন্ত্রণের এই সব পদ্ধতি এত স্পষ্ট (কারণ তা এত জেনে শুনে খাটানো হয়) যে, এগুলির উল্লেখ প্রায় নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ত, যদি না

এদের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণের অন্য একটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী পদ্ধতির দিকে নজর দেবার দরকার থাকতো। একটি অপরিণত সত্তা যাদের সঙ্গে জড়িত, এবং তারা যে পন্থা অবলম্বন করে দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, সেই অন্য পদ্ধতিটি এই পন্থার মধ্যে নিহিত; অর্থাৎ যে সব সাধকের সাহায্যে লোকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে তার মধ্যে এটি নিহিত। যে সমাজ মাধ্যমে একজনে বাস করে, চলাফেরা করে, এবং নিজ সত্তাকে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, সেই সমাজই তার ক্রিয়াশীলতার নির্দেষ্টারূপে চিরস্থায়ী কার্যকারী প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়।

এই সত্যের দাবী এই যে, সামাজিক পরিবেশ বলতে যা বোঝায়, তাকে বিশদভাবে বুঝে নেবার আবশ্যকতা আছে। আমরা যে ভৌত, ও সমাজ পরিবেশে বাস করি তাকে পরস্পর বিচ্ছিন্নরূপে দেখা আমাদের অভ্যাস। এই বিভাজন একদিকে যেমন অধিকতর প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ বিধির নৈতিক গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করার জন্য দায়ী, অন্যদিকে তেমনি, প্রচলিত মনোবিদ্যা ও দর্শনের মধ্যে ভৌত পরিবেশ সংস্পর্শজাত বুদ্ধিগম্য সম্ভাব্যতাকেও অতিরঞ্জিত করার দায় থেকে এটি মুক্ত নয়। বস্তুতঃ, মাধ্যমরূপে ভৌত পরিবেশকে ব্যবহার করা না হলে পৃথকভাবে এক ব্যক্তির উপরে, অন্য ব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব বলে কোনো কিছু থাকতেই পারে না। একটি হাসি, একটি ভ্রূকুটি, একটি তিরস্কার, সতর্কতা বা উৎসাহব্যঞ্জক একটি কথা,—এর সব কিছুই ভৌত পরিবর্তন আনে। অন্যথায়, একজনের মনোভাব আর এক জনের মনোভাবে পরিবর্তন আনতে পারত না। আপেক্ষিকভাবে বলতে গেলে, এই ধরনের সকল প্রভাবকেই ব্যক্তিগত প্রভাব বলে মনে করা যেতে পারে। এখানে ভৌত মাধ্যমটি কেবল ব্যক্তিগত সংযোগের উপায়ে পরিণত হয়, এই যা। পারস্পরিক প্রভাবের এই জাতীয় সরাসরি সংযোগ ছাড়াও আর এক ধরনের পারস্পরিক প্রভাব দেখা যায়। সেটি আসে সমষ্টির সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে ফললাভের উপায় ও পরিমাপরূপে "জিনিসপত্রের" প্রয়োগ থেকে। যদিচ মা, মেয়েকে কোনো সময়েই তাঁকে সাহায্য করতে বলেন না, কিম্বা সাহায্য না করার জন্য কখনো তিরস্কারও করেন না, তবুও মায়ের সঙ্গে মেয়ে যে গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত হয়, কেবল এই সত্যের জোরেই সন্তান তার

নিজের কাজের মধ্যেই নির্দেশ খুঁজে পায় এবং তা মেনেও চলে। অনু-করণ, সক্ষমতা, এবং একত্রে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা বোধই নিয়ন্ত্রণকে বলবৎ করে।

মা যদি শিশুর হাতে প্রয়োজনীয় কিছু দিতে চান, শিশু তা পাবার জন্য অবশ্যই জিনিসটা ধরবে এবং যেখানেই দেওয়া থাকে, সেখানে নেওয়ার প্রশ্ন অবশ্যই থাকে। জিনিসটা পাওয়ার পরে, শিশু যেভাবে তা ধরে নেয় এবং যেভাবে তাকে কাজে লাগায় তা নিশ্চিতরূপেই এই দিয়ে প্রভাবিত হয় যে, সে মায়ের কাজ লক্ষ্য করেছে। অন্য অবস্থায়, মার কাছ থেকে একটি জিনিস নিয়ে নেওয়া যতোটা স্বাভাবিক, শিশু যখন মাকে কিছু খুঁজতে দেখে, তখন তার পক্ষেও তা খোঁজ করা, এবং পাওয়া গেলে তা মাকে দেওয়াও ততোটাই স্বাভাবিক। দৈনন্দিন জীবনের আদান-প্রদানের এই রকম হাজার হাজার দৃষ্টান্ত নিলে, ছোটোদের ক্রিয়াকলাপ নির্দেশে আমরা একটা সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও বলিষ্ঠ পদ্ধতির চিত্র দেখতে পাই।

একথা বলার অর্থ, পূর্বে যা বলা হয়েছে তারই পুনরুক্তি করা। কথাটা এই যে, যৌথ কাজে অংশ নেওয়াই মানসতা গঠনের মুখ্য পথ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যৌথ কাজের মধ্যে "উপকরণের প্রয়োগ" যে অংশ গ্রহণ করে তার স্বীকৃতিও স্পষ্টতঃ যুক্ত। শিক্ষাদর্শন একটা মনস্তত্ত্ববাদ দিয়ে অসঙ্গত-ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বার বার বলা হয় যে, শুধু ইন্দ্রিয়গুলিকেই প্রবেশদ্বার করে বস্তুর গুণাবলীর ছাপ মনের উপর পড়ে, এবং এভাবেই মানুষ শিক্ষালাভ করে,—এই ভাবেই সংজ্ঞাবহ প্রতিচ্ছবিগুলির একটি ভাণ্ডার গড়ে ওঠে, এবং তারপরে, অনুষঙ্গ বা মানসিক সংশ্লেষণকারী কোনো শক্তি এইগুলিকে বিভিন্ন ধারণাতে সংযোজিত করে, অর্থাৎ, অর্থপূর্ণ কোনো কিছুতে যোজনা করে। কোনো একটি বস্তু, যেমন পাথর, লেবু, গাছ, চেয়ার ইত্যাদি জিনিস,—বর্ণ, আকৃতি, আয়তন, কাঠিন্য, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদির বিভিন্ন ছাপ দেয়, এবং এগুলি একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়ে প্রতিটি জিনিসের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থ যোজনা করে। আসলে কিন্তু একটা জিনিসের বিশিষ্ট গুণ থাকার জন্যই তাকে বিশিষ্ট ব্যবহারে লাগানো হয়, এবং তার মধ্যেই জিনিসটির অর্থ নিহিত থাকে বলে তা দিয়েই তাকে সনাক্ত করা হয়। যেমন, চেয়ার একটি জিনিস এবং সেটিকে এক রকমে ব্যবহারে লাগানো হয়;

তেমনি টেবিল এমন একটি জিনিস যা আর এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এমনি ভাবে লেবুকে ব্যবহারে লাগাতে গিয়ে ভাবা চলে যে এর এতো দাম, এটি উষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়, এটি খাবার জিনিস, এবং খাবার সময়ে এর ঘ্রাণ মনোরম, ও স্বাদ স্নিগ্ধকর ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটি শারীরিক উদ্দীপকের সমন্বয় সাধন এবং একটি মানসিক ক্রিয়ার সমন্বয় সাধনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে জিনিসের প্রতি সাড়া জাগে তার অর্থ বা তাৎপর্য হিসাবে, প্রথমটির ক্ষেত্রে তা থাকে না। কোনো হট্টগোলে আমার মন লিপ্ত না হতে পারে। কিন্তু সেই হট্টগোলের জন্য আমি লাফ দিয়ে উঠতে পারি। যখন আমি কোনো গোলমাল শুনে ছুটে গিয়ে জল নিয়ে আসি, এবং আগুন নিবিয়ে দিই, তখন আমি বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করি। এখানে গোলমালের অর্থ ছিল আগুন, আর আগুনের অর্থ ছিল নিবিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। আমি যখন একটা পাথরে ঠোকর খেয়ে "আঃ" করে উঠি, এবং পাথরটাকে ঠোকা দিয়ে একপাশে ফেলে দিই, তখন এটা হয় নিছক দৈহিক কাজ। কিন্তু আর একজনে ঠোকর খেয়ে পড়ে যাবে, এই ভয় করে যদি আমি ওটাকে সরিয়ে রাখি, তাহলে তা হবে বুদ্ধির কাজ। এখানে জিনিসের কোনো একটি অর্থের প্রতি আমি সাড়া দেই। বাজের আওয়াজে আমি আঁতকে উঠি,—তা বুঝি, আর নাই বুঝি, খুব সম্ভব না বুঝেই আঁতকে উঠি। কিন্তু যদি আমি বলি, "বাজ পড়ল"—তা চিৎকার করেই বলি, আর মনে মনেই বলি,—তা হলে আমি এই আলোড়নের প্রতি সাড়া দিই একটা অর্থ নিয়ে। এখানে আমার ব্যবহারের একটা মানসিকতা থাকে। যখন আমাদের কাছে জিনিসের অর্থ থাকে, তখন আমরা যা কিছু করি, তা বুঝে করি ; (মনস্থ করি, প্রস্তাব করি) ; আর যখন তা থাকে না, তখন আমরা অন্ধ, অচেতন, বা অবোধের মতো কাজ করি।

এই উভয়বিধ সংবেদনশীল সমন্বয়ের ক্ষেত্রেই আমাদের ক্রিয়াকলাপ নির্দেশিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সংবেদনশীলতা যেখানে অন্ধ, নির্দেশও সেখানে অন্ধ। এর মধ্যে অভ্যস্ত করার কথা থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষা নেই। অবশ্য পুনরাবৃত্তিশীল উদ্দীপকের প্রতি বারম্বার সাড়া দেওয়াতে এক ধরনের অভ্যাস গঠিত হতে পারে। আমাদের সকলেরই এমন অনেক

অভ্যাস আছে, যেগুলির আবির্ভাব সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অজ্ঞাত, কারণ আমরা কোনটা কেন করছি তা জানবার আগেই ওগুলো গঠিত হয়েছে। ফলে ওরাই আমাদের পেয়ে বসেছে, আমরা ওদের পাইনি, ওরাই আমাদের আন্দোলিত করে এবং নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু ওরা যা সাধন করে তা জানতে না পারলে, এবং তার পরিণাম-মূল্য বিচার করতে না পারলে ওরা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। কোনো শিশুর সঙ্গে যতো বারই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়, ততোবারই যদি তার ঘাড়ের পেশীতে চাপ দিয়ে তাকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করা হয়, তা হলে এই মাথা নোয়ানোর অভ্যাসটা স্বয়ংচল হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এ রকম করে, অর্থাৎ, এর অর্থ হয়, এমন কিছু বুঝে না নিয়ে করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা নোয়ানোটা তার কাছে কোনো শ্রদ্ধা বা স্বীকৃতির কাজ হবে না এবং যে পর্যন্ত সে জানতে না পারে যে, সে কি করছে, এবং তার অর্থ বুঝে না নিয়ে করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যায় না যে তাকে "লালন পালন করে তোলা হয়েছে"—বলা যায় না যে, তাকে কাজে শিক্ষিত করা হয়েছে। সুতরাং, একটা জিনিসের "ধারণা" পাওয়া মানে কেবল সেই জিনিসের সংস্পর্শে কিছু পরিমাণ সংবেদন পাওয়াই নয়। একটি ব্যাপক কর্মপ্রকল্পে কোনো জিনিসের যে স্থান থাকে, তার দিকে লক্ষ্য রেখে তার প্রতি সাড়া দিতে সমর্থ হওয়াই ধারণার কাজ। আমাদের উপরে বস্তুর এবং বস্তুর উপরে আমাদের ক্রিয়ার তাড়না ও সম্ভাব্য পরিণতিকে পূর্ব থেকে দেখতে পাওয়াই হ'ল ধারণা।

অতএব বিবিধ বস্তু সম্বন্ধে অন্যদের যে ধারণা থাকে, সেই ধারণা নিয়ে তাদের সঙ্গে সদৃশ মনোভাব বিশিষ্ট হয়ে, কোনো সমাজ-সমষ্টির যথার্থ সভ্য হওয়ার অর্থ হল, বিবিধ বস্তু ও কর্মের উপর অন্যেরা যে সব অর্থ আরোপ করে, সেই সব অর্থ আরোপ করে তাদিকে অন্তরে গ্রহণ করা। অন্যথায় কোনো সর্বজনীন বোঝাপড়া থাকে না, বা কোনো সামাজিক জীবনও থাকে না। কিন্তু যে কাজে অনেকে অংশ গ্রহণ করে সেখানে প্রত্যেকে নিজে যা করছে তার সাথে অন্যেরা যা করছে তার সম্বন্ধ রাখা হয়; এবং অন্যেরাও তাই করে। অর্থাৎ প্রত্যেকের ক্রিয়াকলাপই একটা ব্যাপক পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপিত হয়। যদি না জানা থাকে যে, অন্যেরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে একটা দড়ি

ধরে টানাটানি করছে, তাহলে সেটায় টান দেওয়া অংশীদারী বা সম্মিলিত কাজ নয়। এবং ঐ কাজে সহায়তা করার বা বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্য ওটা টানা হচ্ছে কিনা সেটি জানলে তবে তাকে সম্মিলিত কাজ বলা যেতে পারে। আলপিন প্রস্তুত করতে হলে, বস্তুটি পর পর অনেক লোকের হাত দিয়ে যায়। কিন্তু আর সকলে যা যা করছে, তা না জেনেও, কিম্বা তার সাথে সংশ্রব না রেখেও, ওদের একজনে তার নিজের কাজ করে যেতে পারে। এখানে সকলেই এক একটা পৃথক ফল পাবার উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে পারে,—যেমন, নিজ নিজ মজুরির জন্যও তো কাজ করা হতে পারে। এখানে এমন কোনো সার্বিক পরিণাম নেই যার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন কর্মাংশ যুক্ত হয়ে যায়। কাজেই যদিও এখানেও কর্মীদের পারস্পরিক সান্নিধ্য বর্তমান, এবং এদের কর্মাংশও কেবল একটি পরিণতির ক্ষেত্রেই অংশ যোগাচ্ছে তথাপি এর মধ্যে কোনো প্রকৃত আদান-প্রদান বা সাহচর্য থাকে না। কিন্তু এদের প্রত্যেকে যদি অন্যদের কাজের উপরে তার নিজের কাজের, এবং তার নিজের কাজের উপরে আর আর সকলের কাজের পরিণাম দেখতে পায়, তা হলে সকলের মধ্যেই একটা সার্বিক মন থাকে, থাকে তাদের ব্যবহারের মধ্যে একটা সার্বিক সঙ্কল্প। এই ভাবে বিভিন্ন অংশদাতাদের মধ্যে যে সার্বিক বোঝাপড়ার ভাব সৃষ্টি হয়, তাই প্রত্যেকের কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ধরা যাক্, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, একজনে স্বচ্ছন্দে একটি বল লুফে নিয়ে আর একজনের কাছে ছুঁড়ে দিল ; সেও বলটি লুফে নিল, এবং স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে দিল, এবং দুজনেই বলটি কোথা থেকে এল কোথায় গেল তা না জেনেই ঐ ভাবে কাজ করে গেল। স্পষ্টতঃই এ রকম কাজের মধ্যে কোনো অর্থ বা তাৎপর্য থাকবে না। এখানে কাজটি ভৌতিকরূপে নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু সামাজিকরূপে নির্দেশিত নয়। কিন্তু ধরা যাক যেন, দুজনেই জানে যে অন্যজনে কি করছে ; এ ক্ষেত্রে একজনে আর একজনের কাজে আগ্রহী হয়, এবং পরস্পরের কাজের সাথে সংশ্রব রেখে নিজে যা করছে তাতেও আগ্রহী হয়। এখানে প্রত্যেকের কাজই হবে বুদ্ধিগত,—সামাজিকরূপে বুদ্ধিগত এবং পরিচালিত। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এতে কল্পনার আশ্রয় খুব কম নিলেও চলবে। একটি খুব ছোটো শিশুর খিদে পেয়েছে ; সে কাঁদছে, এবং তার সামনেই খাদ্য প্রস্তুত

করা হচ্ছে। অন্যে যা করছে তার সাথে যদি সে নিজের অবস্থার সংযোগ না করে, এবং তার নিজের তৃপ্তির সাথে অন্যে যা করছে তা সংযুক্ত না করে, তাহলে বর্ধমান উদ্বেগের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া হবে বর্ধমান অধৈর্য। সে তখন আঙ্গিকভাবেই ভৌতরূপে নিযন্ত্রিত থাকবে। কিন্তু সে যখন আগা গোড়া সম্পর্কটা দেখতে পায়, তখন তার ভাবভঙ্গী পুরামাত্রায় বদলে যায়। সে আগ্রহী হয়, এবং অন্যে যা করছে তা লক্ষ্য করে। সে আর কেবল নিজের ক্ষুধার বশেই প্রতিক্রিয়া করে না, কিন্তু প্রত্যাশিত তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অন্যে যা করছে সে তখন সেই সূত্র ধরতে শুরু করে। এখানে ক্ষুধা কি বস্তু, তা না জেনেই শুধু শুধু ক্ষুধাতেই সে কাতর হয় না, পরন্তু সে লক্ষ্য করে, বোঝে, বা নিজের অবস্থাটা সনাক্ত করে। এটা তার কাছে লক্ষণীয় বস্তু হয়ে ওঠে। এর প্রতি তার ভাবভঙ্গী কিছু পরিমাণে বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। এবং অন্যের কাজ ও নিজের অবস্থার তাৎপর্য উপলব্ধি বশে সে সামাজিক-রূপে নির্দেশিত হয়।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের প্রধান প্রস্তাবটির দু'টি দিক ছিল: এর মধ্যে যেটি বিবেচিত হল, তা এই যে বস্তু বা দ্রব্য মন প্রভাবিত করে না (কিম্বা ধারণা ও বিশ্বাস গঠন করে না): কেবল ভবিষ্যাপেক্ষ পরিণাম সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে জড়িত হয়েই তা মনকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে লোকে ভৌত অবস্থাবলীর যে বিশিষ্ট সদ্ব্যবহার করে, মাত্র তার মধ্যে দিয়েই তারা "পরস্পরের মানসতা" রূপান্তরিত করে। যে সমস্ত প্রকাশ্য আলোড়নের প্রতি অন্যেরা সংবেদনশীল, যেমন, আরক্তিমভাব, মৃদু হাসি, ভ্রূকুটি, শক্ত করে হাত মুট করা, এবং নানা রকমের স্বাভাবিক ভাব ভঙ্গী ইত্যাদি, প্রথমে সেগুলি বিবেচনা করা যাক। এগুলো নিজ নিজ গুণে কিছু প্রকাশ করে না। এগুলো একজনের ভঙ্গীর অঙ্গাঙ্গি অংশ। অন্যকে লজ্জাশীলতা বা হতবুদ্ধিতা দেখানোর জন্য কেহ রক্তিমাভ হয় না, রক্তিমাভ হয় এই কারণে যে, উদ্দীপকের প্রতি সাড়া জাগার ফলে সূক্ষ্ম নলকূপগুলির মধ্যে রক্ত চলাচলের ধারা বদলে যায়। কিন্তু অন্যেরা একজনের আরক্তিম ভাব বা পেশীগুচ্ছের সামান্য সঙ্কোচনকে লোকটি যে অবস্থায় পড়েছে, এবং সেই পরিস্থিতিতে তারা কি ভাবে চলবে, তারই সংকেত রূপে ব্যবহার করে। ভ্রূকুটি আসন্ন তিরস্কার সূচিত করে: তা শোনবার জন্য তৈরী থাকতে

হবে; কিম্বা এতে কোনো অনিশ্চয়তা; বা, দ্বিধাও সূচিত হতে পারে। যদি সম্ভব হয়, তা হলে কোনো কথা বলে বা কোনো কাজ করে এই অবস্থা দূর করতে হবে, বা আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

কিছু দূরে একজন লোক তার হাত দু'খানা প্রচণ্ড ভাবে দোলাচ্ছে। নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ মনোভাব বজায় রাখলে, আমরা যে সব দূরবর্তী ভৌত পরিবর্তন লক্ষ্য করি, এই লোকটির আলোড়ন আমাদের কাছে সেই স্তরেই থাকবে। আমাদের যদি কোনো সংশ্রব বা স্বার্থ না থাকে, তা হলে এই হাত দোলানো, বায়ুচালিত ঘানির পাখার মতোই আমাদের কাছে অর্থহীন লাগবে।' কিন্তু যদি আগ্রহ জাগে তাহলে আমরা ঐ ঘটনায় অংশ নিতে আরম্ভ করি। তখন আসে তার কাজের অর্থ বিচার। ফলে কি কর্তব্য তা স্থির করতে হয়। লোকটি কি সাহায্যের জন্য ইশারা করছে? কোনো বিস্ফোরণ ঘটবে বলে সে কি আমাদের সতর্ক করছে, যাতে আমরা রক্ষা পেতে পারি? এক অবস্থায় তার কাজের অর্থ দাঁড়ায় তার দিকে আমাদের ছুটে যাওয়া; অন্য অবস্থায় অর্থ দাঁড়ায় ছুটে পালিয়ে যাওয়া। অবস্থা যাই হোক না কেন, লোকটি তৎকালীন ভৌত পরিবেশের মধ্যে যে পরিবর্তন আনে, সেই পরিবর্তনই, আমাদের যে ভাবে চলতে হবে, তার সঙ্কেত দেয়। এখানে আমাদের কাজ "সমাজ" নিয়ন্ত্রিত। কারণ এই লোকটি যে পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করছে সেই পরিস্থিতিতেই আমাদের কর্তব্যকে সম্পর্কান্বিত করে দেখবার চেষ্টা করি।

পূর্বেই দেখেছি যে (পূর্বে ১৯ পৃঃ) ভাষা এই ধরনের একটা যুক্ত সম্পর্কের বিষয়—একই পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদের কাজকে আর একজনের কাজের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে। কাজেই সামাজিক নির্দেশের উপায় রূপে ভাষার সার্থকতা অদ্বিতীয়। কিন্তু কার্যসিদ্ধির জন্য অধিকতর স্থূল ও সহজ ভৌত উপায়গুলির প্রয়োগের পটভূমিতে যদি ভাষা না জন্মাত তা হলে তা অত কার্যকারী হ'ত না। একটি শিশু অন্য সব লোকের সঙ্গে বাস করতে করতে দেখে যে, তারা এক এক রকমে চেয়ার, টুপি, টেবিল, কোদাল, করাত, লাঙ্গল, ঘোড়া, টাকা-পয়সা ইত্যাদি ব্যবহার করছে। তারা যা করছে তার মধ্যে যদি শিশুর কোনো অংশ থাকে, তাহলে সেও এই রকম ভাবে জিনিসপত্র ব্যবহার করতে থাকবে, এবং এর সঙ্গে

অন্যান্য জিনিসপত্রও যে ভাবে ব্যবহার করা হয় শিশুও সেই ভাবেই সেগুলির ব্যবহার করে চলবে। যদি টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে আনা হয়, তাহলে সেটি হবে তার উপরে তার বসার সঙ্কেত। যদি একজনে তার ডান হাত বাড়িয়ে দেয়, তাকেও তার হাত বাড়াতে হবে ; এইভাবে অশেষ খুঁটিনাটি কাজের অব্যাহত ধারা চলতে থাকে। কলাসৃষ্ট দ্রব্যাদি ও প্রাকৃতিক কাঁচামাল ব্যবহার করার প্রচলিত অভ্যাস নানাভাবে সামাজিক নিমন্ত্রণের গভীরতম ও ব্যাপকতম ধরন-ধারন গড়ে তোলে। শিশুরা যে বয়সে স্কুলে যায়, তার আগে থেকেই তাদের এমন একটা "মন" ও বোধবিচারের ধাত থাকে যে, ভাষা ব্যবহার করে তার প্রতি আবেদন করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই "মনগুলো" হল বুদ্ধিগত সাড়ার সংগঠিত অভ্যাস,—অর্থাৎ অন্যেরা যে ভাবে জিনিস-আদি ব্যবহার করে তার সঙ্গে যোগ রেখে তাদের কাজে লাগানোর যে অভ্যাসটি পূর্বেই গঠিত হয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ এড়ানো যায় না ; নিয়ন্ত্রণ মানসতাকে পরিপৃক্ত করে।

এর সারকথা এই যে, নিয়ন্ত্রণের মৌলিক উপায় ব্যক্তিগত নয়, বুদ্ধিগত। এটি নৈতিকও নয়, অথাৎ যে অর্থে একজনে অন্যের ব্যক্তিগত আবেদন দ্বারা আলোড়িত হয়, সে অর্থে নৈতিক নয়,—যদিও সঙ্কট সন্ধিক্ষণে এই জাতীয় নৈতিক পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ন্ত্রণ "বোঝাপড়ার" অভ্যাস দিয়ে গঠিত। এই বোঝাপড়া গড়ে ওঠে পারস্পরিক সূত্রে জিনিসপত্র ব্যবহার করার ভিতর দিয়ে,—তা সে সহযোগিতা বা সহকারীতার সূত্রেই হোক, আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতার সূত্রেই হোক। জিনিসপত্রাদিকে যে যে কাজে লাগানো হয়, ঠিক সেই সেই অর্থে সেগুলিকে বুঝতে পারার ক্ষমতাই "মনের" মূর্ত রূপ ; যৌথ বা অংশীদারী পরিস্থিতিতে জিনিসপত্রাদি যে যে কাজে নিয়োজিত করা হয়, সেই সেই অর্থে সেগুলিকে বুঝতে পারার ক্ষমতাই সমাজীকৃত মন। এই অর্থে মনই হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনন্য পদ্ধতি।

৩। অনুকরণ ও সমাজ মনস্তত্ত্ব।

ইতিপূর্বে আমরা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের দোষত্রুটি লক্ষ্য করেছি। সেই ত্রুটিপূর্ণ বিজ্ঞান বলে যে, ব্যক্তির মন যেন শূন্য অবস্থাতেই ভৌত বস্তুর

সংস্পর্শে আসে, এবং মন ও বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই যেন জ্ঞান, ধারণা ও বিশ্বাসাদি গড়ে ওঠে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই, মানসিক ও নৈতিক প্রবণতা গঠনে সহধর্মীদের সঙ্গ-সান্নিধ্যের প্রভাব-প্রাধান্য উপলব্ধি করা হয়েছে। এমন কি, এখনও এই সঙ্গ-সান্নিধ্যকে বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শজাত তথাকথিত শিক্ষা-প্রণালীর একটা আনুষঙ্গিক বিষয় বলে ধরা হয়; এবং মনে করা হয় যে, এ যেন কেবল ভৌত পৃথিবীর জ্ঞানকে মানুষের জ্ঞান দ্বারা পরিপূরণ করা। আমাদের আলোচনার সার কথা এই যে, এই জাতীয় অভিমত ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে একটি অর্থহীন ও অসম্ভব বিভাজন সৃষ্টি করে। বস্তুর সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়া, বাহ্যিক সমন্বয় বিধানের অভ্যাস গঠন করতে পারে। কিন্তু যখন এটিকে একটা ঈপ্সিত ফল লাভের জন্যই ব্যবহার করা হয়, কেবল তখনই এই ক্রিয়া বিক্রিয়া কোনো অর্থপূর্ণ ও সংজ্ঞাত অভিপ্রায়-সম্পন্ন কর্মতৎপরতায় পরিচালিত হয়। একজনের পক্ষে আর-একজনের মন পরিবর্তন করার একমাত্র উপায় হল স্থূল অথবা কৃত্রিম ভৌত অবস্থাদির প্রয়োগে তার কাছ থেকে কোনো প্রত্যুত্তরশীল কর্মতৎপরতা বার করা। এ দুটিই হল আমাদের প্রধান সিদ্ধান্ত। মনোবিজ্ঞানের যে তত্ত্ব অনুসারে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে মানুষের সঙ্গে ভৌত জিনিসের প্রত্যক্ষ সম্পর্কটার আনুষঙ্গিক বিষয় বলে মনে করা হয়, সেই তত্ত্বের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত দু'টিকে বিবর্ধিত ও বলবৎ করা বাঞ্ছনীয়। সংক্ষেপে, তথাকথিত এই সমাজ-মনোবিজ্ঞান, অনুকরণ প্রবৃত্তির ধারণা থেকে গড়ে উঠেছে। কাজেই আমরা মানসিক ধাত গঠনের ক্ষেত্রে অনুকরণের স্বরূপ ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে অন্যদের কাজ-কর্ম অনুকরণ বা নকল করার সহজ প্রবৃত্তিজাত প্রবণতার উপরে। এ ক্ষেত্রে অন্য দের কাজ আদর্শ হয়ে ওঠে। অনুকরণ প্রবৃত্তি এত প্রবল যে, তরুণেরা, অন্য লোকে যে নমুনা তুলে ধরে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে নিজ নিজ আচরণ বিধির মধ্যে তারই পুনরাবৃত্তি করতে তৎপর হয়ে ওঠে। আমাদের তত্ত্ব অনুযায়ী, এ স্থলে যাকে অনুকরণ বলা হচ্ছে, তা হল জিনিস-পত্রের যে ধরনের ব্যাবহারিক প্রয়োগ থেকে সর্ব-সার্থ-জড়িত পরিণাম আসে, অন্যান্যের সঙ্গে একত্র হয়ে সেই সব ব্যাবহারিক প্রয়োগের মধ্যে অংশগ্রহণ করার কোনো বিভ্রান্তিকর নাম।

অনুকরণ সম্বন্ধে চলিত ধারণার মৌলিক ভ্রান্তি হল, ঘোড়ার সামনে গাড়ী বাঁধার মতো—কোনো পরিণামকেই পরিণামের হেতু বলে মনে করা। এ কথা সন্দেহাতীত যে, সমাজ-সমষ্টি গঠনে লোকে সদৃশমনা থাকে, এবং তারা পরস্পরকে বোঝে। সদৃশ অবস্থাধীনে তারা একই নিয়ন্ত্রণকারী ধারণা, বিশ্বাস ও অভিপ্রায় নিয়ে কাজ করতে চায়। বাহির থেকে দেখলে হয়ত কেউ বলবে যে তারা পরস্পরের "অনুকরণে" প্রবৃত্ত। কারণ তারা প্রায় একই রকমের কাজ একই ধরনে করছে, অবশ্য সে অর্থে ও-রকম বলাই ঠিক হবে। কিন্তু তারা কেন যে এ-রকম করছে, "অনুকরণ" তার উপরে কোনো আলোকপাত করে না। এ যেন একটা কাজের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেই কাজটিরই পুনরুক্তি করা। এ ধরনের ব্যাখ্যা সেই যে প্রসিদ্ধ উক্তি আছে "আফিম ঘুমপাড়ায়, কারণ আফিমের ঘুম-পাড়ানো শক্তি আছে"—তারই সমতুল্য।

কাজকর্মের বিষয়গত সাদৃশ্য এবং অন্যান্যের অনুরূপ হওয়া থেকে যে মানসিক তুষ্টি আসে, তাকেই নাম দেওয়া হয় অনুকরণ। এই সামাজিক সত্যকে তখন এমন কোনো মনস্তাত্ত্বিক শক্তি বলে ধরা হয় যেন এর বলেই সাদৃশ্য সৃষ্টি হচ্ছে। যাকে অনুকরণ আখ্যা দেওয়া হয়, তার একটা বড়ো অংশ এই যে, লোকের গঠন এক রকমের বলে, একই উদ্দীপকের প্রতি তারা একই প্রকারে সাড়া দেয়। অনুকরণ থেকে নয়, বরং স্বতন্ত্রভাবেই লোকে অপমানিত হলে ক্রুদ্ধ হয়, এবং অপমানকারীকে আক্রমণও করে। এই যুক্তি খণ্ডনের জন্য অবশ্য বলা চলে যে, পৃথক পৃথক রীতি-নীতি সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অপমানের উত্তর দেয়। এক গোষ্ঠীর লোকে ঘুষির জোরে অপমানের প্রতিকার করতে পারে; আর এক গোষ্ঠী মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে, আবার অন্য গোষ্ঠী হয়তো উপেক্ষাসূচক অবজ্ঞাভরে এর সম্মুখীন হতে পারে। বলা যেতে পারে যে, অনুকরণযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ থাকে বলেই এ রকমটি ঘটে। কিন্তু এতে অনুকরণের দোহাই দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন রীতি-নীতি থাকার অর্থই এই যে, ব্যবহারের আসল উদ্দীপকগুলিও বিভিন্ন। সচেতনভাবে শিক্ষাদানের একটা ভূমিকা আছে; পূর্বের অনুমোদন বা অননুমোদনেরও একটা বড়ো প্রভাব। আরও একটা বিশেষ কার্যকারী প্রভাব এই যে, একজনে যদি তার গোষ্ঠীর প্রচলিত

ধারায় কাজ না করে, তাহলে তাকে কার্যতঃ বহিষ্কৃত হতে হয়। অন্যেরা যেভাবে আচরণ করে সেভাবে আচরণ করেই একজনে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ-ভাবে ও সমান শর্তে মিশতে পারে। একজনে এক রকমের কাজ করলে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং অন্য ধরনের কাজ করলে গোষ্ঠীর বহির্ভূত হয়,—এই সত্যটির প্রাধান্য নিরন্তর বর্তমান। যাকে অনুকরণের ফল বলা হয় তা হল সাধারণতঃ যাদের সঙ্গে মানুষকে থাকতে হয়, তাদের সংজ্ঞাত শিক্ষাদান, নির্জ্ঞাত স্বীকৃতি, এবং সমর্থনপুষ্ট নির্বাচিত প্রভাবের ফল।

ধরা যাক, একজনে কোন একটি শিশুর কাছে একটি বল গড়িয়ে দিল; শিশু ওটি ধরে, ফিরে গড়িয়ে দিল, এবং এভাবে খেলা চলতে লাগল। এখানে বলের বা অন্যের হাত দিয়ে বল গড়ানোর দৃশ্যই উদ্দীপক নয়, উদ্দীপক হল সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি,—অর্থাৎ যে খেলাটি চলছে তাই। সাড়া দেওয়া মানে কেবল বলটা ফিরে গড়িয়ে দেওয়া নয়, পরন্তু এমনভাবে গড়িয়ে দেওয়া যাতে অন্যজনে সেটি ধরতে পারে, এবং ফিরিয়ে দিতে পারে—অর্থাৎ, খেলাটা যাতে চালু থাকে সেই ব্যবস্থা করা। এখানে অন্য জনের কাজ কোনো নমুনা বা আদর্শ উপস্থাপিত করে না। এর সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটির দাবী এই যে একজনে যা করছে বা করবে, তার দিকে নজর রেখেই যেন অন্য জনে তার নিজের কাজটি প্রতিযোজনা করে। এর মধ্যে অনুকরণ আসতে পারে, তবে তা মুখ্য কাজটির অধীন। এখানে শিশুর নিজেরই স্বার্থ রয়েছে,—সে খেলাটি চালু রাখতে চায়। অতঃপর তার নিজের অংশ যাতে সে ভালো করে করতে পারে সেই জন্য, অন্যজনে বলটাকে কেমন করে ধরছে, হাতের মধ্যে রাখছে, তা লক্ষ্য করে। সে কাজ করার পদ্ধতি অনুকরণ করে- কাজের উদ্দেশ্য, বা যা করতে হবে, তার অনুকরণ করে না। এবং সে নিজের থেকেই, নিজের উদ্যোগে ঐ খেলার মধ্যে কার্যকারী অংশ নিতে চায় বলে, পদ্ধতির অনুকরণ করে। জীবনের প্রথম দিনগুলো থেকেই শিশুর মধ্যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য অন্যদের কাজ কর্মের সঙ্গে নিজের কাজ কর্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করবার জন্য একটা আত্যন্তিক নির্ভরশীলতা দেখা যায়। কেবল এই কথাটি বিবেচনা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সে অন্যের মতো ব্যবহার করা, এবং ঐ কাজে সমর্থ হওয়ার জন্যে সেই ব্যবহারকে বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে কি অতিরিক্ত

মূল্যই না দেয়। কাজেই সদৃশ মানসতার উপরে এই প্রভাব থেকে যে চাপ পড়ে, তা এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, অনুকরণের দোহাই দেওয়া নিতান্ত বাহুল্য মাত্র।

বস্তুতঃ যে সব উপায়, উদ্দেশ্যে পৌছোতে সহায়তা করে, সেগুলির অনুকরণ থেকে পৃথকভাবে উদ্দেশ্যের অনুকরণ করা যেন কোনো ভাসা-ভাসা ও অস্থায়ী কাজ। এতে মানসতার উপরে কোনো ফল বর্তায় না। জড়বুদ্ধি লোকেরা এই জাতীয় অনুকরণে বিশেষ পটু। এরূপ অনুকরণ কাজের বাহ্যিক রূপকে প্রভাবিত করে—তার অর্থকে প্রভাবিত করে না। আমরা যখন শিশুদের এই ধরনের ব্যাঙ্গানুকরণ করতে দেখি, তখন এতে উৎসাহ না দিয়ে বরং ওদের উল্লুক, বানর, তোতা, নকলবিড়াল ইত্যাদি বলে তিরস্কার করতে উদ্যত হই (সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে এগুলি ভালো বলে বিবেচিত হলে এতে ওদের উৎসাহ দিতেম)। অন্য দিকে, কাজ সুসম্পন্ন করার "উপায়ের" অনুকরণ করা বুদ্ধির কাজ। এর মধ্যে সতর্ক পর্যবেক্ষণ থাকে এবং একজনে যা করার চেষ্টা করছে, তাকে আরও ভালো করে করার জন্য যা কিছু বিচার বাছাই করা দরকার হয় তাও থাকে। উদ্দেশ্যমূলকতা নিয়ে প্রয়োগ করলে অন্যান্য সহজ-প্রবৃত্তির মতো অনুকরণ-প্রবৃত্তিও ফলপ্রসূ কর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে একটি উপকরণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিশদ এই আলোচনা, যে সিদ্ধান্তকে পুনরায় বলবৎ করে, তা হল এই যে, মানসিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধাত গঠন করা, অর্থাৎ বস্তু, ঘটনা ও ক্রিয়াকলাপ এমনভাবে বোধগম্য করা, যাতে ব্যক্তি সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সফলতার সহিত অংশ নিতে সমর্থ হয়। অন্য লোকের কাছ থেকে বাধা আসবার ফলে যে সব বিরোধের সৃষ্টি হয়, কেবল তার ফলেই এই অভিমত আসে যে, স্বাভাবিক প্রবণতাগুলোকে বিপরীত পথে কাজ করতে বাধ্য করেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়। যে অবস্থাধীনে লোকেরা পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে (কিম্বা পরস্পরের সহিত প্রতিবেদনশীল কাজে সংশ্লিষ্ট থাকে) তা হিসাবে ধরতে ব্যর্থকাম হয়েই অনুকরণ করাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান সাধক বলে গণ্য করা হয়।

৪। শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি প্রয়োগ—

বন্য সম্প্রদায় কেন বন্য থাকে আর সভ্য সমাজ কেন সভ্যতা বজায় রাখে ? এ প্রশ্নের উত্তরে, নিঃসন্দেহে প্রথমে এ কথা মনে আসে যে, বন্যেরা বন্য এবং তারা নিম্নমানের বুদ্ধি ও সম্ভবতঃ ত্রুটিপূর্ণ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন লোক। কিন্তু তাদের স্বাভাবিক সামর্থ্য সভ্য মানুষের সামর্থ্য থেকে নিম্নমানের কি না, সে বিষয়ে সযত্ন অনুশীলনের ফলে, সন্দেহ জেগেছে। নিঃসংশয়ে দেখা গেছে যে, স্বাভাবিক প্রভেদগুলি সাংস্কৃতিক প্রভেদের পর্যাপ্ত কারণ নয়। এক অর্থে বন্য সম্প্রদায়ের মন তাদের অনুন্নত প্রতিষ্ঠানগুলোর কারণ নয়, বরং এই প্রতিষ্ঠানগুলোরই ফল। তাদের সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড এমন ধরনের যাতে তাদের মনোযোগ ও আগ্রহের বিষয়গুলি সীমিত হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের মনোবিকাশের উদ্দীপকগুলিও সীমিত থাকে। এমনকি, যে সমস্ত জিনিস তাদের মনোযোগের সীমার মধ্যে আসে, সে ক্ষেত্রেও আদিম রীতিনীতি, যে সমস্ত গুণাবলী মনের মধ্যে ফল ফলায় না, সে গুলির প্রতিই পর্যবেক্ষণ ও কল্পনাশক্তিকে নিবদ্ধ রাখে। প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের উপর তাদের শাসন-ক্ষমতার অভাব আছে বলে অল্প সংখ্যক প্রাকৃতিক বস্তুই তাদের সমষ্টিগত ব্যবহারের তালিকাভুক্ত হয়। ফলে অল্পসংখ্যক প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানো হয়, এবং সে ক্ষেত্রেও যথার্থ মূল্য অনুযায়ী কাজে লাগানো হয় না। সভ্যতার অগ্রগতির অর্থ হল, অধিক পরিমাণ প্রাকৃতিক শক্তি ও বস্তুকে কর্মের সাধক হিসাবে, এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র উপায় রূপে রূপান্তরিত করা। আমরা অধিকতর সামর্থ্য নিয়ে ততোটা আরম্ভ করি না, যতোটা আরম্ভ করি অধিক সংখ্যক উদ্দীপক নিয়ে। এ সকল উদ্দীপক আমাদের নানা সামর্থ্য জাগ্রত করে তাদিকে এবং নির্দেশিত করে। বন্যেরা বেশীর ভাগ কাজ করে স্থূল উদ্দীপক নিয়ে, আমরা কাজ করি ওজন করা মাপাজোপা বহু কষ্টার্জিত উদ্দীপক নিয়ে।

পূর্বতন মানুষের প্রচেষ্টা প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছে। আদি অবস্থাতে ওগুলো মানবীয় প্রচেষ্টার প্রতি নিরপেক্ষ ছিল। প্রতিটি গৃহপালিত উদ্ভিদ ও প্রাণী, যন্ত্র, বাসন, কলকাঠি; উৎপাদিত সামগ্রী, নান্দনিক সজ্জা এবং শিল্পকলার প্রতিটি জিনিসের অর্থ এই যে, যে সব

অবস্থা এককালে মানবীয় ক্রিয়া-কলাপের প্রতি নিরপেক্ষ, বা তার প্রতিকূল ছিল, পরবর্তীকালে তাদিকে অনুকূল বা পক্ষপাতী অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেহেতু একালের শিশুদের ক্রিয়াকলাপ এই সুনির্বাচিত ও আয়ত্তীকৃত উদ্দীপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই হেতু, যা করতে মানব জাতির প্রয়োজন হয়েছিল বহু মন্থর ও ক্লেশকর যুগ, আজ তারা জীবনের অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। পূর্বতন যাবতীয় কৃতকার্যতার দানে আজকের পাশা সমৃদ্ধ হয়েছে।

যে উদ্দীপকগুলি বর্তমানে মিতব্যয়িতা ও ফলপ্রসূতার আনুকূল্য করছে, যেমন আমাদের রাস্তাঘাট, পরিবহন সংস্থা, তাঁপ, আলো ও বিদ্যুতের প্রতি শাসন, নানা কাজের কল ও যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি, তারা নিজ নিজ গুণে বা সামগ্রিক ভাবে সভ্যতা গঠন করেনি। কিন্তু এগুলি যে সব ব্যবহারে খাটানো হয়, তাই সভ্যতা গড়ে তুলেছে। কিন্তু বস্তু ছাড়া কি প্রয়োগ সম্ভব হতো? একটা প্রতিকূল পরিবেশে পরিশ্রম করে জীবিকা সংগ্রহ করতে, এবং সেই পরিবেশের ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে জীবন রক্ষা করতে অন্য অবস্থায় যে সময় লাগতো, সভ্যতার ফলে তা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। একটি জ্ঞান ভাণ্ডার হস্তান্তরিত হয়েছে। এই জ্ঞানের বৈধতা সুরক্ষিত, কারণ যে ভৌত উপকরণের মধ্যে এই জ্ঞানকে মূর্ত করা হয়, তার ফলাফল প্রকৃতির অন্যান্য সত্য ঘটনার সঙ্গেও খাপ খায়। ফলিত শিল্পের এই সমস্ত কলকাঠি বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস, উদ্ভট্ অতিকথা এবং সৃজনি-শক্তিহীন অতিকল্পনের পুনঃ প্রকোপের বিরুদ্ধে আমাদের রক্ষাকবচ বিশেষ,—সম্ভবতঃ আমাদের মুখ্য রক্ষাকবচ। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এই সব অতিকথা ও অতিকল্পনে অতীতের সর্বোত্তম বুদ্ধিশক্তির একটি বৃহৎ অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আমরা যদি এর সঙ্গে আর একটি উপকরণ যোগ করি, যেমন, ফলিত শিল্পের এই সব কলকাঠি কেবল ব্যবহৃতই হবে না, পরন্তু তা কোনো যথার্থ অংশীদারী বা সমষ্টিগত স্বার্থেও ব্যবহৃত হবে, তা হলে এই সব কলকাঠিই সভ্যতার সদর্থক সঙ্গতিতে পরিণত হয়। গ্রীস্ যে আমাদের বর্তমান বৈষয়িক সঙ্গতির ক্ষুদ্র এক অংশ নিয়েই একটি সার্থক ও উদার, বুদ্ধিগত ও কলাকুশল জীবনধারা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তার কারণ এই যে তাদের যা কিছু সম্বল ছিল, তার সবটুকুই তারা

সামাজিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছিল।

কিন্তু অবস্থা যাই হোক না কেন, অর্থাৎ তার মধ্যে বর্বরতাই থাক আর সভ্যতাই থাক, ভৌত শক্তিপুঞ্জের সীমিত নিয়ন্ত্রণই থাক বা বর্তমানকাল পর্যন্ত অংশীদারী অভিজ্ঞতার প্রবাহিকাহীন একটা যান্ত্রিক দাসত্বই থাক, দ্রব্যাদিকে যে যে ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষামূলক পরিবেশ যুগিয়েছে, এবং মানসিক ও নৈতিক ধাতের গঠন নির্দেশিত করে এসেছে।

আমরা এর আগেই দেখেছি যে, পরিকল্পিত শিক্ষা, কোনো বিশেষরূপে নির্বাচিত পরিবেশ সূচিত করে ; অর্থাৎ যে সব উপকরণ ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্টরূপে অভিপ্রেত পথে ক্রমোন্নতি বিধানের সহায়ক হয়, তার ভিত্তিতেই পরিবেশ নির্বাচিত হয়। যে হেতু সমাজ-জীবনস্বার্থে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে রূপান্তরিত করা ভৌত অবস্থা সমূহকে—অর্থাৎ যে সমস্ত ভৌত বস্তু সামাজিক যন্ত্রে পরিণত হওয়ার ফলে তাদের মৌলিক গুণ হারিয়েছে—তাদিকে ভাষার ভিতর দিয়েই উপস্থাপিত করা হয়, সেই হেতু অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের তুলনায় ভাষা সঙ্গত কারণেই শিক্ষায় একটা বড়ো অংশ গ্রহণ করে। এর সাহায্যে আমরা অতীত মানব অভিজ্ঞতার মধ্যে অংশ গ্রহণ এবং এই ভাবে বর্তমানের অভিজ্ঞতা প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করি। প্রতীক ও কল্পনাসূত্রে আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতির পূর্বাভাষ জানতে পারি। যে সব অর্থে সামাজিক পরিণতি লিপিবদ্ধ হয়, এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্বসূচিত হয়, ভাষা নানা প্রকারে সেগুলিকে সংক্ষেপ করে দেয়। জীবনে যা-কিছুই সার্থক তারই মধ্যে ভাষার উদার ও ব্যাপক অংশদান এতো তাৎপর্যপূর্ণ যে, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত শব্দ দুটির প্রায় এক অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু বিদ্যালয়ে এই বিশিষ্ট সাধকের উপর যে জোর দেওয়া হয়, তার সঙ্গে বিপদও থাকে,—বিপদ তত্ত্বগত নয়, পরন্তু প্রয়োগগত। শিক্ষার দেওয়া ও নেওয়া যে যথাক্রমে জল ঢেলে পাত্র পূর্ণ করবার ও নিষ্ক্রিয় হয়ে শোষণ করবার মতো বস্তু নয়—একথা সর্বজন-নিন্দিত হলেও, শিক্ষাবৃত্তিতে প্রথা দুটি এখনো কেন এতো চালু রয়েছে ?

শিক্ষা যে কেবল "বলে দেবার" আর শুনে নেবার ব্যাপার নয়, পরন্তু কোনো কর্মতৎপর গঠনমূলক কর্মপ্রণালী, এই মূল নিয়মটি তত্ত্ব হিসাবে

যতোখানি গ্রাহ্য করা হয়, বৃত্তি হিসাবে ততোখানিই অগ্রাহ্য করা হয়। এই শোচনীয় অবস্থার কারণ কি এই নয় যে, ব্যবস্থাটা প্রায় মুখে মুখেই চলে? এই ব্যবস্থা প্রচার করা হয়, এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হয়, এ নিয়ে লেখালেখি হয়। কিন্তু শিক্ষাবৃত্তিতে এ ব্যবস্থা চালু করতে হলে, স্কুল পরিবেশকে কাজ করার নানাবিধ উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও ভৌত বস্তু দিয়ে এতো বেশী পরিমাণে সাজানো দরকার যে, তার প্রয়োজন কখনই নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে না। যাতে জিনিসপত্র নিয়ে প্রত্যক্ষ ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিযুক্ত থাকার অনুমোদন ও অধিকার থাকে, শিক্ষণ ও প্রশাসন পদ্ধতিকে তেমন ভাবে পরিবর্তিত করা দরকার। এ কথা বলছি না যে, শিক্ষার সঙ্গতি রূপে ভাষার ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু অংশীদারী ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে ভাষার সংযোগ রেখে তাকে আরও জীবন্ত ও ফলপ্রসূ করা উচিত। "এই জিনিসগুলো তোমাদের সেরে ফেলা উচিত ছিল, আর বাকীগুলো না করে ফেলে রাখা উচিত হয়নি।" স্কুলের পক্ষে "এই জিনিসগুলোর" অর্থ হল সহযোগী বা সম্মিলিত কাজ-কর্মের জন্য বিবিধ সাধকে সজ্জিত হওয়া।

কারণ যে সমস্ত শিক্ষামূলক ব্যবস্থা স্কুলের বাইরের পরিবেশে কার্যকারী হয়, স্কুলে যদি সে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয়, তা হলে সামাজিক প্রেরণার স্থলে একটা পুঁথিগত ও নকল বুদ্ধিগত প্রেরণা অবশ্যই আসবে। অবশ্য শিশুরা স্কুলে যায় বিদ্যালাভের জন্য, কিন্তু বিদ্যালাভ করাকে একটি আলাদা বৃত্তিতে পরিণত করলে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষা হয় কিনা সে কথা এখনো প্রমাণ সাপেক্ষ। যখন শিক্ষাকে এই ধরনের কোনো আলাদা বৃত্তি বলে মনে করা হয়, এবং সর্বজনীন স্বার্থ ও মূল্যবোধ জনিত কাজকর্মে ভাগ নেওয়ার ফলে যে সামাজিক মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে তা বাদ দেওয়া হয়, তখন পৃথকভাবে মেধাগত শিক্ষার চেষ্টা তার নিজ উদ্দেশ্যই অস্বীকার করে। কোনো ব্যক্তিকে তার নিজের মধ্যে নিবিষ্ট রেখে পেশীজাত কর্মতৎপরতা ও সংবেদনজাত উত্তেজনা আমরা জাগাতে পারি বটে, কিন্তু তা করে তাকে, সে যে জীবন প্রবাহের অংশ তা বোঝাতে পারি না—বোঝাতে পারি না সেই প্রবাহের মধ্যে জিনিসপত্রের তাৎপর্য। আমরা বীজগণিত, ল্যাটিন্ বা উদ্ভিদ্ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কারিগরি দক্ষতা লাভ করতে পারি, কিন্তু যে ধরনের বুদ্ধি পারদর্শিতাকে ব্যাবহারিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে, তা আয়ত্ত করাতে

পারি না। যে যৌথ কাজে একজনের বস্তু ও যন্ত্রাদির প্রয়োগ অন্য জনের সামর্থ্য ও সরঞ্জামের ব্যবহারের সঙ্গে সংজ্ঞাত সম্বন্ধ স্থাপন করে—মাত্র সেই জাতীয় যৌথ কাজে নিযুক্ত হয়েই মানসতা গঠনের সামাজিক নির্দেশ পাওয়া যায়।

সারাংশ

ছোটোরা যে সমষ্টির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তার জীবন-রীতির সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক বা জন্মগত আবেগ-প্রবণতা খাপ খায় না। কাজেই তাদের চালাতে বা পথ দেখাতে হয়। এই নিয়ন্ত্রণ, আর দৈহিক বাধ্যতা এক জিনিস নয়। এর মধ্যে থাকে ক্রিয়াশীল আবেগ-প্রবণতাকে কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা; আর থাকে কার্যক্রমের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা পত্তন করা। কোন্ কোন্ উদ্দীপক কোন্ লোককে কিভাবে কাজে তৎপর করবে তা স্থির করে নিয়েই তাদের কাজ প্রভাবিত করা হয়। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন, আদেশ, নিষেধ, সমর্থন, অসমর্থন, ইত্যাদিতে কাজ প্রভাবিত করার সরাসরি উদ্দেশ্যে উদ্দীপক আসে লোকের মুখ থেকে। যেহেতু এই সব ক্ষেত্রে, অন্য লোকের কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা সব চেয়ে বেশী করে সচেতন থাকি, সেই হেতু আমরা কোনো একটি অধিকতর স্থায়ী ও কার্যকারী পদ্ধতির কথা চিন্তা না করে, এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বকেই অতিরঞ্জিত করতে চাই। সে সব পরিস্থিতিতে তরুণেরা অংশগ্রহণ করে, সেই পরিস্থিতির মধ্যেই মৌলিক নিয়ন্ত্রণ বাসা বেঁধে আছে। সামাজিক অবস্থাধীনে অন্যেরা যা কিছু করে, ছোটোদের কাজের ধরন তাইর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হয়। এবং তাকে তারই সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। এই অবস্থা ছোটোদের কাজ-কর্মকে একটা সর্বজনীন পরিণতির দিকে পরিচালিত করে, এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটা সর্বজনীন বোঝা-পড়া আনে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করার সময়েও তারা একই "অর্থ" ধরে নেয়। কাজের উপায় ও উদ্দেশ্যাবলীর প্রতি এই সামগ্রিক বোঝাপড়া সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সারাংশ। এর ধরন পরোক্ষ, বা প্রক্ষোভ ও বুদ্ধিগত,—প্রত্যক্ষ, বা ব্যক্তিগত নয়। অধিকন্তু, এ ব্যবস্থা ব্যক্তির নিজের ধাতের অন্তর্ভুক্ত, বাহ্যিক ও দমন-

মূলক নয়। স্বার্থবোধ ও বোঝা-পড়ার অভিন্নতার মধ্যে দিয়ে এই আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সাধন করাই শিক্ষার ন্যাস্ত কর্ম। যদিও পুস্তক ও আলাপ-আলোচনা অনেক কিছু করতে পারে, তবুও আর সব বাদ দিয়ে কেবল এই সব মাধ্যমের উপরই অতিমাত্রায় ভরসা রাখা হয়। একে সম্পূর্ণরূপে কার্যকারী করার জন্য স্কুলের প্রয়েজন হল, সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার জন্য শিক্ষার্থীদের বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া। এর ফলে তারা নিজ নিজ ক্ষমতা, এবং যে সমস্ত বস্তু ও সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, তার সম্বন্ধে একটা "সামাজিক" বুদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রমবিকাশরূপে শিক্ষা

১। ক্রমবিকাশের শর্তাবলী

তরুণদের কর্মতৎপরতা নির্দেশিত করে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করতে গিয়ে সমাজ তার নিজেরই ভবিষ্যৎকেই নির্ধারিত করে। যেহেতু আজকের ছোটোরাই পরবর্তীকালে তৎকালিক সমাজ গঠন করবে, সেই হেতু পরবর্তী সমাজের প্রকৃতি, তরুণদের ক্রিয়াকলাপ ইতিপূর্বে যেভাবে নির্দেশিত হয় সেইভাবেই গড়ে উঠবে। ক্রমোন্নতির অর্থ, পরবর্তী পরিণতির দিকে কর্মের এই ক্রমপুঞ্জিত গতি।

ক্রমোন্নতির মুখ্য শর্ত হল, অপরিণত অবস্থা। এই উক্তি একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যেরই পুনরুক্তি। কারণ যে দিকটি অবিকশিত, একজনে কেবল সেই দিকেই বিকাশ লাভ করতে থাকে। কিন্তু অপরিণত শব্দটার—"অ" উপসর্গটি কোনো কিছুর সদর্থক, কেবল শূন্যতা বা নঞর্থক নয়। এ স্থলে লক্ষণীয় যে "সামর্থ্য" ও "সম্ভাব্যতা" শব্দ দুটি দ্ব্যর্থক,—অর্থাৎ একটি সদর্থক, অন্যটি নঞর্থক। সামর্থ্য বলতে গ্রহণ ক্ষমতা বোঝায়, -যেমন, এক লিটার জিনিস ধরার সামর্থ্য। সম্ভাব্যতা অর্থে আমরা শুধু সুপ্ত বা নিবৃত্ত অবস্থাও ধরতে পারি। অর্থাৎ যে সম্ভাব্যতা স্বতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কিন্তু আমরা সামর্থ্য অর্থে সক্ষমতা—অর্থাৎ দক্ষতাও বুঝি ; এবং সম্ভাব্যতা অর্থে নিহিত-শক্তি বা প্রচ্ছন্ন শক্তিও বুঝি। আমরা যখন বলি যে, অপরিণত অবস্থা ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা সূচিত করে, তখন পরবর্তীকালে যে সব ক্ষমতার অভ্যুদয় ঘটতে পারে, তার অনুপস্থিতির কথা বলি না ঃ বলি কোনো সদর্থক শক্তির সুনিশ্চিত উপস্থিতির কথা,—তার "হয়ে ওঠার" কথা।

অপরিণত অবস্থাকে শুধু অভাব, এবং ক্রমোন্নতিকে অপরিণত ও পরিণত অবস্থার মধ্যবর্তী ব্যবধান পূর্ণ করার একটা কিছু বলে ধরে নেওয়ার ঝোঁক থাকার কারণ এই যে, আমরা শৈশবকে কোনো মৌলিক অবস্থা বলে ধরে নেওয়ার পরিবর্তে কোনো এক আপেক্ষিক অবস্থা বলে ধরে নিই। শৈশবকে

শুধু একটা রিক্ত অবস্থা বলে ধরে নেওয়ার কারণ এই যে, আমরা সাবালকত্বকে একটি অনড় মানদণ্ড বলে ধরে নিয়ে নাবালকত্বের পরিমাপ করি। এতে শিশুর যা নেই এবং মানুষ না হওয়া পর্যন্ত তার যা থাকবে না, তার উপরেই আমাদের মনোযোগ নিবিষ্ট থাকে। তুলনামূলক এই দৃষ্টিভঙ্গী কোনো কোনো উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু এই যদি শেষ কথা হয়, তা হলে প্রশ্ন ওঠে যে আমরা কোনো অতিকল্পিত পূর্বানুমান দোষদুষ্ট কিনা। যদি শিশুরা স্পষ্ট কথায় ও অকৃত্রিমভাবে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করতে পারতো, তা হলে তারা কিন্তু অন্য কথা বলত। এবং এই বিশ্বাসের পিছনে বড়োদের একটা বড় স্বীকৃতি রয়েছে যে, কতিপয় নীতিগত ও বুদ্ধিগত ব্যাপারে বড়োদের, ছোটো শিশুদের মতো হতে হবে।

অপরিণত অবস্থার সম্ভাবনাগুলির নঞর্থক গুণ মেনে নেওয়ার বিপদ তখনই স্পষ্ট হয় যখন আমরা ভেবে দেখি যে এই ধারণাটি কোনো একটি স্থিতিশীল পরিণতিকে আদর্শ ও মানদণ্ড রূপে দাঁড় করায়। ক্রমোন্নতি লাভ করাকে সাধিত উন্নতি বলে ধরা হয়: এর অর্থ দাঁড়ায় নন্নুন্নতি—অর্থাৎ যা আর উন্নতি লাভ করছে না! এ রকম ধরে নেওয়া অর্থহীন। কারণ দেখা যায় যে, প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক লোক, তার আর উন্নতির সম্ভাবনা নেই বললে ক্ষুব্ধ হয়; এবং সে যতোই দেখতে পায় যে, তার উন্নতির পথ বন্ধ হচ্ছে ততোই সে একে একটা কিছু হারিয়ে যাবার প্রমাণ বলে ধরে নেয়; এবং এজন্য সে অনুতাপও করে। সে পূর্বে যা অর্জন করেছে, তার আশ্রয় নিয়ে, একথা মনে করে না যে, তার ক্ষমতার তো পর্যাপ্ত প্রকাশ হয়েছেই। অতএব, শিশু ও ব্যক্তির জন্য এই অসমান মানদণ্ড কেন?

আপেক্ষিক অর্থে না নিয়ে সম্পূর্ণ অর্থে নিলে, অপরিণত অবস্থা দিয়ে কোনো সদর্থক শক্তি বা সক্ষমতা বোঝায়,—তা ক্রমোন্নতির ক্ষমতা নির্দেশ করে। কতিপয় শিক্ষা-মতবাদ বলে যে, শিশুর মধ্যে থেকে সদর্থক ক্রিয়া-কলাপ বার বা নিষ্কাশন করতে হয়। কিন্তু তা করার দরকার হয় না। যেখানেই জীবন, সেখানেই আগে থেকেই আগ্রহশীল ও আবেগময় ক্রিয়া-কলাপও থাকে। ক্রমোন্নতি এমন একটা বস্তু নয়, যা তাদের লাভ করানো হয়—বরং সেটি এমন কিছু যা তারা লাভ করে। সম্ভাবনার সদর্থক ও গঠনমূলক গুণ, অপরিণত অবস্থাটির দু'টি প্রধান লক্ষণ বুঝে নেওয়ার চাবিকাঠি

স্বরূপ। এরা হল, নির্ভরশীলতা এবং নমনীয়তা। (১) নির্ভরশীলতাকে কোনো সদর্থক লক্ষণ বললে তা যুক্তিহীন শোনায়, এবং তাকে কোনো ক্ষমতা বললে আরও বেশী যুক্তিহীন শোনায়। কিন্তু নির্ভরশীলতার মধ্যে যদি কেবল অসহায় অবস্থাই থাকত, তা হলে কোনো কালেই কোনো বিকাশ ঘটতে পারতো না। যে শুধুই অক্ষম, তাকে চিরকালই অন্যের বহন করতে হয়। নির্ভরশীলতা কর্মক্ষমতার ক্রমোন্নত সঙ্গী, তার ক্রমবর্ধমান পরগাছা নয়; এতে মনে হয় যে, নির্ভরশীলতার গঠনমূলকতা আগে থেকেই ছিল। কিন্তু কেবল অন্যের আশ্রয়ে থাকলেই ক্রমোন্নতি ঘটে না। কারণ (২) এতে অক্ষমতকে ঘিরে প্রাচীর ওঠে। ভৌত পৃথিবী সম্পর্কে শিশু সহায়হীন। জন্মকালে এবং তার পরে দীর্ঘদিন যাবৎ, নিজের দৈহিক বলে পথ করে নেওয়ার বা জীবিকা অর্জন করার ক্ষমতা তার থাকে না। তাকে নিজেই যদি এ কাজ করতে হতো, তা হলে সে এক ঘণ্টাও বাঁচতে পারতো না। এদিক দিয়ে তার সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা। এ বিষয়ে পশুদের বাচ্চারা তার অনেক উর্ধ্বে। শিশুর শরীর দুর্বল, এবং তার যতোটুকু শক্তি আছে, তা নিয়ে সে ভৌত পরিবেশের সঙ্গে যুঝতে অক্ষম।

(১) অসহয়তার এই সর্বগ্রাসী অবস্থা কোনো ক্ষতিপূরক ক্ষমতার ইঙ্গিত আনে। জীবজন্তুর বাচ্চাদের প্রথম থেকেই ভৌত অবস্থাদির সঙ্গে মোটামুটি ভালোভাবে খাপ খাইয়ে চলার আপেক্ষিক যোগ্যতা থাকে। এ থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাদের জীবন তাদের চারপাশের "জীবনের" সঙ্গে ঘনিষ্টরূপে আবদ্ধ নয়। এ যেন সামাজিক গুণের অভাব হেতুই তারা দৈহিক গুণ পেতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, মানবশিশু দৈহিক সামর্থ্যের অভাব নিয়ে ঠিক এই কারণেই চলতে পারে যে, তাদের সামাজিক সামর্থ্য থাকে। সময় সময় আমরা এমন ধরনেও ভাবি এবং বলি যে, শিশুরা যেন কেবল তাদের শরীর নিয়েই সামাজিক পরিবেশে উপস্থিত হয়েছে; যেন বড়োদের মধ্যে যারা শিশুদের তত্ত্বাবধান করেন, সমাজ-শক্তি কেবল তাদের মধ্যেই রয়েছে। আর শিশুরা যেন শুধু নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা। যদি বলি যে, শিশুরা নিজেরাই অন্যদের সহযোগী মনোযোগ আকর্ষণের "ক্ষমতায়" বিচিত্রভাবে অলংকৃত, তা হলে মনে হবে যে, আমরা প্রকারান্তরে এই বলতে চাচ্ছি যে, অন্যেরাও শিশুদের চাহিদার প্রতি বিচিত্রভাবে মনোযোগী। কিন্তু পর্যবেক্ষণের ফলে

দেখা যায় যে, সামাজিক আদান-প্রদানের জন্য শিশুরা প্রথম শ্রেণীর সাজ-সজ্জায় বিভূষিত। যে নমনীয় ও সংবেদী যোগ্যতা নিয়ে শিশুরা চার পাশের লোকের ভাবভঙ্গী ও কাজ করার সাথে সমবেদিতা সহকারে স্পন্দিত হয়, পূর্ণবয়স্কদের মধ্যে তা অল্পই থাকে। ভৌত জিনিস সম্বন্ধে যেমন অমনোযোগিতা এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতা থাকে, মানুষের কাজ সম্বন্ধে তেমনই অনুরূপ ভাবে তীব্র উৎসাহ ও মনোযোগ থাকে। শিশুর স্বাভাবিক গড়ন ও সহজাত আবেগানুভূতি সব কিছুই সামাজিক প্রতিবেদনশীলতাকে সহজ করার সহায়ক। যদি বা এ কথা সত্য হয় যে, সাবালক হওয়ার পূর্বে শিশুরা অহংবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক থাকে, তবুও তা এ উক্তির সত্যতা খণ্ডিত করবে না। তা কেবল এটাই দেখাবে যে তাদের সামাজিক প্রতিবেদনশীলতা তাদের নিজের স্বার্থেই নিয়োজিত হয়; তা প্রতিবেদনশীলতার অভাব জ্ঞাপন করে না। কিন্তু আসলে উক্তিটি সত্যই নয়। শিশুদের অবিমিশ্র অহংভাবের সমর্থনে যে সব কথার উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে এটাই দেখিয়ে দেয় যে, কি প্রগাঢ়তা ও সরলতা নিয়েই না তারা নিজেদের লক্ষ্যটির দিকে ছুটে চলে। যে উদ্দেশ্যাবলী এই লক্ষ্যটি গঠন করে, যদি তা সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর বলে মনে হয়, তার একমাত্র কারণ এই যে বড়োরাও তাদের কালে সদৃশ মোহে আচ্ছন্ন হয়ে এই সব উদ্দেশ্য সাধনে পটু হয়েছেন। কাজেই ওগুলি এখন আর তাদের আগ্রহ জাগায় না। শিশুদের তথাকথিত স্বাভাবিক অহংভাবের বাকী অংশের অনেকখানি এমন ধরনের যে, তা বড়োদের অহমিকার বিরুদ্ধে যায়। যখন একজন বয়স্ক লোক নিজের বিষয় নিয়ে এতো তন্ময় থাকেন যে, শিশুদের ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ থাকে না, তখন নিঃসন্দেহেই তার মনে হবে যে, শিশুরা "তাদের" নিজেদের ব্যাপারে অসঙ্গত রকমে ব্যস্ত থাকে।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরশীলতা দুর্বলতার পরিবর্তে বরং কোনো ক্ষমতা নির্দেশ করে। এবং এর মধ্যে থাকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। অবশ্য সব সময়েই এ বিপদ থাকে যে, বেশী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তির সমাজধর্মী সামর্থ্য হ্রাস করে। বেশী আত্মনির্ভরশীল করতে গিয়ে ব্যক্তিকে বেশী স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে দেয়। এতে তার মধ্যে সমাজ-বিচ্ছিন্নতা ও বেদনহীনতা আনতে পারে। এতে অনেক সময় একজনকে আর সকলের সম্পর্কে এত

বেদনহীন করে তোলে যে, সে যেন বাস্তবিকই একা দাঁড়াতে ও কাজ করতে সমর্থ—এ রকমের একটা মোহের বশবর্তী হয়। এ ভাব হ'ল এক রকমের নামহীন উন্মত্ততা। পৃথিবীতে যে সব প্রতিকারসাধ্য দুর্ভোগ রয়েছে,—এ উন্মত্ততা তার এক বৃহদংশের জন্য দায়ী।

(২) ক্রমোন্নতির জন্য অপরিণত জীবের যে একটি অভিযোজন ক্ষমতা থাকে তাই তার "নমনীয়তা" গঠন করে। এই নমনীয়তা পুটিং বা মোমের নমনীয়তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এটি বাইরের চাপে আকৃতি বদ্‌লে নেবার সামর্থ্য নয়। যে নমনীয় স্থিতি-স্থাপকতার দরুণ কতক লোকের মনে তাদের পরিবেষ্টনীর রঙ লাগে, অথচ তারা নিজ নিজ ঝোঁক বজায় রাখে, এই নমনীয়তা তারই কাছাকাছি, অথচ তার থেকে গভীর। মূলতঃ, এ হ'ল অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করার যোগ্যতা ; অর্থাৎ কোনো অভিজ্ঞতা থেকে এমন কিছু ধরে রাখার ক্ষমতা, যেটি কোনো পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাধাবিঘ্নের সঙ্গে বোঝবার জন্য কাজে লাগানো যায়। এর অর্থ হ'ল, পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ফলাফলের ভিত্তিতে কাজকর্মের ধরন বদলানোর ক্ষমতা, মানস-মুকুলের দল মেলাবার ক্ষমতা। এ ছাড়া অভ্যাস গড়ে তোলা অসম্ভব।

এটা জানা কথা যে, উচ্চতর প্রাণীদের বাচ্চাদের, বিশেষ করে মানব-শিশুদের, সহজপ্রবৃত্তিজাত প্রতিক্রিয়াগুলিকে ব্যবহারে লাগাতে "শিখতে" হয়। অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানবশিশু বেশী সংখ্যক সহজ-প্রবৃত্তিজাত প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু নিম্নপ্রাণীদের সহজ-প্রবৃত্তি জন্মের অল্প দিন পরেই নির্ধারিত কাজ করার মতো পূর্ণাঙ্গ হয়। অপর দিকে, মানবশিশুর অধিকাংশ সহজ-প্রবৃত্তিই ঠিক যে অবস্থায় থাকে তাতে কোনো কাজই হয় না। সমন্বয়ের একটা জন্মগত বিশেষ ক্ষমতা অবিলম্বেই পারদর্শিতা লাভ করে। কিন্তু রেলের টিকিটের মতো এ কেবল একমুখী যাত্রার বেলাতেই কার্যকর। যখন কোনো জীবকে, চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদিকে কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন ক্রিয়া, নানা রকমের যোগসূত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হয়, তখনই একটা নমনীয় ও বিচিত্র গুণবিশিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আয়ত্তে আসে। একটি মুরগীর বাচ্চা ডিম থেকে ফুটে বেরোবার কয়েক ঘণ্টা পরেই খাদ্য-কণায় অভ্রান্তভাবে ঠোকর দিতে পারে। এর অর্থ এই

যে, দেখবার জন্য চোখ দুটির ক্রিয়ার সঙ্গে ঠোকর দেওয়ার জন্য শরীর ও মাথার ক্রিয়ার সমন্বয়, মাত্র কয়েকবার চেষ্টা করার ফলেই পূর্ণতা লাভ করে। যে কাজের মধ্যে দিয়ে একটি নবজাত শিশুর দৃষ্টি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সমন্বিত হয়, তা মোটামুটি ধারণা করে নিতে শিশুর প্রায় ছয় মাস লাগে, অর্থাৎ তার দৃষ্টি-সীমার মধ্যে একটা জিনিসের কাছে সে পৌছোতে পারে কিনা এবং কি করে সে কাজটা করা যায়,—তা বুঝতে তার এই সময়টা লাগে। মুরগীর বাচ্চা তার সহজাত গুণের আপেক্ষিক পূর্ণতা দ্বারা সীমিত। অপর দিকে একটি শিশুর পক্ষে থাকে, "স্তূপীকৃত" সহজ-প্রবৃত্তিজাত পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ক্রিয়া-বিক্রিয়াযুক্ত অভিজ্ঞতার সুবিধা। অবশ্য বিভিন্ন প্রবৃত্তি, একটির পথে আর একটি এসে পড়াতে,তার পক্ষে তখনকার মতো অসুবিধাও হতে পারে। একটা পূর্বপ্রস্তুত কাজ "পড়ে পাওয়ার" পরিবর্তে যদি শিখে নিতে হয়, তা হলে লোকে বাধ্য হয়েই অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী এর উপকরণগুলি পরিবর্তন করতে শেখে, এবং এগুলিকে নানা ভাবে এদিক ওদিক করে দেখতে শেখে। এতে কোনো কাজ শেখবার উপলক্ষে অন্য অবস্থায় কাজে লাগানোর উপযোগী অন্যান্য পদ্ধতিরও বিকাশ ঘটে। এবং এইভাবে ধারাবাহিক অগ্রগতির সম্ভাবনার পথ খুলে যায়। এ থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শেখবার একটা অভ্যাস আয়ত্ত করে। সে শিক্ষা করতে শেখে। মানব জীবনের এই নির্ভরশীলতা এবং পরিবর্তনীয় নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বকে সুদীর্ঘ শৈশবের সার্থকতা সম্বলিত একটি মতবাদের মধ্যে সংক্ষেপ করা হয়েছে[১]। গোষ্ঠীর সাবালক বা নাবালক, যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই শৈশবের এই দীর্ঘস্থায়িতা তাৎপর্যপূর্ণ। নির্ভরশীল ও শিক্ষারত সন্তাদের উপস্থিতি, প্রতিপালন ও স্নেহের উদ্দীপক। নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রযত্নের প্রয়োজনবোধই সম্ভবতঃ সাময়িক সহবাসকে স্থায়ী বন্ধনে রূপান্তরিত করার মুখ্য উপায় ছিল। নিশ্চিতরূপেই এই প্রয়োজন স্নেহশীল ও সংবেদনশীল, সতর্ক দৃষ্টি রাখার অভ্যাস গঠনে একটি মুখ্য প্রভাব ছিল; অর্থাৎ সমষ্টিগত জীবনে অপরের মঙ্গলের প্রতি যে গঠন-মূলক আগ্রহ অপরিহার্য, তা এর থেকেই এসেছে। বুদ্ধির দিক দিয়ে এই

১। এর স্বার্থকতার খবর বেশ কয়েকজনের লেখায় পাওয়া যায়, কিন্তু এর প্রথম সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্য জন ফিসকে'কে তার "অভিজ্ঞতাবাদীর অভিজ্ঞান"নামক গ্রন্থের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়।

নৈতিক বিকাশের তাৎপর্য হল, বহু নতুন জিনিসের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া; এই বিকাশই ভবিষ্যতের জন্য আমাদের দূরদৃষ্টি ও পরিকল্পনার উদ্দীপনা কাজেই এর মধ্যে একটা পারস্পরিক প্রভাব রয়েছে। সমাজ জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা হেতু প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আয়ত্ত করার জন্য দীর্ঘ শৈশবকাল প্রয়োজন। দীর্ঘকালব্যাপী এই নির্ভরশীলতার অর্থ, নমনীয়তারই দীর্ঘস্থায়িতা, বা, পরিবর্তনীয় ও অভিনব নিয়ন্ত্রণ বিধি আয়ত্ত করা। কাজেই সামাজিক অগ্রগতির পেছনে এটি আরও শক্তি যোগায়।

২। ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তিরূপে অভ্যাস

ইতিপূর্বে দেখেছি যে, পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার যে সমস্ত উপাদান পরবর্তী অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করে, তা মনে রাখার ও প্রয়োগ করার সামর্থ্যই নমনীয়তা। এর সার্থকতা হল অভ্যাস আয়ত্ত করার এবং ঈপ্সিত মানসতা বিকাশের সামর্থ্য। এখন আমাদের বিচার্য, অভ্যাসের লক্ষণীয় রূপ। প্রথমতঃ অভ্যাস হল, এক রকমের কার্যনির্বাহী ক্রিয়াকৌশল বা কাজ করার দক্ষতা। অভ্যাসের অর্থ হল উদ্দেশ্য সাধনে প্রাকৃতিক অবস্থাসমূহকে উপায়রূপে ব্যবহার করার পারদর্শিতা। এ হ'ল কার্যসাধক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে পরিবেশের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ। আমরা বোধ হয় পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের উপরে শরীর নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেই। আমরা ভাবি যে হাঁটা-চলা, কথা বলা, পিয়ানো বাজানো, ইত্যাদি কাজ, আর খোদাইকার, অস্ত্রোপচারী, সেতুনির্মাতা প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের ক্রিয়াকৌশল, কেবল তাদের সহজ-সাধ্যতা, নিপুণতা ও নির্ভুলতা জ্ঞাপন করে। অবশ্যই এ সব কাজ নিপুণতা জ্ঞাপন করে। কিন্তু এ সব কাজ দিয়ে পরিবেশের যেরূপ বিচক্ষণ ও কার্যকারী নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়, তার মধ্যেই এদের মূল্যমান বিরাজ করে। হাঁটা-চলার সক্ষমতা হল, ভৌত প্রকৃতির কোনো কোনো গুণ আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা। অন্য সব অভ্যাসের বেলাও এই কথাই খাটে।

যে অভ্যাসগুলো ব্যক্তি এবং তার পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, শিক্ষাকে সময় সময় তার আয়ত্তি বলে বর্ণনা করা হয়। এই সংজ্ঞা ক্রমোন্নতির একটি অত্যাবশ্যক পর্যায় সূচিত করে। কিন্তু সমন্বয়ের সক্রিয় অর্থে, একে

উদ্দেশ্য সাধনে বিবিধ উপায়ের নিয়ন্ত্রণ বলে বুঝে নেওয়া অত্যন্ত দরকার।

আমরা যদি অভ্যাস অর্থে কেবল জীবের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের কথাই বুঝি, এবং সে পরিবর্তন যে পরিবেশের মধ্যে পরবর্তী পরিবর্তন আনবার সক্ষমতা,—এই অর্থটি উপেক্ষা করি, তা হলে আমরা সমন্বয় অর্থে কেবল পরিবেশের উপযোগী হওয়ার কথাই বুঝব। অর্থাৎ, নরম গালা যেমন করে শীলমোহরের চাপের সঙ্গে নিজের সমন্বয় সাধন করে সেই ধরনের সমন্বয় বুঝব। পরিবেশকে একটা কিছু অনড় অবস্থা বলে ধরে নিয়ে মনে করা হয় যে, এই অনড় অবস্থার মধ্যেই, জীবের মধ্যে যে পরিবর্তন চলছে তার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিরাজ করে। এ ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অর্থ দাঁড়ায় কেবল বহিঃপ্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার সাথে আমাদের খাপ খাওয়ানো[১]। অভ্যস্তিরূপে অভ্যাস, সত্য সত্যই অপেক্ষাকৃত অক্রিয়. আমরা আমাদের পরিবেষ্টনীতে অভ্যস্ত হই, —যেমন, আমাদের জামা-কাপড়ে, জুতোয়, দস্তানায়, ইত্যাদিতে—এবং যতক্ষণ সহ্য হয়, আবহাওয়াতে,- এবং দৈনন্দিন সঙ্গীদের সাথে। এই জাতীয় অভ্যস্তির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, পরিবেশের অনুযায়ী হওয়া, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তন করার সক্ষমতার কথা বাদ দিয়ে, কেবল জীবের মধ্যেই পরিবর্তন ঘটানো। এ রকম সমন্বয়ের গুণাবলী (সক্রিয় সমন্বয় থেকে পৃথক রাখবার জন্য একে বরং মেনে নেওয়া বলা যেতে পারে) আমাদের পারিপার্শ্বিকের সক্রিয় সদ্ব্যবহার ও অভ্যাসের মধ্যে আনা যায় না। তা ছাড়া অভ্যস্তির আরও দুটি দিক লক্ষণীয়। প্রথমতঃ আমরা জিনিসের সদ্ব্যবহার করেই জিনিসে অভ্যস্ত হই।

কোনো অজানা মহানগরীতে অভ্যস্ত হওয়ার কথা ভাবা যাক। প্রথমে থাকে অত্যধিক উদ্দীপনা এবং তার উত্তরে একটা আত্যন্তিক অনুপযোগী সাড়া। ক্রমে ক্রমে কোনো কোনো উদ্দীপক প্রাসঙ্গিক ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে আসে, আর বাকীগুলো যায় বাদ পড়ে। এক্ষেত্রে বলতে পারি যে, ওগুলোর প্রতি হয় আমরা আর সাড়া দিই না, নয়তো সঠিক ভাবে এও বলতে পারি যে, আমরা ওগুলোর প্রতি অবিচলিত ভাবে সাড়া দিতে অভ্যস্ত

১। এই ধারণা অবশ্য উদ্দীপনা ও সাড়ার বাহ্যিক সম্পর্কের ধারণার যুক্তি সঙ্গত অনুবন্ধ; এ কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে; আবার অপরিণত অবস্থা ও নমনীয়তার নঞর্থক ধারণারও অনুবন্ধ; এ কথা এ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

হয়েছি। একে বলা যায় সুস্থিত সমন্বয়। এর দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সেই অবিচলিত সমন্বয়, ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ বিশেষ সমন্বয়ের পটভূমি যোগায়। আমরা একটা পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধনে কখনও আগ্রহী হই না; আমরা এর অনেক কিছুই বিনা বিচারে স্বীকার করে নিই। এবং যেমন ভাবে আছে তেমন ভাবেই গ্রহণ করি। এই পটভূমিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পত্তন করার চেষ্টায় আমাদের ক্রিয়াকলাপ কোনো কোনো স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়। কাজেই অভ্যস্তি হল, কোনো এক পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সমন্বয় সাধন। এই সময়ে আমরা পরিবেশের রূপান্তর সাধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই; অথচ পরিবেশই আমাদের সক্রিয় অভ্যাসের স্বপক্ষে কাজ করে।

এক কথায় প্রতিযোজনের মধ্যে আমাদের নিজেদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি পরিবেশের প্রতিযোজন যতোখানি থাকে, পরিবেশের প্রতি আমাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতিযোজনও ততোখানি থাকে। কোনো আদিম সম্প্রদায় কোনো রকমে একটা মরুপ্রান্তরে বাস করতে থাকলে, তারা নিজেদের প্রতিযোজন করে নেয়। কিন্তু এদের প্রতিযোজনের মধ্যে পারিপার্শ্বিককে সবচেয়ে বেশী করে গ্রহণ করা, সহ্য করা এবং জিনিসপত্র যে অবস্থায় আছে তাই বরদাস্ত করা হয়! এতে একদিকে থাকে পরিবেশকে নিষ্ক্রিয় স্বীকৃতি দানের চরম সহনশীলতা, অপরদিকে থাকে তার ব্যাবহারিক প্রয়োগের আত্যন্তিক স্বল্পতা। আবার, এক সভ্য গোষ্ঠীও সেই অঞ্চলে প্রবেশ করে নিজেদের প্রতিযোজন করে। এরা সেচের পত্তন করে; এরা সারা পৃথিবী খুঁজে দেখে যে, এই সব আঞ্চলিক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মাবে—তা কোথায় পাওয়া যাবে। আবার, ওখানে যা জন্মায় তাও তারা সযত্নে বাছাই করে, তারও উন্নতি সাধন করে। এর ফলে উষর প্রান্তর গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত হয়। বর্বরেরা কেবল স্থানে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু সভ্য সমাজের অভ্যাস পরিবেশের রূপান্তর সাধন করা।

অভ্যাসের তাৎপর্য কিন্তু তার কার্যনির্বাহক ও গতিদায়ক স্তরেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। অভ্যাসের ফলে বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত ধাতও গঠিত হয়। এবং কর্মে স্বাচ্ছন্দ্য, মিতাচারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অভ্যাস মানেই কোনো ঝোঁক, এবং তার অনুশীলনের অন্তর্গত অবস্থাদির প্রতি সক্রিয় পক্ষপাতিত্ব ও নির্বাচন। অভ্যাস "মিকোবার"-সুলভ কর্ম-তৎপরতা আনবার

জন্য উদ্দীপনার অপেক্ষায় থাকে না। বরং সেটি, পূর্ণোদ্যমে কর্মে লিপ্ত হবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করে। অভ্যাসের কাজ অযথা ব্যাহত হলে তার ঝোঁক অস্বস্তি ও তীব্র আকুলতায় প্রকাশ পায়। অভ্যাস বৌদ্ধিক প্রবণতাও চিহ্নিত করে। যেখানেই অভ্যাস, সেখানেই, যে সামগ্রী ও সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে কাজ করা হয়, তার সাথে তার পরিচিতি থাকে। যে পরিস্থিতিতে অভ্যাস কাজ করে তা বোঝবার একটা সুনির্দিষ্ট পথও থাকে। যে সমস্ত অভ্যাস একজন লোককে যন্ত্রবিৎ, স্থপতি, চিকিৎসক ও সওদাগর করে, সেগুলির মধ্যে চিন্তন, পর্যবেক্ষণ ও অনুচিন্তনের বিভিন্ন ধরন,—বিভিন্ন ক্রিয়া-কৌশল ও বাসনার আকারে প্রবেশ করে। ক্রিয়া-কৌশলহীন শ্রমের মধ্যে বুদ্ধিগত উপাদান সবচেয়ে কম, কারণ সেখানে সংশ্লিষ্ট অভ্যাস উচ্চমানের নয়। কিন্তু বিচার ও যুক্তিতর্কের মধ্যে যেমন অভ্যাস থাকে, যন্ত্র চালানোর, ছবিতে রং করার বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মধ্যেও তেমনি অভ্যাস থাকে।

এ সব উক্তি অবশ্য ন্যূনোক্তি। চোখ ও হাতের অভ্যাসের মধ্যে মনের যে অভ্যাসটি কাজ করে, তাই প্রথম পক্ষকে তাৎপর্য দান করে। সর্বোপরি, কোনো অভ্যাসের অন্তর্নিহিত বৌদ্ধিক উপাদানটি, নানা পরিবর্তনীয় ও নমনীয় ব্যাবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে এই অভ্যাসটির সম্পর্ক এবং সেই সূত্রে তার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের সম্পর্কও স্থির করে। আমরা "অপরিবর্তনীয়" অভ্যাসের কথা বলি। এর অর্থ হতে পারে যে, কোন কাজ করবার ক্ষমতা এতো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কর্তা প্রয়োজন হলেই সেটিকে সঙ্গতিরূপে পায়। কিন্তু অপরিবর্তনীয় অভ্যাস অন্য অর্থেও ব্যবহার হয়, যেমন গতানুগতিক অবস্থা বা ছকে বাঁধা পথ। অর্থাৎ তার মধ্যে সজীবতা, খোলা মন ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাব থাকে। অপরিবর্তনীয় অভ্যাসের এ অর্থও হতে পারে যে, বস্তুর উপরে আমাদের স্বাধীকার নেই, বরং আমাদের উপরেই একটা কিছুর স্থায়ী অধিকার রয়েছে। এটি অভ্যাস সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণার দুটি দিক তুলে ধরে: মানসিক ও নৈতিক ভঙ্গী উপেক্ষা করে অভ্যাসকে কোনো এক যান্ত্রিক ও বাহ্যিক কর্মপদ্ধতির সহিত একাত্ম করা; আর, অভ্যাসকে মন্দ অর্থ দেওয়ার প্রবণতা,—অর্থাৎ "বদ্" অভ্যাসের সহিত একার্থক করা। অনেকেই তাদের মনোনীত বৃত্তির উপযোগিতাকে অভ্যাস বললে অবাক হবেন, এবং স্বভাবতঃই তামাক,

মদ খাওয়া ও গালাগালির ভাষাকে অভ্যাসের নমুনা বলে মনে করবেন, যা বিচারে দূষণীয় হলেও, ছাড়াতে পারা যায় না; যার দ্বারা মানুষ অধিকৃত সেটাই তাঁদের মতে অভ্যাস।

যে মাত্রায় অভ্যাস বুদ্ধি-বিবিক্ত, সে মাত্রাতেই তা ছকে-বাঁধা কর্ম-পদ্ধতিতে পরিণত হয় বা কাজের এমন কোনো ধরনে অবনমিত হয়, যার ফলে আমরা অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ি। ছকে-বাঁধা অভ্যাস চিন্তা-বিবিক্ত। "বদ্" অভ্যাস এতো যুক্তি-বিচ্ছিন্ন যে, তা সচেতন বিচার ও ধার্য সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। যেমন আগে দেখেছি যে, আমাদের প্রকৃতির কোনো মৌলিক নমনীয়তা বশেই অভ্যাস আয়ত্তে আসে। অর্থাৎ যে পর্যন্ত না একটা কাজ করার উপযুক্ত ও স্বচ্ছন্দ উপায় বের হয়, সে পর্যন্ত আমাদের সাড়ার ধরন বদলাতে থাকে, এবং সেই ক্ষমতার মধ্যে দিয়েই অভ্যাস আসে। ছকে-বাঁধা অভ্যাস এবং যে অভ্যাস আমাদের দাস না হয়ে আমাদের প্রভু হয়ে বসে সে অভ্যাস নমনীয়তার অবসান ঘটিয়ে অন্যভাবে কর্ম-সম্পাদন-ক্ষমতা-বৈচিত্র্যের পরিসমাপ্তি চিহ্নিত করে। এটি সন্দেহাতীত যে, বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক নমনীয়তা,—এর শরীরতাত্ত্বিক ভিত্তি,—হ্রাস পেতে থাকে। শৈশবের সহজ প্রবৃত্তিজাত সচলতা, আগ্রহপূর্ণ বিচিত্র কাজ, নতুন উদ্দীপক ও নতুন নতুন সম্ভাবনার বাসনা ধীরে ধীরে "স্থিতাবস্থা" পায়; এর অর্থ হল, পরিবর্তন-বিমুখতা ও অতীত কীর্তির উপরে নির্ভরতা। যে পরিবেশ অভ্যাস গঠনে বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার আনে, কেবল সেই পরি-বেশই এই আসক্তি প্রতিরোধ করতে পারে। অবশ্য অঙ্গ অবয়বের এই জাতীয় কাঠিন্য, চিন্তন প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত শরীর-বৃত্তিক গঠন প্রণালীও সংক্রমন করে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির প্রক্রিয়া যাতে তার সর্বাধিক সম্ভাবনা সহ আহূত হয়, তার প্রতি অব্যাহত যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাই তো সেটি নির্দেশ করে দেয়। যে অদূরদর্শী পদ্ধতি অভ্যাসে বাহিক দক্ষতা অর্জনের জন্য যান্ত্রিক কর্মসূচী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির এবং আনুষঙ্গিক চিন্তন-বিবিক্ত ক্রিয়া-কৌশলের আশ্রয় নেয়,—সে পদ্ধতি ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় পারি-পার্শ্বিক অবস্থার সংকোচন চিহ্নিত করে।

৩ বিকাশ-ধর্মী ধারণার শিক্ষাগত সংশ্লিষ্টতা

বর্তমান অধ্যায়ে এ পর্যন্ত শিক্ষা সম্বন্ধে খুব কম কথাই বলা হয়েছে। ক্রমবিকাশের শর্তাবলী ও লক্ষণা নিয়েই আমরা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। তবে আমাদের সিদ্ধান্ত বিচার-সম্মত্ হয়ে থাকলে তার সঙ্গেই সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত পরিণতিও যুক্ত হয়ে গেছে। যখন বলি শিক্ষা হল বিকাশ, তখন যা-কিছুই বিকাশ ধারণার অন্তর্ভুক্ত তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। আমাদের মোদ্দা সিদ্ধান্ত এই যে, জীবন হল বিকাশ, এবং বিকশিত, ক্রমবিকশিত হওয়াই জীবন। একে শিক্ষার তুল্যার্থে রূপান্তরিত করলে এর অর্থ দাঁড়ায় (ক) শিক্ষাসংক্রান্ত ক্রিয়াপ্রণালীটির তার নিজের বাইরে কোনো উদ্দেশ্য নেই,—এটিই এর নিজের উদ্দেশ্য, এবং (খ) শিক্ষাসংক্রান্ত ক্রিয়াপ্রণালীটি একটি নিরন্তর পুনঃসংগঠন, পুনর্গঠন, এবং রূপান্তর সাধন প্রণালী।

(১) যখন বিকাশকে আপেক্ষিক অর্থে ধরা হয়,—অর্থাৎ শৈশব ও পরিণত জীবনের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ অনুযায়ী ধরা হয়, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় বিশেষ বিশেষ পথে ক্ষমতা নির্দেশিত করা; যেমন কার্যনির্বাহী ক্রিয়া-কৌশল, স্বার্থবোধের নির্দিষ্টতা, এবং চিন্তনের বিশিষ্ট বিষয় সহ অভ্যাস গঠন ইত্যাদি। কিন্তু তুলনামূলক অর্থই চূড়ান্ত অর্থ নয়। শিশুর বিশিষ্ট ক্ষমতা থাকে, এ কথাটি উপেক্ষা করার অর্থ, যে সব অঙ্গ-অবয়বের উপর তার ক্রমবিকাশ নির্ভরশীল তা খর্ব, বা, বিকৃত করা। বয়স্কলোকে শিশুর পরিবেশ পরিবর্তনে তাদের ক্ষমতাবলী খাটিয়ে নতুন উদ্দীপক যোগাড় করে। এই উদ্দীপক শিশুর ক্ষমতাবলীকে পুনর্নির্দেশিত করে, এবং ক্ষমতাবলীর বিকাশ ঘটাতে থাকে। এ কথা উপেক্ষা করার অর্থ দাঁড়াবে সীমিত বিকাশ ও অক্রিয় উপযোজন। অন্য দিকে, স্বাভাবিক শিশু ও স্বাভাবিক পরিণত লোক উভয়েই সমান ভাবে ক্রমবিকাশ লাভে নিযুক্ত। এদের মধ্যেকার পার্থক্য উন্নতি ও অনুন্নতির পার্থক্য নয়, এ পার্থক্য হল বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের ক্রমবিকাশের। যে সব ক্ষমতা বিনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও আর্থিক সমস্যার সঙ্গে যুঝতে নিয়োজিত হয়, সে সব ক্ষমতার বিকাশ সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে, শিশুর পরিণত হয়ে ওঠা উচিত। সংবেদনশীল কৌতূহল, পক্ষপাতহীন প্রতিবেদনশীলতা এবং মোহমুক্ত মন সম্পর্কে আমরা বলতে

পারি যে, পরিণত বয়স্কদের শিশুসুলভ হয়ে ওঠা উচিত। এর একটা কথা যতো সত্য অন্যটাও ততো সত্য।

যে তিনটি ধারণার সমালোচনা করা হল, যেমন অপরিণত অবস্থার প্রাতিজনিক রূপ, স্থিতিশীল পরিবেশের সঙ্গে গতিহীন সমন্বয়, এবং অভ্যাসের অনমনীয়তা, এদের সবগুলিই ক্রমোন্নতি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার সঙ্গে যুক্ত,—বিকাশ যেন কোনো স্থিতিশীল লক্ষ্যের দিকে গতি বিশেষ, আর ক্রমোন্নতির যেন কোনো একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটি নিজে উদ্দেশ্য নয়, অর্থাৎ ক্রমোন্নতিই যেন ক্রমোন্নতির উদ্দেশ্য নয়। এই তিনটি বিভ্রান্তিমূলক ধারণার শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিরূপ হল: প্রথমতঃ, নাবালকদের সহজ প্রবৃত্তিজাত বা প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাবলী হিসাবে গণ্য করতে ব্যর্থতা; দ্বিতীয়তঃ, অভিনব পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রামী-সুলভ উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশসাধনে ব্যর্থতা; তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত উপলব্ধির মূল্য নিয়ে পৌনঃ-পৌনিক অনুশীলন ও অন্যান্য উপায়-মাধ্যমে স্বয়ংচল দক্ষতা অর্জনের উপর প্রয়োজনাধিক জোর দেওয়া। সর্বক্ষেত্রেই পরিণত বয়স্কদের পরিবেশকে শিশুদের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয়। শিশুকে যেন এই পর্যন্তই আসতে হবে।

স্বাভাবিক সহজ-প্রবৃত্তিকে হয় উপেক্ষা করা হয় নয় উপদ্রব বলে মনে করা হয়। উপযোগীতার উপরেই লক্ষ্য থাকে বলে, একটি নাবালকের মধ্যে যা-কিছু বিশিষ্টরূপে ব্যক্তিগত, তা ঝেঁটিয়ে দূর করা হয়, কিম্বা শয়তানির উৎস বা নৈরাজ্য বলে গণ্য করা হয়। উপযোগিতাকে একরূপতার তুল্য করে নূতনত্বের প্রতি উৎসাহ হ্রাস করা হয়, এবং অনিশ্চিত অজানিতের উপরে আতঙ্কের সৃষ্টি করা হয়। যেহেতু ক্রমোন্নতির লক্ষ্যবস্তু ক্রমোন্নতির ধারাটির বাইরে এবং ওপারে থাকে, সেই হেতু লক্ষ্যবস্তুর দিকে প্ররোচিত করার জন্য বিভিন্ন বাহ্যিক ঘটকের আশ্রয় নিতে হয়। যখনই কোনো শিক্ষাপদ্ধতিকে যান্ত্রিক বলে দোষ দেওয়া হয়, তখনই আমরা নিশ্চিতরূপে ধরে নিতে পারি যে, বাহ্য লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছোবার জন্য বাইরে থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে।

(২) বস্তুতঃ, যেহেতু অধিকতর ক্রমোন্নতি ছাড়া আর কোনো কিছুর সাথেই ক্রমোন্নতির সম্পর্ক নেই, সেই হেতু অধিকতর শিক্ষা ছাড়া এমন আর কিছুই নেই, শিক্ষা যার বশবর্তী হতে পারে। একথা সর্বজনবিদিত

যে, স্কুল ছাড়বার পরক্ষণেই শিক্ষার সমাপ্তি হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু এর সার্থকতা এই যে, যে সমস্ত ক্ষমতা ক্রমোন্নতি সুনিশ্চিত করে, সেগুলিকে সংগঠিত করে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়াই স্কুল শিক্ষার উদ্দেশ্য। স্কুল শিক্ষার সর্বোত্তম ফল হল জীবনযাত্রা থেকেই শেখবার ঝোঁক আনা, এবং জীবন যাত্রার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন করা, যাতে জীবনযাত্রা-প্রণালী থেকেই সকলে শিক্ষালাভ করতে পারে।

আমরা যখন পরিণত বয়স্কদের সুকৃতির সঙ্গে সঠিকভাবে তুলনা করে অপরিণত অবস্থার অর্থ বোঝবার চেষ্টা ত্যাগ করি, তখন অপরিণত অবস্থাটির মধ্যে যে বাঞ্ছিত লক্ষণগুলির অভাব,—সে ধারণাটিও ত্যাগ করতে বাধ্য হই। এ ধারণা ত্যাগ করলে, শিক্ষাকে এ রকমের একটি পদ্ধতিরূপে মনে করার অভ্যাসটিকেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হই, যে পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা যেন জ্ঞান ঢেলে কোনো অপেক্ষমান মানসিক ও নৈতিক গর্ত ভর্তি করে উক্ত অভাবটি পূরণ করা। যেহেতু জীবনের অর্থ ক্রমোন্নতি, সেই হেতু একটি জীবিত সত্তা একই মৌলিক পূর্ণতা, এবং একই অনাপেক্ষিক দাবী নিয়ে এক স্তরে যেমন করে বাস্তব ও সদর্থক জীবন যাপন করে, অন্য স্তরেও তেমন করেই জীবন যাপন করে। সুতরাং শিক্ষার অর্থ হল, যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বয়স নির্বিশেষে ক্রমোন্নতি অথবা জীবনের পর্যাপ্তি সুনির্দিষ্ট করে, সেগুলি যোগানোরই অভিযান বিশেষ। আমরা প্রথমে অপরিণত অবস্থাকে অধৈর্য হয়ে দেখি, এবং একে এমন কিছু বলে মনে করি, যা যতো দ্রুত সম্ভব অতিক্রম করতে হবে। পরে, এরূপ শিক্ষা-মূলক পদ্ধতি দিয়ে যে পরিণত মানুষটি গড়ে ওঠেন, তিনিও অসহিষ্ণু মনস্তাপ নিয়ে আপন শৈশব ও যৌবনের প্রতি ফিরে তাকিয়ে সে কালটিকে একটি হারানো সুযোগ ও অপচায়িত শক্তির দৃশ্যরূপেই দেখতে পান। যতোকাল পর্যন্ত এটি উপলব্ধি না হবে যে, জীবনযাত্রার নিজস্ব মৌলিক গুণ আছে, এবং শিক্ষার কারবার হল ঠিক এই গুণটি নিয়ে, ততোকাল পর্যন্ত এই প্রহসন স্থায়ী থাকবে।

জীবন যে ক্রমোন্নতি,—এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করলে, শৈশবকে তথাকথিত আদর্শান্বিত করার হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাই ; কার্যতঃ, শৈশবকে আদর্শান্বিত করা অলস কল্পনা-বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু না। প্রতিটি

অসার কাজ ও স্বার্থের সঙ্গে জীবনকে একাত্ম করা যায় না। যদিও যা কিছু অসংলগ্ন অবস্থায় থাকে এবং কেবল উপর উপর দেখা যায় তাই কোনো সদ্যোজাত, অথচ অনভ্যস্ত ক্ষমতার চিহ্ন কিনা তা বলা সহজ নয়, তবুও আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যা-কিছু প্রকাশ পায় তাকেই নিজগুণে পরিণতি লাভ করছে বলে গ্রহণ করা ঠিক নয়। বহিঃপ্রকাশ সম্ভাব্য ক্রমোন্নতির লক্ষণ মাত্র। একেই বিকাশের ও ক্ষমতা বাড়াবার উপায় রূপে পরিণত করতে হবে,—শুধু নিজ নিজ কারণে উপভোগ বা অনুশীলন করা হবে না। ভাসা-ভাসা ব্যাপারের প্রতি অত্যধিক নজর দিলে, তা সে তিরস্কার করেই হোক আর উৎসাহ দিয়েই হোক, ওগুলো স্থায়ী হয়ে যেতে পারে, এবং তাদের বিকাশ সীমিত হতে পারে। কোন্ কোন্ আবেগ আগে বাড়ছে, সেটি দেখাই হল পিতা-মাতা ও শিক্ষকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ—সেগুলো কি অবস্থায় আছে তা নয়। অপরিণত অবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ইমারসন্ যা বলেছেন তার থেকে বেশী ভালো আর কিছুই বলা চলে না। তিনি বলেছেন, "শিশুকে শ্রদ্ধা কর। অত্যধিক পিতা-মাতাগিরি খাটিও না। তার নির্জনতার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করো না। কিন্তু এই পরামর্শের যে উত্তর আসবে আমি তার দামামা শুনতে পাচ্ছি। সে প্রশ্ন হল,—তুমি কি যথার্থই ব্যক্তিগত ও সামাজিক শৃংখলার রাস ছুঁড়ে ফেলবে, তুমি কি শিশুকে তার নিজের আবেগ ও খোশখেয়ালের উন্মত্ত গতির উপর ছেড়ে দেবে এবং এই নৈরাজ্য স্বীকার করে শিশুর প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে? এ সব প্রশ্নে আমার উত্তর হল,—শিশুকে শ্রদ্ধা কর,—শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা কর, কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি নিজেকেও শ্রদ্ধা কর···। কোনো বালকের শিক্ষার একদিকে রয়েছে তার প্রকৃতি বজায় রাখা এবং অন্য দিকে রয়েছে এ ছাড়া বাকী সব দূরে সরিয়ে দেওয়া। তার প্রকৃতি বজায় রাখো, কিন্তু তার হৈ-চৈ, প্রতারণা ও ডানপিটেমি থামাও; তার স্বভাব বজায় রাখো, এবং এই স্বভাব যে দিক নির্দেশ করে, তাকে ঠিক সেই দিকটার জ্ঞান দিয়ে তার স্বভাব পোক্ত করো।" ইমারসন যেমন আরও দেখিয়েছেন, শৈশব ও যৌবনের প্রতি এই শ্রদ্ধা শিক্ষকদের কাছে কোনো সহজ ও আয়েসী পথ খোলার পরিবর্তে "একই সঙ্গে তাদের সময়, চিন্তা ও জীবন ধারার প্রতি প্রচণ্ড দাবি আনে। কারণ, এতে সময়, জিনিসের সদ্ব্যবহার, সূক্ষ্ম দৃষ্টি,

যোজনা এবং ভগবান প্রদত্ত সকল মহতী শিক্ষা ও সহায়কের দরকার হয়; এবং কেবল এর প্রয়োগ চিন্তাই চারিত্রিক দৃঢ়তা ও গভীরতা নির্দেশ করে।”

সারাংশ

পরিণতি লাভ করার ক্ষমতা নির্ভর করে অন্য লোকের প্রয়োজনবোধ ও স্বাভাবিক নমনীয়তার উপরে। এর দু'টি অবস্থাই শৈশবে ও যৌবনে সর্বোচ্চ সীমায় থাকে। নমনীয়তা, বা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার অর্থ দাঁড়ায় অভ্যাস গঠন। অভ্যাস পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ এবং মানবিক উদ্দেশ্যে তার সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা দেয়। অভ্যাস একদিকে অভ্যস্ত করার বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে দৈহিক ক্রিয়া-কর্মের সার্বিক ও বিরতিহীন সমন্বয় সাধন করার এবং অন্য দিকে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য সক্রিয় সামর্থ্যাদির পুনর্বিন্যাসী করণের রূপ নেয়। প্রথম অবস্থাটি ক্রমোন্নতি লাভের পটভূমি যোগায়, আর পরের অবস্থা ক্রমোন্নতি গঠন করে। সামর্থ্যকে নতুন লক্ষ্য বস্তুর দিকে প্রয়োগ করার জন্য সক্রিয় অভ্যাসের মধ্যে চিন্তন, রচনা-কৌশল ও উদ্‌যোগ থাকে। এ সব গুণ ছকে-বাঁধা কাজের বিরোধী; সে কাজ ক্রমোন্নতির গতি রোধ করে। যেহেতু ক্রমোন্নতিই জীবনের বৈশিষ্ট্য, সেই হেতু ক্রমোন্নতির সঙ্গে শিক্ষা সামগ্রিকভাবে একাত্ম, নিজের বাইরে এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। যে মাত্রায় স্কুল-শিক্ষা অবিরাম উন্নতির বাসনা সৃষ্টি করে এবং সে বাসনাকে ফলপ্রসূ করতে নানাবিধ উপায় যোগায়, সেই মাত্রাটিই হল স্কুল-শিক্ষার মূল্যমান।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রস্তুতি, আত্ম-বিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা।

১। প্রস্তুতিরূপে শিক্ষা

আমাদের প্রস্তাব এই যে, শিক্ষামূলক ক্রিয়া কোনো এক নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ-ধর্মী ক্রিয়া বিশেষ। ক্রমবিকাশের প্রতি স্তরে অধিকতর সামর্থ্য লাভ করাই হল এর লক্ষণ। অন্যান্য যে সব ধারণা দ্বারা শিক্ষাবৃত্তি প্রভাবিত, তাদের সঙ্গে এই ধারণাটির প্রকট বৈষম্য খোলাখুলি দেখিয়ে দিলে, এটি আরও পরিষ্কার করে বোঝা যাবে। তুলনামূলকতার দিক থেকে এর প্রথম পার্থক্য হল এই যে, শিক্ষা প্রস্তুতির প্রক্রিয়া বা প্রস্তুত হওয়া। যার জন্য প্রস্তুত হতে হবে তা হল অবশ্য পূর্ণ-বয়স্ক জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব ও সুবিধা। পূর্ণ ও নিয়মসম্মতভাবে অধিকার-প্রাপ্ত সামাজিক সভ্যরূপে শিশুদের গণ্য করা হয় না। তাদের ধরা হয় পদপ্রার্থীরূপে, তাদের নাম-ভুক্তি করা হয় প্রতীক্ষার তালিকায়। এই ধারণাকে আরও একটু বাড়িয়ে ধরে নেয়া হয় যে, বড়োদের জীবনেরও নিজগুণে কোনো সার্থকতা নেই। কারণ তাদের জীবনও "আর একটা জীবনের" জন্য প্রস্তুতির শিক্ষানবিশি মাত্র। ক্রম-বিকাশের ধরন সম্বন্ধে যে নঞর্থক ও প্রাতিজনিক ধারণার সমালোচনা করা হয়েছে, উক্ত ধারণাটি তারই রূপান্তর। কাজেই আমরা তার পুনরুক্তি করব না; কিন্তু শিক্ষাবৃত্তিকে এই ভিত্তির উপর দাঁড় করালে এর থেকে যে কুফল আসে, আমরা তার কথাই বলব।

প্রথমতঃ ওতে কাজের উদ্যম নষ্ট হয়। গতিসঞ্চারক শক্তিকে কাজে লাগানো হয় না। প্রবাদ আছে যে, শিশুরা বর্তমানের মধ্যে বাস করে। কথাটা এড়িয়ে যাবার মতো নয়, পরন্তু প্রণিধানযোগ্য। কেবল ভবিষ্যৎ হিসাবে ভবিষ্যৎকে ধরলে, তার কোনো তাড়া থাকে না, তার কোনো রূপও থাকে না। যার সম্বন্ধে কি বা কেন কিছুই জানা নেই, তার জন্যে তৈরী হওয়ার

অর্থ উপস্থিত কল-বল ও কলা-কৌশলকে পরিত্যাগ করে কোনো অনিশ্চিত দৈবের মধ্যে গতিশক্তির সন্ধান করা। দ্বিতীয়তঃ, এই অবস্থাচক্রে ক্রমাগত ইতস্ততঃ ও গড়িমসি করতে গিয়ে আমাদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। যে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি চলে, তাতো অনেক দূরে, এবং তাকে বর্তমানে পরিণত করার আগে প্রচুর সময় দিতে হবে। তাহলে এর জন্যে প্রস্তুতির এত তাড়াহুড়ো কেন? বরং তাকে স্থগিত রাখার প্রয়োজনই বেশী। সেটি এই কারণে যে, বর্তমানের মধ্যেই রয়েছে কত বিস্ময়কর সুযোগ-সুবিধা,—রয়েছে অভিযানের কত না নিমন্ত্রণ। ফলে মনোযোগ ও কর্মশক্তি স্বভাবতঃই ওদের দিকে যায়; এবং তার ফলেই শিক্ষা হয়। কিন্তু ব্যবস্থাদিকে যথাসম্ভব শিক্ষামূলক করবার জন্য পূর্ণ প্রয়াস নিলে যতোখানি শিক্ষালাভ ঘটত, পূর্বোক্ত স্বাভাবিক শিক্ষায় ততোখানি শিক্ষালাভ ঘটে না। তৃতীয়তঃ, আর একটি অবাঞ্ছিত ফল হয় এই যে, শিক্ষাধীন ব্যক্তির জন্য তার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট ক্ষমতা অনুযায়ী আশানুরূপ ও প্রযোজনীয় মানদণ্ডের পরিবর্তে একটা প্রচলিত ও গড়পড়তা মানদণ্ড গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার্থীর নিজের সবল ও দুর্বল গুণাবলীর ভিত্তিতে সুদৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট বিচারের স্থানে কম-বেশী সুদূর ভবিষ্যতে মোটামুটি যা ঘটতে পারে বলে আশা করা যায়, তার সম্বন্ধেই অনির্দিষ্ট ও সংশয়াপন্ন মতামত উপস্থাপিত করা হয়। যেমন, বছরের শেষে যখন প্রমোশন হবে তার কথা, অথবা যখন কলেজে যাবার জন্য প্রস্তুত হবে তার কথা, বা শিক্ষানবিশির সাথে প্রভেদ রেখে যখন অন্য কিছুতে ঢোকবার সময় হবে, ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকেই জীবনের গুরুতর বিষয় বলে ধরা হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই যে এখনকার কৌশলের দিক থেকে মন সরিয়ে নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিষ্ফলা দিকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, তা যেন সুপরিকল্পিত সৈন্য চালনার পরিবর্তে ক্ষয়ক্ষতিকেই বরণ করে নেওয়া। বস্তুতঃ এতে যে ক্ষতি হয় তার অত্যুক্তি অসম্ভব। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি রচনা করতে গিয়ে এই ধরনের শিক্ষা ঠিক করে নেয় যে, ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীর সার্থকতাই আসবে। কিন্তু এই ভবিষ্যতেই তার বিরাট ব্যর্থতা।

সর্বশেষে, প্রস্তুতিতত্ত্ব আনন্দ-বেদনার সুবিধাবাদী প্রেষণাকে খুব বেশী মাত্রায় কাজে লাগাবার একটা অপরিহার্যতা এনে দেয়। যেহেতু ভবিষ্যৎকে বর্তমানের সম্ভাবনা থেকে পৃথক করে নিলে, তার কোনো উদ্দীপনাপূর্ণ বা

নির্দেশকারী ক্ষমতা থাকে না, সেই হেতু ভবিষ্যৎকে কার্যকারী করার জন্য তার সাথে কোনো কিছু গেঁথে দিতে হয়। তখন পুরস্কারের আশা আর শাস্তির ভয়কে কাজে লাগানো হয়। উপস্থিত কারণ বশতঃ এবং জীবন-যাত্রার উপাদানরূপে যে সুস্থ কাজ কর্ম করা হয় তা প্রধানতঃ নির্জ্ঞাত। একজনকে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তার মধ্যেই তার কাজের উদ্দীপক থাকে। কিন্তু যখন এই পরিস্থিতি উপেক্ষিত হয়, তখন শিক্ষার্থীদের বলতেই হয় যে, তারা যদি ব্যবস্থিত ধারায় কাজ না করে তাহলে সাজা পাবে; আর যদি তা করে তাহলে বর্তমানের ত্যাগের জন্য ভবিষ্যতে পুরস্কারের আশা করতে পারে। সকলেই জানেন যে, যে সব শিক্ষা-ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির খাতিরে বর্তমান সম্ভাবনাদিকে উপেক্ষা করে, তার মধ্যে প্রথমে কি পরিমাণ শাস্তির ব্যবস্থার আশ্রয়ই না নিতে হয়। পরে, এই সব পদ্ধতির রূঢ়তা ও অক্ষমতায় উত্যক্ত হয়ে, দোলকটি বিপরীত সীমায় দুলে যায়। এবং পরবর্তী কোনো দিনের প্রয়োজনে যে সংবাদটি দেওয়া হয়, তাতে চিনির প্রলেপ লাগাতে হয়। অবশ্য শিক্ষার্থীদের বোকা বানিয়ে সেটি গেলানো গেলেও তার মধ্যে কোনো স্বাদই তারা পায় না,—সেটা তখন তাদের গ্রাহ্যের বাইরে।

প্রশ্ন অবশ্য এ নয় যে, শিক্ষা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি করাবে কিনা। যদি শিক্ষার অর্থ ক্রমবিকাশ হয়, তা হলে বর্তমান সম্ভাবনাকে ক্রমাগতই কাজে লাগাতে হবে, এবং পরবর্তী প্রয়োজনের সাথে যোঝবার জন্য ব্যক্তিকে বেশী উপযুক্তই করতে হবে। বর্ধনশীলতা এমন জিনিস নয় যে সেটি যখন তখন সম্পূরিত হবে। এ হ'ল নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলা। যদি স্কুল ও বাইরের পরিবেশ এমন অবস্থা-ব্যবস্থা যোগাতে পারে যে, তাতে অপরিণতদের বর্তমান সামর্থ্যকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাজে লাগান যায়, তা হলেই বর্তমানের মধ্যে থেকে যে ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে তার প্রতি যত্ন নেওয়া হয়। ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুতির উপরে গুরুত্ব দেওয়া ভুল নয়। ভুল হল, বর্তমান প্রচেষ্টাকে ভবিষ্যতের মূল উৎস করা। যেহেতু ধারাবাহিক বিকাশমান জীবনের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, সেই হেতু বর্তমান অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব সমৃদ্ধ ও সার্থক করবার জন্য সকল কর্মশক্তিকে সেই দিকে নিয়োজিত করাই বাধ্যতামূলক। সে ক্ষেত্রে, বর্তমান অজ্ঞাতসারেই ভবিষ্যতের মধ্যে মিশে যায় এবং ভবিষ্যতেরও যত্ন নেওয়া হয়।

২। আত্মবিকাশরূপে শিক্ষা

শিক্ষাসংক্রান্ত একটি ধারণা নিজেকে বিকাশ-ধারণাভিত্তিক বলে জাহির করে। কিন্তু এ ধারণা এক হাতে যা দিতে চায়, অন্য হাতে তা নিয়ে নেয়। বিকাশকে নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ বলে ধারণা করা হয় না ; ধারণা করা হয় কোনো স্থির লক্ষ্যবস্তুর দিকে সুপ্ত ক্ষমতাবলীর বহির্বিকাশরূপে। লক্ষ্য-বস্তুটি হল, সমাপ্তি বা সম্পূর্ণতা। এই লক্ষ্যবস্তুকে আয়ত্তে না-পাওয়ার প্রতিটি স্তরেই জীবন তাকে কেন্দ্র করে দল মেলতে চায়। তর্কশাস্ত্র মতে এ মতবাদ প্রস্তুতি তত্ত্বেরই একটা রকমফের মাত্র।• কার্যতঃ এ দুটি মতের মধ্যে প্রভেদ এই যে, শিক্ষার্থী যে সব ব্যবহারিক ও বৃত্তিগত কর্তব্যের জন্য তৈরী হচ্ছে প্রস্তুতিবাদের সমর্থকেরা তার উপরে অতিরিক্ত জোর দেয় ; আর বিকাশধর্মী মতবাদ, যে মূল-সত্তার বহির্বিকাশ ঘটছে, তার আদর্শগত ও আধ্যাত্মিক গুণের কথা বলে।

ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি শুধু এক চরম ও অপরিবর্তনীয় লক্ষ্যবস্তুর নিকট-বর্তী হওয়া—এই যে ধারণা, তা হল, জীবনের স্থিতিশীল থেকে গতিশীল বোধগম্যতায় মনের পরিবৃত্তির পথে এক চরম অথর্বতা। এ-ধারণা গতি-শীলতার ছদ্মবেশে বিকাশ, পদ্ধতি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রশস্তি রচনা করে অনেক কিছু বলে। কিন্তু এ সব ক্রিয়াকে শুধু মধ্যবর্তীকালীন ব্যবস্থা বলে ধরে নেয় ; এদের নিজগুণে কোনো অর্থ হয় না। বর্তমানে যা চলছে তার থেকে দূরবর্তী কোনো কিছুর "দিকে" গতি হিসাবেই এদের তাৎপর্য। যেহেতু ক্রমবিকাশ কেবল এক পূর্ণ সত্তার দিকে গতিমাত্র, সেই হেতু চরম আদর্শ স্থির থাকে। এক বিমূর্ত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কাছে সব কিছুই শাসন-সংযত। এরূপ ধারণায় বর্তমান ক্ষমতা ও সুযোগের মূল্যকে হ্রাস করা হয়।

যেহেতু পূর্ণত্বের আদর্শ ও বিকাশের লক্ষ্যবস্তু বহুদূরে অবস্থিত, সেই হেতু তা আমাদের নাগালের এতো বাইরে যে, সার্বিকভাবে বলতে গেলে তাকে পাওয়াই অসাধ্য। কাজেই তাকে বর্তমানের চালক হিসাবে পেতে হলে, তাকে এমন কিছুতে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে কার্য-ক্ষেত্রে সে তার স্থান করে নিতে পারে। অন্যথায়, আমরা শিশুর যে কোনো

বা প্রতিটি বহিঃপ্রকাশকেই অন্তর থেকে বহির্বিকাশ, অতএব প্রণম্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হই। একটা প্রতিন্যাস বা ক্রিয়াশীলতা পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, না তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার বিচারের জন্য আমরা যদি কোন সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড খাড়া না করি, তাহলে এর একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হবে পরিবেশ থেকে সকল প্রভাব তুলে নেওয়া, পাছে তারা উপযুক্ত বিকাশলাভে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু সেটা তো কাজের কথা নয়। সুতরাং একটা কাজ-চলা গোছের প্রতিকল্প দাঁড় করানো হয়। সচরাচর বয়স্করা এটাই পছন্দ করে যে ছোটরাও যেন এই রকম করেই জ্ঞানার্জন করে। কাজেই "ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে" বা কোনো পণ্ডিতী ফন্দি এটে, শিক্ষক যা চায় শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তাই বের করতে চেষ্টা চলে। শিক্ষক যা চায়, তা যদি সে পায়, তা হলেই প্রমাণিত হয় যে শিশুর ঠিকমতো বহির্বিকাশ হচ্ছে। কিন্তু সাধারণতঃ শিশুর নিজের সেদিকে কোনো উদ্যোগ নেই। ফলে শিক্ষকের প্রত্যাশিত বস্তুর প্রতি শিশুর এলো-মেলো ভাবে হাতড়ানো ছাড়া আর উপায় কি? এতে পরের দেওয়া সঙ্কেতের উপর নির্ভর করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এ ধরনের পদ্ধতি মূলনীতির ভান করে এবং এতে মূলনীতির সমর্থন আছে বলেও দাবী করে। ফলে সোজা "বলে দিলে" যে অনিষ্ট হতো তার থেকে বেশী অনিষ্ট এতে হয়। কারণ সোজা বললে, বলা কথার কতোখানি কাজে লেগে যাবে তা নির্ভর করতো শিশুর উপরে।

দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে পরম লক্ষ্যবস্তুর কার্যকর প্রতিনিধি সংগ্রহ করবার জন্য দুটি বিশিষ্ট চেষ্টা দেখা যায়। দুটি চেষ্টাই আরম্ভ হয়েছে মানবজীবনের অন্তর্বাসী পূর্ণত্ব ও সয়স্তূর ধারণা থেকে। পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণতার আদর্শটি কেবল আদর্শই নয়; তা অনুক্ষণ ক্রিয়ারতও বটে। কিন্তু তা কেবল অবিকশিত রূপে বর্তমান। যেটি এভাবে আবৃত, তাকেই ক্রমাগত অনাবৃত ও বহির্গামী করার নাম বিকাশ। এ দু'টি দার্শনিক প্রকল্পের প্রণেতা হলেন ফ্রয়েবেল ও হেগেল। কিন্তু যে পন্থায় পূর্ণ মূল-সত্তার উত্তরোত্তর অবরোধ বা বহিঃপ্রকাশ সাধিত হয়, সে সম্বন্ধে তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। হেগেলের মতে এ কাজ সম্পাদিত হয় সয়স্তূর বিভিন্ন উপাদান-বিধৃত পরম্পরাগত বহুবিধ ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। ফ্রয়েবেলের মতে কর্মোদ্দীপনের শক্তি

হ'ল বিবিধ প্রতীকের উপস্থাপন। এর বেশীর ভাগই গাণিতিক এবং সয়ম্ভূর সারগর্ভ লক্ষণাদির অনুবর্তী। যখন শিশুর সামনে এদের উপস্থাপিত করা হয় তখন তার ভিতরকার ঘুমন্ত পূর্ণত্ব বা পরমোৎকর্ষ জাগ্রত হয়। মাত্র একটি উদাহরণেই পদ্ধতিটি দেখানো যেতে পারে। কিণ্ডারগার্ডেনের সাথে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন যে, শিশুরা একটি বৃত্তের আকারে জড়ো হয়। এ কথাই যথেষ্ট নয় যে, শিশুদের একত্র করবার জন্য বৃত্ত প্রতীক একটা সুবিধাজনক ব্যবস্থা। কিন্তু এ রকম করতেই হয় "কারণ এটিই হল সমগ্র মানব জাতির সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের প্রতীক।"

ফ্রয়েবেলের দিক থেকে শিশুদের সহজাত সামর্থ্যের সার্থকতাকে স্বীকৃতি দান, তাদের সম্বন্ধে নিরীক্ষার কাজে অন্যান্যকে প্রণোদিত করার বিষয়ে তার প্রভাব, সম্ভবতঃ ক্রমবিকাশ ধারণার সুদূরপ্রসারী স্বীকৃতির ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের সর্বাধিক কার্যকারী শক্তির প্রতীক। কিন্তু বিকাশ-ধারণার সূত্রায়ন, এবং তার উন্নতিবিধানে বিবিধ কৌশলের ব্যবস্থা এই কারণে ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছে যে, তিনি বিকাশকে এক পূর্ব-প্রস্তুত প্রচ্ছন্ন মূল-সত্তার বহির্বিকাশ বলে ধারণা করেছেন। বর্ধমানতাই যে ক্রমবিকাশ, এবং বিকশিত হয়ে ওঠাই যে বিকাশ, এ তত্ত্ব অনুধাবনে তিনি বিফল হয়েছেন, এবং এর ফলে জোর দিয়েছেন পূর্ণতা প্রাপ্ত সত্তাটির উপরে। এইভাবে তিনি এমন একটি লক্ষ্যবস্তু তুলে ধরেছেন, যার অর্থ দাঁড়ায় ক্রমবিকাশের গতিরোধ করা, এবং এমন একটি নির্ণায়কের পত্তন করা, যাকে বিমূর্ত ও সাঙ্কেতিক সূত্রে রূপান্তর করার মাধ্যম বানানো ছাড়া, ক্ষমতার অব্যবহিত নির্দেশক হিসাবে প্রয়োগ করা যায় না।

পেশাদারী দার্শনিক ভাষায়, সম্পূর্ণ বহির্বিকাশের সুদূর-পরাহত লক্ষ্যবস্তু হল তুরীয়। অর্থাৎ তা এমন কিছু যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে স্বতন্ত্র। অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে এটি শূন্যের কোঠায় পড়ে। বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম বা বর্ণনা করা যায়, এটি এ রকমের কিছু না হয়ে, বরং হয়ে দাঁড়ায় কোনো একটা অস্পষ্ট ভাবরসাত্মক উৎকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাই কোনো অবরোহী সূত্র দিয়ে এই অস্পষ্টতার প্রতিবিধান করতে হয়। ফ্রয়েবেল অভিজ্ঞতার মূর্ত তথ্যাবলী ও বিকাশের তুরীয় আদর্শের সংযোগ করেছিলেন প্রথমটিকে পরেরটির প্রতীক ধরে নিয়ে। কোনো অবরোহী সূত্র অনুযায়ী জানা

জিনিসকে প্রতীক বলে জ্ঞান করবার—আর প্রত্যেক অবরোহী ধারণাই তো খেয়াল-খুশী,—অর্থ দাঁড়ায়, কোনো অলীক কল্পনাকে আহ্বান করে সেটির সমর্থক যে কোনো উপমাকেই পাকড়াও করা, এবং কল্পনাটিকে ন্যায় শাস্ত্রানুমোদিত করা। সাঙ্কেতিকতার এই প্রকল্প স্থির হওয়ার পরে এমন কোনো নির্দিষ্ট কারিগরি কৌশল রচনা করতে হয়, যা দিয়ে ব্যবহৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সঙ্কেতগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থকে শিশুদের বোধগম্য করানো যায়। বয়স্ক লোকেরাই প্রতীকতার বা সাঙ্কেতিকতার সূত্রকার; সম্ভবতঃ তারাই এর কৌশলের রচয়িতা ও নিয়ন্ত্রক। ফলে বিমূর্ত প্রতীকের প্রতি ফ্রয়েবেলের ঝোঁক অনেক সময়েই তাঁর সমবেদনাপূর্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টির উর্ধ্বে উঠে বিকাশের জায়গায় এমন একটা খেয়াল-খুশী ও বার-থেকে-চাপানো হুকুমদারী প্রকল্পকে স্থাপিত করেছে যে, শিক্ষার ইতিহাসে এমনটি আর কখনো দেখা যায় নি।

অনভিগম্য সয়ম্ভূর কার্যোপযোগী মূর্ত প্রতিরূপ আবিষ্কারের আবশ্যকতায়, হেগেল সাঙ্কেতিকতার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করেছেন। ফ্রয়েবেলের মতো হেগেলের দর্শনও একদিক থেকে জীবন প্রক্রিয়ার সার্থক ধারণায় এক অপরিহার্য অবদান সূচিত করেছে। বিমূর্ত ব্যক্তিবাদী দর্শনের দুর্বলতা তাঁর কাছে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছিল, তিনি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঝেঁটিয়ে সরিয়ে ফেলবার এবং ওগুলিকে কেবল কৌশল করে পাওয়া ও ছলনা করে পোষণকে স্বৈরাচার বলে গণ্য করবার অসাধ্যতাও বুঝেছিলেন। তাঁর ইতিহাস ও সমাজ-দর্শনে লেসিং, হার্ডার, কান্ট, স্কিলার ও গেটে প্রমুখ এক বিশিষ্ট শ্রেণীর জার্মান লেখকদের প্রচেষ্টা চরম সীমায় উঠেছিল। এঁদের প্রচেষ্টা ছিল মানব জাতির সুমহান যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষামূলক প্রভাবের গুণাবধারণ করা। যাঁরা এ আন্দোলনের সারকথা বুঝেছিলেন তাঁদের পক্ষে তখন থেকে প্রতিষ্ঠান বা সংস্কৃতিকে কৃত্রিম বলে ধারণা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। যে মনস্তত্ত্ব "মনকে" কোনো নগ্ন ব্যক্তির পূর্বপ্রস্তুত সম্পত্তি বলে গণ্য করত, "মনের বিষয়মুখী" স্বভাবের তাৎপর্য দেখবার ফলে সেই মনস্তত্ত্ব, কার্যতঃ না হলেও ধারণায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হ'ল। বিষয়মুখী মন হল সেই মন যা ভাষা, শাসন প্রণালী, শিল্প, কলা, ধর্ম প্রভৃতি মানবিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত। কিন্তু যে হেতু এক সয়ম্ভূ লক্ষ্যবস্তুর ধারণা হেগেলের উপর ভর করেছিল, সেই হেতু তিনি উপস্থিত মূর্ত প্রতিষ্ঠান-

গুলিকে কোনো একটা ঘরাঞ্চির ক্রমোর্ধ্বগামী ধাপে ধাপে সন্নিবেশিত করতে বাধ্য হলেন। প্রত্যেকের পক্ষেই তার কাল ও স্থানের অনুবর্তী হওয়া অপরিহার্য ; কারণ প্রত্যেকেই স্বয়ম্ভূ মনের আত্মোপলব্ধির এক একটি সোপান। এই প্রকারের এক একটি ধাপ বা সোপান মেনে নিলে প্রত্যেকটির অস্তিত্ব প্রত্যেকটির যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। কারণ প্রত্যেকেই যে সম্পূর্ণতার এক একটি উপাদান ; এবং এই সম্পূর্ণতাই হল হেতু। প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন অবস্থায় রয়েছে তার বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোনো আধ্যাত্মিক অধিকার নেই, ব্যক্তিগত বিকাশ ও শিক্ষা হল বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির অনুগত হয়ে ওদের সারমর্মের সাঙ্গীকরণ। অনুবর্তীতাই শিক্ষার সার নির্যাস,—রূপান্তর নয়। ইতিহাস দেখায় বটে যে, প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন ঘটে ; কিন্তু আসলে তাদের পরিবর্তন, রাষ্ট্রের উত্থান পতন, "জগতাত্মার কর্ম"। যারা মহাজন তাঁরা জগতাত্মার নির্বাচিত সংঘটক, তাঁরা ছাড়া এই পরিবর্তনের মধ্যে জনগণের কোনো অংশ নেই, বা তাদের ভাগ্যও তার সঙ্গে জড়িত নয়। উনিশ শতকের শেষভাগে এই জাতীয় আদর্শবাদ জীব-অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছিল। অভিব্যক্তি সেই ধরনের এমন এক শক্তি, যেটি এর নিজের পরিণামের দিকে নিজেই কাজ করে যায়। এর বিরুদ্ধে বা এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, জনগণের সংজ্ঞাত ধারণাবলী ও পছন্দ-অপছন্দ অকার্যকর। অথবা, বরং যাদের মাধ্যমে অভিব্যক্তি নিজের কাজ করে চলে এরা কেবল তার উপায় মাত্র। সামাজিক প্রগতি একটা প্রণালীবদ্ধ সর্বাঙ্গীণ ক্রমবিকাশ, পরীক্ষামূলক নির্বাচনের ব্যাপার। হেতুই সর্বশক্তিমান, কিন্তু কেবল স্বয়ম্ভূ হেতুরই শক্তি আছে।

সুমহান ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানগুলি যে মনের বুদ্ধিগত শিক্ষালাভের সক্রিয় উপাদান, এ কথার জ্ঞান অথবা পুনরাবিষ্কার,—কারণ গ্রীকেরা এ ধারণার সাথে পরিচিত ছিলেন,—শিক্ষা-দর্শনকে এক মহৎ অবদান যুগিয়েছে। এ ধারণা রুশোকে ছাড়িয়ে, এক দূরবর্তী ও সুষ্ঠু পদক্ষেপের নির্দেশ দেয়। রুশো বলেছেন যে, শিক্ষা হল স্বাভাবিক বিকাশ, বাইরে থেকে শিক্ষার্থীর উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া নয় ; কিন্তু এ মতকে তিনি নিজেই এই বলে নস্যাৎ করেছেন যে, সামাজিক অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। কিন্তু বিকাশের পরিণতির এক সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক ধারণার মধ্যে হেগেলের তত্ত্ব বিমূর্ত অর্থে

ব্যক্তিকে বিবর্ধিত করলেও, মূর্ত ব্যক্তিতাকে গ্রাস করেছে। হেগেলের অনুগামী কয়েকজন মনীষী সমাজকে একটি আঙ্গিক পূর্ণতা বা জীবনসত্তারূপে ধারণা করে নিয়ে পূর্ণত্ব এবং ব্যক্তিতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এতে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তিগত সামর্থ্যের পর্যাপ্ত অনুশীলনের জন্য পূর্ব থেকেই একটা সামাজিক সংগঠন থাকা দরকার। কিন্তু দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে যে সম্পর্ক এবং এদের সঙ্গে সম্পূর্ণ দেহটির যে সম্পর্ক রয়েছে, সমাজ-সত্তাকে সে অর্থে ধরলে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই কোনো একটি সীমিত স্থান ও কর্তব্য থাকা দরকার। এবং সেই সীমিত স্থান ও কর্তব্য অন্যান্য ব্যক্তি ও স্থান এবং কর্তব্য দ্বারাও সম্পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা রাখে। যদি দৈহিক কলার এক অংশকে এমন ভাবে পৃথক করা হয় যাতে একভাগে হাত এবং কেবল হাতই হতে পারে, আর এক ভাগে চোখ এবং কেবল চোখই হতে পারে, এবং এইভাবে আর আর জিনিস গড়ে ওঠার ফলে একটি সর্বাঙ্গীণ সত্তা গঠিত হয়, এবং ঠিক সেইভাবেই যদি এক ব্যক্তি সমাজের হাতিয়ারি কাজের জন্য, অন্যজন রাষ্ট্রীয় কাজের জন্য, আর একজন পণ্ডিতী কাজের জন্য এবং এইভাবে আর আর সকলে পৃথকীকৃত হয়, তাহলে সামাজিক বিধিব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণীগত বিভেদকে দার্শনিক স্বীকৃতি দেবার জন্য জীবসত্তা ধারণার প্রয়োগ খাটলেও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই ধারণাটি পুনরায় ক্রমবিকাশের পরিবর্তে বাহ্যিক হুকুমনামাকেই নির্দেশ করে।

৩। ধী-শক্তি নিচয়ের প্রশিক্ষণরূপে শিক্ষা

যখন ক্রমবিকাশ ধারণার প্রভাব খুব বেশী ছড়ায় নি, তখন "বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা" তত্ত্বের খুব চল ছিল। এই তত্ত্ব একটি নির্ভুল আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে গঠিত। শিক্ষার বাঞ্ছফল হওয়া উচিত কার্য সুসম্পন্ন করার বিশিষ্ট ক্ষমতাসমূহকে সৃষ্টি করা। যা-কিছু করা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান প্রধান কাজ, তা যদি একই ব্যক্তি শিক্ষা ছাড়া যে ভাবে করে, শিক্ষা পেয়ে তার থেকে আরও বেশী ভালো ভাবে করতে পারে, তবেই তাকে শিক্ষাপ্রাপ্ত বলা যায়। এখানে "বেশী ভালোর" অর্থ বেশী স্বচ্ছন্দতা, পটুতা, বিচক্ষণতা

ও তৎপরতা। এটা যে শিক্ষার বাহ্যফল তা দেখানো হয়েছে; শিক্ষাগত বিকাশের ক্রিয়াফল হিসাবে অভ্যাস সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার মধ্যেও ঐ কথা আছে। কিন্তু আলোচ্য তত্ত্ব যেন একটা সহজ পথ ধরে কোনো কোনো ক্ষমতাকে (যাদের নাম এখনই করা হবে) সহজ ভাবে ক্রম-বিকাশের "ফল" বলে গণ্য না করে, এগুলিকে শিক্ষাদানের প্রত্যক্ষ ও সংজ্ঞাত "লক্ষ্য" বলে মনে করে। যেন, একজন গল্‌ফ্‌ খেলোয়াড় যেমন নানা জাতীয় মার-এর কৌশল আয়ত্ত করে, ঠিক তেমনি ভাবেই ব্যক্তির ক্ষমতাবলীর মধ্যে কয়েকটিকে নির্দিষ্ট করে নিয়ে তাদের প্রশিক্ষিত করতে হবে। কাজেই শিক্ষার উচিত সরাসরি ঐই ক্ষমতা কটির প্রশিক্ষণের কাজে লেগে যাওয়া। কিন্তু তার মানে হল ওগুলি পূর্ব থেকেই কোনো অশিক্ষিত অবস্থায় ওখানে রয়েছে। অন্যথায় ওগুলির সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ ও সংঘটকের পরোক্ষ ক্রিয়াফল রূপে। আগে থেকেই কোনো স্থূল বা অশোধিত অবস্থায় থাকার দরুণ, বর্তমানে যে করণীয়টুকু থাকে তা হ'ল অব্যাহত ও পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তি দ্বারা ওদের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করা। তা হলেই এই সব ক্ষমতা পরিমার্জিত ও পূর্ণাঙ্গ হবে। এই ধারণার মধ্যে "বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা" বাক্যাংশ যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে শৃঙ্খলা শব্দটি একদিকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্ষমতার বাহ্যফল, অন্য দিকে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পদ্ধতি—এই দু'দিকের সঙ্গেই সম্পর্কান্বিত হয়েছে।

উল্লিখিত ক্ষমতাবলীর রূপ হল, উপলব্ধি, মনে রাখা, স্মরণে আনা, সংযোজন করা, মনোনিবেশ করা, সঙ্কল্প করা, অনুভব করা, কল্পনা করা, চিন্তন ইত্যাদি। এ-সব ক্ষমতাকে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা গড়ে নিতে হয়। এই তত্ত্বকে চরমরূপে প্রকাশ করেছিলেন জন লক্। একদিকে বহির্জগৎ জ্ঞানের বিষয়-বস্তু বা আধেয়কে উপস্থাপিত করে, এবং ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় থেকে এদের সংবেদন গ্রহণ করে। অন্য দিকে মনের কতিপয় পূর্বপ্রস্তুত ক্ষমতা থাকে, যেমন মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ, ধারণ, তুলনা, বিমূর্তকরণ, যৌগিকী-করণ ইত্যাদি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিবিধ বস্তু যে যে ভাবে একত্রিত ও বিভাজিত অবস্থায় রয়েছে, মন যদি সেই সেই ভাবেই তাদের চিহ্নিত ও সংযোজিত করতে পারে, তা হলেই জ্ঞান ফলে। কিন্তু শিক্ষার মধ্যে

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, যে পর্যন্ত মনের ধীশক্তিনিচয় সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত ধাতে পরিণত না হয়, সে পর্যন্ত তাদের অনুশীলন বা ব্যবহার করা উচিত। এ সম্বন্ধে যে উপমাটি প্রতিনিয়ত দেওয়া হয়, সেটি বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় বা শরীর চর্চাকারীর সংযুক্ত। এরা কয়েকটি মাংসপেশীর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা সবশেষে স্বয়ংচল ক্রিয়াকৌশল অর্জন করেন। এমন কি, চিন্তনের মতো মৌলিক শক্তিকেও সহজ পৃথকীকরণ ও সংযোজনের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মাধ্যমে সুশিক্ষিত অভ্যাসে সুগঠিত করতে হয়। লকের বিবেচনায়, এ কাজে গণিত অতুলনীয় সুযোগ দেয়।

লকের কথা তাঁর কালের দ্বৈতবাদের মধ্যে বেশ থাপ খেয়েছিল। এতে মন ও বস্তু, ব্যক্তি ও জগৎ দু'পক্ষের প্রতিই সুষ্ঠু বিচার করা হয়েছিল। এক পক্ষ জ্ঞানের বিষয়বস্তু, এবং যে বস্তুর উপরে মন কাজ করবে তা দিয়েছিলেন, এবং অপরপক্ষ যুগিয়েছিলেন সুনির্দিষ্ট মানসিক ক্ষমতা। অবশ্য এই সব মানসিক ক্ষমতাগুলোর সংখ্যা কম, এবং সুষ্ঠু অনুশীলন দ্বারা এদের প্রশিক্ষিত করতে হয়। প্রকল্পটি জ্ঞানের বিষয়বস্তুর উপর যথাযথ গুরুত্ব অর্পণ করেছে বলেই মনে হয়। তবুও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, শুধু খবরাখবর গ্রহণ ও সঞ্চয় করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল মনোযোগ, স্মরণ, পর্যবেক্ষণ, বিমূর্তন ও সূত্রায়ন ইত্যাদি ব্যক্তিগত ধারণাবলীকে গঠন করা। এতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সকল বিষয়-বস্তুই বহির্জগৎ থেকে গৃহীত। এ কথা বাস্তববাদী সম্মত। কিন্তু সর্বশেষ জোর পড়ে মানসিক ক্ষমতা গঠনের উপরে, সে হল আদর্শবাদের কথা। আবার এ কথাও জোর দিয়ে বলা হয় যে, ব্যক্তি নিজে থেকেই কোনো ধারণা পেতে বা সঞ্চার করতে পারে না। এ কথার তাৎপর্য হল বিষয়মুখিতা এবং নৈর্ব্যক্তিকতা। আবার, প্রারম্ভেই ব্যক্তির যে সব ধী-শক্তি (বা ধী-গুণ) থাকে, তাদের পূর্ণাঙ্গ করার মধ্যেই শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থাপিত হয় বলে, প্রকল্পটি ব্যক্তিবাদীও বটে। এই জাতীয় মূল্য বণ্টনে লকের পরবর্তী কয়েক পুরুষের লোকমতের অবস্থা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে লকের নাম উল্লিখিত না হলেও এই প্রকল্পই শিক্ষাগত ও মনস্তত্ত্বের একটা সাধারণ কথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই মত শিক্ষাবিদকে অস্পষ্ট কর্মভার দেওয়ার পরিবর্তে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মভার দিয়েছিল। এতে শিক্ষাদানের একটা কৌশল

সম্প্রসারণ করা আপেক্ষিকভাবে সহজ হয়েছিল। এখন যা কিছুর আবশ্যক তা হ'ল প্রতিটি ক্ষমতার পর্যাপ্ত ব্যবহার করা। ব্যবহার করার মধ্যে ছিল মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ও মুখস্ত করার "কাজ বার বার করা"। এইভাবে বিবিধ কার্যাবলীকে কঠিনতার মাত্রা অনুযায়ী সাজিয়ে প্রতিবারের পাঠমালার পুনরাবৃত্তিকে তার ঠিক আগের বারের পাঠমালা থেকে কঠিনতর করে শিক্ষা দেওয়ার একটি সম্পূর্ণ প্রকল্প গড়ে উঠল।

এই ধারণার তথাকথিত মৌলিক ভিত্তি এবং শিক্ষাগত প্রয়োগ, উভয়েরই, নানা রকম এবং সমান যুক্তি দেখিয়ে, সমালোচনা করা যায়। (১) সম্ভবতঃ সরাসরি আক্রমণ করা যায় এই বলে যে, পর্যবেক্ষণ, অনুস্মরণ, সঙ্কল্প, চিন্তন ইত্যাদি মৌলিক ধীশক্তি বা (ধীগুণ) অবিমিশ্র পৌরাণিক অতিকথা মাত্র। অনুশীলন বা তৎপ্রসূত শিক্ষার অপেক্ষায় বসে থাকে,—এ রকমের কোনো পূর্বপ্রস্তুত ক্ষমতা বলে কিছু নেই। সত্য বটে যে, বহু সংখ্যক মৌলিক সহজাত প্রবণতা ও সহজ প্রবৃত্তিজাত কাজের ধরন আছে, কিন্তু এ সব গুণ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের অন্তর্গত নিউরণগুলির মৌলিক যোগজালের উপর স্থাপিত। আলো অনুসরণ ও দৃষ্টিবদ্ধ করার প্রতি চক্ষুর্দ্বয়ের আবেগজাত প্রবণতা থাকে; ঘাড়ের মাংসপেশীগুলোর, আলো ও শব্দের দিকে ঘোরাবার প্রবণতা থাকে; নাগাল পাওয়া ও মুট করে ধরার প্রতি হাতের প্রবণতা থাকে,—থাকে ঘোরানো, মোচড়ানো ও পেটানোর প্রবণতা। স্বরযন্ত্রের থাকে বিভিন্ন শব্দ করার প্রবণতা। মুখ গহ্বরের প্রবণতা থাকে অপ্রীতিকর জিনিস থু-করে বের করে ফেলবার,—থাকে ঠোঁট চাপবার বা ঠোঁট বাঁকানোর প্রবণতা। এবং আরো আরো কতো কি, যার সংখ্যা প্রায় অগণিত। এ সব প্রবণতা (ক) সংখ্যায়ও অল্প নয়, আবার এর একটি থেকে আর একটিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করাও যায় না। (খ) এরা অশেষ প্রকারের এবং নানা ধরনের সূক্ষ্মসূত্রে পরস্পরের সাথে গাঁথা। মাত্র চর্চার সাহায্যে পূর্ণতালাভের প্রয়োজনে, সুপ্ত বুদ্ধিগত ক্ষমতা হওয়ার পরিবর্তে, এরা এমন ধরনের কতকগুলো প্রবণতা যা পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দিতে সমর্থ; এবং তার ফলে আরও বেশী পরিবর্তন আনতে সক্ষম। গলার মধ্যে একটা কিছু গেলে কাশি আসে। এখানে প্রবণতা আসে উত্যক্তকর টুকরোটাকে বার করে ফেলে দেবার, এবং এইভাবে পরবর্তী উদ্দীপককে

অনুরূপ করার। হাতে একটা তপ্ত জিনিস লাগলে সবেগে এবং একদম বুদ্ধি না খাটিয়েই হাতখানা চট করে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু হাত গুটিয়ে নেওয়াতে ক্রিয়াশীল উদ্দীপকগুলি বদলে যায়, এবং এরা জীবসত্তার প্রয়োজনের অনুযায়ী হতে চায়। মাধ্যমের মধ্যে সুবিশিষ্ট পরিবর্তন ঘটার প্রতি দৈহিক ক্রিয়া-কলাপের এইরূপ সুনির্দিষ্ট সাড়া দ্বারাই পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়। এরূপ নিয়ন্ত্রণের কথা পূর্বেও বলা হয়েছে (পূবে দেখুন ২২পৃঃ)। আমাদের যাবতীয় প্রাথমিক দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ এই জাতীয়। এবং মানসিক, বৌদ্ধিক এবং জ্ঞানীয় অর্থে অশেষবিধ পুনরাবৃত্তিমূলক অনুশীলনও এদের উপরে পর্যবেক্ষণ, বিচার ও ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বুদ্ধিগত গুণ প্রদান করতে পারে না।

(২) কাজেই শরীর চালনা করে কোনো কোনো মাংসপেশীকে যেভাবে বলশালী করা যায়, আমাদের মৌলিক আবেগজাত ক্রিয়া-কলাপের প্রশিক্ষণ সেভাবে অনুশীলন-লব্ধ পরিশোধন ও পূর্ণাঙ্গীকরণ নয়। বরং সময় বিশেষে যে সব ব্যাপক সাড়া আসে, তার মধ্যে যেগুলো উদ্দীপককে "কাজে লাগাতে" বিশেষ উপযোগী, তাদের বাছাই করে নেওয়াই হ'ল শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া। যেমন, আলো দ্বারা চক্ষু উদ্দীপিত হলে, শরীরের মধ্যে সাধারণ ভাবে[১] এবং হাতের মধ্যে বিশেষভাবে যে যে সহজ প্রবৃত্তিজাত প্রতিক্রিয়া ঘটে, তার মধ্যে থেকে হাত বাড়ানো, হাত মুট করা, জিনিসটা ভালো করে দেখা, এই সব বিশেষরূপে উপযোগী প্রতিক্রিয়া ছাড়া আরগুলো যদি ক্রমে ক্রমে বাদ না পড়ে, তা হলে কোনো শিক্ষাই হয় না। পূর্বেই দেখেছি যে, প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াগুলির অল্প কয়েকটি ছাড়া বাকীগুলো এতো পরিব্যাপ্ত ও সাধারণ ধরনের যে, নবজাত মানব শিশুর পক্ষে সেগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ অসম্ভব। এ জন্যেই বাছাইমূলক সাড়াও যা, শিক্ষাপ্রাপ্ত করাও তাই। (তুলনা করুন পৃঃ ৩৬)। (গ) এবং যে সাড়া আসে তার বিভিন্ন উপাদানের সুষ্ঠু সমন্বয়

১। আসলে, আন্তযোগসূত্রের এতো বেশী জোর, এবং গঠন করার এতো বেশী পথ থাকে যে, প্রতিটি উদ্দীপকই সাড়ার সকল অঙ্গাবয়বের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন আনে। আমরা অবশ্য গোটা শারীরিক ক্রিয়াশীলতার অধিকাংশ রূপান্তরকেই উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত, এবং যা সর্বাধিক সুবিশিষ্ট রূপে সময়কালীন সর্বাধিক জরুরী উদ্দীপকের উপযোগী, তার প্রতিই মনোনিবেশ করি।

করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। হাতের যে সব প্রতিক্রিয়া হাত মুট করায়, শুধু তা-ই বাছাই হয়ে আসে না; যে বিশেষ দৃষ্টি-উদ্দীপকগুলি কেবল এই সব প্রতিক্রিয়াই অহ্বান করে, এবং আর কোনো প্রতিক্রিয়া আহ্বান করে না, তারাও বাছাই হয়ে আসে, আর এই দু'দিকের বাছাই করা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করাও বাছাই হয়ে আসে। সমন্বয় বিধানের এখানেই কিন্তু শেষ নয়। জিনিসটা মুট করে ধরার পরে বিশিষ্ট ধরনের তাপ-প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। এদেরও এর মধ্যে ধরা হয়, পরে কোনো সময়ে তাপ-প্রতিক্রিয়া সরাসরি আলো-উদ্দীপকের সাথে যুক্ত হয়ে, হাতের প্রতিক্রিয়া চেপে দিয়ে, এক উজ্জ্বল অগ্নিশিখারূপে দেখা দিয়ে এক দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, এর মধ্যে আর নিবিড় স্পর্শ থাকে না। আবার এও হয় যে, শিশু ঐ জিনিসটা হাতে পেয়ে ওটা দিযে পেটায়, ওটাকে পিষে ধরে, এবং এর ফলে একটা শব্দ বেরোয়। তখন সাড়া-চক্রটির মধ্যে শ্রুতি-সাড়াটিকেও আনা হয়। অন্যে যদি শব্দ করে (প্রচলিত অর্থে) এবং তাও এই ক্রিয়াশীলতার মধ্যে থাকে, তাহলে কর্ণ এবং শ্রুতি-উদ্দীপনার সাথে যে স্বরযন্ত্র যুক্ত থাকে তাও এই জটিল সাড়া-চক্রের আনুষঙ্গিক উপাদানে পরিণত হয়।[১]

(৩) উদ্দীপক ও সাড়ার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বিধান (পারস্পরিক, কারণ কর্মপরম্পরার মধ্যে, উদ্দীপক যেমন প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিযোজিত হয়, প্রতিক্রিয়াও তেমনি উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিযোজিত হয়) যতো বেশী বৈশিষ্ট্য লাভ করে, প্রাপ্ত শিক্ষা ততোই অনমনীয় এবং সাধারণ ক্ষেত্রে কম প্রযোজ্য হয়। এই অর্থে বলা যায় যে, এ রকম শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধিগত বা শিক্ষাগত গুণ কম থাকে। এই অবস্থাকে সচরাচর এই অর্থে বর্ণনা করা হয় যে, একটি প্রতিক্রিয়া যতো বেশী বিশিষ্টতা লাভ করে এবং তাকে কাজে লাগানো, এবং পূর্ণাঙ্গ করার সময় যে দক্ষতা আয়ত্তে আসে, অন্য কাজের ক্ষেত্রে সেই দক্ষতা স্থানান্তর করার সাধ্যতা ততোই কমে যায়। বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলার গোঁড়া তত্ত্ব অনুসারে, শিক্ষার্থী, শব্দের বানান শেখার সময় বানান করার যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়াও পর্যবেক্ষণ, মনোনিবেশ ও অনু-

১। এর আগে বিভিন্ন সাড়ার ক্রমবিন্যাস সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার সাথে এই কথার তুলনা করা দরকার (পৃঃ ৩২)। উক্ত ক্রমবিন্যাস যে ভাবে ঘটে, এই কথা তারই স্পষ্টতর ব্যাখ্যা।

স্মরণের বর্ধিত ক্ষমতালাভ করে; এবং যেখানেই দরকার হয় সেখানেই সে এই ক্ষমতা খাটাতে পারে। আসলে অন্যান্য বিষয়ের যোগসূত্র খেয়ালে না রেখে, শব্দের আকৃতি দেখতে ও আঁটো করতে সে যতো বেশী নিমগ্ন থাকবে, ততোই আক্ষরিক চাক্ষুষ আকৃতি ছাড়া সে হয়ত এমন কোনো যোগ্যতা অর্জন করবে না যা আর কিছুতে খাটাতে পারে. (এখানে শব্দের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের যোগসূত্র অর্থে বুঝি শব্দের অর্থ, শব্দের অভ্যাসগত প্রয়োগের প্রসঙ্গ, শব্দরূপ. বাচনিক আকৃতির শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি)। সাধারণ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা দূরে থাক. জ্যামিতিক আকৃতিগুলির নিখুঁত পার্থক্য করার ক্ষমতাও তাঁর না বাড়তে পারে। অক্ষরগুলির আকৃতি যে উদ্দীপক যোগায়, আর মৌখিক বা লিখিত পুনরুক্তি যে ক্রিয়াবাহী আঙ্গিক প্রতিক্রিয়া আনে, সে কেবল সেগুলোকেই বাছাই করে নিচ্ছে। এখানে সহযোজনের ক্ষেত্র আত্যন্তিকভাবে সীমিত। শিক্ষার্থী যখন কেবল অক্ষর ও শব্দের আকৃতি নিয়ে মাথা ঘামায়, তখন অন্যান্য পর্যবেক্ষণ. অনুস্মরণ (বা পুনরাবৃত্তি) কল্পে যে সব যোগসূত্র খাটানো হয়েছে, তা ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হয়। এই বাদ পড়ার জন্য, কাজের সময় ওগুলোকে আবার জোড়া যায় না। আক্ষরিক আকৃতি পর্যবেক্ষণ ও মনে আনার যে যোগ্যতা লাভ করা হয়, তা অন্য জিনিসকে উপলব্ধি করার বা মনে আনার কাজে লাগে না। সাধারণ কথায়, এহেন যোগ্যতা স্থানান্তরণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রসঙ্গ যতো প্রশস্ত হয়,—অর্থাৎ যখন সহযোজিত উদ্দীপক ও সাড়া অধিকতর বিচিত্র ধরনের হয়, অন্যান্য কাজের সফল সম্পাদনের জন্য এই অর্জিত যোগ্যতাও ততো বেশী প্রাপ্তিযোগ্য হয়। সঠিকভাবে বললে বোঝা যাবে যে, এর কারণ যোগ্যতার "স্থানান্তরণ নয়" . কারণ হল, সুবিশিষ্ট কাজটিতে যে দূরপাল্লার উপকরণ নিয়োগ করা হয়, তা কোনো সঙ্কীর্ণ ও অনমনীয় এলাকায় সহ-যোজন হওয়ার পরিবর্তে, একটি বিস্তীর্ণ পাল্লার ক্রিয়াশীলতার সমতুল্য হয়ে ওঠে।

(৪) গোড়ার কথা এই যে, এই তত্ত্বের হেত্বাভাস হ'ল এর দ্বৈতবাদ . অর্থাৎ বিষয়বস্তু থেকে ক্রিয়া-কলাপ ও সামর্থ্যের বিচ্ছেদ। দেখবার, শোনবার বা মনে রাখবার সাধারণ সামর্থ্য বলে কিছু নেই। মাত্র "কোনো কিছু" দেখবার, শুনবার বা মনে রাখবার সামর্থ্যই আছে। ক্ষমতার অনুশীলনের

মধ্যে যে বিষয়বস্তু থাকে, তা বাদ দিয়ে মানসিক বা দৈহিক ক্ষমতাকে সুশিক্ষিত করার কথা অর্থহীন। শারীরিক অনুশীলন, রক্তপ্রবাহ, শ্বাস প্রশ্বাস ও পুষ্টির উপরে ক্রিয়া করে তেজ বা শক্তির বিকাশ সাধন করতে পারে। কিন্তু এই পুঁজি সুবিশিষ্ট উদ্দেশ্যের স্বার্থে তখনই খাটে, যখন যে সব বৈষায়ক উপায় অবলম্বন করে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাদের যোগসূত্রে শক্তি খাটানো হয়। দুর্বল হলে যা পারা যায়, শারীরিক শক্তি থাকলে একজন তার চেয়ে বেশী করে টেনিস্ বা গল্‌ফ্ খেলতে বা নৌকা বাইতে সমর্থ হয়। কিন্তু মাত্র টেনিসের র‍্যাকেট ও বল, গল্‌ফের ডাণ্ডা ও গুলি, এবং নৌকার পাল ও হাল সুনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করেই ব্যক্তি এগুলির কোনো একটাতে বিশেষজ্ঞ হয়। এবং এদের একটির অভিজ্ঞতা মাংসপেশী সমূহের সূক্ষ্ম সহযোজনের উপযোগিতাকে যে পরিমাণে চিহ্নিত করে, কিম্বা এদের সব কটির মধ্যেই এক প্রকারের সহযোজন যে পরিমাণে থাকে, তারা সেই পরিমাণেই এদের অন্য একটিতে বিশেষজ্ঞতা আনতে পারে। অধিকন্তু, চাক্ষুষ আকারগত সঙ্কীর্ণ প্রসঙ্গে বানানে যোগ্যতা লাভের কালে যে শিক্ষা আসে, আর ক্রিয়া-কলাপের যোগসূত্রে (যেমন প্রসঙ্গ, শব্দ-পরম্পরা ইত্যাদি) অর্থোপলব্ধির মাধ্যমে যে শিক্ষা আসে,—এ দুয়ের পার্থক্যকে কোনো কোনো মাংসপেশীর উন্নতি কল্পে ব্যায়ামাগারে কপি-কলে ওজন করা ও খেলাধুলার ভিতর দিয়ে করা,—এই দুই জাতীয় পার্থক্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রথমটি এক ধরনের বা একঘেয়ে ধরনের যান্ত্রিক এবং অমননীয় রূপে বৈশিষ্ট্যান্বিত। শেষেরটি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনীয়, এর মধ্যে কোনো দুটো কাজই পুরাপুরি এক ধরনের নয়, অভিনব সঙ্কটাবস্থাকে সামলাতে হয়, যে সব সহযোজন গঠিত হয় তাদিকে নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক রাখতে হয়। কাজেই শিক্ষা অনেক বেশী "সাধারণ" ধরনের হয়; অর্থাৎ এর এলাকা বিস্তীর্ণ এবং এর মধ্যে অধিক সংখ্যক উপকরণ থাকে। মনের বিশিষ্ট শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাই খাটে।

একঘেয়ে এক ধরনের কোনো অনুশীলন, অভ্যস্তির ফলে কোনো বিশিষ্ট কাজে ক্রিয়া-কৌশল আনতে পারে। কিন্তু এই ক্রিয়া-কৌশল মাত্র একটি কাজের মধ্যেই সীমিত থাকে,—তা সে বুক-কিপিং, লগারিদম্ বা হাইড্রোকার-বণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা,—যাই হোক না কেন। একজনে একটি ক্ষেত্রে প্রাধিকারী

হতে পারেন, কিন্তু এর সাথে যার নিকট মিল নেই, সে সম্বন্ধে তিনি অসাধারণ স্বল্প বিচার-সম্পন্নও হতে পারেন,—অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রের শিক্ষাটা যদি অন্যান্য ক্ষেত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে বিভাজিত হবার রূপ না নিয়ে থাকে।

(৫) কাজেই পর্যবেক্ষণ, অনুস্মরণ, বিচার, কমনীয় রুচি এবং অনুরূপ ক্ষমতা, কতিপয় বিষয়বস্তুর সহিত সহজাত সক্রিয় প্রবণতাগুলোর নিযুক্ত থাকার সংগঠিত ফল স্বরূপ। বোতাম টিপে পর্যবেক্ষণ শক্তিকে চালু করে, বা, পর্যবেক্ষণের সঙ্কল্প করে কেউ নিবিড় ভাবে ও সম্পূর্ণ ভাবে পর্যবেক্ষণ করে না। কিন্তু তার যদি এমন কিছু করার থাকে, যেটি কেবল চক্ষু ও হাতের সূক্ষ্ম ও ব্যাপক প্রয়োগ দ্বারাই সাফল্যমণ্ডিত হয়, তা হলে সে স্বভাবতঃই পর্যবেক্ষণ করে। পর্যবেক্ষণ হ'ল ইন্দ্রিয় ও বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জাত বাহ্য ফল, একটা পরিণাম। কাজেই প্রযুক্ত বিষয়বস্তু অনুসারে পর্যবেক্ষণের ধরনও বদলায়।

সুতরাং শিক্ষার্থীকে কি জাতীয় বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ ও অনুস্মরণে বিশেষজ্ঞ করব, এবং কি উদ্দেশ্যে তা করব, তা যদি পূর্বেই স্থির করা না হয়, তা হলে, বলতে কি, স্মৃতি, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি মনোবৃত্তির দূরবর্তী বিকাশের ব্যবস্থাও পণ্ড হয়ে যায়। পূর্বেই যা বলা হয়েছে, অন্যভাবে তারই পুনরুক্তি করে বলা যেতে পারে যে, বিষয়বস্তু বিচারের মানদণ্ড হবে সমাজধর্মী, আমরা ব্যক্তিবিশেষকে সেই সব জিনিসই দেখতে, মনে আনতে ও বিচার করতে বলি, যা তাকে, সে যে সমষ্টির অন্তর্গত তারই একজন যোগ্য সভ্য করে তুলবে। অন্যথায় শিক্ষার্থীকে দেয়ালের উপরের ফাটলগুলো পর্যবেক্ষণ করতে, অথবা একটা অজানা ভাষায় শব্দতালিকা মুখস্থ করতে বললেই কাজ চুকে যায়। আসলে যখন বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলাতত্ত্ব স্বীকার করে নিই তখন কার্যতঃ আমরা এই রকমের একটা কিছুই করি। একজন উদ্‌ভিদবিদ্, রসায়নবিদ্ বা যন্ত্রবিদের পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাস এই জাতীয় অভ্যাস থেকে এই কারণে শ্রেষ্ঠতর যে, তাঁরা এমন সব বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করেন, যেগুলো জীবনের পক্ষে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ।

এই আলোচনা শেষে আমাদের বক্তব্য হল এই যে, বিশিষ্ট ও সাধারণ শিক্ষার পার্থক্যের সাথে বৃত্তি ও ক্ষমতার স্থানান্তরণের কোনো সম্পর্ক নেই। আক্ষরিক অর্থে, যে কোনো স্থানান্তরণই অলৌকিক ও অসম্ভব। কিন্তু কোনো

কোনো ক্রিয়া-কলাপ এমন ব্যাপক ধরনের যে, সেগুলোর মধ্যে নানা উপাদানের সমন্বয়করণ থাকে। সে ধরনের কাজের উন্নতি অবিরাম পরিবর্তন ও পুনঃ সমন্বয় চায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো উপাদান তলিয়ে যায়; আবার গুরুত্বহীন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই ভাবে কর্ম-কেন্দ্রের অবিরাম পুনর্বণ্টন হতে থাকে। কর্ম-কেন্দ্রের এই যে পুনর্বণ্টন সেটি স্বতঃস্ফূর্ত খেলা ও একটি নির্দিষ্ট ওজনের বস্তুকে বার বার একঘেয়ে গতিশক্তি দিয়ে টান মারার পার্থক্য দিয়ে ইতিপূর্বে দেখান হয়েছে। এই ভাবে বিষয়বস্তুর মধ্যে পরিবর্তনের সম্মুখীন হবার জন্য কর্মকেন্দ্র সরে যাবার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ নতুন করে সংযোজন করার চেষ্টা আসে। যখনই কোনো কাজের পাল্লা প্রশস্ত (অর্থাৎ যখন বহুবিধ কর্মাংশের সহযোজন করার প্রয়োজন হয়) এবং তার ক্রম-বিকাশের জন্য অবিরত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে কাজের ধারা বদলাতে বাধ্য হতে হয়, তখনই সাধারণ-শিক্ষা পরিণতি হিসাবে দেখা দেবে। কারণ সাধারণ শব্দের অর্থ হল,—ব্যাপক ও নমনীয়। কার্যতঃ, শিক্ষা যে পরিমাণে নানাবিধ সামাজিক সংশ্লিষ্টতাকে হিসাবের খাতায় জমা রাখে, শিক্ষা সেই পরিমাণেই এই সব শর্তকে পূরণ করে, এবং "সাধারণ" আখ্যা পায়। একজন লোক কারিগরি দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, গণিত, যন্ত্রবিদ্যা বা অর্থশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু তার বাইরে যে কাজ রয়েছে, তার বিচারে সে অকর্মণ্য ও অবিবেচক হতে পারে। কিন্তু যদি এই কারিগরি বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগের সঙ্গে সামাজিকরূপে —প্রশস্ত মানবিক ক্রিয়াকলাপের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, তা হলে যে সব সক্রিয় সাড়া আসে এবং নমনীয়তার সহিত একীভূত হয়, তার পাল্লা বিস্তৃত হয়। প্রচলিত শিক্ষাবৃত্তিতে বিষয়বস্তু থেকে সামাজিক প্রসঙ্গের বিচ্ছেদই মনের সাধারণ-শিক্ষালাভের প্রধান অন্তরায়। সাহিত্য, কলা, ও ধর্মকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন রাখলে কারিগরি বিষয়ের মতোই তা সঙ্কীর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ সাধারণ শিক্ষার তথাকথিত পেশাদারী সমর্থকগণ এরই তীব্র বিরোধিতা করে থাকেন।

সারাংশ।

যে কয়েকটি ধারণা শিক্ষাবৃত্তিকে প্রভাবিত করেছে তার বিপরীত ভাবাপন্ন ধারণা হ'ল এই যে, আরও বেশী শিক্ষার সামর্থ্য লাভ করাই হল শিক্ষা-প্রণালীর ফল। প্রথমে যে ধারণাটি বিবেচিত হয়েছে, তা হ'ল ভবিষ্যৎ কর্তব্য বা সুবিধার জন্য তৈরী বা প্রস্তুত হওয়া। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের যে সব কুফল দেখানো হয়েছে, তা হল এই যে,—যেদিকে সফলতার সহিত পরিচালিত করা যায়, অর্থাৎ যা করে অব্যবহিত বর্তমানের অভাব ও সম্ভাবনাদির সুবিধা নেওয়া যায়,—শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মনোযোগ সে দিকে না গিয়ে অন্য পথ ধরে। কাজেই এই তত্ত্ব তার নিজের স্বীকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে। ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে ধারণাটি তুলে ধরা হয়েছে তার সঙ্গে এই মতের বেশী মিল রয়েছে বলে মনে হয় যে, শিক্ষা হ'ল ভিতর থেকে বাহিরে আত্মপ্রকাশ। কিন্তু ফ্রয়েবেল ও হেগেলের তত্ত্বাবলীর মধ্যে এই মত যে ভাবে খাটানো হয়েছে তাতে এর মধ্যে উপস্থিত জৈব প্রবণতাগুলির সাথে উপস্থিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে প্রস্তুতি-সম্বলিত মতের মতোই উপেক্ষা করা হয়েছে। এগুলিতে একটা কিছু পূর্বপ্রস্তুত অন্তর্নিহিত পূর্ণতা মেনে নেওয়া হয়েছে, এবং ক্রম-বিকাশের সার্থকতা শুধুই সাময়িক; এটি নিজে নিজেরই উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু যা অন্তর্নিহিত রয়েছে তারই প্রকাশের একটা উপায়। যেহেতু অপ্রত্যক্ষের কোনো সুনিশ্চিত সদ্ব্যবহার করা যায় না সেই হেতু এর উপস্থাপনার জন্য কোনো একটা অবলম্বন চাই। যে স্বয়ম্ভূ পূর্ণতা প্রকাশমান, তার স্থানে ফ্রয়েবেল ধরে নিয়েছেন কোনো কোনো বস্তুর ও কর্মের অতীন্দ্রিয় প্রতীকমূলক মূল্যবোধ (প্রধানতঃ গাণিতিক)। হেগেলের মতে উপস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলোই হ'ল এই পূর্ণতার আসল কার্যোপযোগী নিদর্শন। প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানের উপর জোর দিলে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অভিজ্ঞতাকে অর্থ-সমৃদ্ধ ও সরাসরি বিকশিত না করে অন্য পথ ধরে। অন্য একটি প্রভাবশালী, অথচ ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্ব এই যে, জন্মকালে মনের কতকগুলি ধী-শক্তি বা ক্ষমতা থাকে। যেমন ইন্দ্রিয়োপলব্ধি, স্মরণ, ইচ্ছাশক্তি, বিচার, সূত্রায়ন, মনোযোগ ইত্যাদি। শিক্ষা হ'ল পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মাধ্যমে এই ধীশক্তিগুলির প্রশিক্ষণ। এই তত্ত্ব

বিষয়বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বাহ্য ও খেলো মনে করে ; মনে করে যে, সাধারণ ক্ষমতাগুলোর অনুশীলনের ব্যাপারেই এদের মূল্য থাকতে পারে। আরোপিত ক্ষমতাগুলিকে এই ভাবে একটার থেকে আর একটাকে, এবং যে বিষয়বস্তুর উপরে শক্তি খাটানো হয়, তার থেকে, পৃথক পৃথক রাখার সমালোচনাও করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, কার্যক্ষেত্রে এর ফলাফল দাঁড়ায় উদ্‌যোগ, উদ্ভাবন-কৌশল ও পুনরভিযোজন শক্তির বিনিময়ে সঙ্কীর্ণ কারিগরি দক্ষতার আতিশয্য। অথচ সুবিশিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যাপক পারস্পরিক ক্রিয়ার উপরেই এই সব গুণ নির্ভরশীল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষার সংরক্ষণ ও প্রগতিশীল রূপ

১। গঠন রূপে শিক্ষা

এখন আমরা এমন এক ধরনের তত্ত্বের আলোচনায় আসছি, যেটি ধী শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করে মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতির বিকাশে বিষয়-বস্তুর অনন্যসাধারণ ভূমিকার ওপরে গুরুত্ব দেয়। এই তত্ত্ব অনুসারে, শিক্ষা অন্তর থেকে বহির্বিকাশ ক্রিয়া-প্রণালীও নয়, আবার অন্তর্বাসী ধী-শক্তির প্রশিক্ষণও নয়। বরং শিক্ষা হল, বাহির থেকে উপস্থাপিত বিষয়-বস্তুর মাধ্যমে কতিপয় অনুষঙ্গের বা আধেয়ের যোগসূত্র স্থাপন করে মন গঠন করা। সঠিক-ভাবে ও আক্ষরিক অর্থে বললে বলতে হয় যে, নির্দেশ দ্বারা বাহির থেকে মনের মধ্যে নির্মাণ কার্য চলে এবং তার ফলে শিক্ষা চলতে থাকে। শিক্ষা যে মনের গঠনমূলক কাজ সে কথা প্রশ্নাতীত। পূর্বেই এ ধারণা বিশদীকৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে গঠনের একটা কারিগরি অর্থ আছে। সে অর্থ, "বাহির থেকে" একটা কিছু কাজ করে,—এমন একটা ধারণার ওপরে নির্ভরশীল।

এই তত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রতিনিধি হলেন, হারবার্ট। তিনি অন্তর্নিহিত ধী-শক্তি নিচয়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করেন। যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির বাস্তবতা মনের ওপরে ক্রিয়া করে, তাদের ওপরে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে, নানাবিধ গুণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা দ্বারাই মন অলঙ্কৃত। বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট এই সকল প্রতিক্রিয়াই হল উপস্থাপন। প্রতিটি উপস্থাপন একবার ঘটলেই অবিচলিত ভাবে থেকে যায়। একটি নতুন জিনিসের প্রতি আত্মার প্রতিক্রিয়ার ফলে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী উপস্থাপন সৃষ্টি হলে, আগেকার উপস্থাপন চেতনার গভীরে বিতাড়িত হতে পারে। কিন্তু সেই বিতাড়িত উপস্থাপনের নিজের গুণগত গতিশক্তি দ্বারা এর ক্রিয়া চেতনার তলদেশে চলতে থাকে। ধী-শক্তি বলতে যা বোঝায় যেমন, মনোনিবেশ, অনুস্মরণ, চিন্তন, উপলব্ধি, এমন কি, ভাবপ্রবণতাও, তা হল এই সব

নিমজ্জিত উপস্থাপনের একটির সঙ্গে আর একটির, এবং এদের সঙ্গে নতুন উপস্থাপনের, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজনিত ব্যবস্থা, অনুষঙ্গ ও জটিলতার উদ্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে নতুন উপস্থাপনাদিকে সংবর্ধনা জানাতে এবং এদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য, পুরাতন উপস্থাপনাদি জাগরিত হয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি করে, তা-ই উপলব্ধি, যখন অন্য একটি উপস্থাপনের সঙ্গে জড়িত হয়ে একটি পুরাতন উপস্থাপন চেতনার গভীর থেকে উপরিভাগে আহৃত হয়, তখন তার নাম দিই স্মৃতি। উপস্থাপনগুলোর স্বাধীন ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে সংযোজন বলবৎ হওয়ার ফল হল সুখ, এবং তার বৈপরীত্য ঘটলে আসে দুঃখ।

কাজেই পৃথক পৃথক গুণবিশিষ্ট নানাবিধ উপস্থাপন দিয়ে গঠিত নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়েই মনের মূর্ত চরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত। মনের "সাজ-সরঞ্জাম" নিয়েই মন। মন সম্পূর্ণরূপেই আধেয়ের বিষয়। এই মতবাদের শিক্ষাসংক্রান্ত তাৎপর্য ত্রিবিধ। (১) বিবিধ বস্তু ব্যবহার করার ফলে যে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া আহৃত হয়, এবং আগত প্রতিক্রিয়াদির মধ্যে যে যে ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়, সেই সব নিয়েই ভিন্ন ভিন্ন রকমের মন গঠিত হয়। মনের গঠন সম্পূর্ণ-রূপেই যথোপযুক্ত শিক্ষামূলক দ্রব্যাদির উপস্থাপনের ব্যাপার। (২) যে-হেতু প্রাথমিক উপস্থাপনগুলোই "সম্বোধির অঙ্গাবয়ব," সেইহেতু প্রাথমিক উপস্থাপনগুলোই সবতোভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নতুন উপস্থাপনগুলোর ফল হ'ল, পূর্বগঠিত দলগত বিভাজনকে বলবৎ করা। শিক্ষাবিদের প্রথম কাজ হ'ল, মৌলিক প্রতিক্রিয়াগুলোর ধরন স্থায়ী করার জন্য উপযুক্ত জিনিসপত্রের নির্বাচন। এবং দ্বিতীয় কাজ হ'ল, পূর্বের প্রতিক্রিয়ার ফলে যে সমস্ত ধারণা আয়ত্তে এসেছে তার ভিত্তিতে পরবর্তী উপস্থাপনগুলোর ক্রম ঠিক করা। এ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ হ'ল পিছন থেকে, অতীত থেকে,—বহির্বিকাশ ধারণার মতন চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তুর দিকে নয়। (৩) সকল শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেই কয়েকটি নিয়মিত ও বিধিসম্মত স্তর স্থাপন করা যেতে পারে। স্পষ্টতঃই নতুন বিষয়-বস্তুর উপস্থাপনাই হ'ল কেন্দ্রগত বিষয়, কিন্তু যেহেতু চেতনার গভীরে নিমজ্জিত আধেয়ের সঙ্গে বিষয়বস্তুর প্রতিক্রিয়ার ধরন নিয়েই অবগতি, সেইহেতু, প্রথম কথা হ'ল "প্রস্তুতির" ধাপ, অর্থাৎ যে সব পুরাতন উপস্থাপন নতুন উপস্থাপনকে অঙ্গীভূত করবে, তাদের বিশিষ্ট ক্রিয়াকে আহ্বান করা,

এবং চেতনার উপরিভাগে আনা। এর পরে আসে নতুন ও পুরাতন উপস্থাপনের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রণালী। তারও পরে আসে, কোনো কর্মভার সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই নব গঠিত আধেয়কে প্রয়োগ করা। সব কিছুকেই এই ধারার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ; কাজেই সকল বয়সের সকল বিদ্যার্থীকে সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে এক রকমের একটি পদ্ধতিই থাকে।

শিক্ষণ কার্যকে রুটিন ও দৈবের হাত থেকে এই যে নিষ্কৃতি, সেটিই হল হাববার্টের মহৎ অবদান। তিনি শিক্ষাদানকে একটা সংজ্ঞাত পদ্ধতির মধ্যে এনেছেন। আকস্মিক প্রেরণা ও তথাকথিত লোকপরম্পরাগত প্রথার দাস না হয়ে, শিক্ষাকার্য এখন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পদ্ধতি সহ সংজ্ঞাত কর্মে পরিণত হ'ল। অধিকন্তু, চূড়ান্ত আদর্শ ও দূরকল্পী আধ্যাত্মিক প্রতীক সম্বন্ধীয় অস্পষ্ট ও অল্পবিস্তর রহস্যাবৃত সাধারণ সিদ্ধান্তে আত্মতুষ্টি লাভ না করে এখন থেকে আমরা শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলার সব কিছুকেই সুচিহ্নিত করে দেখতে লাগলাম। যে সব ধী-শক্তিকে যে-কোনো একটা জিনিসের উপর চর্চা করিয়ে প্রশিক্ষিত করা যায় বলে মনে করা হতো, হারবার্ট সে সব ধারণা রদ করলেন এবং মূর্ত নানা বিষয়-বস্তুর প্রতি, জ্ঞানের আধেয়ের প্রতি, মনোনিবেশকে সর্বতোভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুললেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তু সংক্রান্ত প্রশ্নাদিকে সর্বাগ্রে স্থাপন করার কাজে অপর যে কোনো শিক্ষাদর্শনবিদ থেকে হারবার্টের প্রভাব বেশী। তিনি পদ্ধতির সমস্যাগুলোকে বিষয়-বস্তুর সঙ্গে যোগসূত্রের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, যে ধরন ও ক্রম অনুসারে বিষয়-বস্তু উপস্থাপিত করলে পূর্বতন উপস্থাপনের সঙ্গে উপযুক্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুনিশ্চিত হতে পারে, তার সাথেই পদ্ধতির যোগ থাকবে।

কিন্তু এই মতের মূল তাত্ত্বিক ত্রুটি হল, জীবসত্তার যে-সব সক্রিয় ও সুবিশিষ্ট কর্মবৃত্তি পরিবেশের সঙ্গে নিযুক্ত থাকার কালে পুনর্নির্দেশিত ও সংযোজিত হয়ে বিকাশ লাভ করে, তাদের অস্তিত্ব উপেক্ষা করা। এই তত্ত্বটি শিক্ষকের আত্মোপলব্ধির প্রতীক। এটাই এর সবলতা ও দুর্বলতা যুগপৎ প্রকাশ করে থাকে। যা শেখানো হয়েছে, তা নিয়েই মন, এবং যা শেখানো হয়েছে তার গুরুত্ব থাকে আরও শেখাবার জন্য তার সাহায্য

পাওয়া,—এই ধারণাটা পেশাদারী শিক্ষাবিদের জীবন-দর্শন প্রতিফলিত করে। শিক্ষার্থীদের শেখাবার ব্যাপারে শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে সে দর্শন মুখর হলেও, শিক্ষকের শেখবার সুবিধা সম্বন্ধে সে প্রায় নীরব। এতে মনের উপরে বুদ্ধিগত পরিবেশের প্রভাবের প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং পরিবেশের মধ্যে যে সর্বজনীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তিগত অংশীদারিত্ব থাকে, তার প্রতি কটাক্ষ থাকে। এ দর্শনে সংজ্ঞাতরূপে সূত্রবদ্ধ ও ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর সম্ভাব্যতা অযৌক্তিকভাবে অতিরঞ্জিত হয়, এবং প্রাণবন্ত নির্জ্ঞাত মনোভাবগুলোর ভূমিকার মূল্যায়ন কমে যায়। এই দর্শন পুরাতন ও অতীতের প্রতি অবিরত জোর দেয়, যথার্থ অভিনব ও অদৃষ্টপূর্ব ক্রিয়া-প্রণালীকে হেলায় কাটিয়ে যায়। সংক্ষেপে, হারবার্টের দর্শন শিক্ষা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারকে হিসাবে ধরলেও, তার অন্তঃসার বাদ দিয়ে চলে, —প্রাণবন্ত তেজোরাশির কার্যকর অনুশীলনের সুযোগ সন্ধান করাই শিক্ষার মূলমন্ত্র। সকল শিক্ষাই মানসিক ও নৈতিক চরিত্র গঠন করে। কিন্তু এই চরিত্র গঠনের মধ্যে প্রকৃতিগত ক্রিয়া-কলাপের নির্বাচন ও সহযোজন এমনভাবে করা থাকে যে, তাতে এই সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ সামাজিক পরিবেশ-উপযোগী বিষয়-বস্তুর সদ্ব্যবহার করতে পারে। অধিকন্তু গঠন কেবল প্রকৃতিগত ক্রিয়া-কলাপের গঠনই নয়, পরন্তু ক্রিয়া-কলাপের “মধ্যে দিয়ে”ই গঠন চলে। গঠন হ'ল, পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের ক্রিয়া-প্রণালী।

২। শিক্ষার পুনরাবৃত্ত ও অতীতানুসন্ধানী রূপ।

বিকাশ এবং বাহির থেকে গঠন,—এই দুই ধারণার এক বিচিত্র সমাবেশে জৈব এবং সাংস্কৃতিক উভয়বিধ প্রসঙ্গেই শিক্ষা সম্বন্ধে এক পুনরাবৃত্ত তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। ব্যক্তি বিকাশ লাভ করে, কিন্তু তার সমুচিত বিকাশের মধ্যে থাকে প্রাণীজীবনের ও মানব ইতিহাসের অতীত অভিব্যক্তির সুবিন্যস্ত স্তরগুলির পুনরাবৃত্তি। প্রথমোক্ত পুনরাবর্তন ঘটে শরীরতত্ত্ব অনুযায়ী, আর শেষোক্তটি ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। জীববিদ্যা বলে, পত্তন থেকে পরিণতি অবধি ক্রমবৃদ্ধির পথে ভ্রূণ সহজতম থেকে জটিলতম অগ্রগতি লাভ করার কালে প্রাণীজীবনের অভিব্যক্তি-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে (অথবা কারিগরি

ভাষায় বললে,—জীবজনি জাতিজনির সমান্তরাল পথে চলে)। এ কথা আমাদের আলোচ্য নয়। তা হলেও ধরে নেয়া হয় যে, এই তথ্যটা অতীতের সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যোগায়। এখন আমরা কেবল এর এই দিকটাই বিবেচনা করব। কৃষ্টিগত পুনরাবৃত্তির প্রথম কথা এই যে, শিশুরা কোনো একটা বয়সে, আদি বন্য লোকের মানসিক ও নৈতিক অবস্থায় থাকে, তাদের সহজ প্রবৃত্তিগুলো ভবঘুরের মতো অস্থির ও লুণ্ঠন প্রয়াসী, কারণ, তাদের পূর্বপুরুষেরা এককালে ঐ রকমের জীবন যাপন করত কাজেই সিদ্ধান্ত করা হয় যে ঐ সময়টাতে শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষার বস্তু হল, সেই সব জিনিস যা ঐ স্তরের মানুষেরা এককালে সৃষ্টি করেছিল, বিশেষ করে অতিকথা, রূপকথা, গান ইত্যাদি সাহিত্যিক সৃষ্টি। এর পরে শিশুশিক্ষা চলবে আর এক স্তরের বিষয় বস্তুতে, যেমন, গো-মেষপালকের ও চারণ ভূমির যুগের সম-স্তরে, এবং যে পর্যন্ত না তারা সমসাময়িক জীবন ধারায় অংশ গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়, এবং বর্তমান সংস্কৃতির যুগে উপস্থিত হয়, সে পর্যন্ত এই ভাবে স্তরে স্তরে তাদের শিক্ষা চলতে থাকবে।

এই তত্ত্ব এরূপ বিশদ ও সুসঙ্গত আকারে জার্মানীর অল্প সংখ্যক মতবাদীদের ছাড়িয়ে অল্প স্থানেই প্রচলিত হয়েছিল,—এঁরা প্রধানতঃ হারবার্টের অনুগামী। কিন্তু এর মূলে যে ধারণা রয়েছে তা হল,—শিক্ষা মূলতঃ অতীতানুসন্ধানী, শিক্ষা সাধারণতঃ অতীতের দিকে, বিশেষ করে, অতীতের সাহিত্য সৃষ্টির দিকে তাকায়। এবং এই যে মন, তাকে যে মাত্রায় অতীতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার আদর্শে গঠিত করা সম্ভব হয়, সে সেই মাত্রাতেই পর্যাপ্তরূপে গঠিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে, এই ধারণার এত প্রচণ্ড প্রভাব ছিল যে, এর চূড়ান্ত সূত্রবদ্ধ রূপটি পরীক্ষা করে দেখবার যোগ্য।

প্রথমতঃ এর জৈবিক ভিত্তি বিভ্রান্তিকর। মানবশিশুর ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির মধ্যে নিঃসন্দেহে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের কোনো কোনো লক্ষণ বজায় থাকে। কিন্তু কোনো অর্থেই, এটি পূর্ববর্তী স্তরগুলোর যথার্থ পরিক্রমা নয়। যদি পুনরাবৃত্তের কোনো বাঁধা “নিয়ম” থাকতো, তা হলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কোনো কালেই বিকাশ সাধিত হতো না। প্রতিটি নতুন বংশাবলী

কেবল তাদের পূর্বপুরুষদের অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তিই করত। সংক্ষেপে, পূর্বতন-বৃদ্ধি প্রকল্পের মধ্যে সহজতর পথ ও ব্যতিক্রম ঢুকেই বিকাশ সাধিত হয়েছে। এবং এটি এই ইঙ্গিতবাহী যে, শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল ঐ প্রকারের সহজতর পথে বিকাশকে সুগম করা। শিক্ষার ভাষায়, অপরিণত অবস্থার বিপুল সুবিধা এই যে তাতে পরিত্যক্ত অতীতে পুনরায় বাস করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা শিশুদের মুক্ত করতে সক্ষম হই। শিক্ষার কাজ হ'ল, অতীতের পুনরাবৃত্তির মধ্যে শিশুদিকে পরিচালিত না করে, বরং অতীতের পুনরুজ্জীবন ও অতীতে পরিভ্রমণ থেকে তাদের মুক্ত করা। সভ্য জগতের মানুষের উপস্থিতি এবং তাদের চিন্তাধারা ও অনুভূতিগত অভ্যাসের প্রক্রিয়া দিয়েই ছোটদের পরিবেশ সংগঠিত। ছোটদের উপরে বর্তমান পরিবেশের নির্দেশকারী প্রভাব উপেক্ষা করার অর্থ দাঁড়ায় শিক্ষার স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করা। একজন জীবতত্ত্ববিদ বলেছেন, "বিভিন্ন প্রাণীর ক্রমোন্নতির ইতিহাস আমাদিকে একটি ধারাবাহিক, অভিনব, দৃঢ়সংকল্পিত, নানামুখী, কিন্তু কম-বেশী অকৃতকার্য প্রচেষ্টা দেখিয়ে দেয়। এই প্রচেষ্টা চলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তি পাবার এবং পুরুষানুক্রমিক পদ্ধতির স্থানে একটা অধিকতর প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্যে···।" যদি শিক্ষা ইচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে, সংজ্ঞাত অভিজ্ঞতা দ্বারা অনুরূপ প্রচেষ্টাকে সুগম করতে এমনভাবে চেষ্টা না করে, যাতে ঐ প্রচেষ্টা ক্রমাগত অধিকতর কৃতকার্যতা লাভ করতে সমর্থ হয়, তা হলে সেটাই নিঃসংশয়ে নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে।

উক্ত ধারণায় দুটি সত্য উপাদান ভ্রান্ত প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িত হয়ে বিকৃত হলেও, সে দুটিকে উদ্ধার করা যায়। জীবতত্ত্বের দিক থেকে দেখা যায় যে, যে কোনো নবজাত শিশুই নানা রকমের আবেগজনিত ক্রিয়াকলাপ নিয়ে জীবন আরম্ভ করে। এ সব ক্রিয়া-কলাপ অন্ধ প্রকৃতির এবং এদের অনেক-গুলোই পরস্পরবিরোধী, ক্ষণস্থায়ী, বিক্ষিপ্ত এবং অব্যবহিত পরিবেশের সঙ্গে অনভিযোজিত। আরও একটা কথা এই যে, ভবিষ্যতের সহায়ক হিসাবে যতোটা প্রয়োজন, অতীত ইতিহাসের সৃষ্টি ততোটা কাজে লাগানোই প্রজ্ঞার কাজ। যেহেতু ঐ সব সৃষ্টি পূর্বতন অভিজ্ঞতার ফলাফলের প্রতিরূপ, সেইহেতু ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার জন্য ওদের মূল্য অবশ্যই অনির্দিষ্টরূপে গুরুত্ব-পূর্ণ হতে পারে। অতীতে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, এখনকার মানুষের হাতে

তার যতটুকু আছে, এবং এর যতটুকু এখনকার মানুষে কাজে লাগায়, তা বর্তমান পরিবেশেরই একটা অংশ. কিন্তু "বর্তমান" সঙ্গতিরূপে ওর সুযোগ নেওয়ার এবং ওর ভূতাপেক্ষরূপকে মানদণ্ড ও নমুনা হিসাবে গণ্য করার মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

১। প্রথমটার বিকৃতি আসে প্রধানতঃ বংশগতি ধারণার অপব্যবহারের ফলে। বংশগতির এই অর্থ ধরে নেয়া হয় যে, অতীত জীবন যেন এ কালের লোকের প্রধান লক্ষণগুলো আগেই ঠিক করে দিয়েছে। এবং সেগুলো এতো অনড় যে, তার মধ্যে কোনো গুরুতর পরিবর্তন আনা সম্ভবই নয়। এভাবে ধরলে বংশগতির প্রভাব বর্তমান পরিবেশ-প্রভাবের বিরোধী হয় এবং এতে বর্তমান পরিবেশের উপযোগিতাও ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে বংশগতি অর্থে ব্যক্তির আদি গুণরাশিই বোঝায়,—তার থেকে কিছু কমও নয়, বেশীও নয়। সত্তা যেমনটি আছে শিক্ষারম্ভে তাকে ঠিক সেই অবস্থাতেই ধরে নিতে হবে। তার যে অমুক অমুক সহজাত ক্রিয়া-কলাপের সাজ সরঞ্জাম আছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কথাটিই ধ্রুব সত্য। সে সব সরঞ্জাম যে অমুক অমুক ধরনে তৈরী হয়েছে, বা তার বংশগতি থেকে এসেছে,—এ তত্ত্ব জীবতত্ত্ববিদের কাছে যতো গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, শিক্ষাবিদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। গুরুত্বপূর্ণ হল এই কথা যে, শিক্ষার্থীর মধ্যে ওগুলো রয়েছে। ধরা যাক,—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে একজনকে পরামর্শ বা নির্দেশ দিতে হচ্ছে। যেহেতু এটা একটা উত্তরাধিকার, সেইহেতু এর সদ্ব্যবহার আগেই ঠিক হয়ে গেছে, এ রকম ধরে নেওয়ার হেত্বাভাস সুস্পষ্ট। যা আছে, পরামর্শদাতা তারই সদ্ব্যবহারের এবং তাকে সর্বাধিক সুবিধাজনক অবস্থার অধীনে কাজে লাগানোর সাথেই সংশ্লিষ্ট। স্পষ্টতঃই, ওখানে যা নেই সে তা কাজে লাগাতে পারে না। শিক্ষাবিদ্‌ও তা পারে না। এই অর্থে, বংশগতি শিক্ষার একটা সীমা। এই সত্যটি স্বীকার করে নিলে, এক ব্যক্তি স্বভাবতঃই যা হবার উপযুক্ত নয়, শিক্ষাদ্বারা তার কাছ থেকে তা পাবার চেষ্টা করার প্রচলিত অভ্যাসের ফলে যে শক্তির অপচয় হয়, এবং এতে যে পরিমাণে ধৈর্য-চ্যুতি ঘটে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তির যে সব সামর্থ্য রয়েছে সে সবের সদ্ব্যবহার কি ভাবে করা যাবে, সে সম্বন্ধে ঐ নীতি কোনো কিছুই ধার্য করে দেয়নি। জড়বুদ্ধি লোকদের কথা বাদ দিয়ে অন্যদের

পক্ষেও দেখা যায় যে, এই সব আদি সামর্থ্য এতো বিভিন্ন প্রকারের এবং এতো শক্তিশালী যে, এমন কি স্থূল-বুদ্ধি লোকের বেলাও আমরা এখন পর্যন্ত জানি না যে, কি করে ঐ সব সামর্থ্য উপযুক্তরূপে কাজে লাগানো যেতে পারে। কাজেই ব্যক্তির সহজাত প্রবণতাগুলি এবং তাদের দুর্বলতা বা অনুপযোগিতা যত্ন সহকারে অনুশীলন করা সর্বক্ষেত্রেই প্রাথমিক আবশ্যকতা হলেও, এর পরবর্তী ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হ'ল এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেটি বর্তমানে সমুপস্থিত যে কোনো ক্রিয়া-কলাপের জন্যই পর্যাপ্তরূপে ক্রিয়া করবে।

বংশগতি ও পরিবেশের সম্পর্কটি ভাষার ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে প্রকাশিত। যে স্বরযন্ত্র থেকে উচ্চারণ ধ্বনি নিষ্কাশিত হয়, কোনো জীবসত্তার যদি তা না থাকে, যদি তার শ্রাবণ ও অন্যান্য সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়ও না থাকে, এবং এই দুই যন্ত্রের মধ্যে কোনো সংযোগও না থাকে, তা হলে তাকে বাক্যালাপ করতে শেখানোর চেষ্টা মানে ভাহা সময় নষ্ট করা। সে ঐ বিষয়ে খর্বতা নিয়েই জন্মেছে, এবং শিক্ষা এই সীমিতাবস্থাকে গ্রাহ্য করতে অবশ্যই বাধ্য। কিন্তু তার যদি কথা বলবার এই সব স্বাভাবিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়েই জন্ম হয়ে থাকে, তা হলে কেবল এ সব জিনিসে তার অধিকার কোনো মতেই নিশ্চয়তা দেবে না যে সে কোনোদিন কোনো ভাষা বলবে, বা, কোন্ ভাষায় কথা বলবে। যে পরিবেশের মধ্যে তার ক্রিয়া-কলাপ চলে এবং যার ভিতর দিয়ে তার কর্মতৎপরতা কার্যে পরিণত হয়, সেই পরিবেশই ও-সব বিষয় স্থির করবে। সে যদি এমন একটা মূক ও অসামাজিক পরিবেশে বাস করে, যেখানে লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে অসম্মত, এবং যে কয়েকটি ন্যূনতম অঙ্গভঙ্গী ছাড়া তারা একেবারেই চলতে পারে না, কেবল সেই কটাই অবলম্বন করে, তা হলে তার স্বরযন্ত্র না থাকলে যা হতো তা-ই হবে—অর্থাৎ, উচ্চারিত ভাষা তার সেই রকমই অনায়ত্ত থাকবে। আবার, সে যে সব ধ্বনি করে, সেগুলো যদি চীনা-ভাষা ভাষীদের পরিবেশে ঘটত, তা হলে, যে ধরনের ক্রিয়াশীলতা অনুরূপ ধ্বনি করে, সেগুলোই নির্বাচিত ও সহযোজিত হয়ে আসত। যে-কোনো ব্যক্তির শিক্ষাসংক্রান্ত সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে এই দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করা চলে। এই দৃষ্টান্তটি অতীতের উত্তরাধিকারকে বর্তমানের দাবী ও সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে যথাযথ সম্পর্কে স্থাপন করে।

(২) শিক্ষার উপযুক্ত বিষয়-বস্তু অতীত যুগের সাংস্কৃতিক-উৎপাদনের মধ্যে রয়েছে (হয় তার সাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে, নয় এক কৃষ্টি-যুগাংশের শিক্ষার্থীদের বিকাশের স্তরের অনুরূপ করে যে সব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, বিশিষ্টরূপে তার মধ্যে)—এই তত্ত্ব ক্রমবিকাশের ক্রিয়াপ্রণালী এবং পরিণতির মধ্যে বিচ্ছেদ আনবার আর একটি দৃষ্টান্ত। এর সমালোচনাও করা হয়েছে। শিক্ষার বিষয়-বস্তুর ন্যস্ত কাজ হল, বিকাশের ক্রিয়াপ্রণালীকে উজ্জীবিত রাখা, এবং এমন সব পথ অবলম্বন করে উজ্জীবিত রাখা যে, ভবিষ্যতে সে কাজ যেন আরও সহজ হয়। কিন্তু ব্যক্তি কেবল বর্তমানের মধ্যেই জীবনযাপন করতে পারে। বর্তমান শুধুই এমন কিছু নয় যা অতীতের পরে আসে, আর এমন কিছুতো নয়ই যা অতীত দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। অতীতকে পিছনে রেখে যে জীবন আগত, তা-ই বর্তমান। "অতীতের উৎপাদনগুলির" অধ্যয়ন আমাদিকে বর্তমান বুঝতে সহায়তা করবে না, কারণ বর্তমান ঐ সব উৎপাদনের ফলে আসেনি—এসেছে সেই জীবনধারার ফলে ঐ উৎপাদন যাদের। অতীতের এবং তার উত্তরাধিকারের জ্ঞান অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ হয় তখনই, যখন তা বর্তমানের মধ্যে প্রবেশ করে,—অন্যথায় নয়। এবং অতীতের লিপিবদ্ধ বিষয় ও ধ্বংসাবশেষকে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তু করার মধ্যে ভুল এই যে, তা বর্তমান ও অতীতের মধ্যেকার প্রাণবন্ত সংযোগ ছেদ করে অতীতকে বর্তমানের প্রতিদ্বন্দ্বী করতে, এবং বর্তমানকে অতীতের কম-বেশী ব্যর্থ অনুকরণে পর্যবসিত করতে চায়। এই অবস্থায়, সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায় একটা আভরণ ও সান্ত্বনা, হয়ে দাঁড়ায় নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,—আতুরাশ্রম। লোকেরা বর্তমান ক্রূরতা থেকে পলায়ন করে কাল্পনিক সংস্কৃতির মধ্যে বাস করে,—বর্তমান ক্রূরতা পরিশোধনের জন্য অতীতের অবদানকে সংঘটকরূপে ব্যবহার করে না।

সংক্ষেপে, বর্তমান বিশেষ বিশেষ সমস্যার জন্ম দেয়, এবং এই সব সমস্যা সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাবার জন্য আমরা অতীতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। অনুসন্ধান করে আমরা যা-কিছু পাই, বর্তমান তাকে অর্থ-সমৃদ্ধ করে। অতীত যথাযথ ভাবে এই কারণেই অতীত যে, বর্তমানের মধ্যে যা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অতীতের মধ্যে তা থাকে না। গতিশীল বর্তমান তার নিজের গতি নির্দেশিত করার কাজে প্রয়োগ করবে বলেই অতীতকে তার মধ্যে গণ্য করে। অতীত,

কল্পনা-শক্তির এক বিরাট সঙ্গতি। অতীত, জীবনকে নতুন বিস্তৃতি দান করে,—কিন্তু তা এই শর্তে যে, তাকে 'বর্তমানের' অতীতরূপেই দেখতে হবে ; পৃথক একটা জগৎ বা একটা বিচ্ছিন্ন জগৎ রূপে দেখবে না। একমাত্র জীবনযাত্রার কাজ-কর্ম এবং ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াই সর্বক্ষণ বিদ্যমান। যে তত্ত্বকথা এটি তুচ্ছ করে, তা স্বভাবতঃই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে। কারণ সেই তত্ত্ব যে ভবিষ্যৎ লক্ষ্যবস্তু দাঁড় করায় তা সুদূরপরাহত এবং শূন্যগর্ভ। কিন্তু বর্তমানের সংযোগ ছিন্ন করে অতীতের পচাধসা সামগ্রীর বোঝা নিয়ে, তার আর বর্তমানের মধ্যে ফিরে আসার পথ থাকে না। যে মন বর্তমান বাস্তবতার প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি উপযুক্ত মাত্রায় সংবেদনশীল, বর্তমানের পশ্চাদ্ভূমির প্রতি আগ্রহের জন্য তার প্রাণবন্ত প্রেষণা থাকবে, এবং তাকে কখনও ফিরে আসবার পথের খোঁজ করতে হবে না, কারণ তার কাছে এ পথ কখনও সংযোজন হারাবে না।

৩। পুনর্গঠনরূপে শিক্ষা

অন্তর্বিশ্ব থেকে সুপ্ত শক্তির বহির্বিকাশ এবং বহির্বিশ্ব থেকে গঠন, তা ভৌত প্রকৃতির প্রভাবেই হোক আর অতীতের সৃষ্টি দিয়েই হোক,—এই উভয়বিধ ধারণার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য রেখে, ক্রমবিকাশের আদর্শ যে ধারণা দেয় তা হল এই যে, শিক্ষা অভিজ্ঞতার অবিরাম পুনঃসংগঠন বা পুনর্গঠন। সর্বক্ষণেই এর একটা অব্যবহিত লক্ষ্য থাকে, এবং কর্মতৎপরতা যতো দূর শিক্ষামূলক হয়, আদর্শও ততোদূর সে লক্ষ্যে পৌঁছোয়। সে আদর্শ হল, অভিজ্ঞতার গুণের সরাসরি রূপান্তর ঘটানো। কি শৈশবে, কি যৌবনে, কি পূর্ণবয়স্ক জীবনে—সব অবস্থাই, শিক্ষণশীল স্তরে থাকে। এর অর্থ হল, যে কোনো, বা প্রতিস্তরেই, যা-কিছু শিক্ষা করা হয়, তাই ঐ অভিজ্ঞতার মূল্য গঠন করে ; এবং ব্যাপক অর্থ এই যে, প্রতি স্তরেই জীবনের প্রধান কাজ হল জীবনযাত্রাকে এর বোধগম্য তাৎপর্যের সমৃদ্ধিকল্পে অংশদান করতে দেওয়া।

এই ভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা একটি কারিগরি সংজ্ঞায় উপনীত হই। সে সংজ্ঞা এই যে, শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার অর্থ বর্ধিত করা এবং পরবর্তী

অভিজ্ঞতার গতি নির্দেশ করার সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

(১) আমরা যে সব ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকি এই বর্ধিত অর্থ তার বিবিধ যোগসূত্র, এবং নিরবচ্ছিন্নতার পরিবর্ধিত উপলব্ধির অনুরূপ। ক্রিয়াশীলতা আরম্ভ হয় আবেগ প্রবণতার রূপ নিয়ে, অর্থাৎ এটা অন্ধ প্রকৃতির; কি যে করছে তা সে নিজেই জানে না, এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে এর পারস্পরিক ক্রিয়ার কথাও জানে না। যে ক্রিয়াশীলতা তার সঙ্গে শিক্ষা বা নির্দেশ আনে, তা পূর্বের অবোধ্য সম্বন্ধগুলোর মধ্যে থেকে কতিপয় সম্বন্ধকে সুস্পষ্ট করে। পূর্বের সরল দৃষ্টান্তই আবার দেখা যাক। শিশু যখন একটি উজ্জ্বল আলো স্পর্শ করে তখন তার সেঁকা লাগে। তখন থেকে সে "জানে" যে একটি দৃষ্টিজনিত ক্রিয়ার যোগসূত্রে একটি স্পর্শজনিত ক্রিয়ার (বা তদবিপরীত ভাবে) অর্থ দাঁড়ায় তাপ ও বেদনা, কিম্বা,—এক প্রকারের আলো, তাপের আধার। যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা একজন বিজ্ঞানী তার পরীক্ষাগারে দীপশিখা সম্বন্ধে আরও অবগত হন, তাও এই মূল নিয়ম থেকে বিন্দুমাত্র পৃথক নয়; কোনো কাজের সূত্রে, তাপের সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের যে যোগসূত্র তিনি পূর্বে উপেক্ষা করেছেন এখানে সেটি তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এই ভাবে ঐ সব জিনিস সম্বন্ধে তার ক্রিয়াকলাপ অধিকতর অর্থপূর্ণ হয়। ঐ সব জিনিস নিয়ে যখন তাঁর কাজ করতে হয়, তখন তিনি যা করছেন, বা করতে চান, সে সম্বন্ধে তিনি আরও ভালো করে জানেন। কোনো একটা পরিণতিকে নিজ থেকেই সংঘটিত হতে না দিয়ে, তিনি ইচ্ছামত "মতলব করে" তা ঘটাতে পারেন,—এর সব কথারই এক অর্থ। ঐ সূত্রেই দীপ শিখার অর্থও বাড়ে, দাহন, জ্বালন, আলো, তাপমাত্রা সম্বন্ধে যা যা জানা গেল, তার সব কিছুই তার বুদ্ধিগত আধেয়ের একটা সার অংশে পরিণত হতে পারে।

২। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার আর একদিক হল, পরবর্তী নির্দেশের বা নিয়ন্ত্রণের বর্ধিত ক্ষমতা। আমরা যখন বলি যে অমুক লোক কি করছে তা সে জানে, বা, সে নিজেই কোনো পরিণাম উদ্দিষ্ট করতে পারে, তখন এটাই বলা হয় যে, যা ঘটতে চলছে সে আগেই তা জানে। কাজেই হিতকর পরিণতির জন্যে এবং অবাঞ্ছিত পরিণতিকে প্রতিহত করার জন্যে আগে থেকেই সে তৈরী বা প্রস্তুত থাকে। ফলে, যেটি খাঁটি শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ যা নির্দেশ বহন করে এবং যোগ্যতা বাড়ায়, সেটি এক

দিকে ছকে-বাঁধা, ও অন্য দিকে খামখেয়ালী কাজের থেকে বিপরীত অর্থে পৃথক। (ক) শেষোক্ত অবস্থায় যা কিছু ঘটে তার জন্যে কারও গ্রাহ্য নেই। এ যেন খুশিমতো কাজে লেগে যাওয়া এবং কাজের সঙ্গে কাজের পরিণতির কথা এড়িয়ে যাওয়া (অর্থাৎ ঐ কাজের সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের সম্পর্কের কথা এড়িয়ে যাওয়া)। এ রকম উদ্দেশ্যহীন খেয়াল-খুশিমত কাজ-কর্মের উপর লোকে সাধারণতঃ ভ্রূ কুঁচকে রায় দেয় যে, এগুলো ইচ্ছাকৃত কুকাজ বা বেপরোয়া বা স্বেচ্ছাচারী কাজ। কিন্তু এ রকম উদ্দেশ্যহীন কাজকর্মের কারণ খোঁজবার ঝোঁক দেখা যায়, আর সব কিছু ছেড়ে, মাত্র যুবকদের নিজেদের প্রবণতার মধ্যে। কিন্তু আসলে এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ বিস্ফোরক এবং এর কারণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অপসমন্বয়। যখন লোকে বাইরের হুকুমে বা অন্যের পরামর্শমত কাজ করে, এবং যখন তাদের নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, কিম্বা অন্যান্য কাজের উপর তাদের কাজের ফল উপলব্ধি করে না, তখনই তারা খামখেয়ালী কাজ করে। একজনে যে কাজ বোঝে না, তা করে দেখার ফলে সে শিক্ষা পেতে পারে। সর্বাধিক বুদ্ধি-চালিত কাজের মধ্যেও আমরা এমন অনেক কিছু করি, যা আমরা করতে চাই না। কারণ আমরা সজ্ঞানে যা মতলব করি তার যোগসূত্রাদির বেশীর ভাগই আমরা উপলব্ধিও করি না, পূর্বানুমানও করি না। কিন্তু আমরা কেবল এই কারণেই শিক্ষালাভ করি যে, কাজটা করার পরে এমন সব ফল দেখতে পাই যা আগে দেখতে পাই নি। কিন্তু স্কুলের বহু কাজের মধ্যেই, শিক্ষার্থীরা যেভাবে কাজ করবে তার এমন সব বাঁধা-নিয়ম থাকে যে, কাজ করার পরেও তার ফল,—যেমন উত্তর আর কষা পদ্ধতির মধ্যের সম্পর্কটা,—দেখতে পায় না। শিক্ষার্থীদের দিক থেকে গোটা বিষয়টাই একটা চাতুরি বা অলৌকিক ধরনের রূপ নেয়। এ রকমের কাজ মূলতঃ খামখেয়ালী এবং এতে খামখেয়ালী অভ্যাসই গড়ে ওঠে। (খ) রুটিন মাফিক কাজ স্বয়ংচল; তা একটা 'বিশেষ' কাজ করবার দক্ষতা বাড়াতে পারে। সে দিক দিয়ে একে শিক্ষামূলক বলা যেতে পারে। কিন্তু এতে কোনো নতুন সংশ্লিষ্টতা, বা যোগাযোগের উপলব্ধি আসে না; এতে অর্থের দিগন্ত প্রসারিত হওয়া তো দূরের কথা, বরং তা সীমাবদ্ধই হয়। এবং যেহেতু পরিবেশ বদলাতে থাকে, এবং বিবিধ জিনিসের মধ্যে কৃতকার্যতার

সহিত সুষম সম্বন্ধ রাখার জন্য আমাদের কাজের ধরনও বদলাতে হয়, সেই হেতু একটা সম্পর্কহীন একাকার কাজের ধরন কোনো এক সন্ধিক্ষণে দুর্ভাগ্যজনক হয়ে ওঠে। তখন দাম্ভিক "ক্রিয়া কৌশলের" দম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে নিছক অকর্মণ্যতায় পরিণত হয়।

শিক্ষাকে অবিরাম পুনর্গঠন রূপে ধারণা করার সাথে, বর্তমান ও পূর্ব অধ্যায়ে সমালোচিত একমুখী ধারণাগুলোর মূল প্রভেদ এই যে, পূর্বোক্ত ধারণাটি পরিণাম (যে ফল হয়) ও পদ্ধতিকে একাত্ম রাখে। আক্ষরিক অর্থে কথাটা স্ববিরোধী, কিন্তু এ কেবল আক্ষরিক অর্থেই। এর অর্থ এই যে, একটা ক্রিয়াশীল পদ্ধতিরূপে অভিজ্ঞতা সময় নেয়, এবং এর শেষ পর্যায় পূর্বগামী অংশকে সম্পূর্ণ করে। এর মধ্যে যে সব যোগসূত্র রয়েছে, অথচ পূর্বে উপলব্ধ হয়নি, সেগুলোকে নজরে আনে। পরবর্তী ফল পূর্ববর্তী ফলের অর্থ প্রকাশ করে, এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতা এই অর্থ-সম্বলিত জিনিসগুলোর প্রতি একটা মানসতা বা ঝোঁক সৃষ্টি করে। এ রকমের প্রত্যেক ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা বা ক্রিয়াশীলতাই শিক্ষাপ্রদ, এবং সকল শিক্ষাই এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যে বিরাজমান।

এখন, অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন যে সমাজগত এবং ব্যক্তিগতও হতে পারে, সেটিই শুধু দেখতে বাকা আছে। অবশ্য পরের আলোচনায় একে বিশেষ ভাবে ধরা হবে। বিষয়টিকে সহজ করার জন্য আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে কতকটা এই ভাবেই কথা বলেছি যে, যে-শিক্ষা অপরিণত লোককে তার সমাজ-সমষ্টির প্রেরণায় পরিপূর্ণ করে, তা হ'ল যেন বড়োদের উপযোগিতা ও সঙ্গতির সমান হওয়া। এই ধারণা প্রধানতঃ প্রযোজ্য স্থিতিশীল সমাজের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে সব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতির সংরক্ষণই মূল্য বোধের মাপকাঠি, সেখানে। কিন্তু উন্নতিশীল সমাজের পক্ষে এ কথা খাটে না। তারা ছোটোদের অভিজ্ঞতা এমন ভাবে গড়তে চেষ্টা করেন, যাতে চলিত অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করার বদলে, আরও ভালো অভ্যাস গঠিত হয়ে ওঠে, এবং এইভাবে ভবিষ্যতের সাবালক সমাজ তাদের তৎকালীন সমাজ থেকে উন্নততর হতে পারে। শিক্ষার সচেতন প্রয়োগ দ্বারা কি পরিমাণে সমাজের সাক্ষাৎ অভিশাপগুলিকে দূর করা যায়, এবং কি ভাবে এই দোষগুলোর আর সৃষ্টি না হয়, এবং তার জন্য যুবজনকে কি ভাবে

ঠিক পথে পরিচালিত করা যায়, বহুকাল থেকেই সে সম্বন্ধে মানুষের কিছু কিছু খবর জানা ছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, সমাজের উন্নতির মাধ্যমরূপে শিক্ষার সম্ভাব্য কার্যকারিতা হৃদয়ঙ্গম করা থেকে আমরা এখনো বহুদূরে,—এখনো হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না যে, শিক্ষা কেবল শিশু ও যুবগণের উন্নতির প্রতীকই নয়, পরন্তু ওরা যে ভবিষ্যৎ সমাজ গঠন করবে, শিক্ষা সে সমাজেরও উন্নতির প্রতীক।

সারাংশ

শিক্ষাকে হয় অতীতানুসন্ধান রূপে, নয় ভবিষ্যাপেক্ষরূপে ধারণা করা যায়, অর্থাৎ, হয় ভবিষ্যৎকে অতীতের উপযোগী করে নেওয়ার পন্থারূপে, নয় একটা বিকাশমান ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে অতীতের প্রয়োগরূপে, ধারণা করা যায়। প্রথমোক্ত প্রণালী তার মানদণ্ড ও নমুনা পায়, যা-কিছু হয়ে গেছে তার মধ্যে। মনের মধ্যে বহুবিষয়ের উপস্থাপনের ফলে মনের যে আধেয় সৃষ্টি হয়, মনকে তারই আধার বলে মনে করা চলে। এক্ষেত্রে পূর্বাগত উপস্থাপনগুলো সেই উপাদান হয়ে দাঁড়ায় যার মধ্যে পরের উপাদানকে স্বাঙ্গীকৃত করাতে হয়। অপরিণতদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার উপর জোর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,—বিশেষ করে এই জন্য যে, একে অর্থহীন বলে ধরে নেওয়ার একটা ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার মধ্যে বাহির থেকে দেওয়া উপাদান থাকে না ; থাকে, সহজাত ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া। এর ফলে ক্রিয়া-কলাপ ও পরিবেশ উভয়েরই রূপান্তর ঘটে। হারবার্টের উপস্থাপনের মাধ্যমে গঠন তত্ত্বের দোষ হল,—এই বিরামহীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্তনশীলতাকে উপেক্ষা করা।

যে সকল তত্ত্ব মানব ইতিহাসের কৃষ্টিগত রচনা-সম্ভারের মধ্যে পাঠ্য বিষয় দেখতে পায়, উপরোক্ত আলোচনার মূল কথা সে সব তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ; যে বর্তমান পরিবেশের মধ্যে লোকে কাজ করতে বাধ্য হয়, তাকে বাদ দিলে ইতিহাসের বিষয়-বস্তু এক রকমের প্রতিদ্বন্দ্বী ও চিত্ত বিক্ষেপ-কারী পরিবেশ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়, তার তাৎপর্য বৃদ্ধিকল্পে যে প্রয়োগ ঘটে তার মধ্যেই ঐতিহাসিক

রচনাবলীর মূল্য বিরাজমান। এই অধ্যায়গুলোর মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে যে ধারণাবলী উপস্থাপিত করা হ'ল, তার সারাংশ দেখা যাবে অভিজ্ঞতার অবিরাম পুনর্গঠন সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে। যে শিক্ষানীতি শিক্ষাকে সুদূর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতিরূপে, বহির্বিকাশরূপে, বাহ্যিক গঠনরূপে এবং অতীতকালের পুনরনুচিন্তনরূপে ধরে নেয়, আমাদের ধারণা সে সকল ধারণা থেকে পৃথক।

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষার গণতান্ত্রিক স্বরূপ

কোনো সমাজ-মণ্ডলীর মধ্যে যে ধরনের শিক্ষাধারা থাকতে পারে, প্রসঙ্গক্রমে ছাড়া, এ যাবৎ আমরা প্রধানতঃ সেই সম্বন্ধেই বলেছি। এখন আমাদিকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িক জীবনের মধ্যে শিক্ষা যে যে ভাবে ক্রিয়া করে তার ভাবগত, বিষয়বস্তুগত ও পদ্ধতিগত প্রভেদ পরিষ্কার করে দেখাতে হবে। যখন বলা হয় যে, শিক্ষা এমন একটা সামাজিক কৃত্য, যা অপরিণত লোকেরা যে গোষ্ঠীর অন্তর্গত, সেই গোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তাদের নির্দেশ দান ও বিকাশ-সাধন করে, তখন কার্যতঃ এ কথাই বলা হয় যে, কোনো গোষ্ঠীর চলিত জীবনযাত্রা প্রণালীর সাথে তাদের শিক্ষাপ্রণালীও বদলাবে। এ কথা বিশেষ করে সত্য যে, যে সমাজ কেবল পরিবর্তনই করে না, পরন্তু যাদের এমন একটা আদর্শও থাকে, যা তাদের উন্নতিবিধানও করবে, সে সমাজের শিক্ষার মান ও পদ্ধতি, যে সমাজ কেবল তাদের রীতিনীতি বজায় রাখতে চায়, তাদের থেকে ভিন্ন রকমেরই হবে। অতএব, আমাদের নিজেদের শিক্ষাবৃত্তিতে এই সাধারণ ধারণাবলীকে প্রয়োগ করার জন্য, আমাদের বর্তমান সামাজিক জীবনের প্রকৃতিটা কাছ থেকে দেখা আবশ্যক।

১। মানবীয় সহাবস্থানের লক্ষণা

সমাজ, শব্দ একটা, কিন্তু তার জিনিস বহু। লোকে নানা প্রকারে এবং নানা উদ্দেশ্য নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। একজন লোক এমন বহু ও বহুবিধ মণ্ডলীর সম্পর্কে থাকে, যেখানে তার সঙ্গী-সাথী একেবারেই পৃথক। অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় যে, সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের চাল-চলন ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোনো রকমের সাধারণত্ব নেই। প্রত্যেক বড়ো সমাজের সংগঠনের মধ্যেই বহু ছোটো ছোটো দল থাকে। এর মধ্যে কেবল রাষ্ট্রীয় ভাগ-বিভাগই থাকে না, শ্রমশিল্পীয় এবং বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় সঙ্ঘও থাকে। বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে ভি

ভিন্ন রাজনীতিক দল থাকে। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী-সম্প্রদায়, চক্রীদল, দুর্বৃত্তের দল, যৌথ সংস্থা, অংশীদারদের দল, রক্তের টানে বাঁধা গোষ্ঠী, এবং এই রকমের অশেষবিধ উপদল থাকে। অনেক আধুনিক রাষ্ট্রেই এবং কোনো কোনো প্রাচীন রাষ্ট্রেও, নানা ভাষা, ধর্ম, নীতিসূত্র ও ঐতিহ্য-সম্বলিত বিচিত্র জনসমষ্টি রয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখলে, আমাদের অনেক ছোটো ছোটো প্রশাসনিক একক, যেমন একটা বড়ো শহর, এক পরিবেশভুক্ত এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট চিন্তা ও কর্মধারা-সম্বলিত একটা সম্প্রদায় না হয়ে, বরং হয়ে দাঁড়ায় একটা শিথিল বন্ধনে যুক্ত কতকগুলো ছোটো ছোটো সমাজের সমষ্টি বিশেষ।

কাজেই সমাজ, সম্প্রদায় শব্দাদি দ্ব্যর্থক। এ সব শব্দের একটা অর্থ প্রশংসনীয় বা আদর্শগত, আর একটা বর্ণনাগত, একটা বিধানানুগ, আর একটা বাস্তব। সমাজ দর্শনের মধ্যে, প্রথম জাত্যার্থটি প্রায় সব সময়েই আর সব অর্থের উপরে থাকে। ঐ অর্থে সমাজের নিজ প্রকৃতি বশেই একে একটা গোটা জিনিস বলে ধরে নেওয়া হয়। এই একত্বের সঙ্গে যে সব গুণ থাকে, যেমন প্রশংসাযোগ্য সামাজিক উদ্দেশ্য ও কল্যাণ, জন স্বার্থের প্রতি আনুগত্য, সমবেদীতার পারস্পরিকতা, সেগুলোর উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু সমাজ শব্দের অন্তর্নিহিত জাত্যার্থের উপর জোর না দিয়ে যখন আমরা এর বাক্যার্থের প্রতি নজর দেই, তখন আমরা একত্ব দেখি না। দেখতে পাই ভিন্ন ভিন্ন ভালো-মন্দ সমাজের বহুত্ব। এর মধ্যে থাকে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী ষড়যন্ত্রকারীদল, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সঙ্ঘ, —যারা জনসেবা ছলে জনগণ শিকার করে, বিভিন্ন রাজনৈতিকদল,—যারা লুণ্ঠনের স্বার্থে একতাবদ্ধ থাকে। যদি কেউ বলেন যে এ সমস্ত সংগঠন সমাজ নয়, কারণ এরা সমাজের আদর্শগত ধারণার প্রয়োজন মেটায় না, সে কথার আংশিক উত্তর এই যে, সে ক্ষেত্রে সমাজের ধারণাটা এতো আদর্শ-গত হয় যে, তা কোনো কাজেই লাগে না, বা, তার সাথে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক থাকে না; আর, আংশিক উত্তর এই যে, এরা অন্যান্য সমষ্টির স্বার্থের যতো বিরোধীই হোক না কেন, এদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই কিছু কিছু প্রশংসনীয় সামাজিক গুণ আছে, যার বলে এরা একত্র থাকে। তস্করদেরও সম্মানবোধ আছে, এবং একটা ডাকাতের দলের মধ্যেও সভ্যদের সম্পর্কে যৌথ স্বার্থবোধ আছে। বিভিন্ন দুর্বৃত্তের দল ভ্রাতৃসুলভ অনুভূতি দ্বারা সুচিহ্নিত

এবং বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ চক্রীদল তাদের নিজেদের বিধি-নিয়মের প্রতি প্রচণ্ড আনুগত্য দ্বারা সুচিহ্নিত। একটি পারিবারিক জীবন বাইরের লোকদের সম্পর্কে একলসেঁড়েমি ঈর্ষা ও সন্দেহ দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে, এবং তা সত্বেও নিজেদের ভিতরে সহৃদয়তা ও পারস্পরিক সহায়তার আদর্শ হতে পারে। একটা মণ্ডলীর যে-কোনো শিক্ষাই তার সভ্যদিকে সমাজবদ্ধ করার সহায়ক হয়, কিন্তু এই সমাজবদ্ধতার গুণ ও মূল্য নির্ভর করে মণ্ডলীর অভ্যাস ও লক্ষ্যাদির উপরে।

কাজেই যে কোনো ধরনের সমাজ-জীবনের মূল্য নির্ণয়ের জন্য একটা মাপকাঠির প্রয়োজন। এই মান খুঁজতে গিয়ে আমাদিকে দুটো চরম পন্থাই ত্যাগ করতে হবে। আমরা শুধু চিন্তা করে মাথার মধ্যে থেকে বার করে একটা আদর্শ সমাজ বলে কিছু দাঁড করাতে পারি না। যে সব সমাজ প্রকৃতপক্ষে চালু রয়েছে তাদের উপরে ভিত্তি করেই আমাদের ধারণা সম্বন্ধে এমন একটা নিশ্চয়তা পেতে চাই যে, তাতে করে আমাদের আদর্শটা কার্যোপযোগী হবে। কিন্তু আমরা এখনি যা দেখলেম তাতে বোঝা গেল যে, যা আদর্শ হবে, তা কেবল দৃশ্যমান লক্ষণগুলোর পুনরাবৃত্তি নয়। সমস্যাটা হল, যে সব ধরনের সাম্প্রদায়িক জীবন আসলে বর্তমান রয়েছে, তার মধ্যে থেকে বাঞ্ছনীয় লক্ষণ বের করে নেওয়া, এবং এর ভিত্তিতে অবাঞ্ছিত আকৃতিগুলোর সমালোচনা করা, এবং উন্নতির পরামর্শ দেওয়া। এখন কথা এই যে, যে কোনো একটা সামাজিক মণ্ডলীর মধ্যেই, এমন কি একটা চোরের দলের মধ্যেও আমরা কতকটা যৌথ স্বার্থবোধ দেখতে পাই, এবং অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে তার কিছু পরিমাণ পারস্পরিক ক্রিয়া এবং সহযোগী আদান প্রদানও দেখতে পাই। এই দুটি লক্ষণ থেকে আমরা আমাদের মানদণ্ড নির্ণয় করছি। যে সব স্বার্থে জ্ঞাতসারে অংশীদারিত্ব থাকে, তার সংখ্যার পরিমাণ কি, আর, তা কতো প্রকারের? অন্যান্য প্রকারের সঙ্ঘের সঙ্গে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া কতোটা স্বচ্ছন্দ ও সম্পূর্ণ। যদি একটা দুর্বৃত্ত-পরায়ণ দলের ক্ষেত্রে আমরা এই দুটো বিবেচনা প্রয়োগ করি, তাহলে দেখি যে, যে সব সংজ্ঞাত বন্ধন এর শাগরেদদের একত্র রাখে তার সংখ্যা অতি কম, এ যেন প্রায় লুণ্ঠনের যৌথ স্বার্থেই সীমাবদ্ধ; এবং এগুলো এমন প্রকৃতির যে, জীবনের মূল্যবোধীয় আদান-প্রদানের সম্পর্কে দলীয় স্বার্থই

দলকে অন্যান্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। কাজেই এ-রকমের একটা সমাজ যে শিক্ষা দেয়, তা পক্ষপাতপূর্ণ ও বিকৃত। অন্য দিকে, যে ধরনের পারিবারিক জীবন আমাদের আদর্শের দৃষ্টান্তস্বরূপ, তা বিচার করলে দেখি যে, এর মধ্যে এমন সব বৈষয়িক, বুদ্ধিগত, ও কমনীয় স্বার্থবোধ থাকে যে, তার মধ্যে সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে. এদের এক জনের উন্নতি অন্যদের উন্নতির ক্ষেত্রেও মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ আদান প্রদানের যোগ্য হয়; আরও দেখি যে, এই পরিবারটি আলাদাভাবে সম্পূর্ণ নয়, পরন্তু বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং অনুরূপ মণ্ডলীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ. আরও দেখতে পাই যে, এরা রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থাতে নিয়মিত ভূমিকা নেয়, এবং তার প্রতিদানরূপে এই বিধিব্যবস্থার সমর্থন পায়। অল্প কথায় এ ক্ষেত্রে বহু এমন স্বার্থ থাকে যা নিয়ে জ্ঞাতসারে বলা-কওয়া ও অংশীদারী করা হয় এবং অন্যান্য প্রকারের সঙ্ঘের সাথেও নানাবিধ এবং স্বচ্ছন্দ যোগসূত্র থাকে।

(১) এই নির্ণায়কের প্রথম উপাদানটি স্বৈরাচার-শাসিত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাক। অবশ্য এ কথা সত্য নয় যে, এই ব্যবস্থাতে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে কোনো যৌথ স্বার্থবোধ থাকে না। শাসকবর্গ শাসিতদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি কিছুটা আবেদন নিশ্চয়ই করবে, শাসিতদের কোনো কোনো ক্ষমতা নিশ্চয়ই কাজে লাগাবে। টেলির‍্যাণ্ড বলেছেন যে, সরকার বেয়নেট দিয়ে সব কিছুই করতে পারে, কেবল তার উপর বসতে পারে না। এই ব্যঙ্গোক্তি অন্ততঃপক্ষে এ কথা মেনে নেয় যে, একতার বাঁধন শুধু বাধ্য করানোর ক্ষমতা নয়। অবশ্য এ কথা বলা যায় যে, যে সব ক্রিয়াকলাপের প্রতি আবেদন জানানো হয়, সেগুলো মূলতঃ অশোভন ও অপমানকর. আরও কথা এই যে, ঐ সরকার কেবল ভয়ের সামর্থ্যই ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে। এক দিক দিয়ে কথাটা ঠিক। কিন্তু সেটি এ দিক দেখে না যে, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ভয় থাকাটা একটা অবাঞ্ছনীয় উপাদান নাও হতে পারে। সতর্কতা, অবহিত-দৃষ্টি, বিচক্ষণতা এবং ভবিষ্যতে ক্ষতিকর অবস্থা এড়িয়ে যাবার জন্য আগেই ভবিষ্যৎ দেখা প্রভৃতি বাঞ্ছনীয় লক্ষণ যেমন ভয়ের আবেগকে ক্রিয়াশীল করার ফল, ভীরুতা এবং শোচনীয় বশ্যতা স্বীকারও তেমনি তার ফল। আসল অসুবিধা এই যে, ভয়ের আবেদন সম্পর্কহীন থাকে।

ভীতি এবং সুবিশিষ্ট বোধগম্য পুরস্কারের আশা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি, আহ্বান করে অন্য অনেক সামর্থ্যকে অক্রিয় রাখা হয়। কিম্বা বলা যায় যে তা অন্যান্য সামর্থ্যকে প্রভাবিত করে, কিন্তু তা এমন ভাবে হয় যাতে ওগুলো বিকৃত হয়। ঐ সমস্ত সামর্থ্য নিজ নিজ গুণে ক্রিয়া করার পরিবর্তে, কেবল সুখ পাবার ও যন্ত্রণা এড়ানোর বাহনে পরিণত হয়।

এর অর্থ এই যে, এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যাপক যৌথ স্বার্থবোধ থাকে না এবং এই সমাজ-মণ্ডলীর সভ্যদের মধ্যে কোনো স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে না। উদ্দীপনা ও সাড়া অত্যন্ত একমুখী থাকে। বেশী পরিমাণে যৌথ মূল্যবোধের জন্যে সমষ্টির সকল সভ্যেরই দেওয়া ও নেওয়ার সুষম সুযোগ থাকতে হবে, থাকতে হবে অনেক প্রকারের অংশীদারী কাজ ও অভিজ্ঞতা। অন্যথায়, যে সব প্রভাব কতক লোককে মনিব হতে শেখায়, সেগুলি অন্যদের ভৃত্য করে তোলে। এবং যখন নানাবিধ জীবন-অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ বিনিময় বন্ধ হয়, তখন দু'দলই অভিজ্ঞতার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। অধিকার-প্রাপ্ত ও অধীনতা-গ্রস্ত শ্রেণী-বিভাগ সামাজিক আন্ত-আস্রবণ প্রতিরোধ করে। এর ফলে যে সব দুষ্ট-প্রভাব উচ্চতর শ্রেণীকে সংক্রমণ করে, তা কম বৈষয়িক, এবং কম প্রত্যক্ষ হলেও সমান বাস্তব। এদের সংস্কৃতি সৃজনহীন হয়ে পেছন ফিরে নিজেকেই নিজে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। এদের শিল্পকলা বাহ্যাড়ম্বর ও কৃত্রিমতায় পরিণত হয়, সম্পদ হয়ে দাঁড়ায় ভোগ-বিলাসের বস্তু, জ্ঞান হয়ে ওঠে অতিমাত্রায় বিশেষজ্ঞ; এবং আচার-আচরণ মানবিক না হয়ে, হয়ে পড়ে রুচিবাগীশ।

নানাবিধ অংশীদারী স্বার্থবোধ থেকে যে স্বচ্ছন্দ ও সমদর্শী আদান-প্রদানের চলন হয়, তার অভাবে বুদ্ধিগম্য উদ্দীপনা তার ভারসাম্য হারায়। উদ্দীপনার বৈচিত্র্যের অর্থ হল অভিনবত্ব, আর অভিনবত্বের অর্থ দাঁড়ায় চিন্তনের সম্মুখীন হওয়া। অল্প কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারায় ক্রিয়াশীলতা যতোই সীমাবদ্ধ রাখা যায়,—অনমনীয় শ্রেণীবদ্ধতার ফলে অভিজ্ঞতার পর্যাপ্ত আদান-প্রদান ব্যাহত হয়ে যে অবস্থা দাঁড়ায়,—সুযোগহীন শ্রেণীর পক্ষে কাজকর্ম ততোই নিয়মে বাঁধা পড়তে চায়, এবং বৈষয়িক হিসাবে ভাগ্যবান শ্রেণীর পক্ষে কাজকর্ম ততোই খামখেয়ালী, লক্ষ্যহীন ও বিস্ফোরক রূপ ধারণ করে। প্লেটো, ক্রীতদাসের বর্ণনায় বলেছেন যে, অন্যের কাছ থেকে উদ্দেশ্য গ্রহণ

করে যখন একজনের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই সেটি ক্রীতদাসের লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি, যেখানে দাসত্ব প্রথা আইনসঙ্গত নয়, সেখানেও এই অবস্থা রয়েছে। যেখানেই লোকেরা সমাজ-সেবা সংক্রান্ত কাজকর্মে নিযুক্ত, কিন্তু কেন যে এ সব কাজ করেছে তা বোঝে না, বা তার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ থাকে না, সেখানেই এই অবস্থা ঘটে থাকে। কাজকর্মের বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়। যে বিজ্ঞান ক্রিয়া-প্রণালীতে কর্মকুশলতা আনে তাকে পেশী চালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি। বিজ্ঞানের প্রধান সুযোগ হল, একজনের সঙ্গে তার কাজের, এবং এর মধ্যে আর যারা অংশ নেয় তাদের, সম্পর্ক আবিষ্কার করা,—সেই সম্পর্ক আবিষ্কার করা, যাতে একজনে যা করছে তাতে তার বুদ্ধিগম্য স্বার্থ নিযুক্ত হয়। উৎপাদনের কর্মকুশলতা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমের বিভাজন দাবী করে। কিন্তু শ্রমিকরা যে কাজ করছে তার মধ্যে যদি তারা কাজের কৌশলগত, মেধাগত ও সমাজগত সম্পর্ক না দেখতে পায়, এবং এর উপলব্ধি যে প্রেষণা যোগায় তাকে বাদ দিয়েই কাজে নিযুক্ত থাকে, তা হলে ঐ শ্রমবিভাগ একটা যান্ত্রিক নিত্যকর্ম-পদ্ধতি বা রুটিনে পরিণত হয়। যাঁরা শ্রমশিল্প নিয়ন্ত্রণ করেন, অর্থাৎ যাঁরা এর লক্ষ্য স্থির করেন, তাঁরা একমুখী চিন্তা দিয়েই উদ্দীপিত হন। তার প্রমাণ এই যে, তাঁরা শ্রমের কর্মকুশলতা ও বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থাগুলিকে একটা অবিমিশ্র বাহ্যিক কারিগরি পরিণতিতে পর্যবসিত করবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে সর্বোতোমুখী এবং সুষম সামাজিক স্বার্থবোধের অভাব হেতু, শ্রমশিল্পে মানবিক উপাদান ও সম্পর্কের প্রতি তাঁদের মনোযোগ যথেষ্ট পরিমাণে উদ্দীপিত হয় না। তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি কারিগরি উৎপাদন ও বিক্রয়ের বাজার সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই সঙ্কুচিত থাকে। নিঃসন্দেহে, এই সব সঙ্কীর্ণ দিকেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিকাশ হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদান হিসেবে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ দাড়ায়, মনের শূন্যতা এবং প্রক্ষোভগত জীবনের অনুরূপ বিকৃতি।

(২) এই দৃষ্টান্ত (যার তাৎপর্য, পারস্পরিক স্বার্থবোধহীন সকল সমষ্টির ক্ষেত্রেই বিস্তৃত) আমাদিকে দ্বিতীয় কথায় টেনে আনে। কোনো দুর্বৃত্তের দল বা একটা চক্রীদলের বিচ্ছিন্নতা ও সংশ্রবহীনতা, তার সমাজ-বিরোধী

ভাবকে সুস্পষ্ট আকার দেয়। কিন্তু যেখানেই কোনো মণ্ডলীর এমন "নিজস্ব" স্বার্থ থাকে, যেটি একে অন্যান্য মণ্ডলীর সঙ্গে পূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে, এবং প্রশস্ততর সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে পুনর্গঠন ও অগ্রগতির পরিবর্তে যদি মণ্ডলীর যা আছে তা রক্ষা করাতেই এর সর্বব্যাপী উদ্দেশ্য দেখা যায়, তা হলে সেখানেই এই ভাব দেখা যাবে। জাতিপুঞ্জের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা এই ভাবই চিহ্নিত করে। যে সব পরিবার তাদের গার্হস্থ্য সংশ্রব এমন ভাবে নিঃসঙ্গ রাখে যে, বৃহত্তর জীবনের সাথে যেন তাদের কোনো সংশ্রবই নাই, তারাও এইরূপ। আবার যে সব স্কুল পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থাদি থেকে পৃথক থাকে তারাও এই ভাবে চিহ্নিত হয়, যেমন চিহ্নিত হয় ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য। সার কথা এই যে, বিচ্ছিন্ন অবস্থা জীবনের অনমনীয়তা ও নিয়ম বাঁধা প্রাতিষ্ঠানিকতার দিকে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় স্থিতিশীল ও স্বার্থপর আদর্শের দিকে। আদিম উপজাতিরা যে "বিজাতীয়" ও "বৈরীকে" সমার্থক ধরে নেয়, তা কিছু আকস্মিক নয়। তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে অতীত রীতি-নীতির প্রতি অনমনীয় আনুগত্যের সঙ্গে একাত্ম করেছে। এই ভিত্তির বশে অন্যান্যের সঙ্গে আদান-প্রদান করাকে ভয় করাই যুক্তি-সঙ্গত, কারণ এ রকমের যোগাযোগ তাদের আচার-অনুষ্ঠানগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে। তাতে নিশ্চিতরূপেই পুনর্গঠনের দরকার হবে। এটা জানা কথা যে, সতর্ক ও পরিবর্ধনশীল মানসিক জীবন, ভৌত পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগের বর্ধনশীল পাল্লার উপরে নির্ভর করে। কিন্তু এই মূল নিয়ম যে আরও বেশী তাৎপর্যপূর্ণভাবে সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আমরা যেন তা উপেক্ষা করতে চাই। যে সমস্ত উপকরণ, পূর্বের সুস্পষ্টরূপে বিভাজিত বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মধ্যের দূরত্ব দূর করার উপক্রম করেছে, মানব-ইতিহাসের প্রত্যেক সম্প্রসারণশীল যুগই সেই সব উপকরণের প্রক্রিয়ার সমকালীন হয়েছে। এমন কি, যুদ্ধের উপকারিতার যেটুকু প্রমাণ সাপেক্ষ ধারণা পাওয়া যায়, তাও এই সত্য থেকেই উদ্ভূত যে, আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যোগাযোগ বলবৎ করে এবং এই আকস্মিতার ফলে পরস্পরের কাছ থেকে শেখবার সুযোগ দেয়, এবং এই সূত্রে তাদের দিগন্তও প্রসারিত করে দেয়। পর্যটন এবং আর্থিক ও

বাণিজ্যিক তৎপরতা, বর্তমানকালে বাহ্যিক প্রতিবন্ধকগুলোকে ভেঙ্গে দেবার জন্য অনেক দূর এগিয়েছে; এবং বিভিন্ন সমাজ ও শ্রেণীর মধ্যে নিকটতর ও অধিকতর প্রত্যক্ষ পারস্পরিক সংযোগ ঘটিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, যা বাকী রয়েছে তা হল স্থানের এই ভৌতিক বিলোপ প্রাপ্তির ফলে যে বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত তাৎপর্য দেখা দিয়েছে, তাকে আয়ত্তে আনা।

২। গণতান্ত্রিক আদর্শ

আমাদের নির্ণায়কের এই দু'টি উপাদানই গণতন্ত্রের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। এর প্রথম উপাদান কেবল অধিকতর সংখ্যক ও অধিকতর বিভিন্ন প্রকারের যৌথ অংশীদারী স্বার্থই জ্ঞাপন করে না, পরন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপাদানরূপে পারস্পরিক স্বার্থবোধের স্বীকৃতির উপরেও অধিকতর আস্থা জ্ঞাপন করে। এর দ্বিতীয় উপাদান কেবল বিভিন্ন সামাজিক সমষ্টির (যারা এক সময়ে যথা সম্ভব ইচ্ছামত পৃথক ছিল) অধিকতর স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই জ্ঞাপন করে না, পরন্তু সামাজিক অভ্যাসের পরিবর্তনও জ্ঞাপন করে,—অর্থাৎ নানাবিধ আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে সকল নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেগুলোর সম্মুখীন হয়ে অভ্যাসের অবিরাম এবং উত্তরোত্তর সমন্বয় বিধানও জ্ঞাপন করে। গণতান্ত্রিক রূপে গঠিত সমাজের বিশিষ্ট গুণ বলতে যা কিছু বোঝায় এই দুটি যথার্থভাবে তারই লক্ষণ।

শিক্ষার দিক থেকে আমরা প্রথমে দেখি যে, যে জাতীয় সামাজিক জীবনের উপলব্ধির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থবোধ পরিব্যাপ্ত থাকে, এবং যেখানেই অগ্রগতি বা পুনঃ-সমন্বয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়, সেখানেই সেটি একটা গণ-তান্ত্রিক সমাজকে সুচিন্তিত ও সুব্যবস্থিত শিক্ষা ব্যবস্থাতে অধিকতর আগ্রহ-শীল করে। অন্য ধরনের সমাজে এই জাতীয় মনোভাব থাকার কোনো কারণ থাকে না। শিক্ষার প্রতি গণতন্ত্রের অনুরক্তি সুবিদিত। এর অগভীর ব্যাখ্যা এই যে, যারা নির্বাচন করে এবং যারা শাসকবর্গকে মেনে চলে, তারা যদি শিক্ষিত না হয়, তা হলে, জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার সফলকাম হতে পারে না। যে হেতু গণতান্ত্রিক সমাজ বাইরের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার নীতি প্রত্যাখ্যান করে, সে জন্য একে স্বতঃস্ফূর্ত মানসতা ও

স্বার্থবোধের মধ্যেই বিকল্প ব্যবস্থা দেখতে হয়, এবং কেবল শিক্ষা দ্বারাই এই ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এর একটা গভীর ব্যাখ্যাও রয়েছে। গণতন্ত্র মাত্র একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাই নয়, সেটি তার থেকে আরও বেশী কিছু দ্যোতিত করে। প্রধানতঃ, গণতন্ত্র হ'ল এক রকমের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রা, ও সংযুক্ত আদান-প্রদানমূলক অভিজ্ঞতা। যে ক্ষেত্রে মানুষেরা এক অভিন্ন স্বার্থের অংশীদারী, অতএব যাদের প্রত্যেককে তার নিজের কাজকে অন্যান্যের কাজের সম্পর্কে দেখতে হয়, এবং নিজের কাজকে অর্থপূর্ণ ও নির্দেশযুক্ত করবার জন্য অন্যান্যের কাজকর্ম বিবেচনা করতে হয়, সে স্থানে তাদের বিস্তৃতির অর্থ দাঁড়ায় শ্রেণী, উপজাতি ও জাতীয় অঞ্চল সম্বলিত প্রতিবন্ধকগুলি ভেঙ্গে যাওয়া। কারণ এই সব প্রতিবন্ধক তাদিকে তাদের কাজকর্মের পরিপূর্ণ ও সার্থক উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। এই অধিকতর সংখ্যা এবং অধিকতর প্রকারের সংযোগ, অধিকতর বিচিত্র উদ্দীপক জ্ঞাপন করে, এবং ব্যক্তিকেও এসব উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে হয় ; কাজেই ঐ সমস্ত সংযোগ ব্যক্তির কাজের বৈচিত্র্য-মূল্য বৃদ্ধি করে। কাজের উদ্দীপক যতো দিন আংশিক থাকে, ততো দিন কতক কতক কর্মশক্তি নিরুদ্ধ থাকে ; অন্যদিকে, ঐ সমস্ত সংযোগ সেই সব কর্মশক্তিকে মুক্ত করে। কিন্তু যে মণ্ডলী আলাদা হয়ে থেকে বহু স্বার্থ রুদ্ধ করে রাখে, তাদের কাজের উদ্দীপনা আংশিক হয়েই থেকে যায়।

অংশীদারী সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে বিস্তৃতিলাভ এবং ব্যক্তিগত সামর্থ্যের অধিকতর বিচিত্রতার মুক্তিই হল গণতন্ত্রের বিশিষ্ট গুণ। কিন্তু এই গুণাবলী অবশ্যই গভীর বিবেচনা ও সংজ্ঞাত প্রচেষ্টার ফল নয়। পক্ষান্তরে, প্রাকৃতিক শক্তির উপরে বিজ্ঞানের শাসনের ফলে যে সমস্ত উৎপাদন প্রণালী, ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন, প্রবাস ও পারস্পরিক যোগাযোগের বিকাশ হয়েছে, তার ফলেই ঐ সব গুণ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এক দিকে অধিকতর ব্যক্তিতা লাভ, অন্য দিকে বৃহত্তর গণ-স্বার্থবোধের পত্তন হওয়ার পরে, এগুলোকে বজায় রাখা ও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারটি, একটা সুবিবেচিত প্রচেষ্টার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সহজেই বোঝা যায় যে, কোনো সমাজের পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীতে স্তরান্বিত হওয়া মারাত্মক। অতএব সমাজকে অবশ্যই দেখতে হবে যে, বুদ্ধিগত সুযোগ-সুবিধাগুলো যেন সুষম এবং সহজ শর্তে

সকলের কাছেই সহজপ্রাপ্য হয়। যে সমাজ শ্রেণীতে শ্রেণীতে চিহ্নিত, সে সমাজ শাসক শ্রেণীর শিক্ষার উপরেই বিশেষ করে মনোযোগ দেয়। যে সমাজ সচল, যে সমাজে এক স্থানের পরিবর্তন অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ার বহু প্রণালী থাকে, সে সমাজকে অবশ্যই দেখতে হবে যে, এর সভ্যেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অভিযোজনাতে শিক্ষিত হচ্ছে। অন্যথায়, যে সকল পরিবর্তনের মধ্যে তাঁরা পড়বে, এবং যার তাৎপর্য ও যোগসূত্রাদি তাঁরা বুঝবে না, তাতে তাঁরা অভিভূত হয়ে পড়বে। এর পরিণাম হবে, একটা হট্টগোল, যার ফলে বহু লোকের অন্ধ ও হুকুমে পরিচালিত ক্রিয়া-কলাপের ফল, মাত্র অল্প কয়েক জনেই আত্মসাৎ করবে।

৩। প্ল্যাটোবাদী শিক্ষা-দর্শন

শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ধারণাবলীর বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্ত আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পরিষ্কার করে বর্ণনা করব। এই অধ্যায়ের বাকী অংশে আমরা সেই সব শিক্ষাতত্ত্ব বিবেচনা করব যেগুলো তিনটি যুগাংশে বিকাশ লাভ করেছিল, এবং যে সময়ে শিক্ষার সামাজিক গুরুত্ব বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রথমে বিবেচনা করব, প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্ব। যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার স্বাভাবিক উপযোগিতা অনুযায়ী এমন ভাবে কাজ করে যায় যে, তার ফলে সে অন্যান্যের কাজের সহায়ক হতে পারে (বা সে যে সমষ্টির অন্তর্গত সেই সমষ্টিকে অংশদান করতে পারে,) সমাজ তখনই সুদৃঢ়রূপে সংগঠিত হয়। এ কথা প্লেটো যেমন পরিষ্কার করে বলেছেন, আর কেউ তেমন করে বলেন নি। তিনি আরও বলেছেন যে, শিক্ষার কাজ হ'ল ঐ সকল উপযোগিতাকে আবিষ্কার করা, এবং সামাজিক ব্যবহার-কল্পে সেগুলোকে ক্রমাগত সুশিক্ষিত করা। এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা প্লেটো জ্ঞাতসারে পৃথিবীকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার থেকেই নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে তিনি বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেননি, তাদের চাপে পড়ে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি এই ধারণা-বলীকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। একজন লোকের, বা, এক সমাজ-সমষ্টির ক্রিয়াকলাপ যে অগণিত রূপ ধারণ করতে পারে, সে সম্বন্ধে

প্লেটোর কোনো ধারণা ছিল না ; এবং এর ফলে, তাঁর দৃষ্টি, বিভিন্ন সামর্থ্য ও সামাজিক ব্যবস্থার মাত্র কয়েকটি সীমিত "শ্রেণীর" মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

প্লেটোর প্রারম্ভিক সূত্র এই যে, সমাজের সংগঠন শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্বলিত জ্ঞানের উপরে। যদি আমরা অস্তিত্বের উদ্দেশ্য না জানি, তা হলে আমরা আকস্মিকতা ও খামখেয়ালীপনার দয়ার উপরে নির্ভর করে থাকব। আমরা যদি সর্বশেষ উদ্দেশ্য, মঙ্গলকে, না জানি তা হলে কোন্ কোন্ সম্ভাব্যতা বাড়াতে হবে, কিরূপ সামাজিক ব্যবস্থাই বা আনতে হবে, যুক্তিসঙ্গতরূপে তা ধার্য করার কোনো নির্ণায়ক থাকবে না। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংগঠন, উভয়ের লক্ষণরূপে ক্রিয়া-কলাপের যথাযথ সীমা ও বণ্টন সম্বন্ধেও—যাকে তিনি ন্যায়-বিচার বলেন—আমাদের কোনো ধারণা থাকবে না। কিন্তু কি করে চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী মঙ্গলের জ্ঞান লাভ করা যায় ? এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে আমরা আপাতদৃষ্টিতে এই অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হই যে, একটা সুবিচারপূর্ণ ও সুসমন্বিত সামাজিক ব্যবস্থা ছাড়া এই জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যান্য সকল অবস্থাতেই মিথ্যা মূল্যায়ন ও মিথ্যা পটভূমিকা দ্বারা মন বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়। একটা অব্যবস্থিত ও দলীয় স্বার্থপুষ্ট সমাজ অনেক বিভিন্ন আদর্শ ও মানদণ্ড তুলে ধরে। এই অবস্থায় ব্যক্তির পক্ষে মনের সামঞ্জস্য লাভ করা অসম্ভব। কেবল সম্পূর্ণ পূর্ণত্বই সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং-সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে সমাজ তার কোনো উপাদানের যুক্তিসঙ্গত বা আনুপাতিক দাবী গণ্য না করেই অন্য উপাদানের প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে, সে সমাজ অনিবার্যরূপে চিন্তাশক্তিকে বিপথে পরিচালিত করে। এ রকমের সমাজ কোনো কোনো জিনিসের উপর অতিরিক্ত মূল্য দেয় এবং কোনো কোনো বিষয়কে তুচ্ছ করে ; এবং এমন এক মনের সৃষ্টি করে, যার আপাতপ্রতীয়মান একত্ব কষ্ট-কল্পিত ও বিকৃত। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি ও ন্যায়-নিয়ম যে সব নমুনা যোগায় তা দিয়েই শিক্ষা চলতে থাকে। কিন্তু কেবল একটা ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রেই এগুলো এমন অবস্থায় থাকে যে তা দিয়ে নির্ভুল শিক্ষা চলতে পারে। আর যাঁরা নির্ভুল-ভাবে শিক্ষিত মনের অধিকারী, একমাত্র তাঁরাই শেষ উদ্দেশ্যে হৃদয়ঙ্গম করতে এবং বিষয়াদির মূলতত্ত্ব বিন্যাস করতে পারবেন। মনে হয় আমরা যেন একটা নিরাশার চক্রে পড়েছি। যাই হোক, প্লেটো সে চক্র থেকে

বেরিয়ে আসবার একটা পথের সন্ধান দিলেন। অল্প কয়েকজন লোক, দার্শনিক বা জ্ঞানানুরাগী বা সত্যানুরাগী লোক, অধ্যয়ন দ্বারা অন্ততঃপক্ষে সত্য অস্তিত্বের যথাযথ নমুনার একটা পরিলেখ শিখে নিতে পারেন। যদি একজন ক্ষমতাশালী শাসক এই সব নমুনা অনুসারে রাষ্ট্রগঠন করেন, তাহলে এর বিধি-নিয়ম সংরক্ষিত হতে পারে। তখন এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, যে শিক্ষা, লোক বাছাই করবে, যা কিছু ভালো তা আবিষ্কার করবে এবং এমন একটা পদ্ধতি যোগাবে যে, তা দিয়ে প্রত্যেকের উপরেই তার প্রকৃতির উপযোগিতা অনুযায়ী জীবনের এক একটা কাজ ন্যস্ত করা যায়। প্রত্যেকেই তার নিজের অংশ করে যাবে এবং কখনও নির্দেশ লঙ্ঘন করবে না। এই ভাবে পূর্ণ সমষ্টির শৃঙ্খলা ও একত্ব বজায় রাখা হবে।

এক দিকে সামাজিক ব্যবস্থাদির শিক্ষামূলক তাৎপর্য, অন্য দিকে যুবকদের শিক্ষিত করার উপায়ের উপরে ঐ সব ব্যবস্থার নির্ভরশীলতা, এ দুটি জিনিস প্লেটোর শিক্ষা দর্শনে যে স্বীকৃতি পেয়েছে অন্য কোনো দার্শনিক শিক্ষা প্রকল্পের মধ্যে তার থেকে বেশী পর্যাপ্ত স্বীকৃতি বের করা অসম্ভব। ব্যক্তিগত সামর্থ্যের আবিষ্কার ও বিকাশ-সাধন এবং ঐ সামর্থ্যের সুশিক্ষণ এমন ভাবে হবে যে, তা অন্য সকলের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে—শিক্ষার এই করণীয় বিষয় সম্বন্ধে এর থেকে গভীরতর অর্থ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তথাপি, যে সমাজের মধ্যে এই তত্ত্বের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা এতো অ-গণতান্ত্রিক ছিল যে, প্লেটো সমস্যাটার শর্তাদি পরিষ্কার দেখতে পাওয়া সত্বেও, এর মীমাংসা করে উঠতে পারেন নি।

যদিও তিনি জোর দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, বংশ, সম্পদ ও রীতিগত পদমর্যাদা দ্বারা সমাজে ব্যক্তির স্থান নিরূপণ করা উচিত নয়, পরন্তু শিক্ষাধীন অবস্থায় তার নিজস্ব যে প্রকৃতি আবিষ্কৃত হয়, তা দিয়েই তার স্থান নির্ণয় করা উচিত, তবুও ব্যক্তির অনন্যসাধারণতা সম্বন্ধে তার কোনো উপলব্ধি ছিল না। তার মতে, প্রকৃতি অনুসারে মানুষেরা শ্রেণীতে শ্রেণীতে পড়ে, এবং তাও খুব অল্প কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও বাছাই করা কেবল এটাই পরিস্ফুট করবে যে, একজন লোক তিন শ্রেণীর কোন শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তার একটা নিজস্ব শ্রেণী গঠন করে, এ কথার স্বীকৃতি না থাকার দরুন, বিভিন্ন ব্যক্তি

যে অসংখ্য রকমের বিচিত্ররূপে ক্রিয়াশীল প্রবণতার, এবং এদের সংমিশ্রণের আধার হতে পারে, সে কথার স্বীকৃতি সেখানে মেলেনি। ব্যক্তির গঠনের মধ্যে মাত্র তিন প্রকারের ধী-শক্তি বা ক্ষমতা থাকে। এ অবস্থায় প্রত্যেক শ্রেণীর ক্ষেত্রেই শিক্ষা অতি শীঘ্রই একটা অচল সীমায় পৌছাবে; কারণ কেবল বিচিত্রতাই পরিবর্তন ও প্রগতি ঘটায়।

কোনো কোনো লোকের মধ্যে ক্ষুধা স্বভাবতঃই প্রবল; এদের শ্রমিক ও বণিক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই শ্রেণী, লোকের অভাব প্রকাশ করে, এবং অভাব পূরণ করে। শিক্ষাকালে অন্যান্যেরা দেখায় যে, ক্ষুধার বাইরেও তাদের একটা উদার বহির্মুখী, ও দুর্দমনীয় সাহসিক মানসতা আছে। এরা রাষ্ট্রের নাগরিক প্রজা হয়। এরা যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার কাজ করে, শান্তির সময় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক তত্ত্বাবধান করে। কিন্তু যে বিচার-বুদ্ধি হল সার্বিক বিষয় উপলব্ধি করার সামর্থ্য, তার অভাব, এদের সীমা বেঁধে দেয়। যাদের এই সামর্থ্য থাকে, তারা সর্বোচ্চ শিক্ষা পাওয়ার যোগ্য। সময়ে, এরাই রাষ্ট্র-বিধায়ক হয়। কারণ বিধানই হল সেই সার্বিক বিষয়, যার দ্বারা অভিজ্ঞতার সব কিছু খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই এ কথা সত্য নয় যে, কোনো সঙ্কল্প বশতঃ প্লেটো ব্যক্তিকে সামাজিক সমগ্রতার অধীনস্থ করেছিলেন। কিন্তু এ কথা সত্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অনন্যসাধারণতার,—অন্যান্যের সঙ্গে তার আনুপাতিক অসমতার,—উপলব্ধির অভাব হেতু, এবং সমাজ যে পরিবর্তনশীল হয়েও অভঙ্গুর হতে পারে তা না বোঝবার দরুন, প্লেটোর সীমিত-ক্ষমতা ও সীমিত-শ্রেণী সম্বলিত মতবাদের মোট ফল দাঁড়াল,—ব্যক্তিত্বের অধীনতা।

প্লেটোর দৃঢ়-প্রত্যয় ছিল যে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে সমস্ত কাজে তার স্বাভাবিক ধৃতি আছে,— তাতে নিয়োজিত থাকে, তখনই সে সুখী হয়, এবং সমাজও তখনই সুসংগঠিত থাকে। আবার শিক্ষার মুখ্য কর্মভার হল এর অধিকারীর কাছে শিক্ষার সাজ-সরঞ্জাম তুলে ধরা এবং এর কার্যকারী প্রয়োগের জন্য তাকে সুশিক্ষিত করা। প্লেটোর এই বিশ্বাস বা মতবাদকে বোধ হয় আর উন্নত করা যায় না—অর্থাৎ এটাই একটা চরম উক্তি। কিন্তু জ্ঞানের অগ্রগতি থেকে আমরা জেনেছি যে, ব্যক্তিসমূহকে এবং তাদের মৌলিক ক্ষমতাবলীকে এক এক জোট বেঁধে বিশেষভাবে-চিহ্নিত, মাত্র কয়েকটি

শ্রেণীতে ভাগ করা একটা অসার প্রস্তাব। তা-ছাড়া এটিও জানা গেছে যে, মৌলিক সামর্থ্য অনির্দিষ্টরূপে বহুসংখ্যক এবং পরিবর্তনশীল। এই সত্যেরই ও-পিঠ হল এই যে, সমাজ যে মাত্রায় গণতান্ত্রিক হতে থাকে, সামাজিক সংগঠনও সেই মাত্রাতেই প্রতি জনের সুবিশিষ্ট ও পরিবর্তনশীল গুণাবলীর সদ্ব্যবহার করতে থাকে। শ্রেণীবিভাগ দ্বারা সেগুলোর স্তর-বিন্যাস করা যায় না। তাঁর শিক্ষা দর্শন বৈপ্লবিক হলেও সেটি অচল আদর্শের শৃঙ্খলেও কিছু কম বাঁধা ছিল না। তাঁর মতে পরিবর্তন বা রূপান্তর একটা বেহিসাবী অস্থিরতার সাক্ষ্য দেয়; বাস্তব সত্য অপরিবর্তনীয়। কাজেই এক দিকে তিনি সমাজের তৎকালীন অবস্থার আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন, অন্য দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন একটা রাষ্ট্র গঠন করা যার মধ্যে পরবর্তীকালেও পরিবর্তনের কোনো স্থান থাকবে না। জীবনের সর্বশেষ উদ্দেশ্যের, অনডতার, দিকে লক্ষ্য রেখে যদি রাষ্ট্রগঠন করা হয়, তা হলে সামান্য খুঁটিনাটি পরিবর্তনও চলবে না। যদিও ঐ সব পরিবর্তনের কোনো মৌলিক গুরুত্ব নাও থাকতে পারে, তবুও যদি তা করতে দেওয়া হয়, তাহলে তা মানুষের মনকে পরি-বর্তনের ধারণায় অভ্যস্ত করবে, এবং তার ফল হবে সব কিছুরই ভাঙ্গন ও নৈরাজ্য। তাঁর দর্শনের ভাঙ্গন এই তথ্যের মধ্যেই স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, তিনি শিক্ষার ক্রমিক উন্নতিবিধান দ্বারা এমন কোনো উচ্চতর সমাজ গঠনে বিশ্বাসী ছিলেন না, যা পরে আরও উন্নতিবিধান করবে এবং অনির্দিষ্টকাল এই ভাবেই চলতে থাকবে। (তার মতে) আদর্শ রাষ্ট্র না আসা পর্যন্ত নির্ভুল শিক্ষাধারা চলতে পারে না, এবং তারপর থেকে শিক্ষা কেবল ঐ রাষ্ট্রের সংরক্ষণের কাজেই নিযুক্ত থাকবে। ঐ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য তিনি কোনো শুভ দৈব-ঘটনার প্রতি আস্থা রেখেছিলেন, যার ফলে দার্শনিক প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকার সহাবস্থান করবে।

৪। অষ্টাদশ শতকের ব্যক্তিবাদী আদর্শ

অষ্টাদশ শতকের দর্শনে আমরা নিজেদের দেখি একটি অতি বিভিন্ন ধারণাচক্রে। "বিশ্বপ্রকৃতি" তখনও উপস্থিত সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থী।

প্লেটো, রুশোর উপরে এক মহান প্রভাব খাটিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতির কণ্ঠস্বর এখন ব্যক্তিগত মেধার বিচিত্রতা, এবং ব্যক্তিতার সর্ব রকম বিচিত্রতার স্বচ্ছন্দ বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে। বিশ্বপ্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা, এখন শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলার লক্ষ্যবস্তু ও পদ্ধতি যোগায়। অধিকন্তু কোনো কোনো চরম ক্ষেত্রে, সহজাত বা মৌলিক গুণাবলীকে, অসামাজিক, এমন কি, সমাজ-বিরোধী বলেও ধারণা করা হয়। সামাজিক ব্যবস্থাদিকে শুধু বাহ্যিক সুবিধার উপায় বলে বিবেচনা করা হয়, যার সুযোগ নিয়ে ঐ সব অসামাজিক লোকেরা তাদের নিজেদের জন্যে বেশী পরিমাণে ব্যক্তিগত সুখ লাভ করতে পারে।

তা সত্ত্বেও, এ সব কথা ঐ আন্দোলনের আসল তাৎপর্য সম্বন্ধে অপর্যাপ্ত ধারণাই বহন করে। প্রকৃতপক্ষে এর মুখ্য স্বার্থ ছিল প্রগতি এবং সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে। আপাতদৃষ্টিতে সমাজবিরোধী হলেও, এই দর্শন এক অধিক-তর প্রশস্ত ও মুক্ত সমাজ স্থাপনের দিকে,—বিশ্ব-নাগরিকতার দিকে, গতিশক্তি যোগানোর একটা স্বচ্ছ মুখোশ পরে ছিল। এর সদর্থক আদর্শ ছিল মানবতা। রাষ্ট্রের সদস্যতা থেকে পৃথকভাবে, মানবতার সদস্যতায় মানুষের সামর্থ্য মুক্ত হবে; উপস্থিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রের শাসকবর্গের নানাবিধ প্রয়োজন ও স্বার্থপর উদ্দেশ্য মেটাতে গিয়ে মানুষের ক্ষমতাবলী ব্যাহত ও বিকৃত হয়।

চরম ব্যক্তিতাবাদ, মানুষের অনির্দিষ্ট পূর্ণতালাভ করার যোগ্যতা এবং মানব জাতির মতোই বিস্তীর্ণ পাল্লার এক সমাজ ব্যবস্থা সম্বলিত আদর্শের প্রতিরূপ, বা ও-পিঠ মাত্র। অধীনতামুক্ত ব্যক্তি, এক ব্যাপক ও প্রগতিশীল সমাজের অবয়ব ও সঙ্ঘটক হয়ে উঠবে।

এই শুভ-বার্তার অগ্রদূতগণ নিজেরা যে সামাজিক রাজত্বে বাস করতেন, তার দোষ-ক্রটির বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাঁরা ভেবে-ছিলেন যে, মানুষের স্বাধীন ক্ষমতার উপরে বাধা-নিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার ফলেই এই সব পাপ বাসা বেঁধেছে। এ ধরনের সীমা নির্দেশ মানুষকে যেমন বিকৃত করে, তেমনই কলুষিতও করে। যে বিশিষ্ট শ্রেণীর উপর অতীত সামন্ত-তন্ত্র ক্ষমতা অর্পণ করেছিল, সেই শ্রেণীর একচেটিয়া সুবিধাকল্পে যে সমস্ত বাধা-নিষেধ কাজ করত, তার থেকে মুক্তিলাভের প্রতি উত্তেজনাপূর্ণ অনুরক্তি, বিশ্বপ্রকৃতির আরাধনামূলক সূত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। "বিশ্ব-

প্রকৃতিকে” পুরাপুরি দোলা দেওয়ার অর্থ ছিল একটা কৃত্রিম, কলুষ ও অসম সমাজ ব্যবস্থাকে নতুন ও উচ্চতর মানবিকতার রাজ্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা। আদর্শ, ও কার্যকরী-শক্তি, এই দু'দিক দিয়েই বিশ্ব-প্রকৃতির উপরে অবাধ বিশ্বাস, প্রকৃতি বিজ্ঞানের অগ্রগতি দ্বারা দৃঢ়তর হয়েছিল। সংস্কার, ধর্ম ও রাষ্ট্রের কৃত্রিম বাধা-বিমুক্ত জিজ্ঞাসা বিশ্বকে একটি ন্যায়ানুগ দৃশ্যরূপে প্রকট করেছিল। নিউটন্-আবিষ্কৃত সৌরমণ্ডল প্রাকৃতিক নিয়মের রাজত্ব প্রকাশ করল ; এর মধ্যে দেখা গেল এমন এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃশ্য, যেখানে প্রতিটি শক্তি আর সব শক্তির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করছে। মানুষ যদি কেবল মানবারোপিত কৃত্রিম দমনমূলক বাধা-নিষেধ থেকে নিষ্কৃতি পায়, তাহলে প্রাকৃতিক নিয়ম মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই ফল সাধন করবে।

এই অধিকতর সামাজিক সমাজকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া প্রথম ধাপ বলে মনে করা হয়েছিল। স্পষ্টই দেখা গেল যে, আর্থিক ও রাজনীতিক সীমিতাবস্থা শেষ পর্যন্ত চিন্তা ও অনুভূতির সীমিতাবস্থার উপরেই নির্ভরশীল। মানুষকে বাইরের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রথম ধাপ হল, তাকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আদর্শের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। যাকে সামাজিক জীবন বলা হয়, যেমন উপস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলো, তা এতো মিথ্যা ও কলুষিত যে, তার উপরে এ কাজের ভার ন্যস্ত করা যায় না। যে সমাজ, শিক্ষার ফলে তার নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে, সে সমাজকে কি করে শিক্ষার ভার দেওয়া যায় ? তা হলে “প্রকৃতি”ই হবে সেই ক্ষমতা, যার উপরে এই সাহসিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে। এমন কি, যে চরম সংবেদনবাদী জ্ঞানতত্ত্ব প্রচলিত ছিল, তাও এই ধারণা থেকে নিজের রূপ পেয়েছিল। আদিতে মন অক্রিয় ও শূন্য থাকে, এই কথার উপরে জোর দেওয়ার অর্থই হ'ল শিক্ষার বিভিন্ন সম্ভাব্যতাকে মহিমান্বিত করার একটা উপায়। মন যদি এমন একটা মোমের চাকতি হয়, যার উপরে বস্তু দিয়ে লেখা যায়, তা হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা শিক্ষার সম্ভাব্যতা সীমাহীন হবে। এবং যে হেতু বস্তু-সম্বলিত প্রাকৃতিক বিশ্ব একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ “সত্যের” দৃশ্য, সেই হেতু এই শিক্ষা নির্ভুলভাবে সত্য-দিয়ে-ভরা মন তৈরী করবে।

৫। শিক্ষার জাতীয় ও সামাজিক রূপ

মুক্তি-প্রয়াসের প্রথম উদ্যম হ্রাস পেতেই গঠনমূলক দিকের প্রতি এই তত্ত্বের দুর্বলতা স্পষ্ট দেখা গেল। কেবল প্রকৃতির উপরে সব কিছু ফেলে রাখা শেষ পর্যন্ত শিক্ষার ধারণাকেই নাকচ করে দেয়। এর অর্থ দাঁড়ায় পারিপার্শ্বিকের আকস্মিকতার প্রতি আস্থা রাখা। কোনো না কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন তো আছেই, তা ছাড়া শিক্ষার কাজকর্ম চালু রাখার জন্য কোনো নির্দিষ্ট শাখা, কোনো প্রশাসনিক সংঘটকেরও প্রয়োজন। "সম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ"-এর সামাজিক প্রতিরূপ হ'ল আলোকপ্রাপ্ত ও প্রগতিশীল মানবজাতি গঠন। একে কাজে পরিণত করতে হলে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা দরকার। জনে জনে এখানে সেখানে নীতিবাক্য ঘোষণা করতে পারে বটে কিন্তু তারা সে কথা কাজে পরিণত করতে পারে না। "একজন" পেস্টালিজি তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারেন এবং ধনী ও ক্ষমতাপন্ন সদাশয় লোককে তার নিজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে পারেন। কিন্তু এ কথা এমন কি পেস্টালজীও বুঝেছিলেন যে, এই নতুন শিক্ষা-আদর্শের কার্যকর অনুধাবনের জন্য রাষ্ট্রের সমর্থন দরকার। যে নতুন শিক্ষা নতুন সমাজ গঠন করবে, তার বাস্তব রূপায়ণ, শেষ পর্যন্ত, উপস্থিত রাজ্যগুলোর ক্রিয়াকলাপের উপরই নির্ভরশীল হবে। ফলে গণতান্ত্রিক ধারণার আন্দোলন অপরিহার্যরূপে সরকার পরিচালিত ও সরকার প্রশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক পরিস্থিতি রাষ্ট্র-সমর্থিত শিক্ষার আন্দোলনকে রাজনীতিক জীবনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম করেছিল; এই ঘটনা পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলনের পক্ষে অসীম তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে, জার্মান চিন্তাধারার প্রভাবে শিক্ষা একটি পৌর-কর্তব্যে পরিণত হ'ল, এবং এই পৌর-কর্তব্য আবার জাতীয়-রাষ্ট্র আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার সঙ্গে একাত্ম হ'ল। মানবতার স্থানে প্রতিস্থাপিত হ'ল রাষ্ট্র, বিশ্ব নাগরিকতার স্থান দখল করল জাতীয়তাবাদ। শিক্ষার লক্ষ্য দাঁড়াল নাগরিক

গড়া, মানুষ গড়া নয়[১]। যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কথা বলা হ'ল তা হ'ল নেপোলিয়নের বিজয়াভিযানের পরবর্তী ফল,—বিশেষ করে জার্মানীতে যেমন দাঁড়িয়েছিল। জার্মান রাজ্যগুলো মনে করল যে, শিক্ষার প্রতি সুসম্বদ্ধ মনোযোগ তাদের রাজনৈতিক অখণ্ডতা ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় (পরবর্তী ঘটনাবলী এ বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করেছিল)। বাহ্যতঃ, ঐ রাজ্যগুলি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন ছিল। প্রাসিয়ার রাজনীতিবিদদের প্রভাবে তারা এই অবস্থাকে একটা ব্যাপক ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার বিকাশের উদ্দীপনায় পরিণত করেছিল।

ব্যবহারিক প্রয়োগের এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবীরূপে তত্ত্বেরও পরিবর্তন ঘটাল। ব্যক্তিতাবাদী তত্ত্ব পিছিয়ে পড়ল। রাষ্ট্র কেবল সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার উপকরণই যোগাবে না, পরন্তু শিক্ষার লক্ষ্যবস্তুও যোগাবে। যখন শিক্ষাদানের বাস্তব প্রথা এমন একটা রূপ নিল যে, প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় শিক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষাব্যবস্থা নাগরিক ও সৈনিক, ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারী ও প্রশাসক যোগাতে থাকবে, এবং সামরিক, শ্রমশিল্পীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা এবং সম্প্রসারণের উপায়ও যোগাতে থাকবে, তখন শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও সামাজিক কৃতিত্বমূলক উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। এবং বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী ও কমবেশী বৈরীভাবাপন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত কোনো জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের উপর যে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হল, তার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক কৃতিত্বকে অস্পষ্ট বিশ্বজনীন লোকহিত অর্থে ব্যাখ্যা করা সমভাবে অসম্ভব হয়ে উঠল। যেহেতু এক বিশেষ ধরনের জাতীয় সার্বভৌমতা বজায় রাখার জন্য, প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক প্রাধান্য লাভের সংগ্রাম-সম্বলিত বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতি জনগণের আনুগত্যের প্রয়োজন,

---

১। রুশোর লেখার মধ্যে এই দিকটাতে একটা বহু উপেক্ষিত বুদ্ধিগত টান দেখা যায়। তিনি এই কারণে তৎকালীন পরিস্থিতির বিরোধিতা করেছিলেন যে, ও অবস্থায় নাগরিকও তৈরী হয় না, মানুষও তৈরী হয় না। তখনকার অবস্থায় তিনি নাগরিক না গড়ে বরং মানুষ গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর এমন অনেক কথা আছে যাতে আদর্শগতরূপে নাগরিক গড়াই উচ্চতর কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। "এমিল" গ্রন্থে লিখিত তাঁর নিজের প্রচেষ্টার মধ্যে সে কালের কলুষিত অবস্থার মধ্যে যথা সম্ভব তারই একটা সর্বোত্তম অস্থায়ী বর্ণনা পাওয়া যায়।

সেই হেতু শিক্ষাতত্ত্বের সামাজিক কৃতিত্বকেও অনুরূপ আনুগত্যের অর্থেই বুঝে নেওয়া হল। শিক্ষা প্রণালীকে ব্যক্তিগত বিকাশ বলে না ধরে, বরং শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রশিক্ষণ বলে ধরা হল। কিন্তু যেহেতু সাংস্কৃতিক আদর্শকে ব্যক্তিতার পূর্ণ বিকাশ বলেই ধরা হ'ত, সেই হেতু শিক্ষাদর্শন এই দুটি ধারণার সমন্বয় বিধান করতে চেষ্টা করল। এই সমন্বয়, রাষ্ট্রের "অঙ্গাঙ্গিক" চরিত্রের ধারণায় রূপ নিল। বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে ব্যক্তি কিছুই নয়; কেবল সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন লক্ষ্য ও তাৎপর্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে এবং তার ভিতর দিয়েই সে যথার্থ ব্যক্তিত্ব লাভ করে। যাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতি আনুগত্য, এবং উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের আদেশে আত্মত্যাগের দাবী বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা হ'ল রাষ্ট্রের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত বিষয়মুখী হেতুকে নিজের করে নেওয়া। এবং এটিই হ'ল একমাত্র পন্থা যা দিয়ে সে যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। বিকাশ সম্বন্ধে যে ধারণাকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শের বৈশিষ্ট্যরূপে দেখেছি (যেমন হেগেলের দর্শনে), তা-হ'ল, ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা-প্রাপ্তি, এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি পূর্ণ "ও সুশৃঙ্খল" আনুগত্য,—এই দুটো ধারণাকে উক্ত প্রকারে একত্র করার একটি সুবিবেচিত প্রচেষ্টা।

যে জার্মান বংশধরগণ জাতীয় স্বাধীনতাকল্পে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিলেন, তাঁদের সময়ে জার্মানীতে শিক্ষা-দর্শনের যে রূপান্তর ঘটছে, কান্টের লেখা থেকে তা সংগ্রহ করা যায়। কান্ট্, এই সময়ে পূর্ববর্তী সময়ের ব্যক্তিতা-বিশ্বনাগরিকতার আদর্শ ভালভাবে প্রকাশ করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে প্রদত্ত তার বক্তৃতাবলীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট "পেশাদারী শিক্ষকতা" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি শিক্ষার সংজ্ঞায় বলেছেন যে, শিক্ষা সেই প্রক্রিয়া যা দিয়ে মানুষ, মানুষ হয়। প্রকৃতিতে নিমজ্জিত থেকে মানবজাতি তার ইতিহাস আরম্ভ করে,—বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতো নয়,—কারণ প্রকৃতি কেবল সহজাত প্রবৃত্তি ও ক্ষুধাই দান করে। প্রকৃতি কেবল সেই বীজ দেয়, শিক্ষাকার্য যার বিকাশ সাধন করে এবং যাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। প্রকৃত মানব জীবনের তাৎপর্য এই যে, মানুষকে তার সদিচ্ছা-প্রণোদিত প্রচেষ্টা দ্বারা নিজেকে গঠন করতে হয়, নিজেকে একটি যথার্থ নৈতিক, যুক্তিসিদ্ধ ও বিমুক্ত অস্তিত্বরূপে গড়ে তুলতে হয়। এই সৃজনশীল

প্রচেষ্টা পুরুষানুক্রমিক শিক্ষাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে মন্থর গতিতে চলতে থাকে। একে ত্বরান্বিত করতে হলে চাই সেই সব ব্যক্তি যাঁরা তাদের বংশাবলীকে জ্ঞাতসারে উপস্থিত পরিস্থিতির পক্ষাবলম্বন করে শিক্ষা না দিয়ে, এমন এক ধরনের শিক্ষা দেন, যাতে ভবিষ্যতে একটা উন্নততর মানব-সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব হয়। কিন্তু এ কাজের একটা বড় প্রতিবন্ধক রয়েছে। প্রত্যেক বংশাবলী শিক্ষার যথাযথ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে, তাদের ছোটোদের এমন ভাবে শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন বর্তমান পৃথিবীর সাথে তাল রেখে চলতে পারে. শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষ হিসাবে মনুষ্যত্বের সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপলব্ধির পৃষ্টপোষক হওয়া। পিতামাতা সন্তানদের শিক্ষা দেন, যেন তারা মানিয়ে চলতে পারে. রাজারা প্রজাদের শিক্ষা দেয় তাদের নিজ উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্ররূপে।

তাহ'লে, মানবতা যাতে উন্নত হতে পারে—সে শিক্ষা কে চালাবে? আমাদিকে অবশ্যই মোহমুক্ত ও আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপরে নির্ভর করতে হবে। "সকল সংস্কৃতিই ব্যক্তির মধ্যে আরম্ভ হয়, এবং তাঁর থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। যারা ভবিষ্যতে উন্নততর অবস্থার আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ, সেই উদারভাবাপন্ন ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই মানব-প্রকৃতির পক্ষে ক্রমে ক্রমে তার উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব।···শাসকবর্গ কেবল সেই প্রকারের শিক্ষাতেই আগ্রহী যা তাদের নিজ নিজ মতলবের খাতিরে প্রজাদিকে উন্নততর সাধকে পরিণত করবে।" এমন কি, বেসরকারীভাবে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সরকারী সাহায্য আসে, তাও সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ, মানবতার পক্ষে যা সর্বোত্তম, তার পরিবর্তে, জাতীয় কল্যাণের প্রতি শাসকবর্গের স্বার্থ থাকার জন্য, তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টাকা দিলে, স্কুলের পরিকল্পনাও তারা নিজেরা করতে চাইবে। এই মতের মধ্যে আমরা অষ্টাদশ শতকের ব্যক্তিতাবাদী বিশ্ব-জনীনতার বিশিষ্ট বক্তব্য বিষয়ের পরিষ্কার বর্ণনা দেখি। এখানে প্রাতিজনিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশকে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্য ও অগ্রগতির ধারণার সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। তা ছাড়াও, এ সকল ধারণা কাজে পরিণত করার উপরে রাষ্ট্র-পরিচালিত ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার প্রতিরোধকারী প্রভাব সম্বন্ধেও প্রকাশ্য আশঙ্কা দেখা যায়। কিন্তু এরপরে, দুই দশকেরও

কম সময়ের মধ্যে কান্টের দার্শনিক উত্তরাধিকারী, ফিট্‌সে ও হেগেল, এই ধারণাটা পরিবর্ধিত করে দেখালেন যে, রাষ্ট্রের মুখ্য করণীয় হল, শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়। তাঁরা বিশেষ করে বললেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থে শিক্ষা-ব্যবস্থা করেই জার্মানীর পুনরুজ্জীবন সাধিত হবে। দেখালেন যে, প্রাতিজনিক ব্যক্তি একটি অংহবাদী, যুক্তিহীন জীব। সে, তার নানাবিধ ক্ষুধা ও অবস্থা-পরম্পরার দাস,—যদি না সে স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও আইন-কানুনের শিক্ষণশীল শৃঙ্খলার অনুগত হয়। এই মনোভাব নিয়ে জার্মানীই হয়ে দাঁড়াল পৃথিবীর প্রথম দেশ, যে দেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শিক্ষা পর্যন্ত, সরকারী, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার ভার গ্রহণ করল, এবং তার সকল বে-সরকারী শিক্ষা উদ্যোগকে রাষ্ট্রের সতর্ক ও সযত্ন নিয়ম-কানুন ও তত্ত্বাবধানের বশবর্তী করল।

এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক নিরীক্ষা থেকে দু'টি বিষয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যক্তি-ভিত্তিক ও সমাজ-ভিত্তিক ধারণাকে যদি স্বতন্ত্রভাবে, বা, প্রসঙ্গ-বিবিক্ত করে ধরা হয়, তা হলে তার কোনো অর্থ হয় না। প্লেটোর শিক্ষা-আদর্শ এমন ছিল, যার মধ্যে ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং সামাজিক সংহতি ও স্থায়িত্বের একই অর্থ ছিল। তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁকে এমন একটা সমাজের ধারণা করতে বাধ্য করিয়েছিল যে, সেটি বিভিন্ন স্তরীভূত শ্রেণী দ্বারা সংগঠিত, এবং তাতে, ব্যক্তি শ্রেণীর মধ্যে হারিয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকের শিক্ষা-দর্শনের রূপ ঘোর ব্যক্তিবাদী হলেও এর অনুপ্রেরণা এসেছিল এক মহান ও উদার সামাজিক আদর্শ থেকে, এবং এমন এক সমাজ থেকে, যা সমগ্র মানবগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত, এবং যাতে মানব জাতির অপরিসীম পূর্ণতালাভের ব্যবস্থা রাখবে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে জার্মানীর আদর্শবাদী দর্শন পুনরায় কৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিতার স্বচ্ছন্দ ও পূর্ণ বিকাশের আদর্শের সঙ্গে সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যকে সমার্থক করতে প্রয়াসী হয়েছিল। এই আদর্শ জাতীয় রাষ্ট্রকে প্রাতিজনিক ব্যক্তিতা, ও মানবতার উপলব্ধির মধ্যবর্তী সংঘটক করেছিল। কাজেই এর অনুপ্রেরণামূলক তত্ত্বকে প্রাচীনমতে "ব্যক্তিত্বের সমগ্র ক্ষমতাবলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ," বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষায়, "সামাজিক দক্ষতা-লাভ,"—যাই বলা হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই সত্য সমানভাবে বজায়

থাকে। যে কথা নিয়ে এই অধ্যায় আরম্ভ করা হয়েছে এ সব উক্তি সেটাকেই বলবৎ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত কি জাতীয় সমাজ আমাদের মনে মনে আছে তার সংজ্ঞা আমরা স্থির না করি, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার ধারণাকে একটা সামাজিক প্রক্রিয়া, বা, সামাজিক করণীয় বিষয় বলে ধরে নেওয়ার কোনো অর্থ ই দাঁড়ায় না।

এই সব বিচার-বিবেচনা আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের পথ সুগম করে দেয়। জাতীয়তাবাদী লক্ষ্য ও বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্যের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে এবং গণতান্ত্রিক সমাজের জন্যেই শিক্ষার একটা মৌলিক সমস্যা জেগে ওঠে। পূর্বতন বিশ্বনাগরিক ও "লোকহিত-কামী" ধারণা, প্রথমতঃ তার অস্পষ্টতা এবং দ্বিতীয়তঃ তাকে ফলপ্রসূ করতে হলে যে সব প্রশাসনিক অঙ্গসংস্থান ও প্রতিনিধির দরকার হয়, তাদের অভাবে, দু'দিক দিয়েই ব্যাহত হয়েছে। ইউরোপে, বিশেষ করে তার মহাদেশগুলোর বিভিন্ন রাষ্ট্রে, মানব কল্যাণ এবং মানব প্রগতির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বের এই নতুন ধারণা জাতীয় স্বার্থের কবলে পড়েছিল; এবং সে ধারণাকে এমন একটা কাজ করার জন্য সাজানো-পরানো হয়েছিল, যার সামাজিক লক্ষ্য নিশ্চিতরূপেই সঙ্কীর্ণ ও একপেশে ছিল। শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যকে জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম করায় সামাজিক লক্ষ্যের অর্থ বিশেষভাবে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই বিভ্রান্তি, মানবিক আদান-প্রদানের বর্তমান পরিস্থিতিরই অনুরূপ। এক দিকে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলাসৃষ্টি জাতীয় সীমা অতিক্রম করে যায়। গুণ ও পদ্ধতির দিক দিয়ে এর বেশীর ভাগই আন্তর্জাতিক। এর মধ্যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা রয়েছে। আবার অন্য দিকে, এই সঙ্গে রাজনীতিতে জাতীয় সার্বভৌমতার ধারণা বর্তমানকালে যেমন জোরালো হয়েছে, আর কখনও তেমন হয়নি। প্রত্যেক জাতিই তার প্রতিবেশীদের সাথে যেন একটা চাপা শত্রুতা ও প্রারম্ভিক যুদ্ধের অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ স্বার্থের সর্বপ্রধান বিচারক বলে ধরে নেওয়া হয়, এবং গতানুগতিকভাবেই ধরে নেওয়া হয় যে, প্রত্যেকেরই এমন এমন স্বার্থ রয়েছে যা একমাত্র তারই নিজস্ব। এর উপরে প্রশ্ন তোলা মানে জাতীয় সার্বভৌমতার ধারণা সম্বন্ধেই

প্রশ্ন তোলা। কারণ ধরে নেয়া হয় যে, জাতীয় সার্বভৌমতাই রাষ্ট্রবৃত্তি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল কথা। সঙ্ঘবদ্ধ ও পারস্পরিক সহায়তামূলক অধিকতর প্রশস্ত সামাজিক জীবন, এবং স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণ একক জীবন,—এই দুইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টিতে যে মূলতঃ বৈরিতা-প্রসূত ধ্যান-ধারণা ও অভিপ্রায় রয়েছে সেটাই এই উভয় জাতীয় সমাজের মধ্যে একটা বিরোধিতার সৃষ্টি করেছে। এই বিরোধিতাই শিক্ষাতত্ত্ব থেকে, শিক্ষার করণীয় বিষয় ও মান-নির্ণয় রূপে, "সামাজিক" শব্দটার অর্থ সম্বন্ধে এমন এক স্পষ্টতর ধারণার প্রত্যাশী যে, সেখানে আজ পর্যন্ত পৌঁছানো যায় নি।

এও কি সম্ভব যে শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হবে, অথচ তাতে শিক্ষামূলক ক্রিয়াপ্রণালীর পূর্ণ সামাজিক উদ্দেশ্য সীমিত, বাধ্যতামূলক ও বিকৃত হবে না? বর্তমানে যে অর্থনীতিক অবস্থা সমাজকে শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়ে, তার কয়েকটি শ্রেণীকে অন্যদের উচ্চতর সংস্কৃতির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করবার প্রবণতা দেখাচ্ছে, ভিতর থেকে দেখলে প্রশ্নটিকে তাদের সম্মুখীন হতে হয়। যে সব বিষয় রাষ্ট্রীয় সীমা অগ্রাহ্য করে সকল মানুষকে একটা উচ্চতর সর্বজনীন উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ করে তাদের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় আনুগত্য ও দেশপ্রেমের সমন্বয় সাধন করাই হল এই প্রশ্নের বাহ্যিক সমস্যা। শুধু নঞর্থক উপায় অবলম্বন করে এ সমস্যার কোনো মীমাংসাই করা যায় না। এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা আর এক শ্রেণীর লোকের শোষন সহজতর করার জন্যে শিক্ষাকে যেন সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা না হয়। শিক্ষাকে এভাবে দেখা ভাল কথা, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধাগুলো এমন বিস্তারিতভাবে ও দক্ষতা-সহকারে যোগাড় করতে হবে যে, তার ফলে আর্থিক অসমতার কুফল কেবল নামেই হ্রাস হবে না, পরন্তু জাতির সকল প্রতিপাল্যদের ভবিষ্যৎ বৃত্তির জন্য সাজ-সরঞ্জামের একটা সমতাও আসবে। এই উদ্দেশ্য সাধন কেবল স্কুলের সুযোগ-সুবিধাদির পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপন, এবং তরুণ সম্প্রদায় যাতে ঐ সব ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারে সে জন্যে তাদের পারিবারিক সঙ্গতির অনুপূরণ করাই দাবী করে না, পরন্তু সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত আদর্শের, ঐতিহ্যগত পাঠ্যবিষয়ের, এবং ঐতিহ্যগত শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলা পদ্ধতির এমন একটা পরিবর্তন সে চায় যে, যে পর্যন্ত না সমগ্র তরুণ সমাজ তার নিজ নিজ

আর্থিক ও সামাজিক বৃত্তির কর্তা হবার উপযুক্ত হয়, সে পর্যন্ত তাদের সকলকেই শিক্ষামূলক প্রভাবের অধীনে রাখা হোক। এই আদর্শ কাজে পরিণত করা সুদূরপরাহত হতে পারে, কিন্তু আমাদের সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই আদর্শ যদি ক্রমেই অধিকতর অধিকার না পায়, তা হলে শিক্ষার গণতান্ত্রিক আদর্শ একটা প্রহসনাত্মক, অথচ দুঃখজনক ভ্রান্তি হয়ে দাঁড়ায়।

যে সব বিচার-বিবেচনা এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট, তার ক্ষেত্রেও এই মূলনীতি খাটে। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ভীতি এবং যা কিছু আন্তর্জতিক হিংসা ও শত্রুতা উদ্দীপিত করে তা এড়ানোই যথেষ্ট নয়। ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে, যা কিছুই সহযোগী মানবিক অনুধাবন ও ফললাভের ক্ষেত্রে জনগণকে একত্রে বাঁধে, তার উপরে অবশ্যই জোর দিতে হবে। সকল মানুষের মধ্যে পূর্ণতর, স্বচ্ছন্দতর ও ফলপ্রসূ সঙ্ঘবদ্ধতা এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় সার্বভৌমতার গৌণ ও অস্থায়ী রূপকে ক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিরূপে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সকল প্রয়োগকে যদি শিক্ষা-দর্শনের বিবেচ্য বিষয় থেকে অতি দূরে অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে সে ধারণা প্রমাণ করবে যে, শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্বে যে ধারণার বিকাশ করা হয়েছে, তা পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়ত্তে আসেনি। শিক্ষার ধারণাটাই হল, সামাজিক লক্ষ্যের দিকে নির্দেশিত প্রগতি-শীল ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সামর্থ্যের বিমুক্তি সাধন। উক্ত সিদ্ধান্ত শিক্ষার এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত। এ না হলে শিক্ষার গণতান্ত্রিক নির্ণায়ক কেবল অসঙ্গতরূপেই প্রয়োগ করা যায়।

সারাংশ

যে হেতু শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সমাজও থাকে অনেক রকমের, সেই হেতু শিক্ষাসংক্রান্ত সমালোচনা ও গঠনের নির্ণায়ক কোনো এক বিশেষ সামাজিক আদর্শের কথা তোলে। কোনো সমাজ-জীবনের আকৃতির মূল্য নিরূপণের জন্য যে দুটি লক্ষণ বেছে নেওয়া হয়েছে, তা হল,—যে মাত্রায় সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে, এর সকল লোকেই অংশ গ্রহণ করে; এবং যে মাত্রায় এই

সমষ্টি অন্যান্য সমষ্টির সঙ্গে পূর্ণরূপে ও স্বাধীনভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। অন্য কথায়, একটা অবাঞ্ছনীয় সমাজ হ'ল, সেই সমাজ, যেটি স্বচ্ছন্দ মেলামেশা ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে "ভিতরে ও বাইরে" প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলে। যে সমাজ তার মঙ্গলাচরণের মধ্যে তার সকল সদস্যদের জন্যই সমান শর্তে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখে, এবং বিভিন্ন প্রকারের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রার ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা রাখে, সে সমাজ সেই মতোই গণতান্ত্রিক। এ রকম একটা সমাজকে অবশ্যই এমন এক ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা রাখতে হবে যা, বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সকলকেই একটা ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ দেয়, নিয়ন্ত্রণ দেয়, এবং এরূপ মানসতা সৃষ্টি করে যে, বিশৃঙ্খলা না এনেও সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।

এই দৃষ্টিকোণ নিয়ে তিনটি বিশিষ্ট ধরনের ঐতিহাসিক শিক্ষা-দর্শন বিচার করা হয়েছে। প্লেটোর দর্শনে যে আদর্শ দেখা যায়, তার আকার উপরোক্ত আদর্শের অনুরূপ ; কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে, এই আদর্শ ব্যক্তিকে সমাজের একক না করে, শ্রেণীকে সমাজের একক করতে গিয়ে নিজেকে ক্ষুণ্ণ করেছে। অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানালোকের তথাকথিত ব্যক্তিবাদিতার মধ্যে সমগ্র মানবজাতির মতোই বড়, একটা প্রশস্ত সামাজিক ধারণা ছিল, এবং ব্যক্তিকেই এর যন্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু সে আদর্শের বিকাশ সাধনের জন্য এর মধ্যে উপযুক্ত সংঘটক ছিল না ; প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল হওয়া এই উক্তির সাক্ষ্য দেয়। উনবিংশ শতকের প্রাতিষ্ঠানিক-আদর্শগত দর্শন জাতীয় রাষ্ট্রকে সংঘটক করে নিয়ে এই অভাব পূরণ করেছিল ; কিন্তু তা করতে গিয়ে সামাজিক লক্ষ্যের ধারণাকে এক-রাষ্ট্র-ভুক্ত লোকের মধ্যে কুক্ষিগত করেছিল, এবং ব্যষ্টিকে প্রতিষ্ঠানের অধীন রাখার ধারণাকে আবার প্রবর্তিত করেছিল।

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষাতত্ত্বে লক্ষ্যসন্ধান

১। একটা লক্ষ্যের স্বরূপ নির্ণয়

গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা করে যে ফল পাওয়া গেল, গোড়ার অধ্যায়গুলোতে লেখা শিক্ষার বর্ণনা ফলতঃ তারই পূর্বানুমান। কারণ সেখানে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিবর্গকে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে সমর্থ করা—কিম্বা এই যে, বিদ্যা-লাভের উদ্দেশ্য ও পুরস্কার হ'ল অবিরাম ক্রমবিকাশে সামর্থ্য লাভ করা। এখন কথা হল এই যে, যে সব ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদান পারস্পরিক, এবং যে সব ক্ষেত্রে ন্যায্যভাবে বণ্টিত স্বার্থাদি-প্রসূত প্রশস্ত উদ্দীপনা দ্বারা সামাজিক অভ্যাস ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন করার যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে, সে সব ক্ষেত্র ছাড়া উক্ত ধারণা সমাজের "সকলের" ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। প্রথমোক্ত ব্যবস্থার অর্থ গণ-তান্ত্রিক সমাজ। অতএব, শিক্ষার লক্ষ্যানুসন্ধানে, যে শিক্ষা শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার অধীন তার বাইরে কোনো উদ্দেশ্যের সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট নই। আমাদের পুরো ধারণাটাই তা নিষিদ্ধ করে দেয়। আমরা বরং, যে ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার কর্মপ্রণালীর মধ্যে ক্রিয়া করে, এবং যে ক্ষেত্রে লক্ষ্য বার থেকে দাঁড় করানো হয়, এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে বিচার করব। শেষোক্ত অবস্থা সেখানেই থাকতে বাধ্য যেখানে সামাজিক সম্পর্কগুলো ন্যায্যভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে না। কারণ এই অবস্থায় পূর্ণ সমাজ-সমষ্টির কতক কতক অংশ দেখতে পায় যে, তাদের লক্ষ্যগুলো স্থির হয় বাইরের হুকুমে, তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ ক্রমবিকাশ থেকে নয়, এবং তাদের নামধেয় লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজস্ব লক্ষ্য না হয়ে, হয়ে দাঁড়ায় অন্যদের অধিকতর দূরবর্তী উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন হ'ল, বার থেকে যোগানো লক্ষ্যের পরিবর্তে, একটা ক্রিয়াশীলতার মধ্যে যতটুকু লক্ষ্য থাকে তার প্রকৃতি নির্ধারিত করা।

যাকে শুধু 'ফলাফল' বলা হয়, তার সাথে 'উদ্দেশ্যের' পার্থক্য নিয়ে আমরা এই সংজ্ঞার দিকে এগোবো। যে কোনো শক্তি প্রকাশের মধ্যেই ফলাফল থাকে। বায়ু মরুভূমির বালুরাশি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করে; বালুকণাগুলি স্থানান্তরিত হয়। এ হ'ল একটা ফলাফল, একটা কাজের ফল, কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। কারণ এই পরিণতির মধ্যে এমন কিছু নেই, যা, এর আগে যা-কিছু হয়েছে তা সমাপ্ত, বা, পূর্ণ করে। এর মধ্যে কেবল স্থানিক পুনর্বণ্টন থাকে। এর এক অবস্থাও যা, আর এক অবস্থাও তা। কাজেই পূর্বের কোনো অবস্থাকে আরম্ভিক ও পরের কোনো অবস্থাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধি বলে বাছাই করে নেওয়ার এবং মধ্যবর্তী কোনো অবস্থাকে রূপান্তরিত বা উপলব্ধ প্রক্রিয়া বলে ধরে নেওয়ার ভিত্তি থাকে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বায়ুতে বালুকণা বিক্ষিপ্ত হয়ে যে পরিবর্তন ঘটে, তার সাথে মৌমাছিদের, ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য বিবেচনা করা থাক। মৌমাছিদের কাজের ফলাফলকে উদ্দেশ্যসিদ্ধি বলা যেতে পারে। কিন্তু তা এ কারণে নয় যে, ঐ কাজ পরিকল্পনা করা হয়েছে, বা জ্ঞাতসারে মনস্থঃ করা হয়েছে, পরন্তু সেটি এই কারণে যে, ওদের কাজের মধ্যে আগে যা ঘটেছে পরে সেটাই শেষ বা সম্পূর্ণ হয়। মৌমাছিরা যখন পরাগ সংগ্রহ করে, মোম তৈরী করে এবং কোষ নির্মাণ করে, তখন তার প্রতি ধাপই পরবর্তী ধাপের সূচনা করে। যখন কোষগুলো তৈরী হয়, রাণী মৌমাছি ঐগুলোর মধ্যে ডিম পাড়ে, ডিম পাড়া হয়ে গেলে কোষের মুখ বন্ধ করা হয়, এবং মৌমাছিরা ওগুলোতে তা দিতে থাকে, এবং ডিম ফোটবার জন্য ওগুলোকে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় রাখে। যখন ডিম ফুটে নতুন নতুন মৌমাছি বার হয়, তখন যে পর্যন্ত বাচ্চা মৌমাছিগুলো নিজেরাই নিজেদের যত্ন না নিতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত বড়োরা তাদের খাওয়াতে থাকে। এ সব বিষয়ের সঙ্গে আমরা এতো সুপরিচিত যে, আমরা যেন এ সব গ্রাহের মধ্যেই আনি না। কারণ আমরা বলি যে, জীবন আর সহজাত প্রবৃত্তি তো এক রকমের অলৌকিক ঘটনা। এই রকমের একটা ভাব নিয়ে আমরা আসল ঘটনাটার সারমর্ম দেখতে ব্যর্থ হই। সে ঘটনার সারমর্ম এই যে, এর প্রতিটি উপাদানের বিষয়গত স্থান ও ক্রমের তাৎপর্য রয়েছে; অর্থাৎ যে ভাবে প্রতিটি পূর্ববর্তী ঘটনা তার উত্তরাধিকারীর মধ্যে পরিচালিত হয়,

এবং এর ফলে যা যোগাড় হয়, উত্তরাধিকারী তা হাতে নিয়ে অন্য এক ধাপের জন্য তার সদ্ব্যবহার করে। এই ভাবে আমরা যে উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে উপনীত হই সেটি যেন একটা প্রক্রিয়া বা কর্মপ্রণালীর একটা সংক্ষিপ্তসার গড়ে দিয়ে সে সম্বন্ধে শেষ কথা বলে যায়।

যে হেতু উদ্দেশ্য সব সময়েই ফলাফলের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত, সেই হেতু লক্ষ্যের প্রশ্নে যা প্রথম দেখতে হবে তা হ'ল ন্যস্ত কাজের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ ও অপরিহার্য নিরবচ্ছিন্নতা আছে কিনা। তা যদি না থাকে, তা হ'লে এ কি কেবল পরপর কতকগুলো কাজের সমষ্টি অর্থাৎ প্রথমে একটা কাজ করা, পরে আর একটা কাজ করা? যখন শিক্ষার্থীর প্রতিটি কাজই মোটামুটিভাবে শিক্ষকের আদেশে করা হয়, যখন তার কর্মপরম্পরার একমাত্র ক্রম আসে আর একজনের দেওয়া নানা পাঠ ও নির্দেশ থেকে, তখন কোনো শিক্ষামূলক লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো কথা বলাই নিরর্থক। স্বতঃ-স্ফূর্ত আত্ম-প্রকাশের নামে খামখেয়ালী বা অসংলগ্ন কাজ করতে দেওয়াও লক্ষ্যের দিক দিয়ে সমভাবে মারাত্মক। লক্ষ্যের মধ্যে থাকে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত ক্রিয়াশীলতা, এমন এক কর্মতৎপরতা যার কার্যক্রম একটি প্রক্রিয়ার ক্রমাগত সমাপ্তিদ্বারা গঠিত। যেখানে ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে কালবিস্তার থাকে, এবং কাল পরম্পরার মধ্যে ক্রমাগত ক্রমবিকাশ থাকে, সেখানে লক্ষ্যের অর্থ দাঁড়ায় উদ্দেশ্যের বা সম্ভাব্য পরিসমাপ্তির আগেই তার পূর্বদৃষ্টি বা পরিণামদর্শিতা। যদি মৌমাছিরা তাদের কর্মতৎপরতার পরিণাম পূর্বানুমান করতে পারত, যদি তারা কাল্পনিক পূর্বদৃষ্টি সূত্রে তাদের উদ্দেশ্যের উপলব্ধি করতে পারত, তা হলে লক্ষ্যের মধ্যে মুখ্য উপাদানটি তাদের জানা থাকত। কাজেই যেখানকার অবস্থা ফলাফলকে ভবিষ্য দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে দেয় না, এবং কোন ক্রিয়াশীলতার পরিণতি কি হবে তা দেখার জন্য অগ্রে দৃষ্টিপাত করতে উদ্দীপিত করে না, সেখানে শিক্ষার বা যে কোনো কর্ম-ভারেরই লক্ষ্য নিয়ে কথা বলার কোনো অর্থ হয় না।

এর পরের কথা হ'ল, পূর্বদৃষ্ট উদ্দেশ্যরূপে যে লক্ষ্য থাকে, তা কর্ম-তৎপরতাকে নির্দেশিত করে; তা কেবল একজন দর্শকের অলস দৃষ্টি নয়। পরন্তু তা উদ্দেশ্যে পৌঁছাবার ধাপগুলোকে প্রভাবিত করে। পূর্বদৃষ্টি তিন প্রকারে ক্রিয়া করে। প্রথমতঃ, এর মধ্যে বর্তমান অবস্থাবলীর এমন একটা

সযত্ন পর্যবেক্ষণ থাকে যে, তা দিয়ে উদ্দেশ্য পৌছানোর প্রাপ্তব্য উপায়াদি পরিলক্ষিত হয় এবং পথের বাধাবিঘ্ন আবিষ্কৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, উপায় প্রয়োগ করার যথাযথ ক্রম বা পরম্পরার ধারণা আসে। বিচক্ষণ নির্বাচন ও ব্যবস্থার পথ সুগম হয়। তৃতীয়তঃ, পূর্বদৃষ্টির দ্বারা বিকল্প ব্যবস্থাদির নির্বাচন করা সম্ভব হয়। আমরা যদি এভাবে, বা ওভাবে কাজ করার পরিণতি আগেই দেখতে পারি, তাহলে তাকে দু' রকম ভাবে করার মূল্য তুলনা করতে পারি, এবং তার আপেক্ষিক বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধেও বিচার করতে পারি। আমরা যদি জানি যে, বদ্ধ-জলে মশা জন্মায় এবং মশা রোগবাহী, তা হলে, এর প্রত্যাশিত ফল অপচ্ছন্দ করি বলে সে অবস্থার প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও করতে পারি। যেহেতু আমরা কেবল বুদ্ধিমান দর্শকের মতো ফলের অনুমান করি না, পরন্তু এর পরিণতির সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট থাকি, সেই হেতু, যে প্রক্রিয়া ফলাফল আনে, আমরা সেই প্রক্রিয়ার অংশগ্রাহী হই এবং এ-ফল বা সে-ফল ঘটানোর জন্য আমরা হস্তক্ষেপও করি।

অবশ্য এই তিনটি বিষয় পারস্পরিক ভাবে নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত। কেবল বর্তমান অবস্থাদির সযত্ন সমীক্ষা দ্বারাই আমরা নিশ্চিতরূপে ফলাফলকে আগে থেকে জানতে পারি, এবং এই সমীক্ষার পরিণতির গুরুত্বই পর্যবেক্ষণ করার প্রেষণা যোগায়। আমাদের পর্যবেক্ষণ যতো পর্যাপ্ত হয়, নানাবিধ অবস্থা এবং বাধাবিঘ্নের চিত্রও ততোই নজরে পড়ে, এবং যে সব বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে থেকে বাছাই করতে হবে, তার সংখ্যাও বেড়ে চলে। পরিস্থিতির স্বীকার্য সম্ভাবনাদি বা কাজের বিকল্প ব্যবস্থাদি যতো বাড়ে, নির্বাচিত কাজটার অর্থও ততো বাড়ে; এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার পথও ততো বেশী নমনীয় হয়। যেখানে কেবল একমাত্র পরিণতির কথাই ভাবা হয়েছে, সেখানে চিন্তা করার আর কিছু থাকে না, এবং কাজটার অর্থও থাকে সীমাবদ্ধ। একজনে কেবল ঐ নিশানাটার দিকেই ধেয়ে যায়। কোনো কোনো সময়ে এ রকমের সঙ্কীর্ণ কাজের ধারা সফলও হয়। কিন্তু যদি অপ্রত্যাশিত বাধাবিঘ্ন এসে পড়ে, তাহলে সম্পূর্ণ কার্যক্ষেত্রের সম্ভাবনাগুলিকে বিস্তারিত ভাবে নিরীক্ষা করে নিয়ে যদি একজন কাজে লেগে যেত, তাহলে যতোখানি সঙ্গতি তার থাকতো এ ক্ষেত্রে ততোখানি সঙ্গতি তার আয়ত্তে থাকবে না। এ অবস্থায় সেই লোক নিজে তৎপর হয়ে কোনো প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস

করতে পারে না।

মোট সিদ্ধান্ত এই যে, একটা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করাও যা, বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করাও ঠিক তাই। একটা কাজের শেষভাগ আগেই দেখে নেওয়ার অর্থ এমন একটা ভিত্তি পাওয়া, যার উপরে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচন করা সহজ হয়, এবং বিবিধ উপকরণ ও নিজেদের সামর্থ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে খাটানো যায়। এ সব করার অর্থ দাঁড়ায় একটা মনের অধিকারী হওয়া,—কারণ মন হল যথাযথ সেই অভিপ্রেত, উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াশীলতা, যা তথ্যাদির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও পারস্পরিক সম্বন্ধ দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। একটা কাজ করতে মনস্থঃ করার অর্থ, একটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আগে থেকেই দেখতে পাওয়া, কাজটা সম্পাদন করার একটা পরিকল্পনা থাকা, এবং যে সব পন্থা কাজটিকে সম্পন্ন করার উপযোগী বা তার পরিপন্থী সে সব দেখতে পাওয়া। কিম্বা সেটি যদি কাজ করবারই মন হয় এবং একটা অস্পষ্ট উৎকাঙ্ক্ষা না হয়,—তা হলে এমন পরিকল্পনার দরকার যেটি বিভিন্ন সঙ্গতি বা বাধা-বিপত্তির হিসাব রেখে দেয়। বর্তমান অবস্থাকে ভবিষ্যতের এবং ভবিষ্যৎ পরিণামকে বর্তমানের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে দেখবার ক্ষমতাই হল, —মন। এবং একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকার অর্থ হল ঠিক ঠিক এই লক্ষণগুলোই থাকা। যে পরিমাণে একজন লোক কোনো কাজে হাত দিয়ে জানে না যে সে কি করছে, অর্থাৎ জানে না কাজটার সম্ভাব্য পরিণাম কি হবে, সে লোক ঠিক সেই পরিমাণেই মূঢ়, অন্ধ বা নির্বোধ,—মনের অভাবগ্রস্ত। যখন কেউ পরিণতি সম্বন্ধে প্রয়োজনাতিরিক্ত শিথিল অনুমান নিয়ে নিজেকে তুষ্ট রাখে, ভাগ্যের আকস্মিকতায় ভর করে, কিম্বা, তার নিজের সামর্থ্যসহ আসল ব্যবস্থাগুলো বিবেচনা না করেই পরিকল্পনা গঠন করে, তখন তার বুদ্ধিবৃত্তি অসম্পূর্ণ। মনের এই আপেক্ষিক অনুপস্থিতির অর্থ দাঁড়ায়, যা ঘটতে চলেছে আবেগানুভূতি দিয়ে তার ওজন করা। বুদ্ধিমান হতে হলে কাজের পরিকল্পনা করার কালে আমাদিকে "থামতে হবে, দেখতে হবে, এবং শুনতে" হবে।

কাজ করাকে একটা লক্ষ্য ও বুদ্ধিগত ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে একাত্ম করা কাজের মূল্যায়নের পক্ষে যথেষ্ট,—এই মূল্য হল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এর কৃত্য কর্ম। বিমূর্ত বিশেষ্য "সচেতনতা"কে একটা মূর্ত সত্তা বানাতে আমরা

খুবই তৎপর। আমরা ভুলে যাই যে, শব্দটা আসে "সচেতন" বিশেষণ থেকে। আমরা যে কাজে ব্যাপৃত থাকি সে সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকার নামই সচেতন থাকা; "সচেতন" শব্দটি, একটা ক্রিয়াশীলতার সুবিবেচিত, পরিলক্ষিত ও পরিকল্পনা মূলক লক্ষ্য সূচিত করে। আমাদের সচেতনতা এমন কিছু নয় যা অলসভাবে চারিদিকের দৃশ্যের প্রতি চেয়ে থাকে, বা, যার উপরে ভৌত পদার্থের ছাপ পড়তে থাকে; এ হল একটা ক্রিয়াশীলতার উদ্দেশ্যপূর্ণ গুণের নাম, একটা লক্ষ্য দিয়ে যা নির্দেশিত হচ্ছে, তারই নাম। অন্যভাবে বলতে গেলে, একটা লক্ষ্য থাকা মানে একটা তাৎপর্য নিয়ে কাজ করা, একটা স্বয়ংচল যন্ত্রের মতো কাজ করা নয়। এ হল একটা কিছু কাজ করতে "মনস্থ" করা, এবং এই অভিপ্রায়ের আলোতে বিষয়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

২। শুভ উদ্দেশ্যের নির্ণায়ক

নির্ভুলভাবে উদ্দেশ্য স্থিরীকরণে যে নির্ণায়ক থাকে, তার বিবেচনায় আমরা উপরোক্ত আলোচনার ফলাফল প্রয়োগ করতে পারি। (১) যে লক্ষ্য ধার্য করা হবে তা যেন বর্তমান অবস্থাবলী থেকে উদ্‌ভিন্ন হয়। বর্তমানে যা চলেছে তার বিবেচনার উপরে এবং বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গতি ও বাধা বিপত্তির উপরেই এর ভিত্তি থাকবে। আমাদের ক্রিয়াকলাপের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বলিত বিভিন্ন শিক্ষা ও নীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব এই মূল নিয়মটিকে অমান্য করে। ঐ সব তত্ত্ব ধরে নেয় যে, উদ্দেশ্য আমাদের ক্রিয়াকলাপের বাইরে অবস্থিত; ধরে নেয় যে, উদ্দেশ্য পরিস্থিতির মূর্ত গড়নের কাছে বিজাতীয় এবং বাইরের প্রভাব থেকে নির্গত। এ অবস্থায় সমস্যা দাঁড়ায় বার থেকে যোগানো উদ্দেশ্যের অর্থোপলব্ধির জন্য আমাদের ক্রিয়াকলাপকে নিয়োজিত করা। উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় এমন কিছু, যার জন্যে আমাদের কাজ করা "উচিত"। যে ভাবেই হোক, ঐ ধরনের "লক্ষ্য" আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সীমিত রাখে; ঐ সব লক্ষ্য ভবিষ্য-দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ, এবং বিকল্প সম্ভাবনাদির মধ্যে যা ভালো তার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মনের বহিঃপ্রকাশ নয়। বুদ্ধিবৃত্তি এই কারণে সীমিত হয় যে, পূর্ব-প্রস্তুত হয়ে আসে বলে, বুদ্ধিবৃত্তির বাইরে অবস্থিত কোনো হুকুমত দিয়ে ওগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে হয়, এবং এ অবস্থায় লক্ষ্য পূরণের

জন্য একটা যান্ত্রিক উপায় বাছাই করা ছাড়া মনের আর কোনো গতি থাকে না।

(২) কথাটা এমনভাবে বলা হল যেন লক্ষ্য পুরণের চেষ্টার আগেই একটা লক্ষ্য পুরাপুরি গড়ে উঠতে পারে। এ ধারণাকে এখন সীমিত করা দরকার। কোনো লক্ষ্য প্রথমে যে আকারে জাগে তা কেবল একটা পরীক্ষামূলক রূপরেখা। একে পূরণ করার প্রচেষ্টাই এর মূল্য পরখ করে। যদি এই রূপরেখা কৃতকার্যতা সহকারে কর্মতৎপরতা নির্দেশিত করার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তা হ'লে আর কিছুর দরকার হয় না। কারণ এর যা কিছু করণীয় তা হল আগে থেকে একটা নিশানা ঠিক করা। এবং কখনো কখনো শুধু একটা সঙ্কেত পাওয়াই এর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সাধারণতঃ,—অন্তত জটিল পরিস্থিতিতে –ঐ রূপরেখা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে, এমন সব অবস্থা নজরে আসে যা আগে চোখে পড়েনি। এতে প্রাথমিক লক্ষ্যের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হয় ; এর সঙ্গে কিছু যোগ বা এর থেকে কিছু বাদ দিতে হয়। কাজেই একটা লক্ষ্যকে নিশ্চয়ই নমনীয় হতে হবে এবং অবস্থাগতিকে তাকে রদ-বদল হওয়ার যোগ্যও হতে হবে। কর্ম-প্রণালীর বার থেকে যে উদ্দেশ্য স্থির করা হয়, তা সব সময়েই অনমনীয় থাকে। বার.থেকে জুড়ে বা চাপিয়ে দেওয়াতে, পরিস্থিতির মূর্ত শর্তাদির সাথে এর কোনো কার্যকারী সম্বন্ধ থাকার যুক্তি থাকে না, এবং কাজ চালিয়ে যাওয়ার পথে যা কিছু ঘটে তা একে না দেয় স্বীকৃতি, না করে খণ্ডন, এবং না আনে পরিবর্তন। এ রকম উদ্দেশ্যের উপর কেবল জোর করাই চলে, অর্থাৎ সে উদ্দেশ্যকে কেবল চাপিয়ে দেওয়াই চলে। অবস্থার সঙ্গে তার খাপ খায় না বলে যে ব্যর্থতা আসে, তার জন্য দায়ী করা হয় অবস্থাদির বিকৃতিকে। কিন্তু ঐ অবস্থাতে উদ্দেশ্যটাই যে যুক্তিসঙ্গত নয়, তার উপরে দোষ পড়ে না। বিপরীতপক্ষে একটা বৈধ লক্ষ্যের মূল্য এই যে, আমরা তার সাহায্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলাতে পারি। সে লক্ষ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে কাজ করার এমন একটা পদ্ধতি যে, তা দিয়ে ঐ অবস্থার মধ্যে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন আনা যায়। একজন কৃষিজীবী জিনিসপত্র যে অবস্থাতে দেখতে পায়, নিষ্ক্রিয়ভাবে ঠিক সেই অবস্থাতেই তাকে মেনে নিয়ে যতো বড়ো ভুল করে, আর একজনে মাটি, আবহাওয়া, ইত্যাদি অনুযায়ী যা সম্ভব

তা পুরাপুরি উপেক্ষা করে পরিকল্পনা করতে গিয়েও ঠিক ততো বড়ো ভুলই করে। শিক্ষার বিমূর্ত ও সুদূরপরাহত লক্ষ্য রাখার একটা দোষ হল এই যে, কার্যক্ষেত্রে এর অপ্রয়োগশীলতা হাতের কাছে পাওয়া অবস্থা-দিকে এলোমেলোভাবে ছিনিয়ে এনে কাজে লাগাতে গিয়ে একটা প্রতিক্রিয়া আনে। কিন্তু একটা উত্তম লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার বর্তমান অবস্থা নিরীক্ষা করে, এবং তার জন্যে একটা পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা গঠন করে নিয়ে সেই পরিকল্পনার উপর অনবরত নজর রাখে, এবং অবস্থার যেমন যেমন বিকাশ হতে থাকে পরিকল্পনাকেও তেমনি তেমনি পরিবর্তন করতে থাকে। সংক্ষেপে, লক্ষ্য হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক। এবং কাজের সূত্রে এর যেভাবে পরীক্ষা চলতে থাকে, সেইভাবেই এটি বাড়তে থাকে।

(৩) একটি লক্ষ্যকে সর্বদাই কর্মতৎপরতা-মুক্তির প্রতীক হতে হবে। দৃশ্যমান উদ্দেশ্য কথাটা ইঙ্গিতপূর্ণ, কারণ এটি মনের সামনে কোনো একটা প্রক্রিয়ার শেষ বা সমাপ্তিকে তুলে ধরে। যে লক্ষ্যবস্তুতে একটা ক্রিয়াশীলতা শেষ হয়, তা আমাদের সামনে রাখাই হল ঐ ক্রিয়াশীলতার সংজ্ঞার্থ দেবার একমাত্র উপায়। যেমন, গুলি করার ক্ষেত্রে একজনের লক্ষ্য হল নিশানা। কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, "লক্ষ্যবস্তুটা" শুধু একটা মার্কা বা চিহ্ন। এর সাহায্যে একজনে যে "কাজটা" করতে চায়, মন তাকে সুনির্দিষ্ট করে। আসলে নিশানা নয়,—নিশানাটিকে "ভেদ করাই" হল দৃশ্যমান উদ্দেশ্য। নিশানাটার সাহায্যে লক্ষ্য স্থির করা হয় বটে কিন্তু বন্দুকে রেখে দৃষ্টির সাহায্যও লাগে। যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা হয় তা হ'ল কর্মতৎপরতাকে "নির্দেশিত" করার উপায়। ধরা যাক যেন এক-জনে একটা খরগোশের উপর লক্ষ্য স্থির করছেন। তিনি যা চান তা হ'ল সিধা করে গুলি করা। এ হল এক রকমের ক্রিয়াশীলতা। কিম্বা তিনি যদি খরগোশটাকেই চান, তা হলেও খরগোশটা তার ক্রিয়াশীলতা থেকে আলাদা থাকে না, পরন্তু তার ক্রিয়াশীলতার উপাদানরূপেই থাকে। অথবা তিনি খরগোশটাকে খেতে চান, কিম্বা লক্ষ্যভেদে তার প্রতিষ্ঠার সাক্ষীরূপে দেখাতে চান; ফলে তিনি ওটা দিয়ে একটা কিছু করতে চান, —উদ্দেশ্য, জিনিসটা দিয়ে কিছু করা, আলাদা ভাবে জিনিসটা নয়। বস্তুতঃ লক্ষ্যবস্তুটা সক্রিয় উদ্দেশ্যের—অর্থাৎ, সফলতার সহিত কর্মধারা চালিয়ে

যাওয়ার,—একটা ক্রমপর্যায় মাত্র। উপরে ব্যবহৃত "কর্মতৎপরতা—মুক্তির" অর্থ হল এই।

কোনো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে যে ক্রিয়াশীলতা চালু থাকে, তার সঙ্গে ক্রিয়াবিচ্যুত চাপানো উদ্দেশ্যের নিশ্চল প্রকৃতির বৈসাদৃশ্য লক্ষণযোগ্য। একে সর্বদাই অচলায়তনরূপে ধারণা করা হয়; এ এমন "কোনো জিনিস" যা জোটাতে হবে এবং রাখতে হবে, এ রকম আবছা ধারণা থাকলে, ক্রিয়াশীলতা যেন অন্য কিছু করার অনিবার্য উপায় হয়ে দাঁড়ায়; তার নিজের কোনো তাৎপর্য বা গুরুত্ব থাকে না। উদ্দেশ্যের সঙ্গে তুলিত হলে এ কেবল একটা অবশ্যকীয় পাপ বলে মনে হবে; এমন একটা কিছু, লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছোতে গেলে যার ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। কারণ এখানে লক্ষ্য বস্তুই সারবস্তু। অন্যভাবে বললে, একটি লক্ষ্যের বাহ্যিক ধারণা উদ্দেশ্য থেকে উপায়কে পৃথক করে; অথচ যে উদ্দেশ্য একটি কর্মতৎপরতার মধ্যে তার নির্দেশের জন্য পরিকল্পনারূপে বিকাশ লাভ করে, সেটিই একাধারে উদ্দেশ্য ও উপায়। এদের পৃথক রাখা হয় কেবল সুবিধার জন্য। যে পর্যন্ত না সম্পন্ন হয় সে পর্যন্ত, প্রতিটি উপায়ই এক একটি অস্থায়ী উদ্দেশ্য, এবং যখনই তা সম্পন্ন হয়, তখনই কর্মতৎপরতাকে আরও বাড়ানোর জন্য সিদ্ধ-উদ্দেশ্যটি উপায়ে পরিণত হয়। যে ক্রিয়াশীলতার মধ্যে আমরা নিযুক্ত থাকি, তখন "যা-কিছু" তার ভবিষ্যৎ নির্দেশকে চিহ্নিত করে, তাকে বলি উদ্দেশ্য. আবার যখন "সেই কিছু" বর্তমান নির্দেশকে চিহ্নিত করে, তখন তাকে বলি উপায়। উপায় ও উদ্দেশ্যের ছাড়াছাড়ি যে পরিমাণে ঘটে, কর্ম-তৎপরতার তাৎপর্য সেই পরিমাণে কমে যায় এবং একে এমন একটা এক-ঘেয়ে খাটুনিতে পরিণত করতে উদ্যত হয় যে, তার থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচা যায়। একজন কৃষিজীবীকে তার কৃষিকাজের তৎপরতা চালানোর জন্য উদ্‌ভিদ্ ও প্রাণীকে ব্যবহার করতে হয়। উদ্‌ভিদ্ ও প্রাণীর উপর তার টান আছে কিনা, কিম্বা, যাতে কেবল তার একার স্বার্থ আছে, সে রকম কিছুর জন্য তাকে যে সব উপায় অবলম্বন করতে হয়, উদ্‌ভিদ্ এবং প্রাণীকেও সে সেই রকমই মনে করে কিনা, তার উপরে তার জীবন যাত্রাতে অনেক পার্থক্য হবে। প্রথম অবস্থাতে তার কাজের সম্পূর্ণ ধারাটাই তাৎপর্যপূর্ণ হবে; এর প্রতি ধাপেরই নিজ নিজ মূল্য থাকবে; প্রতি ধাপেই

তার উদ্দেশ্যপূরণের একটা অভিজ্ঞতা থাকবে। কারণ স্থগিত লক্ষ্য বা শেষ উদ্দেশ্যটি, তার ক্রিয়াশীলতাকে পূর্ণভাবে ও স্বচ্ছন্দরূপে চালু রাখার জন্য একটা অগ্রদৃষ্টি মাত্র। কারণ যদি যে অগ্রে দৃষ্টি না রাখে তাহলে তাকে খুব সম্ভব থেমে যেতে হবে। একটি ক্রিয়াশীলতার অন্য যে কোনো অংশের মতো, লক্ষ্যও নিশ্চিতরূপে কাজের একটা "উপায়" মাত্র।

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ

শিক্ষার উদ্দেশ্যের কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই। এ যে-কোনো নির্দেশিত বৃত্তির উদ্দেশ্যের মতো। কৃষকের মতো শিক্ষকেরও কিছু করার থাকে; যা দিয়ে করতে হয় সে রকমের কিছু সঙ্গতি থাকে এবং যার সাথে যুঝতে হয় সে রকমের কিছু বাধা-বিপত্তিও থাকে। যে সব অবস্থা নিয়ে কৃষককে কাজ করতে হয়, তা সঙ্গতিই হোক আর বাধা-বিপত্তিই হোক, সেগুলোর নিজ নিজ গঠন ও ক্রিয়া থাকে এবং কৃষকের নিজের কোনো উদ্দেশ্য থেকে স্বতন্ত্রভাবেই ওসব থাকে। বীজে অঙ্কুর হয়, বৃষ্টি পড়ে, সূর্য আলো দেয়, পোকায় খায়, উদ্ভিদের ক্ষয়রোগ হয়, ঋতুর পরিবর্তন হয়। কৃষকের লক্ষ্য কেবল এই সব নানাবিধ অবস্থাকে কাজে লাগানো। তার নিজের ক্রিয়া-কলাপ ও ওদের শক্তির মধ্যে একের বিরুদ্ধে অন্যকে না লাগিয়ে, সব কিছুকে এক সঙ্গে কাজ করানো। জমি, আবহাওয়া, উদ্ভিদের বৃদ্ধি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক না রেখে যদি কৃষক কৃষির একটা উদ্দেশ্য দাঁড় করায়, তবে তার কোনো অর্থ হবে না। তার সহজ উদ্দেশ্য হ'ল তার নিজের কর্মশক্তির সঙ্গে তার চতুষ্পার্শের শক্তিপুঞ্জের যোগসূত্র আগেই দেখা; এবং তার দৈনন্দিন গতিবিধিকে নির্দেশিত করার জন্য এই দেখাকে কাজে লাগানো। সম্ভাব্য পরিণামের অগ্রদৃষ্টি তাকে যে সব জিনিস নিয়ে কাজ করতে হবে তাদের প্রকৃতি ও কার্যোপযোগিতার সযত্ন ও ব্যাপক পর্যবেক্ষণের কাজে, এবং একটা পরিকল্পনার, অর্থাৎ যে সব কাজ করতে হবে তার একটা কার্যক্রম তৈরী করায়, কাজে পরিচালিত করে।

পিতামাতাই হ'ন আর শিক্ষকই হ'ন, শিক্ষাবিদের পক্ষেও এই একই কথা। সংশ্লিষ্ট অবস্থার ধার না ধেরে কৃষকের পক্ষে যেমন কৃষির একটা

আদর্শ খাড়া করার কোনো অর্থ হয় না, শিক্ষাবিদের পক্ষেও তেমনি শিশু-দের ক্রমবিকাশের যথার্থ লক্ষ্য বস্তুরূপে তার "নিজের" উদ্দেশ্য দাঁড় করানোর অর্থ হয় না। একটা বৃত্তি চালু রাখতে যে সব পর্যবেক্ষণ, অনুমান ও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, একটা লক্ষ্য থাকার অর্থ হ'ল, সে সব করার দায়িত্ব গ্রহণ করা, তা সে কৃষির কাজই হোক আর শিক্ষার কাজই হোক। মুহূর্তের পর মুহূর্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা ক্রিয়া চালিয়ে যাবার জন্য পর্য-বেক্ষণ, মনোনয়ন ও পরিকল্পনা করতে ঐ লক্ষ্য যতোটা সাহায্য করে সেই লক্ষ্যের ততোটাই মূল্য থাকে। অন্য দিকে যদি সেই লক্ষ্য একজনের সাধারণ বুদ্ধির পথ রোধ করে, তাতে ক্ষতিই হবে (বার থেকে চাপানো বা হুকুমতি সূত্রে পাওয়া লক্ষ্য নিশ্চিতরূপে এই ভাবেই ক্ষতি করে)।

আমাদের মনে রাখা ভালো যে, শিক্ষার নিজ অর্থে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই। উদ্দেশ্য থাকে কেবল লোকেদের, পিতামাতাদের ও শিক্ষক-দের—শিক্ষার মতো একটা বিমূর্ত ধারণা তাদের থাকে না। কাজেই তাদের উদ্দেশ্যগুলো অনির্দিষ্টরূপে বিচিত্র থাকে, যেমন থাকে বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে। শিশুরা যেমন যেমন বাড়ে তেমনি তেমনি তারা বদলাতে থাকে। আর শিশুদের যিনি শিক্ষা দেন, তাঁর অভিজ্ঞতা বদলানোর সাথে তিনিও বদলাতে থাকেন। এমন কি, শব্দে বা কথায় যার রূপ দেওয়া যায়, সে রকমের সর্বাধিক বৈধ উদ্দেশ্যও, শুধু শব্দের অর্থরূপে, ভালোর থেকে মন্দই বেশী করে, যদি এটা বুঝে না নেওয়া হয় যে, ঐ শব্দাবলী উদ্দেশ্য নয়, বরং কিভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, কি ভাবে অগ্রে দৃষ্টি রাখতে হয়, এবং যে মূর্ত পরিস্থিতির মধ্যে ঐ সব উদ্দেশ্য থাকে, সেই পরিস্থিতির শক্তি-পুঞ্জকে মুক্ত ও নির্দেশিত করার জন্য কি ভাবে বাছাই করতে হয়,—ঐ শব্দাবলী তারই সঙ্কেত। সাম্প্রতিক কালের একজন লেখক যেমন বলেছেন, "কি করে বালকটিকে গোয়েন্দার গল্পের পরিবর্তে স্কটের উপন্যাস পড়ানো যায়, এই বালকটিকে সেলাই শেখানো যায়, "জন"-এর মেজাজ থেকে কি করে উৎপীড়ন করার অভ্যাস দূর করা যায়, কি করে ঐ শ্রেণীকে চিকিৎসা বিদ্যা পড়ানোর উপযুক্ত করা যায় ইত্যাদি শিক্ষার মূর্ত কাজের মধ্যে আমাদের সম্মুখে যে কোটি কোটি উদ্দেশ্য রয়েছে, এই কটা উদাহরণ তারই নমুনা।"

এই সব গুণ-বৈষম্য মনে রেখে শিক্ষার সকল উদ্দেশ্যের মধ্যেই যে সব

বিশিষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হয়, আমরা এখন তার কয়েকটার কথা বলব। (১) যাকে শেখাতে হবে তার মৌলিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রয়োজনের (আদি সহজাত প্রবৃত্তি এবং শিক্ষা-লব্ধ অভ্যাস সহ) ভিত্তির উপরেই শিক্ষার লক্ষ্য স্থাপিত হবে। আমরা দেখেছি যে, প্রস্তুতি-জাতীয় লক্ষ্যের ঝোঁক হ'ল বর্তমান ক্ষমতাকে বাদ দিয়ে, কোনো সুদূর কৃতি ও দায়িত্বের মধ্যে লক্ষ্যকে দেখা। সাধারণতঃ, পূর্ণবয়স্কদের অন্তরে যে সব বিচার বিবেচনা প্রিয় সেগুলিকে গ্রহণ করারই ধাত থাকে, এবং যাদের শেখাতে হবে তাদের সামর্থ্যের ধার না ধেরেই ঐ সব বিচার বিবেচনাকে উদ্দেশ্য বলে দাঁড় করানো হয়। আবার এ রকম সব লক্ষ্য উপস্থাপিত করারও ঝোঁকও দেখা যায় যে, সেগুলো এতোই এক জাতীয় যে তাতে ব্যক্তি বিশেষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষমতা ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়। এ কথা মনে থাকে না যে, সব রকমের শিক্ষা-লাভই এমন একটা কিছু, যেটি শিক্ষার্থীর পক্ষে স্থান ও কাল অনুযায়ী ঘটে। অপরিণতদের সক্ষমতা ও অক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করে তারা কি হ'তে পারে তা স্থির করবার জন্য পরিণত বয়স্কদের উপলব্ধির বৃহত্তর পাল্লা অতীব মূল্য-বান। যেমন একজন সাবালকের শিল্পীসুলভ সামর্থ্য একটি নাবালকের কোনো কোনো ঝোঁকের সম্ভাব্য যোগ্যতাকে প্রদর্শন করাতে পারে। আমাদের কাছে যদি পূর্ণবয়স্কদের কৃতি না থাকত, তাহলে আমরা ছবি আঁকা, পুন-রুৎপাদন করা, প্রতিমা গড়া, রং লেপা ইত্যাদি শৈশবকালীন ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে পারতাম না। এই ভাবেই বড়োদের ভাষার ভিত্তি ছাড়া আমরা নবজাত শিশুর কলকলানির আবেগের তাৎপর্য বুঝতে পারতাম না। কিন্তু শৈশব ও যৌবনের ক্রিয়াকলাপ পূর্ণবয়স্কদের বিভিন্ন সুকৃতির প্রসঙ্গে স্থাপন করে নিরীক্ষা করা এক কথা, আর যাদের শেখানো হয় তাদের ক্রিয়াকলাপ অগ্রাহ্য করে বড়োদের সুকৃতিকে অনড় লক্ষ্যরূপে দাঁড় করানো একেবারে অন্য কথা।

(২) একটা লক্ষ্যকে এমন হতে হবে যাতে সেটি শিক্ষাধীনদের ক্রিয়া-কলাপের সাথে সহযোগিতা করতে পারে,—এমন একটি পদ্ধতির মধ্যে রূপা-য়িত হবার যোগ্য হয়। তাকে এমন এক পরিবেশের সন্ধান দিতে হবে "যেটি" শিক্ষাধীন লোকদের সামর্থ্যকে মুক্ত ও সংগঠিত করার উপযুক্ত। যদি একটা লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গঠনে সহায়ক না হয়, যদি এই কার্যক্রম বিভিন্ন

লক্ষ্যকে পরীক্ষা, সংশোধন ও বিবর্ধন না করে, তা হলে ঐ লক্ষ্য হবে মূল্যহীন। এ ধরনের লক্ষ্য শিক্ষাদানের ন্যস্ত কাজের সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে, উপস্থিত পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ ও পরিশোধনের কাজে সাধারণ বিচার বুদ্ধিকে রুদ্ধ করে দেয়। আর অনড় উদ্দেশ্যের সাথে যা যা খাপ খায় তাদের ছাড়া আর সব কিছুকেই স্বীকৃতির বাইরে রাখার পক্ষে ক্রিয়া করে। প্রতিটি অনমনীয় লক্ষ্যই মূর্ত অবস্থার প্রতি সযত্ন মনোযোগকে নিষ্প্রয়োজন করে তুলতে চায়। যেহেতু যেভাবেই হোক একে খাটাতেই হবে, সেই হেতু যা ধর্তব্যের মধ্যে নয় তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা কি? বার থেকে চাপানো উদ্দেশ্যের যে পাপ তার মূল রয়েছে গভীরে। শিক্ষকেরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ওগুলো পায়, আর কর্তৃপক্ষেরা পায় সমাজে যা প্রচলিত রয়েছে তার থেকে। শিক্ষকেরা ওগুলো চাপিয়ে দেন শিশুদের উপরে। এর প্রথম পরিণাম এই যে, শিক্ষকের বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীনভাবে কাজে করে না, উপর থেকে যা লিখে দেওয়া হয়েছে তার পরিগ্রহণের মধ্যেই তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি বন্দী থাকে। শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে কর্তৃত্বশীল পরিদর্শকের হুকুম, পদ্ধতি সম্বন্ধীয় পাঠ্যপুস্তক, নির্দিষ্ট পাঠক্রম, ইত্যাদি থেকে এতো কম মুক্ত থাকেন যে, তিনি শিক্ষার্থীর মন ও বিষয়বস্তুর উপর নিবিড়ভাবে কোনো মনোযোগ দিতে পারেন না। শিক্ষকের অভিজ্ঞতার প্রতি এই অনাস্থা, তখন শিক্ষার্থীদের সাড়ার প্রতি অনাস্থাতে প্রতিফলিত হয়। বার থেকে দু-তিন বার করে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্দেশ্য পরিগ্রহণ করে। এবং যে সব উদ্দেশ্য তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, আর যেগুলো তাদের মেনে নিতে হয়, এ দু'য়ের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তারা অনবরত বিভ্রান্ত হতে থাকে। যে পর্যন্ত প্রতিটি ক্রমবিকাশমান অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের গণতান্ত্রিক নির্ণায়ককে স্বীকৃতি দেওয়া না হয়, সে পর্যন্তই আমরা বহিরাগত লক্ষ্যের প্রতি উপযোগিতার দাবীতে বুদ্ধির দিক দিয়ে বিভ্রান্ত হতে থাকব।

(৩) যাকে সাধারণ ও শেষ উদ্দেশ্য বলা হয় শিক্ষাবিদদের তা থেকে সতর্ক থাকতেই হবে। অবশ্য প্রতিটি ক্রিয়াশীলতা, তা সে যতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণই হোক না কেন, তার শাখা-প্রশাখা সূত্রে সাধারণ রূপ নেয়। কারণ তা অনির্দিষ্টরূপে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। একটি সাধারণ ধারণা যে পরিমাণে

এই সব যোগসূত্রের প্রতি আমাদিকে সজীব রাখে, সেই পরিমাণেই তা সাধারণ। কিন্তু সাধারণ শব্দে "বিমূর্ত"ও বোঝায়, অর্থাৎ যা বিশিষ্ট প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত। এবং এই বিমূর্ততার অর্থ দূরবর্তিতা। এটি আমাদিকে উপায়-বিচ্যুত উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুতিকল্পে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করার ধারণাতে আবার ফিরিয়ে আনে। আক্ষরিক অর্থে এবং সকল সময়েই শিক্ষা যে তার নিজেরই পুরস্কার, এ কথার অর্থ এই যে, কোনো শিক্ষা বা শৃঙ্খলাই শিক্ষামূলক নয়, যদি তা নিজগুণেই এবং অব্যবহিতভাবে সার্থক না হয়। একটি যথার্থ সাধারণ লক্ষ্য দৃষ্টিভঙ্গী প্রশস্ত করে। একজনকে অধিক সংখ্যক পরিণাম বা যোগসূত্র গ্রহণ করতে উদ্দীপিত করে। এর অর্থ, বিভিন্ন উপায়ের অধিকতর প্রশস্ত ও নমনীয় পর্যবেক্ষণ। একজন কৃষক পারস্পরিক ক্রিয়াশীল শক্তিপুঞ্জের যতো বেশী হিসাব রাখবে, তার সঙ্গতিও ততো বেশী বিচিত্র প্রকারের হবে। কাজ আরম্ভ করার জন্য সে সম্ভাব্য অনেক ক্ষেত্র দেখতে পাবে, এবং সে যা করতে চায় তা করার জন্য বেশী পথ খুঁজে পাবে। সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কৃতি সম্বন্ধে একজনের ধারণা যতো বেশী সম্পূর্ণ থাকে, অল্প কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে তার ক্রিয়াশীলতা ততোই কম বাঁধা থাকে। একজনে যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে জানে, তা হলে সে প্রায় যে-কোনো জায়গা থেকেই কাজ আরম্ভ করতে পারে, এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ও সফলতার সহিত তার কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে।

অতএব, যাকে সাধারণ বা ব্যাপক লক্ষ্য বলা হয় তা বর্তমান ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত ভাবে নিরীক্ষা করার অর্থে বুঝে নিয়ে, আমরা এখন আজকালকার শিক্ষাতত্ত্বে সে সব বৃহত্তর উদ্দেশ্য চল হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটিকে হাতে নেব, এবং দেখব যে ঐ সব উদ্দেশ্য অব্যবহিত, মূর্ত ও বহুমুখী লক্ষ্যগুলির উপরে কি ধরনের আলোকপাত করে। অবশ্য, সর্বক্ষেত্রেই এই সব অব্যবহিত লক্ষ্যই শিক্ষাবিদের আসল দায়িত্বের বিষয়। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, (যা বলা হয়েছে তার থেকেই অবশ্য এ কথা আসে) ঐ সব উদ্দেশ্যের মধ্যে বাছাই করার, বা, ওগুলোকে পরস্পরের প্রতিযোগী মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা যখন প্রত্যক্ষভাবে একটা কাজে লাগি, তখন আমাদিকে একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ কাজ বেছে নিতে বা মনস্থঃ করতে হয়, কিন্তু ব্যাপক উদ্দেশ্য বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বি-

তায় যতো খুশী থাকতে পারে। কারণ তা থাকার অর্থ হবে একই দৃশ্য বিভিন্ন দিক থেকে দেখা। একজনে একই সময়ে কয়েকটা পাহাড়ে উঠতে পারে না, কিন্তু সে ভিন্ন ভিন্ন পর্বতে আরোহণ করে যে সব দৃশ্য দেখে, সেগুলো পরস্পরের অনুপূরণ করে, এরা বিরুদ্ধ প্রতিযোগী জগৎ খাড়া করে না। কিম্বা বিষয়টা একটু অন্য রকম ভাবে বললে দাঁড়ায় যে, একই উদ্দেশ্যের এক রকমের বর্ণনা এক রকমের প্রশ্ন ও পর্যবেক্ষণের সঙ্কেত দিতে পারে, এবং আর এক রকমের বর্ণনা আর এক রকমের প্রশ্নমালা তুলে, অন্য রকম পর্যবেক্ষণের দাবী তুলতে পারে। তা হলে উদ্দেশ্য যতো সাধারণ হয় ততোই ভালো। এতে একটা বর্ণনা যা তুচ্ছ করবে, অন্যটা তার উপরই জোর দেবে। বিজ্ঞান-সন্ধানীর পক্ষে অনুমানের বহুত্ব যে ভাবে কাজ করে শিক্ষকের পক্ষেও বর্ণিত লক্ষ্যের বহুত্ব সেই ভাবে কাজ করতে পারে।

সারাংশ

লক্ষ্য সন্ধানের অর্থ, যে-কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পরিণাম চেতনায় এনে বর্তমান পর্যবেক্ষণ ও কর্ম-ধারাকে বাছাই করার উপাদান রূপে গ্রহণ করা। এতে সূচিত হয় যে, একটি ক্রিয়াশীলতা বুদ্ধিগম্য হয়েছে। এর সুনির্দিষ্ট অর্থ হল, কোনো এক পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কাজ করার সাথে যে বিকল্প পরিণাম জড়িত থাকে, তার ভবিষ্য-দৃষ্টি, এবং যা-কিছু পূর্বানুমান করা হয়েছে, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্দেশিত করার জন্য তার সদ্ব্যবহার করা। কাজেই, একটা কাজের প্রণালীর উপরে বার থেকে কোনো লক্ষ্য চাপিয়ে দেওয়া হলে আসল লক্ষ্যটি প্রতি পদেই তার বিরোধিতা করে। চাপানো লক্ষ্য অনড় ও অনমনীয়। কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, এ রকমের লক্ষ্য বুদ্ধিবৃত্তির উদ্দীপক হয় না, পরন্তু এই এই করতে হবে বলে এটা একটা বাইরের হুকুম হয়ে থাকে। বর্তমান ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগ সাধন করার পরিবর্তে, এ ধরনের লক্ষ্য বহুদূরে থাকে, এবং যে সব উপায় অবলম্বন করে এতে পৌঁছোতে হবে তার থেকে এটি বিচ্ছিন্ন থাকে। স্বচ্ছন্দ ও অধিকতর সমতাপূর্ণ ক্রিয়াশীলতার সঙ্কেত দেওয়ার পরিবর্তে

এ রকমের লক্ষ্য কর্মতৎপরতাকে সীমাবদ্ধ রাখে। শিক্ষাক্ষেত্রে, বার থেকে চাপানো এই লক্ষ্যের প্রচলন, কোনো এক সুদূর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির উপরে জোর দেয়। এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাজকেই যান্ত্রিক ও দাস-সুলভ করে তোলে।

নবম অধ্যায়

লক্ষ্য হিসাবে স্বাভাবিক বিকাশ ও সামাজিক কৃতিত্বের স্থান

১। লক্ষ্য সরবরাহে প্রকৃতি

যে চূড়ান্ত লক্ষ্যের কাছে অন্য সব কিছুই অধীন, শিক্ষার এমন একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াস আমরা এইমাত্র দেখিয়েছি। দেখিয়েছি যে, যেহেতু সাধারণ লক্ষ্যগুলো মাত্র সেই সব ভবিষ্যাপেক্ষ দৃষ্টিকোণ, যার থেকে বর্তমান অবস্থাদির নিরীক্ষা, এবং তাদের সম্ভাব্যতার মূল্যানুমান করা যায়, সেইহেতু আমাদের যতো খুশী লক্ষ্য থাকতে পারে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধও থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহু লক্ষ্যের কথা বলেছি, এবং এর সব কটিরই স্থানিক মূল্য রয়েছে। কারণ একটি লক্ষ্যের প্রস্তাবনার অর্থ, তাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া। এবং যে সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই, অর্থাৎ যে সব বিষয় নিজেরা নিজেদের ভালোভাবেই দেখতে পারে, আমরা তার উপরে গুরুত্ব দিই না। আমরা বরং সমসাময়িক পরিস্থিতির ত্রুটি ও প্রয়োজনের ভিত্তিতেই আমাদের প্রস্তাব রচনার দিকে ঝুঁকি। যা কিছু ঠিক আছে বা মোটামুটি ঠিক আছে, আমরা কোনো প্রকাশ্য উক্তি না করে তা মেনেই নিই। কারণ ও-রকমের উক্তি কোনো কাজে লাগে না। কোনো পরিবর্তন আনবার জন্যই আমরা আমাদের স্পষ্ট লক্ষ্য গঠন করি। কাজেই যখন বলি যে, কোনো এক কাল-ধর্ম বা বংশাবলী তাদের সংজ্ঞাত অভিক্ষেপনের মধ্যে যা যা আসলে তাদের মধ্যে খুব কম মাত্রায় থাকে, ঠিক তাদের উপরেই গুরুত্ব দেয়, তখন আপাত বিরোধী এমন কোনো কথা বলা হয় না যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে। স্বৈরাচারী দমন-নীতি সচেতন প্রতিক্রিয়ারূপে সুমহান ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাঞ্ছনীয়তাকে আহ্বান জানাবে,—আহ্বান জানাবে বিশৃঙ্খল ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ আচার-আচরণ এবং সংজ্ঞাত বা বর্ণিত উদ্দেশ্য এই-

ভাবে পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। বিভিন্ন সময়ে, — পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাত্রা, ভাষা-শিক্ষার সুন্দরতর পদ্ধতি, শব্দের পরিবর্তে বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা, সামাজিক কৃতিত্ব, ব্যক্তিগত কৃষ্টি, সমাজ সেবা, ব্যক্তিতার পূর্ণ বিকাশ, বিশ্বকোষিক জ্ঞান, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্যানুভূতি, ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি লক্ষ্য,—উদ্দেশ্য সাধন করেছে। নিম্নলিখিত আলোচনাতে সম্প্রতি-প্রভাবশীল তিনটি উক্তিকে ধরা যেতে পারে। পূর্বের কয়েকটি অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে আরও কয়েকটি উক্তি আলোচিত হয়েছে। এর পরে, জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়নের মূল্যবোধের আলোচনাকালে, আরও কয়েকটি বিবেচিত হবে। আমরা রুশোর এই উক্তি নিয়ে বিবেচনা শুরু করছি যে, শিক্ষা হ'ল বিশ্ব-প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশের ক্রিয়া-প্রণালী। এই উক্তি অনুসারে প্রকৃতি সমাজের বিরোধিতা করে (পূর্বে দেখুন, পৃঃ ১১৯)। এর পরে, সামাজিক কৃতিত্ব সম্বলিত বিপরীত ধারণা বিচার করব, এই ধারণা অনেক স্থানে সমাজকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করে।

(১) শিক্ষা-সংস্কারকগণ গতানুগতিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতির কৃত্রিমতার উপর বিরক্ত হয়ে শিক্ষার মানদণ্ডরূপে বিশ্ব-প্রকৃতির আশ্রয় নিতে চান। ধরে নেয়া হয় যে, বিশ্ব-প্রকৃতিই শিক্ষার নিয়ম এবং উদ্দেশ্য যোগাতে পারে। আমাদের কাজ হ'ল প্রকৃতির পন্থা অনুসরণ করা এবং তার সাথে সঙ্গতি রাখা। যাদের শেখান হয় তাদের প্রকৃতিদত্ত সম্পদের দিকে খেয়াল না রেখে যে লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয় তার ভ্রান্তির প্রতি সবলে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মধ্যেই এই ধারণার সদর্থক মূল্য রয়েছে। কিন্তু যা প্রাকৃতিক তাকে এক অর্থে "স্বাভাবিক" এবং আর এক অর্থে ভৌতিক বলে ধরে নিলে, দুই অর্থ মিশে গিয়ে সহজেই একটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এই ধারণার দুর্বলতা এখানেই। এ অবস্থায় ভবিষ্যদৃষ্টি ও যোজনার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির গঠনমূলক ব্যবহারকে হ্রাস করা হয়। প্রকৃতির পথ থেকে আমাদের সরে দাঁড়াতে হবে এবং প্রকৃতিকেই কাজ করতে দিতে হবে,—আমাদের কাজ হবে এইটুকু। যেহেতু এই মতের সত্য ও মিথ্যা দিক দুটো রুশোর থেকে বেশী ভালো করে আর কেউ বর্ণনা করেন নি, সে জন্যে আমরা রুশোর কথাতেই ফিরে যাব।

তিনি বলেন, "আমরা শিক্ষা পাই তিনটি উৎস থেকে,—প্রকৃতি, মানুষ ও বস্তু। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সামর্থ্যের স্বতঃবৃত্ত বিকাশ হ'ল প্রকৃতির শিক্ষা।

এই বিকাশকে কাজে লাগাতে শেখাবার শিক্ষা হ'ল মানুষের দেওয়া শিক্ষা। পারিপার্শ্বিক বস্তু ও ঘটনা থেকে আমরা যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করি তা হ'ল বস্তু-প্রদত্ত শিক্ষা। এই তিন রকমের শিক্ষা যখন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখনই মানুষ তার যথার্থ লক্ষ্য-বস্তুর দিকে চলে।......আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় এই উদ্দেশ্যটা কি, তাহলে তার উত্তর হবে এই যে, উদ্দেশ্যটা হ'ল প্রকৃতির। কারণ যেহেতু এই তিন রকমের শিক্ষার পূর্ণতার জন্য এদের মধ্যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন, সেইহেতু ঐ তিনটির মধ্যে যেটি সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন, সেটিই অন্য দুটিকে নির্ধারিত করার জন্য আমাদিকে অপরিহার্যরূপে নিয়ন্ত্রিত করবে।" এর পরে রুশো প্রকৃতির সংজ্ঞায় বলেন যে, "বাধ্যতামূলক অভ্যাস হবার, আর অন্যদের মতামতের প্রভাব দ্বারা রদ-বদল হবার পূর্বে এরা যে অবস্থায় থাকে," প্রকৃতি হ'ল সেই বিবিধ সহজাত সামর্থ্য ও মানসতা।

রুশোর শব্দ বিন্যাস যত্নসহকারে পরীক্ষা করে দেখা সার্থক হবে। রুশোর এই অদ্ভুত বাক্-ভঙ্গীতে শিক্ষা সম্বন্ধে সার সত্যগুলি নিহিত হয়েছে। প্রথম কয়েকটি বাক্যে যা যা বলা হয়েছে তার থেকে আরও ভালো করে কিছু বলা অসম্ভব। শিক্ষাগত বিকাশের তিনটি উপাদান হ'ল, (ক) আমাদের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক গঠন ও তাদের স্বধর্মগত ক্রিয়াকলাপ। (খ) অন্যান্য লোকের প্রভাবে এই সব অঙ্গকে যেভাবে কাজে লাগানো হয়; (গ) পরিবেশের সঙ্গে তাদের সরাসরি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। প্রস্তাবনার পক্ষে এই উক্তি নিশ্চিতরূপেই যথেষ্ট। তার আর দুটো প্রস্তাবও সমান সঙ্গত। যেমন, (ক) যখন শিক্ষার এই তিনটি উপাদান সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহযোগী হয়, কেবল তখনই ব্যক্তির পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটে, এবং (খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-কলাপ আদি বলে, এরাই সামঞ্জস্য গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে, আর রুশোর অন্যান্য উক্তি দিয়ে তা পরিপূরণ করে নিলে দেখা যাবে যে, যদিও এই তিনটি উপাদানের যে কোনো একটি যাতে তার শিক্ষামূলক ক্রিয়া করতে পারে, সে জন্যে তিনটিকেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে, তবুও রুশো কিন্তু, এ তিনটিকে সে রকমের সহযোগী উপাদান বলে মনে করার পরিবর্তে, এদের ক্রিয়া পৃথক পৃথক ও স্বতন্ত্র বলেই ধরে নিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি বিশ্বাস করেন যে, জন্মসূত্রে লব্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ধীশক্তি স্বতন্ত্র-

ভাবে এবং তাঁর কথায়, "স্বতঃস্ফূর্ত" ভাবেই বিকাশ লাভ করতে থাকে। তাঁর বিবেচনায়, ওদের যে ভাবে কাজে লাগানো হয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক-বিহীন হয়েই ওরা বিকাশলাভ করতে পারে। এবং সামাজিক সহযোগ থেকে যে শিক্ষা আসে, সে শিক্ষাকে ঐ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশলাভের অধীনে রাখতে হবে। এখন দেখা যাবে যে, এ দুটো বিষয়ের মধ্যে প্রচণ্ড প্রভেদ রয়েছে: এর একটা হ'ল, সহজাত ক্রিয়াকলাপকে এই ক্রিয়াকলাপেরই অনুযায়ী রেখে কাজে লাগানো,—এর উপরে কোনো জোর জবরদস্তি করে, বা একে বিকৃত করে নয়। অন্যটি হ'ল এই যে, কোনো কাজে লাগানো ছাড়াই সহজাত ক্রিয়াকলাপের একটা স্বাভাবিক বিকাশ থাকে, এবং কাজের ভিতর দিয়ে যা শিক্ষা করা হয়, এই স্বাভাবিক বিকাশই তার মান ও নমুনা যোগায়। পূর্ব দৃষ্টান্তে ফিরে গেলে দেখা যাবে যে, ভাষা আয়ত্ত করার ক্রিয়া-প্রণালী যথাযথ শিক্ষামূলক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রায় পূর্ণাঙ্গ আদর্শ যোগায়। এখানে কাজ আরম্ভ হয়, স্বরযন্ত্র, শ্রবণেন্দ্রিয় ইত্যাদির স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ থেকে। কিন্তু এ রকম মনে করা একেবারেই অর্থহীন যে, এই সব সহজাত যন্ত্রের এমন কোনো নিজস্ব ও স্বাধীন ক্রমবিকাশের গুণ আছে যার উপরে ফেলে রাখলে সুসম্বদ্ধ বাচনভঙ্গী ফুটে বেরবে। আক্ষরিক অর্থে ধরলে রুশোর সূত্রের এই অর্থ দাঁড়ায় যে, বড়োরা শিশুদের কলরব ও কলকলানিকে মেনে নিয়ে ওগুলোরই পুনরাবৃত্তি করাবে, এবং ওগুলোকে কেবল স্পষ্ট বাক্-প্রণালীর সূচনা বলেই ধরে নেবে না, বরং সেগুলিকে আসল ভাষার অঙ্কুর বলেই মেনে নেবে, এবং সকল প্রকার ভাষা-শিক্ষার মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করবে।

বিষয়টি এই বলে সংক্ষেপ করা যায় যে, রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অতি প্রয়োজনীয় সংস্কৃতি সাধনের সূত্রপাত করেছিলেন; তাঁর এই মত নির্ভুল যে, অঙ্গ-অবয়বের স্বাভাবিক গঠন ও ক্রিয়াকলাপ এদের ব্যবহার সম্বন্ধে যাবতীয় শিক্ষা দেওয়ার "শর্ত" যোগায়; কিন্তু তার এ কথার মধ্যে বড় ভুল এই যে, তারা কেবল শর্তই যোগায় না, পরন্তু এদের বিকাশের "উদ্দেশ্যও" যোগায়। আসলে, সহজাত ক্রিয়াকলাপকে এলোমেলো ও খামখেয়ালী অনুশীলন থেকে দূরে রেখে যথার্থভাবে কাজে লাগালেই তাদের বিকাশ ঘটে। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, সমাজ মাধ্যমের কাজ হল, ক্ষমতাদির সর্বোত্তম সম্ভাব্য প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে ক্রমোন্নতি নির্দেশিত করা। সহজ-প্রবৃত্তিজাত

ক্রিয়াকলাপকে রূপক অর্থে এই জন্যে স্বতঃস্ফূর্ত বলা যেতে পারে যে, বিশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এক এক ধরনের কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ পক্ষপাতিত্ব থাকে। এই পক্ষপাতিত্ব এতো শক্তিশালী যে, আমরা এর বিপরীত দিকে যেতে পারি না, যদিও বিপরীত দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে আমরা এদের বিকৃত, খর্ব ও কলুষিত করতে পারি। কিন্তু এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক বিকাশ হবে,—এই ধারণাটা অবিমিশ্র অতিকল্পনা। স্বাভাবিক বা সহজাত ক্ষমতা সর্বরকম শিক্ষার প্রারম্ভিক ও প্রান্তিক শক্তি যোগায়, এরা এর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যোগায় না। অনভ্যস্ত ক্ষমতা নিয়ে আরম্ভ করা ছাড়া কোনো শিক্ষাই ঘটে না, কিন্তু শিক্ষালাভ অনভ্যস্ত ক্ষমতাদির স্বতঃস্ফূর্ত প্লাবন নয়। নিঃসন্দেহে, রুশোর বিপরীত মতের কারণ এই যে, তিনি ভগবানকে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্ম করেছিলেন। তার মতে আদি ক্ষমতাবলী পুরোপুরি কল্যাণকর। কারণ এগুলি সরাসরি একজন মঙ্গলময় স্রষ্টিকর্তার কাছ থেকে এসেছে। গ্রাম ও শহর সম্বন্ধে একটা পুরাতন প্রবাদকে শব্দান্তরিত করলে এই দাঁড়ায়: ভগবান স্রষ্টি করেছেন মানুষের আদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ধীশক্তি, আর মানুষ স্রষ্টি করে সেই সব প্রয়োগ যার মধ্যে ওগুলো খাটানো হয়। কাজেই পূর্বোক্ত বিষয়টির বিকাশ যে মানদণ্ড যোগায়, শেষোক্ত বিষয়টিকে তার অনুগত করতে হবে। যখন মানুষ তার জন্মগত ক্রিয়াকলাপকে যে যে কাজে খাটাতে হবে তা ঠিক করতে চেষ্টা করে, তখন সে ঐশ্বরিক পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করে। প্রকৃতির উপর বা ভগবানের কাজের উপর সামাজিক ব্যবস্থাদির এই হস্তক্ষেপই মানুষের মধ্যে কলুষতার মুখ্য প্রভব। সকল স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য কল্যাণ সম্বন্ধে রুশোর এক আবেগময় ঘোষণা ছিল। সহজাত প্রবৃত্তির সামগ্রিক দুর্বৃত্তি সম্বন্ধে সেকালের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে এই ঘোষণা এক প্রতিক্রিয়া বিশেষ। শিশুদের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি দৃগ্‌ভঙ্গীর পরিবর্তন সাধনে সে ঘোষণার প্রবল প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু এ কথা বলা প্রায় নিষ্প্রয়োজন যে, জন্মগত আবেগ নিজগুণে ভালও নয়, মন্দও নয়, পরন্তু যে সব লক্ষ্যবস্তুর প্রতি ওগুলো নিয়োজিত হয়, সেই অনুসারে ওগুলো ভালো বা মন্দ রূপ ধারণ করে। এ কথা সন্দেহাতীত যে, উপেক্ষা, অবদমন, এবং উপযুক্ত সময়ের আগেই জবরদস্তি করে কোনো কোনো সহজ প্রবৃত্তিকে অন্য কিছুর জন্যে ব্যয় করে যে বিকাশ ঘটাবার প্রচেষ্টা

দেখা যায়—তা বহু নিবার্য অনিষ্টের জন্যই দায়ী। কিন্তু এ কথার নীতিবাচক অর্থ এ নয় যে, নিজ নিজ "স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের" জন্যে এদের নিজ নিজ ভাগ্যের উপর ফেলে রাখতে হবে। পরন্তু এর অর্থ হল, এমন এক ধরনের পরিবেশ যোগানো, যে পরিবেশ এই সব প্রবৃত্তিকে সংগঠিত করবে।

রুশোর বর্ণনার মধ্যে যে যে সত্য উপাদান রয়েছে তার দিকে চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাই যে, স্বাভাবিক বিকাশকে লক্ষ্যরূপে নিয়ে তিনি চলিত আচার-আচরণের অনেক দোষ সংশোধনের উপায় স্থির করতে পেরেছিলেন এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বাঞ্ছনীয় লক্ষ্য নির্দেশ করতেও সমর্থ হয়েছিলেন।

(১) স্বাভাবিক বিকাশকে লক্ষ্যরূপে নিলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে এবং স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রয়োজনের দিকে নজর পড়ে। স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষ্য পিতামাতা ও শিক্ষকদের কাছে এই আবেদন জানায় যে, স্বাস্থ্যকে একটা লক্ষ্য করে নাও. শারীরিক শক্তি ছাড়া নিয়মিত বিকাশ হয় না। কথাটা খুবই সোজা, তবুও কার্যক্ষেত্রে এর যথোপযুক্ত স্বীকৃতি থাকলে, প্রায় স্বয়ংচল হয়েই তা আমাদের শিক্ষা কার্যের বহুবিষয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনত। "প্রকৃতি" অবশ্য একটা ভাসা ভাসা রূপক শব্দ, কিন্তু প্রকৃতি যা বলে তার একটা কথা এই যে, শিক্ষাসংক্রান্ত কৃতির কতকগুলো শর্ত আছে ; এবং যে পর্যন্ত না আমরা জানতে পারি যে, এই শর্তগুলো কি কি, এবং যে পর্যন্ত না আমাদের শিক্ষাবৃত্তিকে এই শর্তাবলীর সাথে সুসঙ্গত করতে শিখি, সে পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্যের মহোত্তম ও সর্বোচ্চ আদর্শগত লক্ষ্যও ব্যাহত হতে বাধ্য ; এবং সেটি সুফলদায়ক না হয়ে বরং মৌখিক ও ভাবরসাত্মক হয়েই থাকবে।

(২) স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষ্য দৈহিক সচলতাকে শ্রদ্ধেয় করার লক্ষ্যে রূপান্তরিত হয়। রুশোর কথায়, "শিশুরা সর্বক্ষণই গতিশীল ; বসে-থাকা-জীবন ক্ষতিকর।" যখন তিনি বলেন, "প্রকৃতির অভিপ্রায় হল মন চালনা করার আগে শরীরকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন," তখন তিনি প্রকৃত অবস্থাটা খুব যুক্তিসঙ্গতভাবে বলেন নি। কিন্তু যদি তিনি বলতেন যে প্রকৃতির "অভিপ্রায়" (তার কাব্যস্নিগ্ধ ভাষায়) হল, শরীরের মাংসপেশী সঞ্চালনের "দ্বারা" মনের বিশিষ্ট রূপের বিকাশ সাধন করা, তা হলে তিনি একটা সদর্থক সত্যোক্তি

করতেন। অন্য কথায়, প্রকৃতিকে অনুসরণ করার মূর্ত অর্থ হল, অভিযান-আবিষ্কারে জিনিস-পত্র নিয়ে কাজ করার প্রতি, এবং ক্রীড়া-কৌতুকের ক্ষেত্রে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে আসল ভূমিকা গ্রহণ করে তার প্রতি, শ্রদ্ধা রাখা।

(৩) এই সাধারণ লক্ষ্য, শিশুদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে তার প্রতি শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয়। যিনিই সহজাত ক্ষমতাবলীর গুরুত্বের সারমর্ম অনুধাবন করেন, তিনিই ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে এই ক্ষমতাগুলোর বিভিন্নতা দেখে চমৎকৃত না হয়ে পারেন না। এই পার্থক্য কেবল ঐ সব ক্ষমতার প্রাখর্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, পরন্তু আরও বেশী প্রযোজ্য ওদের গুণ ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে। রুশো বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তিই একটা বিশেষ ধাত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।...আমরা বাদ-বিচার না করে বিভিন্ন ধাতের শিশুদের একই অনুশীলনের কাজে নিযুক্ত করি। তাদের শিক্ষা তাদের বিশিষ্ট ঝোঁক নষ্ট করে একটা নিরুদ্যম একরূপতা স্থাপন করে। এতে প্রকৃতির প্রকৃত অবদানের খর্বতায় আমাদের প্রচেষ্টা অপচায়িত হবার পরে আমরা দেখতে পাই যে, ক্ষণিকের জন্য যে অলীক দীপ্তি প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল তা ম্লান হয়ে যায়, এবং যে স্বাভাবিক সামর্থ্য আমরা চূর্ণ করেছি তাও আর পুনরুজ্জীবিত হয় না।"

সর্বশেষে, শিক্ষায় প্রকৃতি-অনুসরণ লক্ষ্যের অর্থ হল, বিভিন্ন অগ্রাধিকার ও স্বার্থবোধের উদ্ভব, বৃদ্ধি ও হ্রাস লক্ষ্য করা। বিভিন্ন সামর্থ্য অনিয়মিতভাবে মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হয়, এদের কোনো সুষম ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হতে থাকে না। সময় থাকতে থাকতে কাজে লাগাতে হয়। ক্ষমতা বিকাশের প্রথম প্রভাত বিশেষ করে মূল্যবান। যে ভাবে প্রথম শৈশবের প্রবণতাগুলি লালিত হয়, মৌলিক মতিগতি স্থিরীকরণে তাদের প্রভাব কল্পনাতীত। এবং যে সব ক্ষমতা পরে প্রকাশিত হয় তারা যে পথ নেবে তা এরাই স্থির করে। যখন রুশোর অনুসরণে, পেস্টালজি ও ফ্রয়েবেল, ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মের উপর জোর দিতে আরম্ভ করেছেন, প্রায় সম্পূর্ণরূপে তখন থেকেই জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর নিয়ে শিক্ষার ভাবনা (ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ থেকে পৃথক ভাবে) আরম্ভ হয়েছে। নার্ভতন্ত্রের ক্রমবিকাশে অনুশীলনরত একজন বিদ্যার্থীর নিম্নলিখিত উক্তি থেকে ক্রমবিকাশের অনিয়মিত ক্রম এবং তার তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু সন্ধান

পাওয়া যায়। তাঁর মতে, "যখন ক্রমবিকাশ চলতে থাকে, তখন দৈহিক ও মানসিক ব্যাপারগুলো ভারসাম্যহীন থাকে, কারণ ক্রমবিকাশ একই সঙ্গে সর্বতোমুখী হয় না, কখনও একস্থানে জোর পড়ে, কখনও বা আর এক স্থানে।···যে সমস্ত পদ্ধতি সহজাত সামর্থ্যাদির এই প্রকাণ্ড পার্থক্যের মধ্যে ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক অসমতার গতিশীল মূল্যকে গ্রাহ্য করে, তার সদ্ব্যবহার করে, এবং সেই পার্থক্যগুলোকে কাট্‌ছাট্‌ করে নিটোল করে না নিয়ে, অসমতাগুলোই বেছে নেয়, সেই সমস্ত পদ্ধতিই শরীরের মধ্যে যা যা ঘটতে থাকে তাকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে, এবং সেই সব পদ্ধতিই সর্বাধিক ফলপ্রসূ হয়।"[১] বিধি-নিষেধে আবদ্ধ স্বাভাবিক প্রবণতার পর্যবেক্ষণ কষ্টসাধ্য। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কথা ও কাজের মধ্যে ওগুলো খুব সহজে প্রকাশ পায়,—অর্থাৎ, যখন সে এমন কাজে নিযুক্ত থাকে, যা তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, এবং যখন সে জানে না যে তাকে কেউ লক্ষ্য করছে। এ থেকে এ কথা আসে না যে, যেহেতু এই সব প্রবণতা স্বাভাবিক, সেই হেতু এদের সবগুলোই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ঐ সব প্রবণতা তার মধ্যে বর্তমান। কাজেই সেগুলি ক্রিয়াশীলও বটে। এবং অবশ্যই তাদের হিসাবে ধরতে হবে। আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে, বিভিন্ন বাঞ্ছিত প্রবণতাগুলি যেন এমন একটা পরিবেশ পায় যাতে তারা কর্মরত থাকতে বাধ্য হয়, এবং সেই কর্মতৎপরতা যেন যে সব বাকী প্রবণতাগুলোর অব্যবহারে কিছুমাত্র আসে যায় না, তাদের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। পিতামাতা উদ্বিগ্ন হন, এ রকমের প্রবণতা দেখা দিলে তা ক্ষণস্থায়ী হবার সম্ভাবনা, এবং এর উপরে সরাসরি অতিরিক্ত নজর দিলে শিশুর মনোযোগ ঐদিকেই পড়ে। যাই ঘটুক না কেন, বড়োরা অতি সহজে তাঁদের অভ্যাস ও ইচ্ছাকেই বিচারের মানদণ্ড করে নেন, এবং শিশুদের আবেগানুভূতির যাবতীয় তারতম্য দোষের মনে করে ওগুলো ছাড়াতে চান। প্রকৃতি অনুসরণ সম্বলিত ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এবং সে কৃত্রিমতা, শিশুদের জোর করে সরাসরি বড়োদের মানদণ্ডে গড়া ছাঁচে ঢালাই করার অপচেষ্টারই পরিণতি।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রকৃতি-অনুসরণ ধারণার প্রাথমিক

১। ডোনাল্‌ড্‌সন্‌, "গ্রোথ অব ব্রেইন" পৃঃ ৩৫৬।

ইতিহাস এমন দুটো উপাদানকে একত্র করেছিল যার মধ্যে কোনো মূলগত যোগ ছিল না। রুশোর পূর্ববর্তী কালে, শিক্ষা-সংস্কারকগণ শিক্ষাকে প্রায় অসীম ক্ষমতার পদে ভূষিত করে, তার গুরুত্ব উপলব্ধিতে তৎপর ছিলেন। বিভিন্ন জনসমষ্টির এবং একই জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণী ও লোকের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তাকে শিক্ষা, অনুশীলন, ও বৃত্তির পার্থক্যজনিত বলে মনে করা হ'ত। শুরুতে মন, বিচারশক্তি ও বোধশক্তি, সকলের মধ্যেই এক রকমের থাকে। মনের এই সারগর্ভ একাত্মতার তাৎপর্য হ'ল, সকল লোকেরই সারগর্ভ সমতা আছে এবং সকল লোককেই এক স্তরে আনবার সম্ভাব্যতা আছে। এই মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে, প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিমূলক মতবাদের অর্থ দাঁড়ায়, মন এবং মনের ক্ষমতাবলী সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ ও বিমূর্ত ধারণাকে খর্ব করা। এই মতবাদ বোধশক্তি, স্মরণ-শক্তি ও সামান্যী-করণ শক্তি সম্বলিত বিমূর্ত ধীশক্তির স্থানে, সুনির্দিষ্ট সহজপ্রবৃত্তি, প্রবণতা, ও শরীরতাত্ত্বিক সামর্থ্যকে—যা লোকের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় থাকে—প্রতিস্থাপিত করেছিল। (রুশোও বলেছেন যে, এ সব ভাব ও সামর্থ্যের পার্থক্য এক পাল কুকুরের বাচ্চার মধ্যেও যেমন থাকে মানুষের মধ্যেও তাই)। এই দিক দিয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গতি রাখার মতবাদ, আধুনিক জীববিদ্যা, শরীরতত্ত্ব ও মনোবিদ্যার জ্ঞান দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে। ফলতঃ এর অর্থ এই যে, প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা প্রচেষ্টার মাধ্যমে লালন, পরিবর্তন ও রূপান্তরের খুব তাৎপর্য থাকলেও, প্রকৃতি বা বিভিন্ন অনভ্যস্ত সামর্থ্যই লালনের ভিত্তি এবং চূড়ান্ত সঙ্গতি যোগায়।

অপরপক্ষে, প্রকৃতি-অনুসরণ মতবাদ ছিল একটা রাষ্ট্রনীতি। এর অর্থ ছিল তৎকালীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (পূর্বে ১২০ পৃষ্ঠা)। স্রষ্টিকর্তার হাত থেকে যা আসে তার সবই শুভ, রুশোর এই উক্তির তাৎপর্য, ঐ বাক্যের শেষাংশ "মানুষের হাতে সব কিছুরই অধোগতি হয়"-এর সঙ্গে পার্থক্য রেখে বুঝতে হবে। এবং তিনি আবার বলেন, "প্রাকৃতিক মানুষের নিরাপেক্ষিক মূল্য রয়েছে। সে একটি সংখ্যাগত একক, একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং তার নিজের ও সহযাত্রীর সাথে ছাড়া, তার আর কোনো সম্পর্ক নেই। সভ্যব্যক্তি কেবল একটি আপেক্ষিক একক, একটি ভগ্নাংশের লব, যার মূল্য নির্ভর করে এর হরের

উপর —সমাজের পূর্ণ অবয়বের সাথে এর সম্পর্কের উপর। উত্তম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হ'ল তা-ই, যা মানুষকে অস্বাভাবিক করে।" সংগঠিত সমাজ-জীবনের তদানীন্তন কৃত্রিম ও অনিষ্টকর ধারণার[১] উপরেই তিনি এই ধারণা স্থাপন করেছিলেন যে, প্রকৃতি কেবল ক্রমবিকাশ সূচনা করার মুখ্য শক্তিই যোগায় না, পরন্তু এর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যও যোগায়। এ কথা খুবই সত্য যে, মন্দ প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতি প্রায় স্বয়ং-চালিত হয়েই এমন একটা ভ্রান্ত শিক্ষার স্বপক্ষে কাজ করে যে, সর্বাধিক যত্নবান স্কুলশিক্ষাও তার প্রতিকার করতে পারে না। কিন্তু তা থেকে এ সিদ্ধান্ত আসে না যে, পরিবেশ থেকে আলাদা করে নিয়ে শেখাতে হবে; পরন্তু এমন একটা পরিবেশ যোগাতে হবে, যার মধ্যে সহজাত ক্ষমতাগুলো ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়।

২। লক্ষ্যরূপে সামাজিক কৃতিত্ব

যে ধারণা অনুসারে প্রকৃতি সংশিক্ষার, এবং সমাজ অসংশিক্ষার উদ্দেশ্য যোগায় সে ধারণা প্রতিবাদহীন হতে পারে না। এর বিপরীত দিকে জোর পড়ার ফলে এই মতবাদ গড়ে উঠল যে, শিক্ষার কর্মভার হ'ল প্রকৃতি যা আয়ত্ত করাতে অক্ষম, সেটাকেই যথার্থভাবে যুগিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ, ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত করানো, স্বাভাবিক ক্ষমতাকে সামাজিক নীতির বশবর্তী করা। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, স্বাভাবিক-বিকাশ মতবাদ যে যে স্থানে বিপথগামী সেই সেই স্থানে তার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ দেখা গেছে, সামাজিক কৃতিত্বের ধারণার মূল্য সেখানেই প্রধানতঃ নিহিত। আবার স্বাভাবিক বিকাশের ধারণার মধ্যে যে সব সত্য নিহিত রয়েছে সে সব তুচ্ছ করতে গিয়েই সামাজিক কৃতিত্বের ধারণার অপব্যবহার করা হয়েছে। এ কথা সত্য যে, ক্ষমতার বিকাশের, অর্থাৎ কৃতিত্বের, অর্থ কি

১। আমরা এ কথা নিশ্চয়ই ভুলব না যে, রুশোর একটি মৌলিকরূপে বিভিন্ন সমাজের ধারণা ছিল—এমন একটি ভ্রাতৃসুলভ সমাজ যার উদ্দেশ্য হবে তার সকল সভ্যদের কল্যাণ। তাঁর ধারণা, ওরূপ সমাজ উপস্থিত ব্যবস্থা থেকে সেই পরিমাণে উত্তম হবে, এই ব্যবস্থা যে পরিমাণে প্রকৃতির ব্যবস্থা থেকে অধম।

তা দেখাবার জন্যে আমাদিকে সমষ্টিবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ ও কৃতির দিকে তাকাতে হবে। কিন্তু কৃতিত্ব অর্জনের জন্য ঐ সব ক্রিয়া-কলাপ ও কৃতিকে কাজে লাগানোর পরিবর্তে মানুষকে ঐ সবের অধীনস্থ করতে হবে—এই ধারণা দিলে—একটা ভুল থেকে যায়। এই মতবাদ তখনই যথোপযুক্ত হয়, যখন আমরা মেনে নিই যে, নিরর্থক বাধ্যবাধকতা দিয়ে সামাজিক কৃতিত্ব আসে না, পরন্তু যার মধ্যে সামাজিক তাৎপর্য আছে, সেই রকমের বৃত্তিতে সহজাত ব্যক্তিগত সামর্থ্যের সদর্থক প্রয়োগের ভিতর দিয়েই তা আসে।

(১) সুবিশিষ্ট উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করলে, সামাজিক কৃতিত্ব শ্রমশিল্পীয় যোগ্যতার গুরুত্ব নির্দেশ করে। লোকে জীবিকার উপায় ছাড়া বাঁচতে পারে না; এই সব উপায় যেভাবে প্রয়োগ ও ভোগ করা হয় সেটা মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করে। যদি এক ব্যক্তি তার নিজের এবং তার উপরে নির্ভরশীল তার সন্তানদের জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে অন্যান্যের কাজ-কর্মের উপর একটা বোঝা বা পরজীবী হয়ে দাঁড়ায়। সে নিজেও জীবনের একটা সর্বোত্তম শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকে। যদি সে শিল্পোৎপাদিত সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত না হয়, তা হলে এই গুরুতর আশঙ্কা থাকে যে, তার অর্থ-সঙ্গতি দ্বারা সে নিজেকেও দুর্নীতিপরায়ণ করবে এবং অন্যেরও ক্ষতিসাধন করবে। কোনো শিক্ষাপ্রকল্পেরই এই সব মৌলিক বিচার-বিবেচনাকে উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। তৎসত্ত্বেও উচ্চতর ও অধিকতর আধ্যাত্মিক আদর্শের নামে, উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা এ সব বিষয়কে কেবল উপেক্ষাই করে যায় নি, পরন্তু এগুলিকে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় থেকে নিম্নস্তরের বিষয় বলে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছে। শ্রেণী-শাসিত সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল যে, যে শিক্ষার ফলে ব্যক্তি পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সঙ্গতি লাভ করে, এবং সেই সঙ্গতিকে কেবল আড়ম্বর ও বিলাসিতায় নিয়োজিত না করে প্রয়োজনীয় কাজে সদ্ব্যবহার করতেও সক্ষম হয়, শিক্ষার সেই তাৎপর্যের উপরই গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

কিন্তু গুরুতর আশঙ্কা এই যে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে বর্তমান অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও মানদণ্ডই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। আমাদের কাছে

গণতান্ত্রিক নীতির দাবি হ'ল, স্বাভাবিক সামর্থ্য তার নিজ বৃত্তি বেছে নিক ও তাকে অনুধাবন করার যোগ্যতা লাভ করুক। কিন্তু যখন একজনকে তার শিক্ষাপ্রাপ্ত মৌলিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে না দিয়ে তাকে পিতামাতার ঐশ্বর্য বা সামাজিক পদমর্যাদার ভিত্তিতে আগে থেকেই নির্দিষ্ট শ্রমসংস্থানের উপযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়, তখনই উক্ত গণতান্ত্রিক নীতিকে অমান্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নতুন নতুন উদ্ভাবনের ফলেই শ্রমশিল্পে দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। নতুন শিল্প গড়ে ওঠে, আর পুরাতন শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। কাজেই অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দক্ষতা লাভের জন্য প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা তার নিজ উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। যখন একটি বৃত্তির পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় তখন তাতে নিযুক্ত কর্মীরা পেছনে পড়ে যায়, তাদের প্রশিক্ষা কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলে যা হ'ত, পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের সক্ষমতা তার থেকেও কম থাকে। সব চেয়ে বড় দোষ এই যে, সমাজের বর্তমান শিল্পনীতিক সংগঠন, পূর্বেকার প্রতিটি সমাজের মতোই অবিচারে পরিপূর্ণ। প্রগতিশীল শিক্ষার স্থির লক্ষ্য হ'ল অন্যায্য সুবিধা ও অন্যায্য বঞ্চনার প্রতিকারের কাজে অংশ নেওয়া, তাকে চিরস্থায়ী করা নয়। যেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ ব্যক্তিগত ক্রিয়া-কলাপকে শ্রেণীগত কর্তৃত্বের অধীনস্থ করা, সেখানেই এই বিপদ থাকে যে, কারিগরি শিক্ষাও পূর্বপ্রচলিত অবস্থার চাপেই নিয়ন্ত্রিত হবে। এ অবস্থায় অর্থনীতিক সুযোগের পার্থক্যই লোকের ভবিষ্য কর্মসংস্থান কি হবে তা নির্দেশ করে দেবে। এভাবে প্লেটো-প্রকল্পিত সংস্কার-বিমুক্ত উদার ও অভিনব নির্বাচন পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে তার দোষ-ত্রুটিগুলোকেই অজ্ঞাতসারে আমরা পুনরুজ্জীবিত করব। (পূর্বে ১১৭ পৃঃ)

(২) নাগরিক কৃতিত্ব বা সুনাগরিকতা। সুনাগরিকতা থেকে শ্রম-শিল্প সম্বন্ধীয় যোগ্যতাকে পৃথক করা অবশ্যই স্বেচ্ছাচারী কাজ। কিন্তু সুনাগরিকতা কথাটিকে এমন কয়েকটি গুণ নির্দেশ করার অর্থে প্রয়োগ করা যায়, যা বৃত্তিগত সক্ষমতা থেকে বেশী অস্পষ্ট। যা কিছুই একজন লোককে রাষ্ট্রীয় অর্থে অধিকতর সুশোভন নাগরিকতার সহযাত্রী করে, ঐ সমস্ত গুণ বা লক্ষণ তার থেকেই আসে। সুনাগরিকতা অর্থে বোঝায়,—বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিধি-বিধানকে বিজ্ঞতার সহিত বিচার করা এবং বিবিধ আইন-কানুন

প্রণয়ন করে সেগুলিকে পালনের জন্য একটা দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণের সক্ষমতা। লক্ষ্য হিসাবে নাগরিক কৃতিত্বের অন্ততঃপক্ষে এই গুণ আছে যে, তা আমাদিকে, মোটের উপর, মানসিক ক্ষমতার প্রশিক্ষণমূলক ধারণা থেকে রেহাই দেয়। সে লক্ষ্য এই সত্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে যে, ক্ষমতা কোনো কিছু করার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, এবং যা করা সব চাইতে বেশী প্রয়োজন, তা হ'ল, যে সব বিষয় একের সাথে অন্যদের সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট।

এই লক্ষ্যকেও খুব সঙ্কীর্ণভাবে বুঝে নিলে চলবে না, বরং তার বিরুদ্ধেই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এর অতি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা কোনো কোনো কালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে বাঁদ দিয়ে গেছে,—যদিও দেখা গেছে যে, শেষ বিশ্লেষণে, সামাজিক অগ্রগতির রক্ষা-কবচ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপরেই নির্ভর করে। সেকালে বিজ্ঞানচর্চাকারীদের শুধু তত্ত্ব-প্রবণ ভাবুক বলে মনে করা হ'ত, মনে করা হ'ত যে, এদের সামাজিক কৃতিত্বের একেবারেই অভাব। শেষ পর্যায়ে সামাজিক কৃতিত্বের অর্থ হল অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মধ্যে অংশ নেওয়ার সামর্থ্য, এর থেকে কিছু বেশীও নয়, কমও নয। যা কিছুই একের অভিজ্ঞতাকে অন্য সকলের কাছে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ করে, এবং অন্যদের তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যক্তিকে অংশ নিতে সমর্থ করে, সেটি এবং তার সংলগ্ন যাবতীয় বিষয়ই সামাজিক কৃতিত্বের অন্তর্গত। নাগরিকতাকে অনেক সময় প্রচলিত ধারা অনুযায়ী অন্য অনেক বিষয়ের সহিত যুক্ত করা হয়। কিন্তু তাদের থেকে কলাসৃষ্টি ও উপভোগ করার সক্ষমতা, নতুন করে সৃষ্টি করার সামর্থ্য, অবকাশের তাৎপর্যপূর্ণ সদ্ব্যবহার, ইত্যাদি যে-সব বিষয় নাগরিকতার সঙ্গে অনুস্যূত তা-ই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাপকতম অর্থে, মনের যে সমাজধর্মী অবস্থা অভিজ্ঞতাকে অধিকতর আদান-প্রদান-যোগ্য করে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট রাখে, সামাজিক কৃতিত্ব তার থেকে কোনো অংশে কম নয়। সামাজিক স্তরায়নজনিত যে সমস্ত প্রতিবন্ধক লোককে অন্যান্যের স্বার্থের প্রতি অভেদ্য করে রাখে, সমাজধর্মী মন তা চুরমার করবার জন্য সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রকাশ্য কাজ করে যে সেবা করা হয়, সামাজিক কৃতিত্বকে যদি তাতেই সীমিত রাখা হয়, তা হলে তার মুখ্য অঙ্গকেই বাদ দেওয়া হয়। এই অঙ্গ হ'ল বুদ্ধিগম্য সমবেদনা বা শুভেচ্ছা (এই হ'ল সামাজিক কৃতিত্বের একমাত্র নিশ্চয়তা)। কারণ, বাঞ্ছনীয় গুণ

হিসাবে, সমবেদনা, শুধু অনুভূতি থেকে আরও বেশী কিছু দ্যোতিত করে; মানুষের মধ্যে যা সর্বজনীন, এ হ'ল তার কর্ষিত কল্পনা, এবং যা কিছু মানুষকে অযথা পৃথক রাখে এ হ'ল তার প্রতি বিদ্রোহ। যাকে সময় সময় লোক-হিতের প্রতি বদান্যতা বলা হয়, তা লোকের নিজেদের মনোমত হিত সাধনের পথ খুঁজে নিতে তাদের মুক্ত করার পরিবর্তে বরং তাদের পক্ষে যা হিতকর হবে তাই নির্দেশ করে দেওয়ার একটা অনবহিত মুখোশ হতে পারে। সামাজিক কৃতিত্ব, এমন কি সমাজ সেবাও, কঠিন ও ধাতব রূপ ধারণ করে, যদি তাকে বিভিন্ন লোকের হিতসাধনের পক্ষে যে সব বিচিত্র সুযোগ জীবন যুগিয়ে চলে তার সক্রিয় স্বীকৃতি থেকে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মনোনয়নে বুদ্ধিগম্য করতে উৎসাহিত করার মধ্যে যে সামাজিক সার্থকতা আছে তার প্রতি আস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়।

৩। লক্ষ্যরূপে কৃষ্টি

সামাজিক কৃতিত্ব এমন একটা লক্ষ্য কি না, যা কৃষ্টির সঙ্গে সুসঙ্গত, —সে কথা এই সব বিচার-বিবেচনার উপরই নির্ভর করে। কৃষ্টির অর্থ অন্ততঃ এমন কিছু যা কর্ষিত হয়েছে, বা যা সুপক্ব হয়েছে। কৃষ্টি, কাঁচা ও স্থূল অবস্থার বিরোধী। যখন "স্বাভাবিক"কে এই কাঁচা-অবস্থার সাথে একাত্ম করা হয়, তখন, যাকে স্বাভাবিক বিকাশ বলা হয় কৃষ্টি তার বিরোধী হয়ে ওঠে। এ ছাড়া, কৃষ্টি একটা ব্যক্তিগত জিনিস: বিভিন্ন ধারণা, কলা, ও প্রশস্ত মানবিক স্বার্থাদির মূল্যবোধ সংক্রান্ত চর্চা বা কর্ষণ। যখন কৃতিত্বকে "কর্মতৎপরতার" ভাব ও তাৎপর্যের সাথে একাত্ম করার পরিবর্তে, এক সঙ্কীর্ণ পরিধিবিশিষ্ট বিভিন্ন "কাজের" সঙ্গে একাত্ম করা হয়, তখন কৃষ্টি হয় কৃতিত্বের বিরোধী। কৃষ্টিই বলি আর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশই বলি, যখন একজন লোকের মধ্যে যা অনন্য-সাধারণ তার প্রতি মনোযোগ পড়ে, তখনই কৃষ্টি বা বিকাশের পরিণতি সামাজিক কৃতিত্বের আসন্ন অর্থের সাথে এক হয়ে যায় (এবং যার মধ্যে অসামান্যতা বলে কিছু নেই, তাকে ব্যক্তিই বলা চলে না)। এর বিপরীত অবস্থা হ'ল মাঝারি অবস্থা, বা গড়পড়তা অবস্থা। যখনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ বিকাশলাভ করে, তখনই

ব্যক্তিত্বের পার্থক্য ঘটে, এবং এর সঙ্গে সমাজ সেবার যে অধিকতর সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা বৈষয়িক পণ্য আমদানির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়। কারণ, যদি একটা সমাজ তাৎপর্যপূর্ণ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে গঠিত না হয়, তা হলে সে সমাজ কি করে যথার্থ সেবার উপযুক্ত হতে পারে?

আসল কথা এই যে, সামাজিক কৃতিত্বের প্রতি ব্যক্তিত্বের উচ্চমূল্যের বিরোধিতা, অধম ও উত্তমের মধ্যে অনমনীয় বিভাজন-সম্বলিত সামন্ততন্ত্র সংগঠিত সমাজেরই ক্রিয়াফল। এখানে ধরে নেওয়া হতো যে, উত্তম শ্রেণীর লোকেরাই মানুষের মতো বিকাশ লাভ করার উপযুক্ত সময় ও সুযোগ পায়, এবং অধম শ্রেণীর লোকেরা বাইরের সামগ্রী যোগাবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। একটি ভবিষ্যাপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য উৎপাদন বা ফলন দিয়ে পরিমাপ-করা সামাজিক কৃতিত্বকে যখন আদর্শ বলে জোর দেওয়া হয়, তখন তার এই অর্থ দাঁড়ায় যে, অভিজাত গোষ্ঠী স্বভাবতঃ সাধারণ লোকের সম্বন্ধে যে হেয় মূল্যানুমান করে, তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া এবং তারই জের টেনে চলা। কিন্তু গণতন্ত্রের যদি একটি নীতিগত বা আদর্শগত অর্থ থাকে, তাহলে সেটি এই যে, সকলের কাছ থেকেই একটা সামাজিক প্রতিদান দাবী করতে হবে, এবং সকলকেই নিজ নিজ বৈশিষ্টপূর্ণ সামর্থ্যের বিকাশ লাভের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুটো লক্ষ্য পৃথক করে রাখা গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক। কৃতিত্বের সঙ্কীর্ণ অর্থ ধরলে তার মূল সার্থকতাকে বাদ দেওয়া হয়।

যে কোনো শিক্ষাসংক্রান্ত লক্ষ্যের মতোই কৃতিত্বের লক্ষ্যকে অভিজ্ঞতার ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে ধরতে হবে। যখন একে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূল্যবান অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে বিচার না করে, প্রকাশ্য বাহ্য ফলাফলের মানদণ্ডে ধার্য করা হয়, তখন কৃতিত্ব হয়ে দাঁড়ায় জড়বাদী। পণ্য-সামগ্রীসংশ্লিষ্ট ফললাভ, সুদক্ষ ব্যক্তিত্বের উপবৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু ঠিক ঠিক অর্থে, এ হ'ল শিক্ষার উপজাত ফল। এ সব উপফল অবশ্যম্ভাবী এবং গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা উপফল মাত্র। একটা বাহিক লক্ষ্য দাঁড় করালে, এর প্রতিক্রিয়ার ফলে কৃষ্টি সম্বন্ধে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা বলবৎ হয় যে, সেটি কৃষ্টিকে বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ কোনো কিছুর সাথে একাত্ম করে রাখে। এবং অন্তরঙ্গ বা ভিতরকার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণাঙ্গ করার ধারণা সামাজিক বিভাজনেরই একটা

নিশ্চিত লক্ষণ। কারণ, যাকে অন্তরঙ্গ বলা হয় তা অবশ্যই এমন কিছু, যা অন্যান্যের সাথে সংযোজিত হয় না, এবং যা স্বচ্ছন্দ ও সম্পূর্ণ আদান-প্রদানের যোগ্য হয় না। যাকে আধ্যাত্মিক কৃষ্টি বলা হয়, তাও সাধারণতঃ ব্যর্থ হয়ে থাকে; তার সাথে বিকৃত কোনো কিছু জড়ো হয়েছে; এবং ঠিক এই কারণেই তা হয়েছে যে, একে এমন কিছু বলে ধারণা করা হয়েছে যেটি কেবল একজনের অন্তরেই থাকতে পারে,—কাজেই তা একতরফা ও অপরের সঙ্গে সংশ্রবশূন্য। ব্যক্তি হিসাবে একজন যা, তা হল পারস্পারিকতার ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সে যে ভাবে অন্যান্যের সাথে সম্মিলিত থাকে। যে কৃতিত্বের অর্থ অন্যাণ্ঠকে সামগ্রী যোগানো, আর যে কৃষ্টি এক তরফা পরিশোধন ও পরিমার্জন, উক্ত ব্যবহার এর দুয়েরই উর্ধ্বে।

কৃষক, চিকিৎসক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই তার ন্যস্ত বৃত্তি ব্যর্থ হয়ে যায়,—যদি সে দেখতে না পায় যে, যা কিছু সে করছে তার ফল অপরের কাছে একাধারে মূল্যবান ও মূলতঃ সার্থক। বস্তুতঃ সম্পাদন ও অভিজ্ঞতার ক্রিয়া সহযোগী,— এরা একসঙ্গেই চলে। তা হলে কেন এ রকম মনে করা হয় যে, ব্যক্তির উদ্দেশ্য তার নিজের আত্মাকে বাঁচাবার জন্যই হোক বা এক অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক জীবন বা ব্যক্তিত্ব গঠন করার জন্যই হোক, তাকে অবশ্যই পরার্থে কাজ করার জন্য আত্মবলি, বা নিজের এক তরফা উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য পরকে বলি দেওয়ার মধ্যেই একটাকে বেছে নিতে হবে? আসলে যা ঘটে তা এই যে, যেহেতু এর কোনোটাই অবিরত ভাবে করে যাওয়া সম্ভব নয়, সেই হেতু আমরা একটা মীমাংসা বা পালা-বদল করে নিই। এর প্রতিটি ধারা পালাক্রমে চেষ্টা করা হয়। পৃথিবীতে স্বীকৃত আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার এতো বড়ো একটা অংশ, আত্ম বলিদান ও আধ্যাত্মিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা সম্বলিত দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত না করে, এই দুটো আদর্শের উপরই যে এতো বেশী জোর দিয়েছে—এর চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে? এই দ্বৈতবাদ এতো গভীরে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, একে সহজে দূর করা যাবে না। এই জন্য বর্তমান কালে শিক্ষার বিশেষ কর্মভার হল এমন একটা লক্ষ্যের পক্ষ নিয়ে সংগ্রাম করা, যার মধ্যে সামাজিক কর্মকুশলতা ও ব্যক্তিগত কৃষ্টি পরস্পর-বিরোধী না হয়ে একই অর্থ বহন করবে।

সারাংশ

সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার সুনির্দিষ্ট সমস্যাদিকে নিরীক্ষা করার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ। কাজেই কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্যকে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়, তাকে অন্য আর একটি উদ্দেশ্য দ্বারা নির্দেশিত কার্যক্রমের মধ্যে স্থানান্তরিত করা যায় কি না, তাই দেখে প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন করা হয়। আমরা তিনটি সাধারণ লক্ষ্যের উপর এই পরীক্ষা প্রয়োগ করেছি : স্বাভাবিক বিকাশ, সামাজিক কর্মকুশলতা (কৃতিত্ব), এবং কৃষ্টি বা ব্যক্তিগত মানসিক সমৃদ্ধি। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি যে, আংশিকভাবে নিলে, এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। স্বাভাবিক বিকাশের আংশিক প্রস্তাবনা জন্মগত ক্ষমতা সমূহের তথাকথিত স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে উদ্দেশ্য বলে ধরে নেয়। এই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, যে শিক্ষা এই সব ক্ষমতাকে পরের কাজের উপযুক্ত করে সেটা অস্বাভাবিক বাধ্য-বাধকতার রূপ নেয়। আবার যে শিক্ষা ইচ্ছাকৃত লালনের মাধ্যমে ঐ ক্ষমতাগুলোর গভীর পরিবর্তন করতে চায় সে শিক্ষা নিজেই দূষিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে, স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের অর্থ হল জন্মগত ক্রিয়াকলাপ, এবং যে সব কাজে এদের লাগানো হয় তার মধ্যে দিয়েই এরা বিকাশ লাভ করে, তখন এই দ্বন্দ্ব লোপ পায়। এইরূপে, যখন সামাজিক কর্মকুশলতাকে অপরকে বাহ্যিক সেবাদানের অর্থে সংজ্ঞায়ন করা হয়, তখন তা অবশ্যই অভিজ্ঞতার তাৎপর্যকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যের বিরোধী হয়। অন্য দিকে, যে কৃষ্টিকে মনের আভ্যন্তরীণ পরিমার্জনা অর্থে ধরা হয়, তাও সমাজধর্মী ধাতের বিরোধী। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে সামাজিক কর্মকুশলতার অর্থ হওয়া উচিত ক্ষমতার সেইরূপ কর্ষণ যাতে সর্বজনীন বা অংশীদারী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এটি স্বচ্ছন্দে ও সম্পূর্ণরূপে যোগ দিতে পারে। কৃষ্টি না থাকলে তা করা যায় না, এবং তাতে কৃষ্টিও পুরস্কৃত হয় ; কারণ শিক্ষা ছাড়া, প্রশস্ততর দৃষ্টিকোণ ছাড়া, এবং তার অভাবে যা কিছু অজ্ঞাত থাকে তার উপলব্ধি ছাড়া, কেউই অন্যান্যের সঙ্গে আদান-প্রদানে অংশ নিতে পারে না। সম্ভবতঃ কৃষ্টির সর্বোত্তম সংজ্ঞা হল,—অর্থোপলব্ধির সীমা ও নির্ভুলতাকে অবিরত সম্প্রসারিত করার সামর্থ্য।

দশম অধ্যায়

স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খলা

১। শব্দার্থ

আমরা এর আগেই, একজন দর্শক এবং একজন সংঘটক বা অংশগ্রাহীর মনোভাবের পার্থক্য দেখেছি। যা ঘটছে, তার প্রতি প্রথম জন নির্বিকার; তাঁর কাছে এর এক ধরনের ফলও যা, আর এক ধরনের ফলও তাই। এ কেবল একটা কিছু দেখবার মতো। কিন্তু পরবর্তী ব্যক্তি, যা ঘটছে তার সাথে জড়িত; এর পরিণতি তার কাছে পার্থক্যমূলক। ঘটনার যে ফল হবে, তার সাথে তার ভাগ্য কম বেশী জড়িত। কাজেই উপস্থিত ঘটনাবলী কোন্ মোড় নেয়, তা প্রভাবিত করার জন্য সে যা পারে, তা করে। এক ব্যক্তি কারাকক্ষের কোনো কয়েদির মতো যেন জানালা দিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখছে; এতে তার কিছু যায় আসে না। অন্য ব্যক্তি৷ হলেন তাঁর মতো, যিনি পরের দিন বেড়াতে বেরোবার মতলব করেছেন, এবং বৃষ্টি যদি হতেই থাকে, তা হলে তা নষ্ট হবে তাও ভাবছেন। উপস্থিত মানসিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে তিনি অবশ্য আগামী কালের আবহাওয়া বদলাতে পারেন না; তবে তিনি এমন কিছুতে হাত দিতে পারেন যা ভবিষৎ ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করবে—হয়তো তা কেবল প্রস্তাবিত বনভোজন স্থগিত রাখার জন্যও হতে পারে। যদি কেউ দেখতে পান যে, একটা গাড়ী এসে পড়ল, এবং তিনি চাপা পড়তে পারেন, তাহলে তিনি গাড়ীটা না থামাতে পারলেও, অন্ততঃ তার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন, অবশ্য যদি তিনি সময় থাকতেই এর পরিণাম দেখতে পান। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে তিনি আরও সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারেন। কাজেই একটি ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একজন অংশগ্রাহীর মনোভাব দ্বিবিধ: প্রথমত: উৎকণ্ঠা,—ভবিষৎ পরিণাম সম্বন্ধে উদ্বেগ, এবং দ্বিতীয়তঃ সুফলকে নিশ্চিত ও কুফলকে প্রতিহত করার প্রবণতা।

এই মনোভাবকে ব্যক্ত করার জন্ত সংশ্লিষ্টতা, স্বার্থবোধ প্রভৃতি শব্দ

ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই শব্দদ্বয় ইঙ্গিত করে যে, লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে যে সব সম্ভাব্যতা থাকে, ব্যক্তি তার সাথে জড়িত। এই জন্য লক্ষ্যবস্তু তাঁর সম্পর্কে যা ঘটাতে পারে ব্যক্তি তার উপরে নজর রাখে ; এবং তাঁর প্রত্যাশা বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ভিত্তিতে তিনি বিষয়টিকে এ ভাবে মোড় না দিয়ে বরং অন্যভাবে মোড় দেওয়ার সপক্ষে কাজ করার জন্য ব্যগ্র থাকেন। স্বার্থবোধ ও লক্ষ্য, সংশ্লিষ্টতা ও উদ্দেশ্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শব্দ। যে সব "ফল" চাওয়া হয়, এবং যার জন্য চেষ্টা করা হয়, লক্ষ্য, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য প্রভৃতি শব্দ তার উপরেই গুরুত্ব দেয়। এই শব্দাবলী, উৎকণ্ঠা ও মনোযোগপূর্ণ ব্যগ্রতা সমন্বিত ব্যক্তিগত মনোভাবের বিদ্যমানতা ধরেই নেয়। স্বার্থবোধ, বেদন সংশ্লিষ্টতা, প্রেষণা প্রভৃতি শব্দ, যা-কিছু পূর্বদৃষ্ট হয়, এবং ব্যক্তির অদৃষ্টের উপরে যার প্রভাব পড়ে, এবং সম্ভাব্য ফলের জন্য ব্যক্তির যে সক্রিয় আগ্রহ বর্তমান থাকে, তার উপরেই গুরুত্ব দেয়। এই শব্দাবলী বিষয়মুখী পরিবর্তনকে ধরেই নেয়। কিন্তু পার্থক্য কেবল জোর দেওয়ার উপরেই। এক শ্রেণীর শব্দের মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন থাকে, আর এক শ্রেণীর শব্দের মধ্যে তা প্রকাশ পায়। "যা-কিছু"ই পূর্বানুমিত, তা বিষয়মুখী এবং নৈর্ব্যক্তিক ; যেমন আগামীকালের বৃষ্টি, গাড়ী চাপা পড়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সক্রিয় সত্তার পক্ষে, অর্থাৎ যে সত্তা পরিণাম থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে, পরিণামের ভোগী হয়, তার পক্ষে, পূর্বানুমানকালে ব্যক্তিগত সাড়াও আসে। কল্পনায় যে পার্থক্য আগে থেকে দেখা যায় সেটাই উপস্থিত সাড়ার পার্থক্য সৃষ্টি করে, এবং তা-ই প্রকাশ প্রায় উৎকণ্ঠা ও প্রচেষ্টাতে। যদিও বেদন, সংশ্লিষ্টতা, মতলব, শব্দাবলী ব্যক্তিগত পক্ষপাতের মনোভাব সূচিত করে, তবুও এ সব শব্দ সব সময়েই "বিষয়ের" প্রতি মনোভাব, অর্থাৎ যা অগ্রদৃষ্ট হয়েছে তার প্রতি মনোভাবকেই বোঝায়। আমরা বিষয়মুখী অগ্রদৃষ্টির পর্যায়কে বুদ্ধিগত, এবং ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতার পর্যায়কে প্রক্ষোভগত ও ঐচ্ছিক বলতে পারি, কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তব তথ্যের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা থাকে না।

এরূপ বিচ্ছিন্নতা তখনই থাকতে পারত যদি বিভিন্ন ব্যক্তিগত মনোভাব নিজ নিজ বিশ্বে বিচরণ করে বেড়াতো। কিন্তু পরিস্থিতির মধ্যে যা চলছে, ব্যক্তিগত মনোভাব তারই অংশ এবং তার প্রতি সাড়া। এবং তার সার্থক

বা ব্যর্থ প্রকাশ নির্ভর করে, অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে তার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপরে। কেবল পরিবেশের মধ্যস্থিত পরিবর্তনের সম্পর্কেই জীবনের ক্রিয়াকলাপ সমৃদ্ধি লাভ করে, বা বিফল হয়। জীবনের ক্রিয়াকলাপ এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে আক্ষরিক অর্থে জড়িত। আমাদের চতুষ্পার্শ্বের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের সাথে আমাদের ক্রিয়া-কর্ম যে যে ভাবে বাঁধা, আমাদের বিভিন্ন বাসনা, প্রক্ষোভ ও বেদন তারই নানাবিধ রূপ। এই সব মনোভাব বিষয়মুখী নৈর্ব্যক্তিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অবিমিশ্র ব্যক্তিগত ও অন্তর্মুখী জগৎকে চিহ্নিত করার পরিবর্তে, বরং ও-রূপ কোনো জগতের অস্তিত্বহীনতাই সূচিত করে। এ সব মনোভাব সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে, বস্তুর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, তা "স্বয়ং"-এর ক্রিয়াকর্মের সম্পর্কে বিরুদ্ধাচারী নয়; বরং তার কর্মজীবন ও কল্যাণ, ব্যক্তি ও বস্তু সমূহের আন্দোলনের সঙ্গেই জড়িত। স্বার্থবোধ এবং সংশ্লিষ্টতার অর্থ এই যে, একটি বিকাশমান পরিস্থিতির মধ্যে স্বয়ং এবং বিশ্ব পারস্পরিক ভাবে নিযুক্ত।

প্রচলিত প্রয়োগ অনুসারে, স্বার্থবোধ শব্দটি, (১) সক্রিয় বিকাশের সম্পূর্ণ অবস্থা, (২) অগ্রদৃষ্ট ও আকাঙ্ক্ষিত বিষয়মুখী ফল, এবং (৩) ব্যক্তিগত প্রক্ষোভমূলক ঝোঁক জ্ঞাপন করে। (১) কোনো বৃত্তি, কর্মসংস্থান, অনুধাবন ও ব্যবসায়কে এক একটি স্বার্থ বলে বলা হয়। আমরা বলি যে, একজনের স্বার্থ হ'ল, রাজনীতি বা সাংবাদিকতা বা লোকহিতৈষণা, বা প্রত্নতত্ত্ব, বা জাপানী ছাপার জিনিস, বা লগ্নি কারবার। (২) কোনো একটা বিষয় একজন লোককে যেখানে আবেগাকুল করে তোলে বা তাতে নিযুক্ত করে, অর্থাৎ তাকে প্রভাবিত করে, তখন আমরা সেই অবস্থাকেও স্বার্থবোধ বলে অভিহিত করতে পারি। কোনো কোনো আইন-ঘটিত ব্যাপারে, আদালতে স্বীকৃতি পাবার জন্য একজনকে প্রমাণ দিতে হয় যে, তার "স্বার্থ" আছে। তাকে দেখাতে হয় যে, কোনো প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপ তার ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদিও একজন নীরব অংশীদার ব্যবসা চালাতে কোনো সক্রিয় অংশ নেন না, তবুও এতে তার স্বার্থবোধ থাকে। কারণ এর উন্নতি বা অবনতি তার লাভ ও দায়-এর উপরে প্রভাব খাটায়। (৩) আমরা যখন বলি যে একজন লোকের এটাতে বা সেটাতে স্বার্থ আছে,

তখন কথার জোরটা সরাসরি পড়ে তার ব্যক্তিগত মনোভাবের উপরে। স্বার্থ-বোধিত হওয়া মানে কোনো বিষয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া, জড়িয়ে পড়া এবং তা দিয়ে প্রভাবিত হওয়া। স্বার্থ দেখানোর অর্থ হ'ল, তৎপর থাকা, যত্ন নেওয়া, মনোনিবেশ করা। স্বার্থ রয়েছে, এ রকম একজন লোকের সম্বন্ধে আমরা বলি যে, বিষয়টার মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে; আবার এও বলি যে, বিষয়টার মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। দুটো কথাই কোনো একটা বিষয়ের মধ্যে আত্ম-মগ্নতা প্রকাশ করে।

যখন শিক্ষায় স্বার্থবোধ সম্বন্ধে নিন্দাসূচক কোনো কথা বলা হয়, তখন দেখা যায় যে, উল্লিখিত অর্থগুলির মধ্যে দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রথমে অতিরঞ্জিত, এবং পরে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়। ব্যক্তিগত সুবিধা বা অসুবিধা, কৃত-কার্যতা বা অকৃতকার্যতার উপরে যে ফলাফল ঘটে, স্বার্থবোধ অর্থে কেবল সেটাই ধরে নেওয়া হয়। বিষয়ের বিষয়মুখী বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে এই ফলাফল কেবল ব্যক্তিগত আনন্দ বা বেদনার অবস্থাতে পরিণত হয়। তখন শিক্ষার দিক থেকে স্বার্থবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ দাঁড়ায় যা অন্যভাবে ভালও নয় মন্দও নয়, তাতে প্রলুব্ধ করার মতো গুণ আরোপ করা, অর্থাৎ সুখের ঘুষ কবুল করে মনোযোগ ও চেষ্টা জাগানো। একেই বলে "নরম" মাস্টারী বা "ঝোল-রসই শিক্ষাতত্ত্ব। এবং এ দুইয়েরই বদনাম আছে। কিন্তু সে আপত্তির ভিত্তি, বা মন-গড়া ভিত্তি এই যে, যে সব ক্রিয়া-কৌশল দখলে আনতে হবে, এবং যে সব বিষয়-বস্তু আয়ত্ত করতে হবে তাদের নিজ নিজ গুণে কোনো আকর্ষণ থাকে না; অন্য কথায়, শিক্ষার্থী-দের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের সম্পর্কে ওগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক ধরা হয়। স্বার্থবোধ মতবাদের খুঁত ধরে প্রতিকার হয় না; এবং অসংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তুর সাথে গেঁথে দেওয়ার জন্য কোনো আকর্ষণীয় টোপের তালাস করেও এর প্রতিকার হয় না। এর প্রতিকার হ'ল এমন বিষয়-বস্তু ও কাজের ধরন আবিষ্কার করা, যা শিক্ষার্থীদের উপস্থিত ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। কাজে নিযুক্ত করার পক্ষে, এবং অবিচলিত ও অবিরতভাবে কাজ করে যাওয়ার পক্ষে, এই বিষয়-বস্তুর যে ধর্ম থাকে, তাই এর আকর্ষণ। যদি বিষয়-বস্তু এই ভাবে ক্রিয়া করে, তা হলে একে আকর্ষণীয় করার জন্য ফন্দি খোঁজবার বা স্বেচ্ছাচারী আধা দমন-নীতি প্রয়োগ করবার, তাগিদ

থাকে না।

শব্দ প্রকরণ অনুসারে, যা-কিছু "মধ্যস্থলে" থাকে,—অর্থাৎ অন্যভাবে দূরে দূরে অবস্থিত, এমন দুটো জিনিসকে যা কিছু যুক্ত করে—আকর্ষণ শব্দটা তারই আভাস দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দূরত্বকে সময়গত বলে মনে করা যেতে পারে। একটা কাজের ধারার পরিণতির সঙ্গে সময়ের কথাটা এতো স্পষ্ট যে, আমরা কচিৎ তা বিশদভাবে বলি। আমরা দেখেও দেখি না যে, কোনো কার্য-ধারার প্রথম পর্যায় ও সমাপ্তিকালের মধ্যবর্তী ব্যবধান পূরণ করতে হবে; দেখেও দেখি না যে, মাঝখানে একটা কিছু এসে পড়েই। বিদ্যালাভে শিক্ষার্থীর বর্তমান ক্ষমতা হ'ল প্রারম্ভিক পর্যায়; শিক্ষকের লক্ষ্য হ'ল দূরবর্তী সীমারেখা। এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে "উপায়"—অর্থাৎ যে সব কাজ করতে হবে, যে সব প্রতিবন্ধক দূর করতে হবে, যে সব উপকরণ প্রয়োগ করতে হবে,—সেই সব মধ্যবর্তী শর্ত। আক্ষরিকভাবে সময়গত অর্থে, কেবল এ সবের "মধ্য দিয়েই" প্রারম্ভিক ক্রিয়াকলাপ সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করে থাকে।

এই মধ্যকালীন শর্তাবলী ঠিক ঠিক এই কারণেই স্বার্থদ্যোতক যে, অগ্রদৃষ্ট ও অভিলষিত উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপের বিকাশ এদের উপরেই নির্ভর করে। উপস্থিত প্রবণতাগুলির সিদ্ধির উপায়স্বরূপ হওয়া, সংঘটক ও তার উদ্দেশ্যের "মধ্যকালীন" হওয়া, এবং স্বার্থদ্যোতক হওয়া প্রভৃতি অবস্থাগুলি একই অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নাম। বিষয়বস্তুকে যখন স্বার্থ-বোধক "বানাতে হবে" তখন তার এই অর্থ দাঁড়ায় যে, যেভাবে তা এখন উপস্থাপিত করা হচ্ছে, তাতে উদ্দেশ্য ও বর্তমান ক্ষমতার সঙ্গে তার সংযোগের অভাব রয়েছে; কিম্বা, যদিও বা সংযোগ থেকে থাকে, তা হলেও সেটা মালুম হয় না। এখন কথা হল এই যে, যে সংযোগ থাকে তার স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়ে দিয়ে বিষয়টাকে স্বার্থদ্যোতক করা সোজাসুজি বুদ্ধিমানের কাজ; আর বাহ্যিক ও কৃত্রিম প্রলোভন দেখিয়ে একে স্বার্থদ্যোতক করলে, শিক্ষায় স্বার্থবোধ সম্বন্ধে যতো দুর্নাম করা হয়েছে তার সব কিছুই তার প্রাপ্য হয়।

স্বার্থবোধের অর্থ তো বলা হল, এখন ধরা যাক শৃঙ্খলার অর্থ। যে ক্ষেত্রে কোনো ক্রিয়াশীলতা সময়সাপেক্ষ, যে ক্ষেত্রে আরম্ভ ও সমাপ্তির মধ্যে অনেক

উপায় ও বাধা থাকে, সে ক্ষেত্রে গভীর বিবেচনা ও অধ্যবসায়ের দরকার। সহজেই দেখা যায় যে, সংকল্প শব্দের চলিত অর্থের একটা খুব বড়ো অংশ হ'ল, বাধাবিপত্তি ও বিপরীত প্রলোভন সত্ত্বেও, কোনো পরিকল্পিত কর্ম-পথে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাওয়া এবং লেগে থাকার একটা সুচিন্তিত বা সংজ্ঞাত প্রবণতা থাকা। চলিত প্রয়োগ অনুসারে যাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প আছে মনোনীত উদ্দেশ্য সম্পাদনে তিনি অস্থিরও ন'ন, নিরুদ্যমও ন'ন। তাঁর সক্ষমতা কৃতি সুলভ; অর্থাৎ তিনি অধ্যবসায় ও উদ্যম সহকারে তাঁর লক্ষ্যকে সার্থক বা সম্পাদন করতে প্রবল চেষ্টা করেন। দুর্বল সঙ্কল্প জলের মতোই টলমল করে।

স্পষ্টই দেখা যায় যে, সঙ্কল্পের মধ্যে দুটো উপাদান থাকে। একটি ফলাফলের অগ্রদৃষ্টি সম্বন্ধীয়, অন্যটি ব্যক্তির উপরে অগ্র-দৃষ্ট পরিণতির প্রভাবের গভীরতা সম্বন্ধীয়।

(১) জিদ বা একগুঁয়েমি অবিচল হতে পারে, কিন্তু এতে সঙ্কল্পের জোর নেই। এ কেবল জৈব জড়তা এবং বেদন-হীনতা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে একজনে একটা কাজ আরম্ভ করেছে কেবল সেই কারণেই সে সেটা করে চলেছে, কোনো সুবিবেচিত উদ্দেশ্য রেখে নয়। প্রকৃতপক্ষে, জেদী লোকের কাছে সাধারণতঃ তার প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য যে কি, তাও পরিষ্কার নয়, (যদিও সে এই অস্বীকৃতির কথা ঠিক করে নাও জানতে পারে)। সে যেন মনে করে যে, যদি সে নিজেকে এর একটা স্পষ্ট ও পূর্ণ ধারণা দেয়, তা হলে হয়ত কাজটা করার সার্থকতাই থাকবে না। উদ্দেশ্য সাধন করতে অধ্যবসায় ও উদ্যম সহকারে উপায় প্রয়োগ করার মধ্যে একটা জেদ দেখা যায়; এমন কি, তার থেকেও বেশী জেদ দেখা যায় উপস্থিত উদ্দেশ্যের সমালোচনা করতে অনিচ্ছার মধ্যে। তিনিই হলেন আসল কৃতকর্মা লোক যিনি তাঁর উদ্দেশ্য ভেবে চিন্তে দেখেন, যিনি তাঁর কাজের ফলাফলের ধারণা যতোদূর সম্ভব স্পষ্ট করে দেখে নেন। যাদের আমরা দুর্বল সঙ্কল্পের বা অসংযমী লোক বলেছি তারা সব সময়েই তাদের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে নিজেদের ঠকায়। তারা কোনো পছন্দসই দিক বার করে নেয়, এবং সংলগ্ন বাকী সব কিছুই অবহেলা করে। যখন তারা কাজ করতে আরম্ভ করে তখন যে সব অপছন্দ-করা ফলাফলকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, সেগুলো আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এতে তারা দমে যায়, বা অভিযোগ করে যে, দুরদৃষ্ট তাদের

সদুদ্দেশ্যে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। তখন তারা অন্য পথ ধরে। এটি আদৌ অত্যুক্তি নয় যে, দৃঢ় এবং শিথিল সংকল্পের মধ্যের মৌলিক পার্থক্য বুদ্ধিগত; অর্থাৎ যে মাত্রায় অবিচলিত দৃঢ়তা ও সম্পূর্ণতা সহকারে বিভিন্ন পরিণামকে বিবেচনা করে নেওয়া হয়েছে, তার অন্তর্গত।

(২) অবশ্য ফলাফলের দূরকল্পিত রূপরেখার মতো একটা কিছু থাকে। এতে পরিণাম পূর্ব-দৃষ্ট হয়, কিন্তু তা ব্যক্তির গভীরে রেখাপাত করে না। এ এমন কিছু, যার প্রতি শুধু তাকানো চলে, যা সম্পাদ্য না হয়ে শুধু একটা কৌতূহলী ক্রীড়ায় পর্যবসিত হয়। অতিরিক্ত-বুদ্ধি বলে কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু এক-তরফা বুদ্ধি বলে কিছু আছে। আমরা বলি যে, কোনো প্রস্তাবিত কর্মধারার পরিণাম বিবেচনা করার কালে একজনে যেন "সেটা টেনে বের করে নেয়।" মগজের এক রকম স্থূলতার জন্য বিবেচ্য বিষয়টি লোকটিকে বাগে আনতে এবং তাকে কাজে নিযুক্ত করতে বিরত করে। এবং অধিকাংশ লোকই অসাধারণ ও অদৃশ্যপূর্ব প্রতিবন্ধকের জন্য, অথবা অধিকতর প্রত্যক্ষ পছন্দসই কাজের প্রলোভন বশে, স্বভাবতঃই প্রস্তাবিত কর্মধারা থেকে ভিন্ন পথে চালিত হয়।

যে ব্যক্তি তাঁর কাজকর্ম বিচার-বিবেচনা করতে ও সুবিবেচনার সহিত তা হাতে নিতে অভ্যস্ত, তিনিই মাত্রা অনুযায়ী শৃঙ্খলাসম্পন্ন। এই সক্ষমতার সঙ্গে যখন বিক্ষেপ, বিভ্রান্তি ও বাধা-বিঘ্নের মুখে মনোনীত কর্মধারার মধ্যে স্থির চিত্তে নিবিষ্ট থাকার বুদ্ধিবৃত্তি যোগ হয়, তখনই আমরা শৃঙ্খলার সারাংশ দেখতে পাই। শৃঙ্খলার অর্থ আয়ত্তীকৃত ক্ষমতা, যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রাপ্তব্য সঙ্গতির উপর অধিকার। কি করতে হবে তা জানা, চটপট করে তাতে অগ্রসর হওয়া, এবং উপযুক্ত উপায় প্রয়োগ করে তা করা,—এ সব কিছুরই অর্থ হল শৃঙ্খলাসম্পন্ন হওয়া—তা সে সেনাবাহিনীর পক্ষেই হোক, আর মনের পক্ষেই হোক। শৃঙ্খলা সদর্থক। প্রাণশক্তি সঙ্কুচিত করা, ঝোঁক দমিয়ে দেওয়া, আদেশ পালনে বাধ্য করা, দৈহিক শাস্তি দেওয়া, অধীনস্থ লোককে রুচিহীন কাজ করতে বাধ্য করা,—এই সব কাজ শৃঙ্খলাসম্পন্ন হবে কি হবে না—সেটা জানতে হ'লে বুঝতে হবে যে, একজনে যা করছে তা বোঝবার পক্ষে, এবং অবিচলিতভাবে তা সম্পাদন করার পক্ষে, তাঁর ক্ষমতার বিকাশে সেটি

সহায়ক কি না।

স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খলা যে সংযুক্ত বিষয়, বিরোধী বিষয় নয়, এ কথার উপরে ততো জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (১) এমন কি, অভ্যস্ত ক্ষমতার অধিকতর বিশুদ্ধ, বুদ্ধিগম্য দিকটাও,—অর্থাৎ, একজনে যা করছে, তার পরিণাম যে ভাবে প্রদর্শিত হবে তারও আভাসিক জ্ঞান স্বার্থবোধ ছাড়া সম্ভবপর হয় না। যেখানে স্বার্থবোধ নেই সেখানে বিচার-বিবেচনা শিথিল এবং ভাসাভাসাই থাকে। পিতা-মাতা ও শিক্ষকেরা অনেক সময় অভিযোগ করেন এবং অভিযোগ সত্যও বটে যে, ছেলেমেয়েরা "শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না।" বিষয়-বস্তুর উপর তাদের মন ঠিক এই কারণেই থাকে না যে, এ বিষয়-বস্তু তাদের মনকে স্পর্শ করে না; তাদের ব্যাপারের মধ্যে বিষয়টা প্রবেশ করে না। এ অবস্থার প্রতিকার প্রয়োজন। কিন্তু যে সব বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে অমনোযোগ ও অপছন্দ বাড়ে তার মধ্যে তো এর প্রতিকার নেই। এমন কি অমনোযোগী শিশুকে শাস্তি দেওয়াও, সংশ্লিষ্ট বিষয়টা যে সম্পূর্ণরূপে সংশ্রবহীন "নয়" তা বোঝবার এবং স্বার্থবোধ জাগিয়ে তোলা বা সংশ্রবের বোধ আনার জন্য একটা উপায় বা পদ্ধতি হিসাবে ধরা যায়। শেষ পর্যন্ত, এ রকমের পদ্ধতি, বড়োরা যা চায় সেই অনুযায়ী কাজ করার জন্য শিশুর শুধু শারীরিক উত্তেজনাই যোগায়, না শিশুকে "চিন্তা করতে," অর্থাৎ তার কাজ ভেবে দেখতে এবং উদ্দেশ্য দিয়ে সে কাজকে ভরপুর করতে প্রণোদিত করে,—তা দিয়েই মূল্যায়ন করা হয়।

(২) কার্যনির্বাহী অবিচলতার জন্যও যে স্বার্থবোধের প্রয়োজন তা আরও স্পষ্ট। নিয়োগ কর্তারা এমন কর্মীদের জন্য বিজ্ঞাপন দেন না, যাদের করণীয় কাজে কোনো স্বার্থবোধ থাকবে না। একজনকে যদি এক আইনজ্ঞ, বা চিকিৎসক নিয়োগ করতে হয়, তার মাথায় এ রকম বিচার-বুদ্ধি কখনো আসবে না যে, নিযুক্ত ব্যক্তি একমাত্র বিবেক বুদ্ধি নিয়েই তার কাজে লেগে থাকবে এবং কাজটা তার কাছে যত রুচিহীনই হোক না কেন সে কেবল কর্তব্যের খাতিরেই কাজটা করবে। কোনো পূর্বদৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজের প্রেরণা আনতে সেই উদ্দেশ্য একজনের উপরে যে প্রভাব স্থাপন করে, তার গভীরতাই স্বার্থবোধের পরিমাপ, বা তা-ই স্বার্থবোধ।

২। শিক্ষায় স্বার্থবোধ ধারণার গুরুত্ব।

উদ্দেশ্য-সম্বলিত যে কোনো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই হোক, স্বার্থবোধ হ'ল, বিষয়বস্তুর গতিদায়ক শক্তির প্রতীক, তা সে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বশতঃই হোক, আর কল্পনাতে উপস্থাপিত হয়েই হোক। মূর্ত অর্থে, শিক্ষামূলক বিকাশের ক্ষেত্রে স্বার্থবোধের গতিদায়ক স্থানকে স্বীকৃতি দেওয়ার মূল্য এই যে, এতে বিভিন্ন শিশুদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামর্থ্য, প্রয়োজন ও রুচি বিচার বিবেচিত হয়। যিনি স্বার্থবোধের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেন, তিনি এ রকম ধরে নেবেন না যে, যেহেতু সকল মনের সামনেই এক শিক্ষক ও এক পাঠ্যপুস্তক থাকে, সেইহেতু তারা এক ভাবেই ক্রিয়া করে। একই বিষয়-বস্তুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আবেদনের সঙ্গে মনোভাব, অনুক্রমণ পদ্ধতি ও সাড়ার প্রকারান্তর ঘটে। আবার স্বাভাবিক উপযোগিতা, অতীত অভিজ্ঞতা এবং জীবনের পরিকল্পনা প্রভৃতির পার্থক্য অনুযায়ীও আবেদনের ধরন বদলায়। কিন্তু স্বার্থবোধের বাস্তবিকতা শিক্ষা-দর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণ মূল্যবোধক বিবেচনাদিও যোগায়। সঠিকভাবে বুঝে নিলে, এই বাস্তবিকতা, মন ও বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে অতীতের দার্শনিক চিন্তনে যে সব ধারণা বহু প্রচলিত ছিল, এবং যা শিক্ষা ও শৃঙ্খলার কাজে গুরুতর বিপত্তিজনক প্রভাব খাটিয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে আমাদিকে সতর্ক রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জগতের জ্ঞাতব্য বস্তু ও ঘটনার উপরে আমাদের মন অনুপ্রবিষ্ট করান হয়,—জগৎ যেন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বর্তমান ; আর মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়াও যেন স্বাধীনভাবে বর্তমান। পরে ধরে নেয়া হয় যে, জ্ঞান যেন জ্ঞাতব্য জিনিসের উপর মানসিক অস্তিত্ব সমূহের বাহ্যিক প্রয়োগ, নয় তো, মনের উপর বাহ্য বিষয়-বস্তুর শিল-মোহরের ফলাফল, নয় তো এ দুটোর একটা মিশ্রণ। পরে, বিষয়-বস্তুকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো কিছু বলে ধরা হয় ; এ কেবল এমন একটা কিছু যা শিখতে হবে বা জানতে হবে। এবং সে শেখা বা জানা হবে, হয় মনের ঐচ্ছিক প্রয়োগ দ্বারা,—নয়, মনের উপরে ওদের যে ছাপ পড়েছে তার মধ্য দিয়ে।

স্বার্থবোধের প্রকৃত অবস্থা দেখিয়ে দেয় যে, এ সমস্ত ধারণা অতিকথা। সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিণামের পূর্বানুমানের ভিত্তিতে উপস্থিত উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়ার সক্ষমতারূপে, এবং যে জাতীয় পরিণাম ঘটবে তা নিয়ন্ত্রিত

করার জন্য, অভিজ্ঞতার মধ্যে মন দেখা দেয়। আনুমানিক ঘটনা প্রবাহের উপরে যা-কিছুরই প্রভাব আছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হল, তারাই হয় বিভিন্ন উপাদান, বা জানা বিষয়-বস্তু। এদের প্রভাব ঘটনা প্রবাহের অনুকূলেও হতে পারে, প্রতিকূলেও হতে পারে। এই উক্তিগুলো এতো বিধিবৎ যে, খুব বোধগম্য নয়। একটা উদাহরণ দিলে এদের তাৎপর্য পরিষ্কার হবে।

ধরা যাক আপনি একটি কাজ করতে, যেমন টাইপরাইটারের সাহায্যে লিখতে নিযুক্ত আছেন। আপনি যদি এতে বিশেষজ্ঞ হন, তাহলে আপনার সুগঠিত অভ্যাস যান্ত্রিক নড়াচড়ার প্রতি যত্ন নেবে, এবং আপনার চিন্তাধারা বিষয়-বস্তু বিবেচনা করার জন্য মুক্ত থাকবে। কিন্তু ধরুন যেন, আপনি তেমন দক্ষ নন, অথবা, যদিও আপনি সুদক্ষ, মেসিনটা ভালো কাজ করছে না। এ অবস্থায় আপনাকে বুদ্ধি খাটাতে হবে। আপনি পরিণামের পরোয়া না করে যদৃচ্ছভাবে চাবিগুলো ঠুকতে চান না; আপনি কোনো নির্দিষ্ট ধারায় শব্দগুলো বসাতে চান, যাতে অর্থ পরিষ্কার হয়। আপনি চাবিগুলোর দিকে, যা লিখছেন তার দিকে, আপনার নড়ন-চড়নের দিকে, এবং রিবন বা মেসিনের কল-কবজার দিকে নজর রাখছেন; আপনার মনোযোগ নিঃস্বার্থ-ভাবে ও মিশ্রিতভাবে প্রতিটি খুঁটিনাটির মধ্যে বন্টিত হয় না। আপনার হাতের কাজটিকে করবার জন্য যা কিছুর প্রভাব বর্তমান, তার উপরেই আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকে। আপনার দৃষ্টি রয়েছে ভবিষ্যতের দিকে এবং বর্তমান অবস্থাগুলো আপনাকে এই কারণে দেখতে হচ্ছে যে, ওগুলো আপনার অভীষ্ট ফললাভের উপাদান স্বরূপ এবং উপাদান হিসাবে যতোদূর প্রয়োজন, ততোদূরই আপনাকে দেখতে হচ্ছে। আপনাকে দেখে নিতে হবে যে, আপনার সঙ্গতি কি, কোন্ কোন্ অবস্থা আপনার অধীনে আছে এবং এতে বাধা-বিঘ্নই বা কি কি আছে। এই অগ্রদৃষ্টি এবং যা অগ্রদৃষ্ট হচ্ছে তার সম্পর্কে এই নিরীক্ষাই মনের গঠন-সামগ্রী। যে কাজের মধ্যে ফলাফলের এরূপ পূর্বাভাস নেই, এবং বিভিন্ন উপায় ও বাধা-বিপত্তির এরূপ পরীক্ষণ নেই, সে কাজ হয় অভ্যাসগত, নয়, অন্ধ;—কোনো ক্ষেত্রেই তা বুদ্ধিগত নয়। অভীষ্ট ফল সম্বন্ধে যে পরিমাণে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা থাকে, এবং তাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে যে সব শর্তগুলো এসে পড়ে

তাদের নিরীক্ষা করতে যে পরিমাণে অযত্ন থাকে, মূঢ়তা বা আংশিক বুদ্ধিও সেই পরিমাণেই প্রকাশ পায়।

যে ক্ষেত্রে মন যন্ত্রপাতির ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়ে যা লিখতে মনস্থঃ করা হয়েছে তার সাথেই সংশ্লিষ্ট, সে ক্ষেত্রেও এই অবস্থা বিদ্যমান। পদ্ধতির মধ্যে একটা ক্রিয়াশীলতা থাকে; সেই সঙ্গে বিষয় বস্তুর বিকাশেও মন নিবিষ্ট থাকে। গ্রামোফোন যে ভাবে কথা বলে, সে ভাবে যদি না লেখা হয়, তা হলে এ কাজে বুদ্ধি লাগে; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমান তথ্য ও বিচার-বিবেচনা যে সব নানা প্রকার সিদ্ধান্তের দিকে মোড় নিতে চায়, তার অগ্রদর্শন করতে তৎপর থাকা চাই; এবং যে সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হবে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তুকে আয়ত্তে আনবার জন্য অবিরতভাবে নতুন করে পর্যবেক্ষণ ও অনুস্মরণের প্রয়োজন হয়। যা দাঁড়াবে এবং বর্তমানে যা আছে সেটা যতদূর পরিসমাপ্তির দিকে গতির মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের সমগ্র মানস প্রবণতা তার সব কিছুকে নিয়েই তৎপর থাকে। কর্মধারার যে নির্দেশ সম্ভাব্য ভবিষৎ ফলাফলের অগ্রদৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, সেটি বাদ পড়লে বর্তমান আচরণ বুদ্ধি-বিবিক্ত হয়ে ওঠে। যদি কল্পনামূলক পূর্বাভাস থাকে, অথচ যে সব শর্তের উপর এর সমাধান নির্ভর করে তার প্রতি মনোযোগ না থাকে, তা হলে তা দাঁড়ায় আত্ম-প্রতারণা, বা অলস স্বপ্ন,—ব্যর্থ বুদ্ধি।

যদি এই দৃষ্টান্তটি নমুনাসই হয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে, মন এমন কিছুর নাম নয় যা স্বয়ংসম্পূর্ণ। মন হল কোনো কর্মধারার নাম। এই কর্মধারা বুদ্ধি দিয়ে যতোটা পরিচালিত হয়,—যতোটা, অর্থাৎ, এর মধ্যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যতোদূর প্রবেশ করে,—আর উদ্দেশ্যে পৌঁছোবার জন্য উপায় নির্বাচন করা যে পরিমাণে থাকে, সেই পরিমাণে বা ততোটাই তা বুদ্ধি বলে ধরা হয়। বুদ্ধিমত্তা এমন একটা অনন্য সম্পত্তি নয়, যা ব্যক্তি অধিকার করে থাকে, পরন্তু ব্যক্তি যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপে ভূমিকা নেয় সেই ভূমিকার মধ্যে উক্ত গুণরাশি যে পরিমাণে থাকে, ব্যক্তি সেই পরিমাণেই বুদ্ধিমান। আবার, ব্যক্তি যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হয়, তা বুদ্ধিগত হোক আর না-ই হোক, তাও ব্যক্তির খাস সম্পত্তি নয়; সে সব এমন কিছু, যার মধ্যে ব্যক্তি "নিযুক্ত হয় ও অংশীদারী করে।" অন্যান্য

জিনিস ও লোকের স্বতন্ত্র পরিবর্তন, হয় সেখানে সহযোগিতা করে, নয় বাধা ঘটায়। ব্যক্তি একটা ঘটনা প্রবাহের সূচনা করতে পারে, কিন্তু এর পরিণাম নির্ভর করবে, অন্যান্য সংঘটক-সূত্রে-আসা শক্তিপুঞ্জের সহিত ব্যক্তির সাড়ার পারস্পরিক ক্রিয়ার উপরে। পরিণামকে ফলিত করার ক্ষেত্রে অন্যান্যের সঙ্গে অংশীদারী করে,—মনকে এ রকমের একটি উপাদান ছাড়া আর কিছু মনে করলে সেটা অর্থহীন হবে।

কাজেই নির্দেশের সমস্যা হ'ল, এমন বিষয়-বস্তু খুঁজে বের করা, যেটি ব্যক্তিকে তার নিজের-কাছে মূল্যবোধক বা স্বার্থাবোধক কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বলিত সুনির্দিষ্ট কাজকর্মে নিযুক্ত করবে, এবং বস্তু ও বিষয়কে ব্যায়ামের যন্ত্রপতি রূপে ব্যবহার না করে, উদ্দেশ্য সাধন করার শর্তরূপে ব্যবহার করবে। পূর্বোক্ত বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলাবাদের সঙ্গে যে সমস্ত দোষ জড়িত আছে, তার স্থানে কোনো বৈশিষ্টপূর্ণ শৃঙ্খলাবাদ উপস্থাপিত করে ঐ দোষের প্রতিকার হবে না,—প্রতিকার হবে মন ও মনের প্রশিক্ষণ-মূলক ধারণার সংস্কৃতি করে। ক্রীড়া-কৌতুকই হোক আর প্রয়োগশীল বৃত্তিই হোক, যা-কিছুর মধ্যে লোকে জড়িত, যার পরিণতির মধ্যে তাঁদের কিছু লাভ-ক্ষতি আছে বলে তাঁরা স্বীকার করেন, এবং যা পর্যবেক্ষণ ও অনুস্মরণের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিন্তন ও বিচারের প্রয়োগ ছাড়া সম্পাদন করা যায় না, ক্রিয়াশীলতার সেই জাতীয় কার্যক্রম আবিষ্কারের মধ্যেই এর যথার্থ প্রতিকার রয়েছে। অল্প কথায়, মনের প্রশিক্ষা সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে বহুদিন যাবৎ যে ভ্রান্তি চলে এসেছে, তার মূলে এই রয়েছে যে, ব্যক্তি যে ফলাফলের অংশীদার হয়, এবং যা নির্দেশিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ, কল্পনা ও অনুস্মরণ নিয়োজিত হয়, তার তালিকাতে বস্তু ও বিষয়ের গতি-প্রকৃতিকে ধরা হয় না। ভ্রান্তি হ'ল, মনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে ধরে নেওয়া, যেন সেটা উপস্থিত যে কোনো বিষয়ে সরাসরি প্রয়োগ করার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে।

ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে ঐ ভ্রান্তি দুটো পথ কেটেছে। এক দিকে সেটি ঐতিহ্যিক পাঠ্য-বিষয় ও শিক্ষণ পদ্ধতিকে বুদ্ধিগত সমালোচনা, ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের হাত থেকে আড়াল করে সংরক্ষিত করেছে। "শৃঙ্খলাসূচক" আখ্যা দিয়ে এই পাঠ্য-বিষয় ও পদ্ধতিকে সকল জিজ্ঞাসা থেকে রক্ষা

করবার জন্য প্রহরা বসিয়েছে। জীবন-যাত্রায় যে এগুলোর কোনো প্রয়োগ নেই, ব্যক্তিগত সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে এরা কোনো অংশদান করে না, তা দেখিয়ে দেওয়া যথেষ্ট হয় নি। এরা যে "শৃঙ্খলাসূচক" এই কথাই সকল জিজ্ঞাসার শ্বাসরোধ করে, সকল দ্বিধা দমন করে, বিষয়টাকে ন্যায়সঙ্গত আলোচনা থেকে বাইরে রেখেছে। কথাটার প্রকৃতিই এমন ধরনের যে, একে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখা চলে না। এমন কি, কাজের বেলায় যখন কোনো শৃঙ্খলাই ঘটেনি, বরঞ্চ শিক্ষার্থী নিজেকে খাটাতে আরো শৈথিল্য দেখিয়েছে এবং বুদ্ধিগম্য আত্ম-নির্দেশের ক্ষমতা হারিয়েছে, তখনও দোষ পড়েছে তার নিজেরই উপরে, পাঠ্য-বিষয় বা শিক্ষণ পদ্ধতির উপরে নয়। তার ব্যর্থতা কেবল এ কথারই প্রমাণ যে, তার আরও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। কাজেই এই অবস্থা পুরোনো পদ্ধতিকে বজায় রাখার কারণ স্বরূপ হয়ে উঠল। দায়িত্বটা শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীর উপর চালান করা হল। কারণ বিষয়টাকে তো আর কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষণের সম্মুখীন হতে হতো না; এটা দেখাতেও হতো না যে, বিষয়টা কোনো বিশিষ্ট প্রয়োজন মেটাচ্ছে, বা কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কাজ করছে। ব্যাপক শৃঙ্খলা সাধনের জন্য এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং যদি তা ব্যর্থ হয়ে থাকে, তা হলে তার কারণ এই যে, ব্যক্তিই শৃঙ্খলা সম্পন্ন হতে অনিচ্ছুক।

অন্য দিকে, শৃঙ্খলাকে কৃতির গঠনমূলক ক্ষমতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে একাত্ম করার পরিবর্তে, শৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটা নঞর্থক ধারণা পোষণের ঝোঁক দেখা দিল। আমরা যেমন আগেই দেখেছি, সংকল্প হল ভবিষ্যতের দিকে সম্ভাব্য পরিণাম ঘটানোর স্বার্থে কোনো একটা ভঙ্গী বিশেষ। এটি এমন একটা মনোবৃত্তি, যার মধ্যে কর্মপন্থার সম্ভাব্য ফলাফলকে স্পষ্ট ও ব্যাপক ভাবে অগ্রদর্শন করা, এবং কোনো পূর্বানুমিত পরিণামের সঙ্গে তার সক্রিয় একীকরণ করার প্রচেষ্টা থাকে। যখন এমন কোনো ক্ষমতা বিশিষ্ট মন গড়ে তোলা হয়, যা কেবল উপস্থিত বিষয়ের উপরেই প্রয়োগ করতে হবে, তখন এর ফল দাঁড়ায় সংকল্প বা প্রচেষ্টাকে কেবল জুলুম বা জবরদস্তির সঙ্গে একাত্ম করা। হাতে নেওয়া কাজে একজনে হয় মাথা খাটাবে, নয় মাথা খাটাবে না। বিষয়-বস্তু যতো বেশী নিঃসম্পর্ক হয়, ব্যক্তির

অভ্যাস ও রুচির সাথে তার সংস্রব ততোই কম থাকে, বিষয়-বস্তুর উপর মন লাগানোর চেষ্টা করার তাগিদ ততোই বেশী আসে, এবং কাজেই সংকল্পের শৃঙ্খলার ততো বেশী প্রয়োজন হয়। একজনে যে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তা নিয়ে কিছু করতে হবে বলে বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেবে,—উক্ত মত অনুসারে, তা শৃঙ্খলাসূচক নয়; এমন কি, এর ফলে যদি গঠনমূলক ক্ষমতার কোনো বাঞ্ছনীয় উন্নতিও হয়, তা হলেও নয়। যেটি কেবল প্রয়োগের খাতিরেই প্রয়োগ, প্রশিক্ষার জন্যই প্রয়োগ,—একমাত্র সেটাই হল শৃঙ্খলা-মূলক। এ রকম হওয়ার সম্ভাবনা তখনই বেশী থাকে, যখন উপস্থাপিত বিষয়-বস্তু রুচিহীন হয়, কারণ সে অবস্থায় কেবল কর্তব্যের স্বীকৃতি বা শৃঙ্খলার মূল্যবোধ ছাড়া আর কোনো মতলবই থাকে না—অবশ্য এটাই ধরে নেওয়া হয়। একজন আমেরিকান রসিকের এক উক্তির মধ্যে এর একটা যুক্তি সঙ্গত ফল আক্ষরিক সত্যরূপে প্রকাশ পায়, "একটি ছেলেকে যা কিছুই শেখানো হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না যদি কেবল সে তা না পছন্দ করে।"

উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য মনকে বস্তু সম্বলিত ক্রিয়াকলাপ থেকে আলাদা করে নেওয়ার অপর পিঠ হল, যা শিখতে হবে, সেই বিষয়-বস্তুকে আলাদা করে নেওয়া। চিরাচরিত শিক্ষা প্রকল্পে বিষয়-বস্তুর অর্থ হল, এতোখানি জিনিস পড়তে হবে। অধ্যয়নের বিবিধ শাখা, কতকগুলো স্বতন্ত্র শাখা উপ-স্থাপিত করে। এদের মধ্যে আবার স্বয়ং-সম্পূর্ণ নিজস্ব বিধি-ব্যবস্থা থাকে। ইতিহাস হল এই রকমের একটি তথ্য সমষ্টি; বীজগণিত আর একটি, ভূগোল আর একটি, এইভাবে সমগ্র পাঠক্রম সাজানো থাকে। এদের নিজ নিজ হিসাবেই এক একটা পূর্ব-প্রস্তুত অস্তিত্ব থাকে বলে, আয়ত্ত করার জন্যে এরা মনকে যা-কিছু যোগায় তার মধ্যেই মনের সাথে এদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। যে প্রচলিত রীতি অনুসারে দিন, মাস ও বছর-বছরের স্কুলের কার্যসূচী পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন "পৃথক পৃথক পাঠ্যবিষয়" দিয়ে গঠিত হয়, এবং যেখানে প্রতিটি বিষয়কে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলে ধরা হয়,—অন্ততঃ শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ধরা হয়—এ ধারণা তারই অনুরূপ।

পরে একস্থানে বিষয়-বস্তুর তাৎপর্যকে বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য এক অধ্যায় উৎসর্গ করা হয়। চিরাচরিত তত্ত্বের সাথে বৈষম্য দেখিয়ে, এ স্থলে

আমাদের কেবল এটাই বলা প্রয়োজন যে, বুদ্ধি দিয়ে যা কিছু পাঠ করা হয়, তা হল স্বার্থবোধের সক্রিয় ধারাকে অগ্রবর্তী করতে বস্তু ও বিষয় যে ভূমিকা গ্রহণ করে তারই প্রতিরূপ। ফল সম্পাদনের জন্য টাইপ-রাইটারের প্রয়োগকে যেমন একজনে ক্রিয়ার অংশরূপে "পাঠ করে", অর্থাৎ তার অন্ধি-সন্ধি বুঝে নেয়, অন্য যে কোনো ঘটনা বা সত্যের বেলাও সেইরূপ ঘটে। যে ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একজন ব্যাপৃত, এবং যার পরিণতি দ্বারা সে প্রভাবিত, তা সুসম্পন্ন করার উপকরণরূপে স্বীকৃত হয়ে যখন একটা জিনিস রূপ ধারণ করে, তখনই তা পাঠ করার, অর্থাৎ জিজ্ঞাসা ও অনুচিন্তনের, বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যা ইতিপূর্বে বিদ্যার গণিত শাস্ত্র নামক শাখা রচনা করেছে,—এই কারণেই যে সংখ্যা পাঠ্য বিষয় তা নয়; পরন্তু সেটি পাঠ্য বিষয় এই কারণে যে, যে সংসারের মধ্যে আমাদের কাজকর্ম চলে, সংখ্যা তারই বিভিন্ন গুণ ও সম্পর্ক উপস্থাপিত করে। সেটি পাঠ্য বিষয় আরও এই কারণে যে, আমাদের উদ্দেশ্য সম্পাদন করা যার উপরে নির্ভর করে, সংখ্যা তার উপকরণ। এ রকম ব্যাপকভাবে বললে সূত্রটিকে নিরাকার বলে মনে হতে পারে। বিশদ করে বললে এর এই অর্থ দাঁড়ায় যে, শিক্ষা করা বা পাঠের কাজটাকে যে মাত্রায় পড়া-শিখতে হবে বলে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা হয়, কাজটা সেই মাত্রাতেই কৃত্রিম ও অকার্যকর হয়। শিক্ষার্থী তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপকে ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে, তার বিচারাধীন সংখ্যাগত সত্যের স্থান যে পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করে, তার পাঠ সেই পরিমাণেই কার্যকর হয়। একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মতৎপরতার উন্নতি বিধানের সঙ্গে, বিষয় ও পাঠ-প্রসঙ্গের এই যোগসূত্রই শিক্ষায় নির্ভেজাল স্বার্থবোধ তত্ত্বের প্রথম ও শেষ কথা।

৩। প্রশ্নটির কয়েকটি সামাজিক দৃষ্টিকোণ

আমরা যে তাত্ত্বিক ভুল-ত্রুটির কথা বলছিলাম, যদিও তা স্কুল পরিচালনা করার ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়, তথাপি সে ভুল-ত্রুটি আবার সামাজিক অবস্থারই পরিণতি। কোনো একটা পরিবর্তন শিক্ষাবিৎদের কাছে তত্ত্বগত প্রত্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সঙ্কট দূর হবে না, যদিও সে প্রত্যয় সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করার প্রচেষ্টাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করবে। সংসারের উপর

মানুষের মৌলিক মনোভাব, মানুষ যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে তার পরিধি ও গুণ দিয়েই স্থির হয়। শিল্পীসুলভ ভঙ্গীর মধ্যে স্বার্থ-বোধের আদর্শ উদাহৃত হতে পারে। কলা শুধু অন্তর্মুখীও নয়, বহির্মুখীও নয়। আবার মানসিক বা ভৌতিকও নয়। অন্য সব ধরনের কাজের মতো, কলাও পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটায়। কোনো কোনো কাজ যে ধরনের পরিবর্তন ঘটায় (কলার বিপরীত অর্থে যাকে যান্ত্রিক বলা যায়), তা বহির্মুখী; অর্থাৎ সেখানে জিনিস-পত্রের অদল বদল ঘটে। এর সাথে আদর্শ স্বরূপ কোনো পুরস্কার, কোনো প্রক্ষোভগত বা বুদ্ধিগত সমৃদ্ধি থাকে না। আর এক ধরনের কাজ জীবন-যাত্রা নির্বাহে এবং এর বাহ্যিক সজ্জা ও আড়ম্বরে অংশ দেয়। আমাদের মধ্যে বর্তমান শ্রমশিল্প ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় বহু সামাজিক কার্যকলাপ এই দুই শ্রেণীতে পড়ে। যাঁরা এ সব কাজে নিযুক্ত অথবা যাঁরা এ সব কাজে সরাসরি প্রভাবিত তাঁরা নিজ নিজ কাজে সম্পূর্ণ ও স্বচ্ছন্দ স্বার্থোপলব্ধি করতে পারেন না। যিনি যে কাজ করছেন, তাতে তাঁর উদ্দেশ্য থাকার অভাব হেতু, অথবা তাঁর লক্ষ্য খুব সীমিত থাকার দরুন, সে কাজে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়োজিত হয় না। এই সব অবস্থা বহুলোককে আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধ্য করে। তাঁরা ভাব-প্রবণতা ও অতিকল্পনের অন্তর্মুখী অভিনয়ের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তাঁদের রম্যতা আছে, কিন্তু সৌষম্য নেই, কারণ তাদের আবেগানুভূতি ও ধারণাবলী, যে সমস্ত কাজ-কর্ম অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, তার পদ্ধতি হওয়ার পরিবর্তে, তাঁদের নিজেদের দিকেই মুখ ফেরাতে বাধ্য করে। তাদের মানসিক জীবন ভাবপ্রবণ;—অন্তর্দৃশ্যের উপভোগ মাত্র। এমন কি, বিজ্ঞানের অনুধাবনও সংসারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ লেনদেনের জন্য পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করার, এবং এ সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা পাওয়ার জন্য সাময়িক নির্জনতার আশ্রয় না হয়ে, জীবনের কঠিন সমস্যাদিকে এড়ানোর জন্য একটা পলাতকের আশ্রয়ে পরিণত হতে পারে। কলা শব্দটাই একটা জিনিসের সুনির্দিষ্ট রূপান্তর ঘটানোর এবং মনের স্বার্থে তাকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ করার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে, বরং উৎকেন্দ্রিক অতি কল্পনের উদ্দীপনা এবং ভাবাবেগপূর্ণ বাসনা চরিতার্থ করার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। “ব্যবহারজীবী” এবং তত্ত্ব বা কৃষ্টিজীবীর মধ্যে পার্থক্য ও পারস্পরিক অবজ্ঞা,—এবং চারু ও শ্রমশিল্পের বিচ্ছেদ,

এই পরিস্থিতিরই নিদর্শন। এইভাবে স্বার্থবোধ ও মন হয় সঙ্কুচিত নয় বিকৃত হয়ে পড়ে। পূর্বের এক অধ্যায়ে কর্মকুশলতা ও কৃষ্টির ধারণার সাথে যথাক্রমে এক এক তরফা অর্থ যুক্ত হওয়ার বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে এই কথার তুলনা করা যাক।

সমাজ যতোদূর শ্রমিক-শ্রেণী ও অবকাশ-শ্রেণী বিভাজনের ভিত্তিতে সংগঠিত থাকবে, এই অবস্থা ততোদূরই বজায় থাকবে। যাঁরা সামগ্রী তৈরী করেন, পদার্থ নিয়ে অবিশ্রান্ত সংগ্রামের ফলে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি কঠিন হয়ে যায়; যাঁরা শ্রমের কঠিন শিক্ষা থেকে মুক্ত তাঁরা বিলাসপ্রিয় ও পৌরুষ-হীন হয়ে পড়েন। এ ছাড়া এখনও অধিকাংশ লোকের আর্থিক স্বাধীনতার অভাব। তাদের বৃত্তি স্থির হয় দৈববশে, ও অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থার তাগিদে। পরিবেশের প্রয়োজন ও সঙ্গতির সঙ্গে নিজ নিজ ক্ষমতার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্ষমতার যে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে, তাদের বৃত্তি তা দিয়ে ধার্য হয় না। আমাদের অর্থনীতিক ব্যবস্থা এখনও বহুলোককে গোলাম করে রেখেছে। এর পরিণামরূপে চলিত অবস্থা যাদের দখলে তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিতে উদার-পন্থী নন। ফলে মানবিক উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ভৌত পৃথিবীকে আয়ত্তে আনবার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ করা হয় না,—প্রয়োগ করা হয় অন্য দলের মানুষকে অপপ্রয়োগ করে, অমানবিক উদ্দেশ্য সাধনে। আর সে সব উদ্দেশ্য অপরের সঙ্গে যতোখানি বর্জন নীতি নিয়ে চলে ততোখানিই তারা অমানবিক হয়ে ওঠে।

অবস্থার এই হাল, আমাদের শিক্ষাসংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের বহু বিষয়কে ব্যাখ্যা করে। স্কুল ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন লক্ষ্যের যে সংঘাত ঘটে, এই অবস্থা তার উপরও আলোকপাত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষার ধরনই সঙ্কীর্ণরূপে উপযোগিতা-মূলক, এবং অধিকাংশ উচ্চশিক্ষার ধরনই সঙ্কীর্ণরূপে শৃঙ্খলা বা কৃষ্টিমূলক। জ্ঞান যে পর্যন্ত না তাত্ত্বিক, পণ্ডিতী বা ব্যবহারিকরূপে কৌশলী হয়, সে পর্যন্ত তাকে বুদ্ধিগম্য বিষয় থেকে পৃথক করে রাখার প্রতি যে প্রচলিত ঝোঁক দেখা যায়, এই অবস্থা সেটাই বুঝিয়ে দেয়। জীবনের বিভিন্ন বৃত্তির জন্য যে শিক্ষা উপযোগী হবে, সে শিক্ষার জন্য যা প্রয়োজন, উদারনৈতিক শিক্ষা যে তার বিরোধী, এই বহু প্রচলিত বিশ্বাসেরও ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায়

কিন্তু এই হাল বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অনন্য সমস্যাটাকে রূপ দিতেও সাহায্য করে। পূর্বতন সামাজিক অবস্থার ফলে যে সব আদর্শ স্থির হয়েছে, স্কুল শিক্ষা এই মুহূর্তেই তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কিন্তু স্কুল শিক্ষা যে নমুনার বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত মানসতা গঠন করে তার মধ্যে দিয়ে ঐ সব অবস্থার উন্নতি বিধানের কাজে অংশ দিতে পারে। এবং ঠিক এখানেই স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খলার বাস্তব ধারণা খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্যপূর্ণ সক্রিয় বৃত্তিতে বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় নিয়ে কাজ করার ফলে, তা সে খেলাই হোক আর কাজই হোক, যে সব লোকের স্বার্থবোধ সম্প্রসারিত হয়েছে এবং বুদ্ধিবৃত্তি সুশিক্ষিত হয়েছে, খুব সম্ভব সেই সব লোকেই, এক দিকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন জ্ঞান এবং অন্য দিকে একটা কঠিন, সঙ্কীর্ণ ও শুধুই "ব্যবহারিক" বৃত্তি সম্বলিত বিকল্প ব্যবস্থা,—এই দুইয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি এমন করা যায় যে, তাতে স্বাভাবিক সক্রিয় প্রবণতা কোনো কিছু করার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত হবে, এবং এই সঙ্গে এদিকেও লক্ষ্য থাকে যে, কাজ করতে গেলে পর্যবেক্ষণ, সংবাদ আহরণ ও গঠনমূলক কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়, তা হলেই সামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য যা সর্বাধিক প্রয়োজন তাই করা হবে। এক দিকে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ বাদ দিয়ে পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অনুশীলন করে বাহ্যিক কর্ম-কুশলতা লাভ করার প্রচেষ্টা, ও অন্য দিকে এমন জ্ঞান সঞ্চয় করা যা চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হয়ে নিজ রাজ্যেই থাকে,—এই দুয়ের মধ্যে দোলায়মান থাকার এই অর্থ দাঁড়ায় যে, শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থাকেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলে মেনে নিয়েছে, এবং তাকেই বলবৎ রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যাতে উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজকর্মের বুদ্ধিগম্য সম্প্রসারণের সঙ্গে যোগ রেখে শিক্ষালাভ হয়, সেই ভাবে শিক্ষার পুনঃসংগঠন করা ধৈর্যের কাজ। এ কাজ কেবল একটু একটু করে এবং এক এক বারে এক এক ধাপ করেই সংসাধিত হতে পারে। কিন্তু তা বলে, একটা শিক্ষাদর্শনকে নামে মাত্র মেনে নিয়ে, কার্যতঃ আর একটার সাথে আমাদের উপযোজনা করে চলার কোনো যুক্তি নেই। সাহসের সঙ্গে পুনর্গঠনের কাজ হাতে নিতে এবং তাতে অবিচালিত ভাবে নিযুক্ত থাকতে, এই অবস্থা আমাদিকে আহ্বান জানাচ্ছে।

সারাংশ

স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খলা হল একটা লক্ষ্য সমন্বিত কর্মতৎপরতার আনুষঙ্গিক ব্যাপার। যে সমস্ত বিষয় কোনো কর্মতৎপরতাকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেয়, এবং এর পরিণতির পথে বিভিন্ন উপায় ও প্রতিবন্ধক উপস্থিত করে, তাদের সাথে একাত্মবোধই স্বার্থবোধের অর্থ। যে কোনো লক্ষ্য সমন্বিত কর্মতৎপরতাই একটা পূর্ববর্তী অসমাপ্ত এবং পরবর্তীকালে সমাপ্য পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে; আবার মধ্যবর্তী ধাপগুলোরও ইঙ্গিত দেয়। স্বার্থবোধ থাকার অর্থ হল, বিভিন্ন উপাদানকে আলাদা আলাদা করে না দেখে তারা যে অমুক ধরনের কোনো একটা নিরবচ্ছিন্নরূপে ক্রমবিকাশমান পরিস্থিতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে—এই ভাবে তাদের গ্রহণ করা। উপস্থিত অপূর্ণ অবস্থা এবং কাম্য পূর্ণ অবস্থার সময়-ব্যবধান রূপান্তর ঘটাতে চেষ্টার তাগিদ আনে, এবং তাতে মনোযোগ ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন ঘটায়। সঙ্কল্প বলতে কার্যতঃ যা বোঝায় এই মনোভাব তারই প্রতিরূপ। এর সুফল হল শৃঙ্খলা বা নিরবচ্ছিন্ন মনোনিবেশের ক্ষমতার বিকাশ।

শিক্ষাতত্ত্বে এই মতবাদের দ্বিবিধ সার্থকতা আছে। মন ও মানসিক অবস্থা-সমূহ যে নিজ নিজ গুণেই সম্পূর্ণ, তারা যে এই অবস্থাতেই কোনো পূর্বপ্রস্তুত বিষয়-বস্তু বা আলোচনাতে প্রযুক্ত হয়, এবং তারই ফলে যে জ্ঞান জন্মায়—এরূপ ধারণা থেকে সে সার্থকতা আমাদের রক্ষা করে। এটি আরও দেখিয়ে দেয় যে, মন,—এবং বস্তু সম্বলিত কর্মধারার মধ্যে বুদ্ধিগম্য বা উদ্দেশ্যপূর্ণ নিয়োজন,—একই কথা। কাজেই মনের বিকাশ সাধন বা শিক্ষাদান কল্পে, এমন একটা পরিবেশ যোগাতে হবে যা এই ধরনের কর্মতৎপরতাকে জাগাতে পারে। অন্যদিকে, বিষয়-বস্তু যে আলাদা ও স্বতন্ত্র এই ধারণার হাত থেকেও এই মতবাদ আমাদের রেহাই দেয়। কোনো নিরবচ্ছিন্ন ও পূর্বকল্পিত কর্মধারা অনুসরণের মধ্যে যে সমস্ত জিনিস, ধারণা এবং নিয়ম,—সঙ্গতি বা প্রতিবন্ধক রূপে প্রবেশ করে,—তার সব কিছুর সাথেই যে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু একাত্ম,—এই মতবাদ সেটাই স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য ও শর্তাবলীর উপলব্ধি সম্বলিত কোনো বিকাশমান কর্মধারা হল সেই একত্ব, যাতে একদিকে একটা তথাকথিত স্বতন্ত্র মন এবং অন্যদিকে একটা বস্তু ও ঘটনা-সম্বলিত স্বতন্ত্র পৃথিবী একাধারে বিধৃত হয়ে থাকে।

একাদশ অধ্যায়
অভিজ্ঞতা ও চিন্তন

১। অভিজ্ঞতার স্বরূপ

অভিজ্ঞতার স্বরূপ কেবল এই দেখেই বোঝা যায় যে, এর মধ্যে একটি সক্রিয় ও একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান অদ্ভুতভাবে সংযুক্ত থাকে। সক্রিয় দিকে, অভিজ্ঞতা হল চেষ্টা করে দেখা। এর সংশ্লিষ্ট শব্দ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়েও এই অর্থকেই স্পষ্ট করা হয়। নিষ্ক্রিয় দিকে, অভিজ্ঞতা হল সহ্য করা বা ভোগ করা। কোনো কিছু সম্বন্ধে আমরা যখন অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকি তখন সেই 'কোনো কিছু' দিয়ে কিছু একটা করতে থাকি এবং পরে আমরা তার পরিণাম সহ্য করি বা পরিণামের ভাগী হই। আমরা জিনিসটার ওপরে কিছু করি, পরে জিনিসটা উল্টে আমাদের উপর কিছু করে এমনই অদ্ভুত ধরনের সংযোগ এটি। অভিজ্ঞতার দুটি পর্যায়ের এই সংযোগই অভিজ্ঞতার ফলপ্রসূতা বা মূল্য স্থির করে। শুধু কর্ম-তৎপরতা অভিজ্ঞতা গঠন করে না। কর্মতৎপরতা বিকিরণশীল, ক্ষয়িষ্ণু, কেন্দ্রাতীগ। "করে দেখা" অর্থে অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা পরিবর্তন থাকে। কিন্তু এই পরিবর্তন থেকে পরিণামের যে উল্টো ঢেউ আসে, তার সঙ্গে "করে দেখা"কে সজ্ঞানে যুক্ত না করলে, পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ায় অর্থশূন্য স্থানান্তর মাত্র। যখন কোনো কর্মতৎপরতাকে তার পরিণাম ভোগের "মধ্যে" প্রসারিত করা হয়, যখন কোনো কর্ম-কৃত পরিবর্তন আমাদের মধ্যে সংঘটিত কোনো পরিবর্তনে প্রতিফলিত হয়, তখন সেই অবিরত প্রবহমান পরিবর্তনটাই তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। আমরা একটা কিছু শিখি। একটি শিশু যখন দীপশিখার মধ্যে আঙুল পুরে দেয় তখন সেটা অভিজ্ঞতা হয় না; এর পরিণামে যে যন্ত্রণা ভোগ হয়, তার সাথে যখন আগের কাজটা যুক্ত হয়, তখনই তা অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। এই সময় থেকে আগুনের মধ্যে আঙুল দেওয়ার "অর্থ" হয় আগুনে-পোড়া। আগুনে পোড়া

একটা কাঠ পোড়ার মতোই ভৌত পরিবর্তন, যদি তা অন্য কোনো কাজের পরিণামরূপে উপলব্ধ না হয়।

অন্ধ ও খামখেয়ালী আবেগ অসতর্ক ভাবে আমাদিকে এক জিনিস ছেড়ে আর এক জিনিসের দিকে নিয়ে যায়। এ রকম হতে থাকলে সব কিছুই জলে লেখার সামিল হয়। যে ক্রমপুঞ্জিত ক্রমবিকাশ জীবন্ত অর্থে অভিজ্ঞতা গঠন করে, এতে তার কিছুই থাকে না। পক্ষান্তরে, সুখ দুঃখ জড়িয়ে আমাদের এমন অনেক কিছু ঘটে, যা আমরা বিগত কাজের সঙ্গে যুক্ত করি না। আমাদের ব্যাপারে এ কেবল দৈব ঘটনা। এ রকম অভি-জ্ঞতার কোনো পৌর্বাপর্য থাকে না। এতে না থাকে অতীতের স্মরণ, না থাকে ভবিষ্যতের ভঙ্গি; পরিণামে এর কোনো অর্থ ই থাকে না। আমরা এমন কিছুই পাই না, যাকে অবলম্বন করে পরিণামদর্শী হতে পারি, এবং পরে যা আসছে তার সাথে সমন্বয় করার উপযুক্ত সক্ষমতা বা অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করতে পারি। কেবল ভদ্রতার খাতিরেই এ রকম পরিণাম বা ভোগকে অভিজ্ঞতা বলা হয়ে থাকে। "অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা-লাভ" করা হ'ল, আমরা একটা বিষয় নিয়ে যা করি, এবং তা করার পরিণামে যা উপভোগ করি, বা যে দুর্ভোগ সহ্য করি, তাদের মধ্যে একটা অগ্রপশ্চাৎ সংযোগ স্থাপন করা। এই অবস্থায় কিছু করার অর্থ হল চেষ্টা করে দেখা, এবং জগৎ কি ধরনের তা জানবার জন্য জগৎ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। এই অবস্থায়, পরিণাম ভোগ করা শিক্ষায় পরিণত হয়,—আবিষ্কৃত হয় বিভিন্ন জিনিসের যোগসূত্র।

এর থেকে শিক্ষা-সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ, দুটো সিদ্ধান্ত আসে। (১) অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ কোনো সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় ব্যাপার, জ্ঞানীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু (২) কোনো অভিজ্ঞতা আমাদিকে যে সব সম্পর্ক ও নিরবচ্ছিন্নতা উপলব্ধি করতে পরিচালিত করে, তার মধ্যেই সে অভিজ্ঞতার "মূল্যের পরিমাপ" থাকে। অভিজ্ঞতা যে মাত্রায় ক্রমপুঞ্জিত হয়, বা সঙ্গতি লাভ করে, বা অর্থলাভ করে, সেই মাত্রাতেই তার মধ্যে জ্ঞান থাকে। যাঁরা বিদ্যালয়ে শিক্ষাধীন থাকেন, অতিশয় রীতিগতভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, তাঁরা যেন তাত্ত্বিক দর্শক হয়েই জ্ঞান আহরণ করছেন, যেন কতকগুলো মন বুদ্ধিবৃত্তির প্রত্যক্ষ শক্তির সাহায্যেই জ্ঞান আত্মসাৎ করছে। বিদ্যার্থী শব্দের প্রায় এই অং

দাঁড়িয়েছে যে, তিনি কোনো ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা লাভে নিযুক্ত নন, পরন্তু সরাসরি জ্ঞান শোষণেই নিযুক্ত। যাকে মন অথবা চেতনা বলা হয়, তাকে ক্রিয়াশীল শারীরিক অঙ্গ-অবয়ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়। এর পরে, মন বা চেতনাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিগত বা জ্ঞানগত বলে বিবেচনা করা হয়; আর অঙ্গ-অবয়বকে অপ্রাসঙ্গিক অনধিকার প্রবেশকারী দৈহিক উপদ্রব বলে ধরে নেয়া হয়। কর্মতৎপরতা এবং তার পরিণাম ভোগের মধ্যস্থিত যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আমাদের তাৎপর্য বুঝতে পরিচালিত করে, এতে সে সংযোগ ছিন্ন হয়। ফলে কোনো সংযুক্ত জিনিসের পরিবের্তে আমরা পাই দুটো টুকরো, —এক দিকে শুধুই দৈহিক ক্রিয়া, অন্য দিকে তাৎপর্য। এটি নাকি আধ্যাত্মিক ক্রিয়া দ্বারা সরাসরি হৃদয়ঙ্গম হয়।

মন ও শরীরের এই দ্বৈততত্ত্ব থেকে যে কুফল এসেছে, তা পর্যাপ্তরূপে বর্ণনা করাই অসম্ভব; অতিরঞ্জিত করা তো দূরের কথা। তবুও এর কয়েকটি স্পষ্ট ফলের উল্লেখ করা যেতে পারে। (ক) অংশিকভাবে, দৈহিক কর্মতৎপরতা অনধিকার প্রবেশকারী। মনে করা হয় যে, মানসিক সক্রিয়তার সাথে এর কিছু যোগ নেই। তাই দৈহিক কর্মতৎপরতা হয়ে দাঁড়ায় এমন একটা বিক্ষেপ বা আপদ বিশেষ, যার সাথে লড়াইয়ের দরকার হয়। কারণ বিদ্যার্থীর একটা শরীর আছে এবং সে মনের সঙ্গে শরীরটাকেও স্কুলে নিয়ে আসে। শরীরটা আবার অপরিহার্য রূপে তেজের উৎস; তারও একটা কিছু করা চাই। কিন্তু যে সব জিনিস তাৎপর্যপূর্ণ ফল দেয় তাতে নিযুক্ত করে তার শক্তি না খাটাতে পারলে, তার উপরে ভ্রূকুটিই করতে হয়। বিদ্যার্থীর মন পাঠে নিযুক্ত থাকা উচিত, কিন্তু শারীরিক ক্রিয়াকলাপ মনকে তার ন্যস্ত বিষয় থেকে সরিয়ে নেয়; এ সব ক্রিয়াকলাপ দুষ্কর্মের উৎস। বিদ্যালয়ে "শৃঙ্খলা সমস্যার" প্রধান কারণ এই যে, যে সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া-কলাপ মনকে মনের বিষয় থেকে সরিয়ে নেয়, তা দমন করতেই শিক্ষককে তার অধিকাংশ সময় নষ্ট করতে হয়। শারীরিক শান্তভাবের উপর অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয়; নীরবতা, হাবভাব ও নড়ন চড়নের অনমনীয় একরূপতা, এবং বুদ্ধিগত আগ্রহের ভঙ্গি দেখানোর মন্ত্রবৎ ছদ্মবেশ ইত্যাদির ওপরেও অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয়। শিক্ষকের কাজ হল এই সব প্রয়োজনীয়তা পালনে বিদ্যার্থীদের বাধ্য রাখা, এবং যে

সব অনিবার্য ভ্রষ্টাচার ঘটে তার জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে, অর্থোপলব্ধি থেকে শারীরিক কর্মতৎপরতার বিচ্ছিন্নতার অনিবার্য পরিণাম হল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই স্নায়ুর শ্রান্তি ও ক্লান্তি। কখনও নির্বিকার উদাসীনতা, কখনো বা অবসাদ জনিত বিস্ফোরণ, একের পর এক চলতে থাকে। কর্মতৎপরতার কোনো সুসংবদ্ধ ও ফলপ্রসূ পথ না থাকার জন্য, উপেক্ষিত শরীর, 'কেন' বা 'কেমন করে' না জেনেই অর্থহীন দৌরাত্ম্যে ফেটে পড়ে, অথবা সমান অর্থহীন ভাঁড়ামিতে লিপ্ত হয়। এই দুটো পরিস্থিতিই শিশুদের স্বাভাবিক খেলাধূলা থেকে অত্যন্ত পৃথক। কর্মঠ শিশুরা অস্থির ও অবাধ্য হয়। কিন্তু যারা চুপচাপ ধরনের, অর্থাৎ তথাকথিত বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন, তারা গঠনমূলক পরিকল্পনায়, এবং সেই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে সদর্থক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত না হয়ে, তাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও কর্মতৎপর প্রবণতাকে নিরুদ্ধ রাখার নিরর্থক প্রচেষ্টায় শক্তি ক্ষয় করে। এই ভাবে তারা শারীরিক ক্ষমতার তাৎপর্যপূর্ণ ও সুশোভন প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণে শিক্ষিত না হয়ে, সে ক্ষমতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ যাতে না হয় তার জন্য বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালনে শিক্ষিত হয়। এ কথা জোর দিয়ে বলা দরকার যে, গ্রীকদের শিক্ষার অসাধারণ কৃতিত্বের প্রধান কারণ এই ছিল যে, তারা শরীর ও মনের বিচ্ছেদমূলক ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে কখনো বিপথে যায়নি।

(খ) এমন কি, "মন" প্রয়োগ করে যে সমস্ত পাঠ শিখতে হয়, তার মধ্যেও কিছু শারীরিক কর্মতৎপরতা খাটাতে হয়। ইন্দ্রিয়, বিশেষতঃ চোখ ও কান,—বই, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড, এবং শিক্ষক যা বলেন তার উপরে নিয়োগ করতেই হবে। শ্রেণীতে যা যা বিতরণ করা হয়, কথায় ও লেখায় তার পুনরাবৃত্তির জন্য ওষ্ঠ ও স্বরযন্ত্র, এবং হাত প্রভৃতিকে প্রয়োগ করতেই হবে। বহিরিন্দ্রিয়দের এমন কতকগুলো নল-নালা বলে ধরা হয়, যার মধ্যে দিয়ে বহির্জগতের খবরাখবর মনোজগতে প্রবাহিত হয়। এই সব নল-নালাকে জ্ঞানের প্রবেশ পথ বা মার্গ বলা হয়। বইয়ের উপরে চোখ দুটো রাখা এবং শিক্ষকের কথার প্রতি কান খাড়া রাখা হল বৌদ্ধিক দীপ্তির রহস্য-পূর্ণ উৎস। অধিকন্তু পড়া, লেখা ও আঁক কষা—স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলা—মাংসপেশীর সঞ্চালন ও গতিসঞ্চারক প্রশিক্ষণ দাবী করে। কাজেই

চোখ, হাত ও স্বরযন্ত্রের মাংসপেশী সমূহকে, জ্ঞানকে মনের মধ্যে থেকে বহির্মুখী কর্মে নিয়ে যাবার জন্য নলের মতোই কাজ করতে অভ্যস্ত করাতে হবে। কারণ দেখা যায় যে, মাংসপেশীগুলোকে পুনঃ পুনঃ একই ভাবে প্রয়োগ করালে ওদের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করার স্বয়ংচল ঝোঁক বদ্ধমূল হয়ে যায়।

এর স্পষ্ট ফল এই দাঁড়ায় যে, মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে শরীরের নাক গলানো ও অযাচিত হস্তক্ষেপের প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও যে সব দৈহিক ক্রিয়াকলাপ কম বেশী নিয়োজিত করতেই হবে, তাদের 'কলের মতো' ব্যবহার করা হয়। কারণ ইন্দ্রিয় ও মাংসপেশীসমূহকে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে অংশগ্রহণকারী বলে ব্যবহার করা হয় না,—ব্যবহার করা হয়, মনের বহিরঙ্গ আগমন ও নির্গমন প্রণালীরূপে। শিশু স্কুলে যাবার পূর্বে হাত, চোখ, কান দিয়ে শেখে, কারণ যা থেকে অর্থ উৎপত্তি হয় এরা হল সেই সব কাজ চালানোরই যন্ত্র। ঘুড়ি ওড়াবার সময় শিশুকে তার ঘুড়ির উপরে চোখ রাখতে হয় এবং হাতের সুতোর ওপরে নানা প্রকারের চাপও লক্ষ্য করতে হয়। বাইরের বিষয়গুলোকে কোনোমতে মস্তিষ্কের মধ্যে চালান দিলে শিশুর বহিরিন্দ্রিয়গুলো জ্ঞানের দুয়ার হয় না। আসলে, উদ্দেশ্য নিয়ে একটা কিছু কাজ করার মধ্যে ইন্দ্রিয়কে "প্রয়োগ" করা হয় বলেই সেটা জ্ঞানের দুয়ার হয়। কাজ করার সময়ে দেখা ও ধরা-ছোঁয়া জিনিসের গুণ ক্রিয়া করে, এবং সে গুণ সহজেই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয় এবং এ সব গুণের তাৎপর্য থাকে। কিন্তু তাৎপর্যের ধার না ধরেই, বানান ও উচ্চারণের পুনরাবৃত্তি কল্পে যখন কেবল শব্দের আকৃতি দেখবার জন্যেই শিক্ষার্থীরা চক্ষুর প্রয়োগ করবে বলে আশা করা যায়, তখন এর ফল দাঁড়ায় কেবল বিচ্ছিন্ন বহিরিন্দ্রিয়ের ও মাংসপেশীর প্রশিক্ষণ। উদ্দেশ্য থেকে কাজের এইরূপ বিচ্ছেদই শিক্ষাকে যন্ত্রবৎ করে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীকে অভিব্যক্তি সহকারে পড়ার জন্য চাপ দেন, যাতে অর্থবোধ হতে পারে। কিন্তু তাঁরা যদি প্রথমে পড়বার সংজ্ঞাবহ-পেশীসঞ্চালক কৌশলটাই শিখে থাকে, অর্থাৎ শব্দের আকৃতি সনাক্ত করার এবং সংলগ্ন উচ্চারণের পুনরাবৃত্তির ক্ষমতাই লাভ করে থাকে,—অর্থাৎ যে পদ্ধতির মধ্যে তাৎপর্যের দিকে মনোযোগ দেবার দরকার হয়নি তা শিখে থাকে, তা হলে তাদের

এমন একটা যান্ত্রিক অভ্যাস গড়ে ওঠে যে, পরে বুদ্ধি খাটিয়ে পড়তে শেখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। যে স্বরযন্ত্র পৃথকভাবে স্বয়ংচল হয়ে নিজ পথ ধরতে অভ্যস্ত, ইচ্ছে করলেই তার সাথে অর্থ জুড়ে দেওয়া যায় না। চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও হস্তলিপি, একই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শেখানো যেতে পারে। কারণ আমরা আবার বলছি, যে কোনো পদ্ধতিই শারীরিক কর্মতৎপরতাকে সঙ্কীর্ণ করে, এবং তার ফলে মন থেকে, অর্থাৎ তাৎপর্যবোধ থেকে, শরীরের বিচ্ছেদ ঘটায়, সেই পদ্ধতিই যান্ত্রিক। এমন কি, গণিতের উচ্চতর শাখাও যখন গণনার কৌশলের ওপরেই অযথা জোর দেয় এবং বিজ্ঞান যখন কেবল পরীক্ষণের জন্যই পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে, তখন তারাও ঐ দোষদুষ্ট হয়।

(গ) বুদ্ধিগম্য দিকে, জিনিসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ নিযুক্তি থেকে মনের বিচ্ছেদ মানে "সম্পর্ক" বা সংযোগের কথা উড়িয়ে দিয়ে শুধু জিনিসের প্রতি জোর দেওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, এমন কি ধারণাবলীকেও বিচার-বুদ্ধি থেকে পৃথক রাখা হয়। মনে করা হয় যে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও ধারণাবলীকে তুলনা করার জন্য বিচার-বুদ্ধি বুঝি এদের পরে আসে; বলা হয় যে, সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথকভাবেই যেন মন জিনিসের উপলব্ধি করে। আরও বলা হয় যে, মন বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র-বিবিক্ত হয়েই অর্থাৎ যা আগে হয়েছে ও পরে আসবে, তা থেকে স্বতন্ত্র ভাবেই, জিনিসের ধারণা গঠন করে। এর পরে "জ্ঞানের" পৃথক পৃথক অংশকে একত্র করার জন্য বিচার-বুদ্ধি বা চিন্তনকে আহ্বান করা হয়, যাতে করে ওদের সাদৃশ্য বা সাময়িক যোগসূত্র বের করা যায়। বস্তুতঃ, প্রতিটি প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি, প্রতিটি ধারণাই কোনো জিনিসের আকৃতি, কার্যকরতা এবং কারণের চেতনা বিশেষ। একটি চেয়ারের নানাবিধ পৃথক পৃথক গুণ তালিকা বা সংখ্যাভুক্ত করে আমরা তাকে চিনতে বা তার সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি না; কিন্তু ঐ সমস্ত গুণ অন্য কিছুর সম্পর্কে এনে, যেমন, যে উদ্দেশ্যে জিনিসটা টেবিল না হয়ে চেয়ার হ'ল, কেবল তা জেনে নিয়েই, চেয়ারটা চিনতে পারি। কিংবা আমরা যে ধরনের চেয়ারে অভ্যস্ত, তার সাথে আর একটা চেয়ারের পার্থক্য বুঝে নিয়ে, অথবা যে "কাল"কে ঐ চেয়ারটা চিহ্নিত করে, তা বুঝে নিয়ে, এবং এই রকমের আরও অন্যান্য চিহ্ন দিয়ে, কোনো চেয়ার সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। একটা মালবাহী গাড়ীর পৃথক পৃথক অংশ যোগ করে

গাড়ীটার ধারণা করা যায় না। সবগুলো অংশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পর্কই মাল-গাড়ীর ধারণা দেয়; এবং এই সব অংশ কেবল তাদের ভৌতিক সান্নিধ্যই জ্ঞাপন করে না; পরন্তু যে পশু দিয়ে গাড়ীটা টানা হয়, ওতে যে সব মাল বহন করা হয়, ধারণার মধ্যে তাও থাকে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে বিচার-বুদ্ধি নিয়োজিত হয়; নইলে উপলব্ধি হয়ে দাঁড়ায় কেবল সংবেদনশীল উত্তেজনা, কিম্বা পূর্বতন কোনো বিচারের ফলাফলকে স্বীকৃতি দান,—সুপরিচিত জিনিস পত্রের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে।

শব্দ ধারণার প্রতিরূপ, কিন্তু শব্দকেই সহজে ধারণা বলে গ্রহণ করা হয়। এবং ঠিক যে মাত্রায় মানসিক ক্রিয়াশীলতা পৃথিবীর সঙ্গে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, অর্থাৎ কাজ করা এবং তার ফল ভোগ করা থেকে যে মাত্রায় সেটি বিচ্ছিন্ন থাকে, সেই মাত্রাতেই শব্দ ও সঙ্কেত ধারণার স্থান অধিকার করে। যা-হোক-কিছু একটা অর্থবোধ হয় বলে, এই প্রতিস্থাপন প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আমরা ন্যূনতম অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেই খুব সহজে অভ্যস্ত হই, এবং যে সব সম্পর্ক তাৎপর্য দান করে, সে সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি যে কতো সীমিত তা দেখতে পাই না। আমরা এক রকমের নকল ধারণাতে বা আধা-উপলব্ধিতে এতো পুরোপুরি অভ্যস্ত হই যে, আমাদের মানসিক ক্রিয়া যে কতোদূর অর্ধমৃত তা আমাদের জানাও থাকে না। এবং যে সব জীবন্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, সেই সব অভিজ্ঞতার অধীনে যদি আমাদের পর্যবেক্ষণ ও ধারণাবলী গঠিত হতো, তা হলে তা যে কতো সূক্ষ্ম ও ব্যাপক হতো আমাদের তাও জানা নেই। বিচার-বুদ্ধির ব্যবহার করা হ'ল বিচারাধীন জিনিষের বিভিন্ন যোগসূত্র অনু-সন্ধান করা।

এই বিষয়টির তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো মত-পার্থক্য নেই। শিক্ষাবিশারদগণ সকলেই একমত যে, সম্বন্ধের অভিজ্ঞা খাঁটি বুদ্ধিগম্য বিষয়; কাজেই তা শিক্ষামূলক বিষয়ও বটে। এর বিফলতা তখনই আসে যখন মনে করা হয় যে, "অভিজ্ঞতা" ছাড়াই বুঝি সম্পর্ক উপলব্ধ হতে পারে;—অর্থাৎ পূর্বে যাকে আমরা সংযুক্ত করে দেখা ও ভোগ-করা বলেছি, তা ছাড়াই বুঝি সম্পর্ক বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় যে, কেবল মনোযোগ দিলেই বুঝি "মন" বিভিন্ন সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে; এবং পরিস্থিতি যাই হোক

না কেন, ইচ্ছা করলেই বুঝি মনোযোগ দেওয়া যায়। এর থেকেই যে সব আধা-পর্যবেক্ষণ, মৌখিক ধারণা ও বদহজমী "জ্ঞান" সংসারে দুর্দশা আনে তাদের "প্লাবন" আসে। এক টন্ তত্ত্ব থেকে এক আউন্স্ অভিজ্ঞতাও ভালো। কারণ কেবল অভিজ্ঞতার মধ্যেই কোনো তত্ত্বের প্রাণবন্ত ও পরীক্ষণ-যোগ্য তাৎপর্য থাকে। যে কোনো অভিজ্ঞতা, এমন কি সামান্য ধরনের অভিজ্ঞতাও, যতো খুশি বৌদ্ধিক আধেয় বা তত্ত্বের জন্ম দিতে পারে ও তাকে ধারণা করতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা-করা কোনো তত্ত্বকে, তত্ত্ব হিসাবেও নিশ্চিতরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এ জাতীয় তত্ত্ব কেবল একটা মৌখিক সূত্রে পরিণত হতে চায় এবং এমন এক প্রস্থ মামুলী বচন হয়ে দাঁড়ায় যে, তাতে করে চিন্তন, বা খাঁটি তত্ত্বানুসন্ধান অনাবশ্যক ও অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমাদের শিক্ষার দরুন আমরা শব্দ ব্যবহার করি, যেন শব্দই ধারণা, এবং শব্দ দিয়েই প্রশ্নের মীমাংসা করি। আসলে কিন্তু এই মীমাংসা আমাদের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধিকে এমনভাবে ঘোলাটে করে দেয় যে, আমরা প্রশ্নের জটিলতাকেও যেন আর দেখতে পাই না।

২। অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুচিন্তন।

পুর্বে স্পষ্টতঃ না হলেও কার্যতঃ আমরা দেখেছি যে, চিন্তন বা অনুচিন্তন হল, আমাদের চেষ্টা করা এবং তার পরিণামের মধ্যে সম্পর্কের অভিজ্ঞা। কিছুটা চিন্তনের উপকরণ ছাড়া, কোনো অর্থবহ অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্যে যে পরিমাণ অনুচিন্তন থাকে, তার অনুপাতে আমরা দুই জাতীয় অভিজ্ঞতার বৈষম্য দেখাতে পারি। মনোবিজ্ঞানীরা যাকে "চেষ্টা ও ত্রুটি" পদ্ধতি বলেন আমাদের সকল অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যেই সেই রকম কোনো একটা "কাট-কুট ও চেষ্টা"র পর্যায় থাকে। আমরা একটা কিছু করতে গিয়ে যখন বিফল হই, তখন আর কিছু করি এবং এই ভাবে চেষ্টা করতে করতে হয়ত এমন কিছু আবিষ্কার করে ফেলি, যা কাজে লাগে। যে নিয়মে এই আবিষ্কারটি হ'ল, পরবর্তী কাজে তখন সেটিকেই হাতুড়ে নিয়মের মতো কাজে লাগাই। কতিপয় অভিজ্ঞতার

মধ্যে এই চেষ্টা করা ও বিফল হওয়া বা সফল হওয়া নিয়মের বাইরে আর প্রায় কিছুই থাকে না। আমরা দেখতে পাই যে এক রকমের কাজের সাথে এক রকম পরিণামের যোগ আছে। কিন্তু কাজের সাথে তার পরিণাম যে "কি ভাবে" যুক্ত তা দেখতে পাই না। যোগ-সূত্রটার সব দিক দেখতে পাই না; বাঁধুনিও অজ্ঞাত থাকে। এ অভিজ্ঞা স্থূল প্রকৃতির। অন্যান্য অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আমরা পর্যবেক্ষণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলি। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই যে, কারণ ও ফলের, করা ও তার পরিণামের মধ্যে ঞি ভাবে তারা যথার্থরূপে একত্রে বাঁধা পড়েছে। আমাদের সূক্ষ্মদৃষ্টির এই সম্প্রসারণ আমাদের অগ্রদৃষ্টিকে অধিকতর নির্ভুল ও ব্যাপক করে। যে কাজ কেবল "চেষ্টা ও ত্রুটি" প্রণালীর উপর নির্ভর করে তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন। সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলাতে পারে এবং ঐ কাজ আশানুরূপ ক্রিয়া না করতে পারে। কিন্তু যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানি যে, ফলটা ঠিক কিসের উপরে নির্ভর করে, তা হলে লক্ষ্য করে দেখতে পারি যে, প্রয়োজনীয় অবস্থাদি বর্তমান রয়েছে কি না। কারণ যদি কোনো শর্তের অভাব থাকে, এবং এক প্রকারের ফললাভ করার পূর্ব-শর্ত জানা থাকে, তা হলে আমরা তার যোগাড়ে লেগে যেতে পারি; কিম্বা তা যদি এমন হয় যে তাতে অবাঞ্ছনীয় ফলও আসতে পারে, তা হলে আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু কিছু উদ্দেশ্য ছেঁটেও দিতে পারি এবং চেষ্টাকে পরিমিত ভাবেও ব্যবহার করতে পারি।

আমাদের ক্রিয়া-কলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ যোগসূত্রাদি এবং পরিণামে যা কিছু ঘটে, তা আবিষ্কার করার পথে "কাট-কুট ও চেষ্টা"-জনিত অভিজ্ঞতার মধ্যে যে চিন্তন প্রচ্ছন্ন থাকে, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং এর পরিমাণ বেড়ে যায়। কাজেই এর আনুপাতিক মূল্যেও খুব তফাত হয়। ফলে অভিজ্ঞতার গুণও বদলায়। এই পরিবর্তন এতো তাৎপর্যপূর্ণ যে, আমরা এই প্রকারের অভিজ্ঞতাকে অনুচিন্তনমূলক, অতুলনীয়ভাবে অনুচিন্তনমূলকও, বলতে পারি। চিন্তনের এই পর্যায়ের সুবিবেচিত কর্ষণ চিন্তনকে একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিজ্ঞতারূপে গঠন করে। অন্য কথায়, চিন্তন হ'ল সেই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রচেষ্টা, যার দ্বারা, আমাদের করা এবং তার পরিণামের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা থাকে এবং তার ফলেই এই

দুটো দিক নিরবচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। এতে দুটো দিকের বিচ্ছিন্ন অবস্থিতি এবং অবিমিশ্র খামখেয়ালী সহগামিতা বাতিল হয়ে যায় এবং তার স্থান নেয় কোনো একীভূত বিকাশমান পরিস্থিতি। অতঃপর ঘটনা বোধগম্য হয়, একে ব্যাখ্যা করা যায়। তখনই আমরা বলি, ঘটনা যে ভাবে ঘটে, সেই ভাবে ঘটাই যুক্তি-সঙ্গত।

অতএব চিন্তন এবং আমাদের অভিজ্ঞতার বুদ্ধিগম্য উপাদানের সুস্পষ্ট প্রকাশ,—সমতুল্য। কোনো উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করাকে চিন্তনই সম্ভবপর করে তোলে। এটি আমাদের উদ্দেশ্য থাকার অনন্য শর্ত বিশেষ। নবজাত শিশু প্রত্যাশা করতে আরম্ভ করলেই, বর্তমানে যা চলছে তাকে, এর পরে যা আসবে তার সঙ্কেতরূপে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। এ ক্ষেত্রে যতো স্থূল ভাবেই হোক না কেন, সে বিচার করছে। কারণ সে কোনো-কিছুকে আর একটা কিছুর প্রমাণ বলে গ্রহণ করছে, কাজেই কোনো একটা সম্পর্ককে সে চিনে নিচ্ছে। যে কোনো ভবিষ্যৎ বিকাশই, তা সে যত বৃহৎই হোক না কেন, অনুমিতির এই সহজ কাজটিকে পরিবর্ধন ও পরিশোধন করে তোলে। বিজ্ঞতম ব্যক্তিও যা করতে পারেন, তা হ'ল যা চলেছে তা অধিকতর বিস্তারিতভাবে এবং অধিকতর সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা, এবং যা যা দেখা গেল তার থেকে যেটি ঘটনার সঙ্কেত দিতে পারে, কেবল সেই উপাদানকে বেছে নেওয়া। আবার বলছি যে, চিন্তাধর্মী কাজের বিপরীত কাজ হল ছকে-বাঁধা ও খামখেয়ালী আচরণ। রুটিনমাফিক কাজে, যা রীতিগত তাকেই পূর্ণমাত্রা বলে ধরে নেওয়া হয়, এবং যে সব বিশেষ কাজ করা হচ্ছে তাদের বিভিন্ন যোগসূত্র হিসাবে ধরা হয় না। খামখেয়ালী কাজে, কোনো ক্ষণস্থায়ী কাজকেই মূল্যের পরিমাপ বলে ধরে নেওয়া হয়, এবং পরিবেশের শক্তিপুঞ্জের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত কাজের বিভিন্ন যোগ-সূত্র উপেক্ষা করা হয়। তা যেন কার্যতঃ বলে, "আমি এই মুহূর্তে যে রকম চাই, ঠিক তাই হতে হবে," আর রুটিন যেন কার্যতঃ বলে "আমি আগের কালে যে রকম দেখেছি, তাই চলুক"। ফলে, বর্তমান কাজ থেকে যে ভবিষ্যৎ পরিণাম আসতে পারে, ঐ দুটো অবস্থাই তার দায়িত্ব অস্বীকার করে। অপর দিকে, অনুচিন্তন হ'ল এরূপ দায়িত্বের স্বীকৃতি।

যা-কিছু চলেছে তা নিয়েই যে-কোনো চিন্তন-ক্রিয়ার সূত্রপাত। এই 'যা-কিছু' এখন যে অবস্থাতে রয়েছে, তা অসমাপ্ত বা অসম্পূর্ণও বটে। এর কেন্দ্র, এর অর্থ, যা-কিছু হতে চলেছে এবং যে ভাবে তা রূপ নেবে, আক্ষরিকভাবে তার মধ্যেই থাকে। এই লেখা যখন চলেছে তখন প্রতিদ্বন্দ্বী সেনা বাহিনীর রণহুংকারে পৃথিবী পরিপূর্ণ। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, যুদ্ধে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, এর ফলাফল, এ ঘটনা সে ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণাম। অন্ততপক্ষে সাময়িক ভাবে, সে ফলাফলের সঙ্গে একাত্ম; ঘটনাচক্র যে পথ নিচ্ছে "তার" অদৃষ্ট তার উপরেই ঝুলছে। কিন্তু, এমন কি, এক নিরপেক্ষ দেশের কোনো দর্শকের পক্ষেও, যে কুলক্ষণ সূচিত হচ্ছে তার মধ্যেই প্রতিটি গতির অর্থাৎ এখানে অগ্রসর হওয়ার, ওখানে পিছু হটে যাওয়ার তাৎপর্য থাকে। যে যে খবর আসছে, তার উপর "চিন্তা-করার" অর্থ হল, পরিণতি সম্বন্ধে যা কিছু সম্ভাব্যতা বা সম্ভাবনা নির্দেশিত হয়, তা দেখতে চেষ্টা করা। ছিন্ন সংবাদপত্রের খাতার মতো দফায় দফায় সংবাদকে সম্পূর্ণ বা সমাপ্ত ধরে নিয়ে তা দিয়ে মগজ ভর্তি করাকে চিন্তা বলে না। এ রকম করার অর্থ দাঁড়ায় আমাদিকে কোনো তালিকা প্রণয়নের যন্ত্রে পরিণত করা। যা হতে পারে, কিন্তু এখনো হয়নি, তার প্রতি ঘটনার সংযোগ বিবেচনা করাই চিন্তা করা। স্থান-বিচ্ছিন্নতার বদলে কাল-ব্যবধান প্রতিস্থাপিত করলেও অনুচিন্তনমূলক অভিজ্ঞতা ভিন্ন জাতীয় হবে না। কল্পনা করুন যেন, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবং একজন ভবিষ্যৎ-ঐতিহাসিক এর বর্ণনা দিচ্ছেন। ধরে নেয়া হয়েছে যে, এ উপাখ্যান অতীত কালের। কিন্তু সময়ের ক্রম বজায় না রেখে তিনি ঐ যুদ্ধের চিন্তামূলক বর্ণনা দিতে পারেন না। প্রতিটি ঘটনা নিয়ে তিনি যখন বিচার করেন, তখন "সেই ঘটনার" পক্ষে যা কিছু ভবিষ্যৎ ছিল, তার মধ্যেই তার তাৎপর্য নিহিত থাকে, যদিও ঐতিহাসিকের পক্ষে তা নয়। মাত্র ঘটনাটিকেই যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থিতি রূপে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে অর্থ দাঁড়াবে, অনুচিন্তন না করেই তা ধরে নেওয়া।

অনুচিন্তন, ফলাফলের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। ঘটনা প্রবাহের পরিণতির সঙ্গে আমাদের নিজেদের নিয়তিরও একটা সমবেদী একাত্মতা সূচিত হয়। যদিও তা কেবল নাটকীয়ই বটে। যুদ্ধে লিপ্ত একজন সেনাধ্যক্ষের, বা সাধারণ

সৈনিকের, বা প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিপুঞ্জের একজন নাগরিকের পক্ষে চিন্তনের উদ্দীপক প্রত্যক্ষ ও জরুরী। নিরপেক্ষ জাতিদের পক্ষে তা পরোক্ষ এবং কল্পনার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এক ধরনের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার, এবং আর এক ধরনের ঘটনা প্রবাহকে পরকীয় বলে অগ্রাহ্য করার যে তীব্র ঝোঁক থাকে, মানব প্রকৃতির নিদারুণ দলাদলির স্বভাবই তার প্রমাণ দেয়। প্রকাশ্য কার্যে পক্ষ নিতে না পারলে, এবং চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ স্থির করতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করতে না পারলে, আমরা প্রক্ষোভ ও কল্পনাসূত্রে পক্ষ অবলম্বন করি। আমরা এ রকম বা সে রকম পরিণতি কামনা করি। যিনি পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার, তিনি যা-কিছু ঘটছে তার সম্বন্ধে খবরও রাখেন না, চিন্তাও করেন না। যা চলতে থাকে তার পরিণামের মধ্যে অংশগ্রাহী মনোভারের ওপর চিন্তন-ক্রিয়ার নির্ভরতা থেকে চিন্তনের মুখ্য কুটাভাস সমূহের মধ্যে একটির উদয় হয়। পক্ষপাতিতার মধ্যে জন্ম নিয়ে এবার চিন্তনকে তার কর্মভার সম্পাদনের জন্য এক ধরনের নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতেই হবে। যে সেনাধ্যক্ষ তার আশা ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যাকে ব্যাহত হতে দেন, তিনি নিশ্চয়ই ঠিকে ভুল করবেন। যদিও কোনো নিরপেক্ষ দেশের একজন দর্শকের পক্ষে, তার নিজের ভয় ও আশাই বিবেচনা সহকারে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করে যাওয়ার প্রধান অনুপ্রেরণা হতে পারে, তবুও যে পরিমাণে তার পক্ষপাতিত্ব তার পর্যবেক্ষণ ও বিচার বুদ্ধির মালমশলার পরিবর্তন ঘটাবে, তিনি সেই পরিমাণেই নিষ্ফলভাবে চিন্তা করবেন। একদিকে চিন্তার সময়টি থাকে যা চলছে তাতে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের মধ্যে, অন্যদিকে চিন্তার মূল্য নির্ভর করে নিজেকে বিষয়টির বাইরে রাখার উপরে,—এ দুটির মধ্যে অবশ্য কোনো অসঙ্গতি নেই। বিশ্লিষ্ট অবস্থা ঘটানোর মধ্যে যে প্রায়-অলঙ্ঘনীয় বাধা থাকে, তা-ই প্রমাণ করে যে, চিন্তা সেই পরিস্থিতি বশেই জাগে, যেখানে চিন্তার ধারা ঘটনা প্রবাহের একটি আসল অংশ; এবং ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্যই চিন্তা পরিকল্পিত হয়ে থাকে। কেবল ক্রমে ক্রমে, এবং সামাজিক সমবেদনার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে দৃগ্‌ভঙ্গীর সীমা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই, চিন্তা বিকাশ লাভ করে, এবং আমাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থবোধের বাইরে যা থাকে, তাও চিন্তার অন্তর্ভুক্ত হয়; শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিষয়টি

অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ।

যে পরিস্থিতি এখনও চলমান এবং অসমাপ্ত, তার সংশ্রবেই যে চিন্তন ঘটে, এ কথা বলার অর্থ এই যে, যখন কোনো বিষয় অনির্দিষ্ট, সন্দেহসংকুল বা সমস্যাপূর্ণ, তখনই চিন্তা আসে। যা সমাপ্ত হয়েছে, সম্পূর্ণ হয়েছে, কেবল সেটাই পুরামাত্রায় সুনিশ্চিত। যেখানেই অনুচিন্তন সেখানেই অনিশ্চয়তা। চিন্তনের উদ্দেশ্য হল সিদ্ধান্তে পৌছোতে সাহায্য করা, যা আগে থেকেই রয়েছে তার ভিত্তিতে কোনো সম্ভাব্য পরিসমাপ্তির পরিকল্পনা করা। চিন্তনের আরও কয়েকটি তথ্য এই বৈশিষ্ট্যের সহগামী। যেহেতু, যে পরিস্থিতির মধ্যে চিন্তন ঘটে তা সন্দেহাতীত নয়, সেই হেতু চিন্তন একটা জিজ্ঞাসা প্রণালী, বিষয়ের অন্তর্দর্শন,—একটা সন্ধান। জ্ঞান সর্বদাই জিজ্ঞাসার অধীন এবং সহায়ক। যা হাতের কাছে নেই, জিজ্ঞাসা তাকেই খোঁজ করে ও তার অনুধাবন করে। আমরা সময়ে সময়ে এমন ভাবে কথা বলি, যেন "মৌলিক গবেষণা" বিজ্ঞানীদের বা উচ্চ-শিক্ষিত লোকদেরই একটা অনন্য অধিকার। কিন্তু সকল চিন্তনই গবেষণা, এবং যিনি গবেষণা করে যাচ্ছেন তাঁর কাছে তাঁর সকল গবেষণাই নিজ প্রকৃতিতে মৌলিক। এমন কি, তিনি এখনও যার খোঁজে আছেন তা যদি আর সকলের জানাও থাকে তা হলেও সেটি একটি গবেষণা বিশেষ।

তারপরে এ কথাও আসে যে, সকল চিন্তনের মধ্যেই একটা ঝুঁকি থাকে। নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আগেই জামিন দেওয়া যায় না। অজানিতের মধ্যে প্রবেশ করা একটা অভিযানের মতো; এতে আগে থেকেই নিশ্চিত হওয়া যায় না। কাজেই চিন্তন-লব্ধ সিদ্ধান্ত বাস্তব ঘটনা দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত, ঐ সিদ্ধান্ত কমবেশী পরীক্ষাসাপেক্ষ ও আনুমানিক ধরনের থাকে। কোনো কিছুকে চূড়ান্ত আখ্যা দিয়ে, ঔদ্ধত্যপূর্ণ মতবাদ জাহির করা অযৌক্তিক; বস্তুতঃ সেটি বিচার সাপেক্ষ। আমরা কি করে শিখতে পারি? আসলে গ্রীকেরা এই প্রশ্নটাই তুলেছিলেন। কারণ আমরা যার সন্ধানে, তা হয় জানি, নয়তো জানি না। এ দুটির কোনো ক্ষেত্রেই শেখা সম্ভব নয়; প্রথম অনুকল্পে, এই কারণে শেখা সম্ভব নয় যে, আমরা তো আগে থেকেই জানি; দ্বিতীয় অনুকল্পে এই কারণে যে, আমরা কি চাই তা জানি না, এবং যদিও বা দৈবযোগে তা পাই তা হলেও আমরা বলতে পারি না যে আমরা

এটাই চেয়েছিলাম। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে জানার পথে "এগোবার" ব্যবস্থা নেই; শেখবার ব্যবস্থা নেই। এ ক্ষেত্রে হয় পূর্ণ জ্ঞান, নয়, পূর্ণ অজ্ঞতাকে ধরে নেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও, জিজ্ঞাসার বা চিন্তনের একটা গোধূলি লগ্ন থাকে। গ্রীকদের এই উভয়-সঙ্কট তত্ত্বটি এই কথাটা উপেক্ষা করেছে যে, একটা "আনুমানিক" সিদ্ধান্ত, একটা "পরীক্ষাসাপেক্ষ" ফলাফলও থাকতে পারে। কোনো পরিস্থিতির বিভ্রান্তিকর অবস্থাই তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো না কোনো পথের ইঙ্গিত দেয়। আমরা এ সব পথ পরীক্ষা করি, এবং হয় তা ঠেলে বেড়িয়ে পড়ি, নয়তো পরিস্থিতিকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্তিকর করি। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারি যে আমরা যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারি যে আমরা তখনও অজ্ঞ। পরীক্ষাসাপেক্ষ শব্দটির অর্থ, করে দেখা—অস্থায়ীভাবে এ পথ সে পথ পরখ করে দেখা। একক-ভাবে নিলে, গ্রীকদের এই বিতর্ক বিধিবদ্ধ যুক্তিশাস্ত্রের একটি উত্তম উক্তি। কিন্তু এ কথা সত্য যে, মানুষ যতোদিন জ্ঞান ও অজ্ঞতার মধ্যে তীক্ষ্ণ বিচ্ছেদ রেখা টেনে রেখেছে ততোদিন বিজ্ঞান কেবল মন্থর গতিতে এবং আকস্মিক ভাবেই অগ্রসর হয়েছে। আবার, আবিষ্কার ও উদ্‌ভাবনের ক্ষেত্রে সুসম্বদ্ধ অগ্রগতি তখনই আরম্ভ হয়েছে, যখন মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে দ্বিধা সন্দেহকে কাজে লাগিয়ে আন্দাজ অনুমান করা চলে, এবং তা দিয়ে পরীক্ষামূলক অভিযানও পরিচালিত করা চলে। এই অভিযানের ফলাফল পথ-দেখানো আন্দাজ অনুমানকে হয় দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করবে, নয় খণ্ডন করবে, নয় শোধন করবে। গ্রীকেরা জ্ঞানকে বিদ্যার ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সংরক্ষিত জ্ঞানকে বিদ্যালাভের ও আবিষ্কারের উপায়রূপে খাটায়।

আমাদের পূর্বের দৃষ্টান্তে ফেরা যাক। সেনাধ্যক্ষের কাজ পুরাপুরি নিশ্চয়তা বা অজ্ঞতার ওপর চলতে পারে না। তাঁর হাতে কিছু পরিমাণ খবর থাকে। ধরা যাক যে, তা মোটামুটি বিশ্বাস যোগ্য। এর থেকে তিনি ভবিষ্যৎ সৈন্য সমাবেশ সম্বন্ধে কিছুটা "অনুমান করেন", এবং এইভাবে উপস্থিত পরিস্থিতির প্রকট তথ্যাবলীকে অর্থদান করেন এবং তাঁর অনুমান কমবেশী সংশয়াপন্ন ও প্রকল্পিত থাকে। কিন্তু তিনি তার ভিত্তিতেই কাজ করেন। তিনি কার্যক্রমের একটা পরিকল্পনা খাড়া করেন, পরিস্থিতির সাথে যোঝবার একটা

পদ্ধতি ঠিক করেন। এক ভাবে কাজ না করে আর একভাবে কাজ করলে যে প্রত্যক্ষ পরিণাম ঘটে তা দিয়েই তার অনুচিন্তনের মূল্য পরীক্ষিত হয় ও প্রকাশ পায়। তিনি যা পূর্বেই জানেন, তা-ই কাজে খাটানো হয়, এবং তিনি যা শেখেন সেটাই তার মূল্য যোগায়। কিন্তু কোনো নিরপেক্ষ দেশের যে লোকটি তাঁর সাধ্যমত সুচিন্তিতভাবে ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করে যাচ্ছেন তার বেলায় কি এই হিসাব খাটবে? এর রীতিগত উত্তর "হ্যাঁ" এবং বিষয়তঃ উত্তর অবশ্যই, "না"। কারণ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বর্তমান ঘটনাবলীর সাহায্যে তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে অনুমান করেন, এবং যে অনুমান দিয়ে তিনি স্তূপীকৃত অসংলগ্ন ঘটনাবলীর তাৎপর্য যোগাড় করেন, সে তাৎপর্য সংগ্রামে কাজে লাগানোর উপযুক্ত কোনো পদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ হতে পারে না। "ওটা" তাঁর নিজের সমস্যা হয় না। কিন্তু যদি তিনি কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে ঘটনা প্রবাহকে না দেখে, সক্রিয়ভাবে তার সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তা হ'লে, যে মাত্রায় তিনি সক্রিয় থাকেন সেই মাত্রাতেই তাঁর পরীক্ষাসাপেক্ষ অনুমান, "তাঁর" পরিস্থিতির উপযুক্ত কোনো কর্মপদ্ধতিতে রূপ নেয়। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো কোনো ভবিষ্যৎ গতিবিধি পূর্বানুমান করবেন, এবং তা ঘটে কিনা লক্ষ্য করতে তৎপর থাকবেন। যে মাত্রায় তাঁর সংশ্লিষ্টতা বা চিন্তাশীলতা বুদ্ধিগত হবে সেই মাত্রাতেই তাঁর লক্ষ্য বা পর্যবেক্ষণ সক্রিয় হয়ে উঠবে। তিনি এমন ব্যবস্থায় হাত দেবেন, যা তাঁর পরবর্তী কাজের কিছুটা অদল-বদল করবে, যদিও তাতে অভিযানের কিছু যাবে আসবে না। তা না হলে, পরের উক্তি—"আমি তো তা আগেই বলেছি" কথাটার কোনো বুদ্ধিগম্য গুণ থাকে না, এ কথা দিয়ে পূর্ববর্তী চিন্তনের কোনো পরীক্ষা বা প্রমাণ চিহ্নিত হয় না, কেবল এমন একটা কাক-তালীয় ব্যাপার ঘটে যাতে করে প্রক্ষোভগত পরিতুষ্টি থাকলেও তার মধ্যে একটা বড়ো রকমের আত্ম-প্রবঞ্চনা থাকে।

একজন জ্যোতির্বিদ যে ভাবে তাঁর জানা তথ্যাবলীর সাহায্যে কোনো ভাবী সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ সম্বন্ধে অনুমান করতে অগ্রসর হন, এই বিষয়টি তার সাথে তুলনা করার যোগ্য। গ্রহণের গাণিতিক সম্ভাব্যতা যতো বড়োই হোক না কেন, এর অনুমিতি আনুমানিক,—কেবল একটা

সম্ভাবনা[1] বিশেষ। পূর্বানুমিত গ্রহণের তারিখ ও স্থানের অনুমান ভবিষ্যৎ আচরণবিধি স্থির করার উপাদানে পরিণত হয়। যন্ত্রপাতি সাজানো হয়; সম্ভবতঃ ভূমণ্ডলের কোনো সুদূর অঞ্চলে অভিযান চালানো হয়। যাই হোক, এমন কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা করতে হয়, যা প্রকৃতপক্ষে "কোনো কোনো" ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং সেই সমস্ত ব্যবস্থা, এবং পরিস্থিতির সংলগ্ন পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে চিন্তনের কাজ সম্পূর্ণ হয় না এবং সে কাজ স্থগিত থাকে। জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বেই যে জ্ঞান লাভ করা হয়েছে তা চিন্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাকে ফলপ্রসূ করে।

অনুচিন্তনশীল অভিজ্ঞতার সাধারণ রূপরেখা সম্বন্ধে যা বলা হল, তাতে এই সব বৈশিষ্ট্য থাকে (১) যার সম্পূর্ণ প্রকৃতি এখনও ধার্য হয় নি, এমন কোনো অসম্পূর্ণ পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য কারও বিহ্বলতা, বিভ্রান্তি ও দ্বিধা; (২) কোনো আভাসিক পূর্বানুমান অর্থাৎ জানা উপাদানের ওপর কোনো পরিণাম ঘটানোর ঝোঁক এবং ঐ উপাদানের পরীক্ষাসাপেক্ষ ব্যাখ্যা; (৩) যে সব সাধ্যমত বিচার বিবেচনা হাতের সমস্যাটাকে মূর্ত ও পরিষ্কার করবে, তার সযত্ন নিরীক্ষা, (পরীক্ষণ, পরিদর্শন, উদ্‌ঘাটন বিশ্লেষণ ইত্যাদি); (৪) পরীক্ষাসাপেক্ষ অনুমানকে অধিকতর খাঁটি ও সুসঙ্গত করার জন্য তার পরবর্তী বিস্তার এমন হবে যে, তাতে করে একে অধিকতর বিস্তীর্ণ পাল্লার ঘটনাবলীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়; (৫) কোনো কাজের পরিকল্পনারূপে প্রকল্পিত অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে, তাকে উপস্থিত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা; পূর্বানুমিত ফল ঘটানোর জন্য প্রকাশ্য-ভাবে কোনো কিছু করা, এবং তা দিয়ে অনুমানটিকে কার্যতঃ পরীক্ষা করে দেখা। উপরোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপের পরিসর ও নির্ভুলতাই চেষ্টা ও ত্রুটির স্তরের অভিজ্ঞতা থেকে বিশিষ্ট অনুচিন্তনশীল অভিজ্ঞতা সূচিহ্নিত করে। তা সত্ত্বেও আমরা পুরাপুরি, "চেষ্টা ও ত্রুটি" পরিস্থিতির বাইরে যেতে পারি না। আমাদের অতি বিস্তারিত ও যুক্তিপূর্ণ সুসঙ্গত চিন্তনকেও

১। বিজ্ঞানের কাজের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাবনায় এবং সম্ভাব্য ভুলের মাত্রা গণনা করা যায়, কিন্তু তাতে উক্ত পরিস্থিতির যে সাধারণ রূপ-রেখা বর্ণনা করা হয়েছে তার বদল হয় না বরং এতে তা পরিশোধিত হয়।

সংসারের মধ্যেই পরীক্ষা করতে হবে; এবং এইভাবে পরীক্ষা করেই এর যোগ্যতা বিচার করতে হবে। এবং যে হেতু চিন্তন কখনো সংসারের যাবতীয় যোগসূত্রকে হিসাবে ধরতে পারে না, সেই হেতু তার যাবতীয় পরিণামকেও সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে দেখতে পারে না। তথাপি, শর্তাবলীর চিন্তনমূলক নিরীক্ষা এতো যত্ন-কৃত, এবং ফলাফলের অনুমান এতো নিয়ন্ত্রিত থাকে যে, অনুচিন্তনশীল অভিজ্ঞতাকে স্থূলতর চেষ্টা-ত্রুটি ধরনের কাজ থেকে সুচিহ্নিত করার অধিকার আমাদের আছে।

সারাংশ।

অভিজ্ঞতার মধ্যে চিন্তনের স্থান নির্ণয় করার সময়ে আমরা প্রথমে দেখেছি যে, অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছু করা বা চেষ্টা করার সাথে তার পরিণামভোগের যোগসূত্র থাকে। সক্রিয় "করার" অবস্থা থেকে নিষ্ক্রিয় পরিণামভোগের অবস্থার বিচ্ছিন্নতা, অভিজ্ঞতার জীবন্ত অর্থকে নষ্ট করে দেয়। যা করা হয় এবং তার পরিণাম, এই দুয়ের মধ্যে নির্ভুল ও সুচিন্তিত যোগসূত্রের সংস্থাপনই হ'ল, চিন্তন। চিন্তন কেবল এটাই দেখে না যে, এরা সংযুক্ত কিনা, পরন্তু সংযোগ সূত্রটাকেও তন্নতন্ন করে দেখে। চিন্তন যোগসূত্রের বাঁধনগুলোকে বিভিন্ন সম্পর্কের আকারে স্পষ্ট করে। আমরা যখন কোনো কৃত বা কৃত্য কর্মের তাৎপর্য নির্ণয় করতে চাই তখনই চিন্তনের উদ্দীপক আসে। তখন আমরা পরিণাম পূর্বানুমান করি। এর অর্থ এই যে, চলিত পরিস্থিতি প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে অসম্পূর্ণ,—কাজেই অনির্ধারিত। পরিণাম অভিক্ষেপণ করার অর্থ হল একটা প্রস্তাবিত বা পরীক্ষাসাপেক্ষ মীমাংসা। এই অনুমান নিখুঁত করার জন্য চলিত অবস্থাকে সযত্নে ও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করতে হয়, এবং অনুমানের বিভিন্ন তাৎপর্যকে বিকাশ করতে হয়। এই কাজকে বলে বিচার করা। তখন অনুমিত মীমাংসা, ধারণা বা তত্ত্বকে কাজে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। যদি এতে কোনো পরিণাম ঘটে,—কোনো নির্ণয়সাধ্য বৈষয়িক পরিবর্তন ঘটে,—তা হলে তা ন্যায়-সিদ্ধ বলে গৃহীত হয়। তা না হলে, অনুমান বদলাতে হয় এবং আবার পরীক্ষা করতে

হয়। চিন্তনের মধ্যে এর সব ক'টা স্তরই থাকে,—যেমন একটা সমস্যার তাৎপর্য, এর শর্তাবলীর পর্যবেক্ষণ, ইঙ্গিত অনুমান গঠন, এর যুক্তিপূর্ণ বিস্তার, এবং সক্রিয় পরীক্ষামূলক পরীক্ষা। যদিও যাবতীয় চিন্তনই জ্ঞানপ্রসূ, তথাপি জ্ঞানের মূল্য, চিন্তনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগের অধীন। কারণ আমরা একটা স্থিতিশীল ও "সব পেয়েছি" পৃথিবীতে বাস করি না, বাস করি এক চলমান সংসারে। এখানে আমাদের প্রধান কর্মভার ভবিষ্যাপেক্ষ, এবং ভবিষ্যতের সাথে বোঝাপড়ার জন্যে যে অতীতানুচিন্তন আমাদের সারগর্ভতা, নিরাপত্তা ও ফলপ্রসূতা যোগায় তার মূল্য আছে। আর চিন্তন থেকে পৃথকভাবে বিশিষ্ট করে ধরলে সকল জ্ঞানই যে অতীতানু-চিন্তন,—সে কথাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

শিক্ষায় চিন্তন-পদ্ধতি

১। সে পদ্ধতির সারমর্ম

তত্ত্ব হিসাবে বিদ্যালয়ে চিন্তনের সদভ্যাস সম্বন্ধে উৎসাহদানের গুরুত্বে কারও দ্বিধা নেই। কিন্তু এর তত্ত্বগত স্বীকৃতি যতোখানি, কার্যগত স্বীকৃতি ততোখানি নয়। তা ছাড়া, শিক্ষার্থীদের "মন" সম্বন্ধে (অর্থাৎ কোনো কোনো বিশিষ্ট পেশীগত সক্ষমতা ছাড়া) স্কুল যা করতে পারে, বা স্কুলের যা করা উচিত, তা হ'ল তাদের চিন্তা করার সক্ষমতাকে বিকাশ করা,—এ কথারও যথেষ্ট তাত্ত্বিক স্বীকৃতি নেই। শিক্ষাকে নানাবিধ উদ্দেশ্যে থাকে থাকে ভাগ করা, যেমন দক্ষতা অর্জন করা (পাঠ, বানান, হাতের লেখা, চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তিতে); সংবাদ আহরণ করা (যেমন, ভূগোল ও ইতিহাসে) "এবং" চিন্তা করতে শেখানো, এই তিনটি বিষয়ই আমরা যে রকম বিফলতার সহিত সম্পাদন করি তা থেকেই তার পরিমাপ ধরা পড়ে। বস্তুতঃ যে চিন্তন কার্যক্ষেত্রে কর্মকুশলতা বাড়াবার সাথে এবং আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে এবং আমরা যে জগতে বাস করি তার সম্বন্ধে, বেশী করে জানার সাথে যুক্ত নয়, চিন্তার বিষয়-বস্তুর মতো সেই চিন্তনের মধ্যেও কিছু গলদ আছে (পূর্বে দেখুন পৃঃ ১৯১)। এবং চিন্তন ছাড়া, অর্জিত দক্ষতার সাথে যে উদ্দেশ্যে দক্ষতা খাটাতে হবে তার উপলব্ধিরও কোনো যোগ থাকে না। এর ফলে একজনে তার রুটিন-মাফিক অভ্যাসের দাস হয়ে থাকে। এবং যে সমস্ত লোক তাঁদের নিজেদের মতলব ভালো করে জানেন, এবং যাঁরা নিজ নিজ কৃতির উপায় সম্বন্ধে বিশেষ বিবেকসম্পন্ন নন তাঁদের কর্তৃত্বাধীন নিয়ন্ত্রণের দয়ার উপরে নির্ভর করে সে ব্যক্তি বসে থাকে। কোনো সংবাদকে চিন্তাধর্মী কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে, সেটা একটা প্রাণহীন, মন নিষ্পেষণকারী বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু এই জাতীয় সংবাদ জ্ঞানের ভান করে, এবং তা দিয়ে আত্মম্ভরিতার বিষ বাড়ায়, সেইহেতু সেটি বুদ্ধিদীপ্ত ক্রমবিকাশের

পথে একটা প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করার স্থায়ী উন্নতিবিধানের একমাত্র প্রত্যক্ষ উপায় হল, যে সমস্ত অবস্থা চিন্তন দাবী করে, চিন্তন বাড়ায়, এবং চিন্তন পরীক্ষা করে, সেই সমস্ত অবস্থাকে শিক্ষার কেন্দ্র করা। চিন্তনই হ'ল বুদ্ধিগম্য বিদ্যালাভের নির্দিষ্ট পদ্ধতি, অর্থাৎ চিন্তনই মনকে নিয়োজিত করে এবং পুরস্কৃত করে। বলার সময়ে আমরা খুবই ন্যায়সঙ্গতভাবে চিন্তন পদ্ধতির কথা বলি, কিন্তু আসলে সে সম্বন্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা মনে রাখতে হবে, তা হ'ল এই যে, চিন্তনই পদ্ধতি অর্থাৎ বুদ্ধিগম্য অভিজ্ঞতার পদ্ধতি, এবং সে অভিজ্ঞতা আসে কার্যক্রম ধরে।

(১) যে বিকাশমান অভিজ্ঞতাকে চিন্তন বলে, তার প্রথম ধাপই "অভিজ্ঞতা"। কথাটিকে একটা বোকার স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হতে পারে। স্বতঃসিদ্ধই হওয়া উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটি তা নয়। পক্ষান্তরে, দার্শনিক তত্ত্বে এবং শিক্ষাবৃত্তিতে চিন্তনকে এমন কিছু বলে ধরা হয়, যা অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক, এবং পৃথক ভাবেই তা কর্ষণযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, চিন্তনের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার আত্যন্তিক কারণ হিসাবে, অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক সীমিতাবস্থার উপরেই সচরাচর জোর দেওয়া হয়। মনে করা হয় যে, অভিজ্ঞতা, বহিরিন্দ্রিয় ও বাসনার মধ্যে, এবং শুধু বৈষয়িক জগতেই সীমাবদ্ধ; আর চিন্তন আসে কোনো উচ্চতর ধী-শক্তি বা বিচার থেকে এবং চিন্তন কোনো আধ্যাত্মিক, বা অন্ততঃ লেখাপড়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এই কারণে অনেক সময়েই বিশুদ্ধ গণিত ও প্রযুক্ত গণিতের মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রভেদ রাখা হয়। বিশুদ্ধ গণিতকে চিন্তনের উপযুক্ত অনন্যসাধারণ বিষয়-বস্তু বলে ধরা হয় (কারণ এর সাথে কোনো ভৌতিক অবস্থিতির সম্পর্ক নেই; আর প্রযুক্ত গণিতকে ধরা হয় ব্যবহারিকরূপে, কারণ তার কোনো মানসিক মূল্য নেই।)

সাধারণভাবে বলতে গেলে, শিক্ষাদান পদ্ধতির মৌলিক হেত্বাভাস এই ইঙ্গিতের মধ্যেই থাকে যে, শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা থাকাটা যেন ধরেই নেওয়া যায়। এখানে যা বারবার বলা হচ্ছে, তা হ'ল চিন্তার বিষয়-বস্তুর প্রারম্ভিক পর্যায়ে কোনো বাস্তব পরীক্ষালব্ধ পরিস্থিতি থাকার অপরিহার্যতা। পূর্বে অভিজ্ঞতার যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে এখানে অভিজ্ঞতা সেই অর্থেই নেওয়া হয়েছে। সেটি হল এই যে, কোনো জিনিস নিয়ে কাজ করার চেষ্টা

করা এবং প্রতিদানে যিনি কাজ করছেন, তাঁর উপরে ঐ জিনিসের কোনো প্রত্যক্ষ ক্রিয়া হওয়া। আমরা যখন মেনে নিই যে, কোনো পরিস্থিতির কোনো-রূপ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা গণিত বা ভূগোল বা অন্য কোনো পূর্ব-প্রস্তুত বিষয়-বস্তু নিয়ে অধ্যায়ন আরম্ভ করতে পারি তখনই এই হেত্বাভাস ধরা পড়ে। এমন কি, কিণ্ডারগার্টেন ও মণ্টেশ্বরী কৌশল গুলিও "সময়ের অপচয়" না করেই বুদ্ধিগত কৃতিত্বলাভে এত ব্যস্ত থাকে যে, সেখানেও অভিজ্ঞতার চেনা-জানা জিনিসগুলোর অব্যবহিত স্থুল ব্যবহার উপেক্ষা করে, বা, কমিয়ে, বড়োদের মেধালব্ধ কৃতিত্বে যে সব জিনিস গড়ে উঠেছে, তার সাথে বিদ্যার্থীদের একচোটেই পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু বিকাশমানতার যে কোনো বয়সেই, কোনো নতুন জিনিসের সাথে সংযোগের প্রথম ধাপটিকে যে অপরিহার্যরূপে চেষ্টা-ত্রুটি জাতীয় পদ্ধতি হতেই হবে! খেলাতেই হোক, আর কাজেই হোক, একজনকে তার আবেগমূলক কর্ম-তৎপরতা চালিয়ে যাবার জন্যে কোনো জিনিস নিয়ে কিছু না কিছু করার চেষ্টা করতেই হবে; এবং তারপরে তার নিজের শক্তি এবং প্রযুক্ত জিনিসটার শক্তির মধ্যের পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াও তাকে লক্ষ্য করতেই হবে। প্রথম অবস্থায়, শিশু যখন খণ্ড খণ্ড জিনিস নিয়ে তৈরী করতে আরম্ভ করে তখন এই জিনিসই ঘটে। আবার বিজ্ঞানী যখন অল্প পরিচিত জিনিস নিয়ে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন, তখন তিনিও সমভাবে এই কাজই করেন।

কাজেই শব্দকে আয়ত্ত করানোর পরিবর্তে যদি চিন্তার উদ্রেক করাতে হয়, তা হলে যে কোনো বিষয়-বস্তুই হোক না কেন, স্কুলে তার প্রথম পরিচয় হবে যতোদূর সম্ভব অপণ্ডিতী। কোনো অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষালব্ধ পরিস্থিতির অর্থ কি, তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য স্কুলের বাইরে যে সব পরিস্থিতি নজরে আসে তা মনে করিয়ে দিতে হয়। মনে জাগাতে হয় দৈনন্দিন জীবনে যে সব বৃত্তি আগ্রহ জাগায় এবং কাজ করতে নিযুক্ত করে। বিধিবদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যে সব পদ্ধতি স্থায়ীভাবে কৃতকার্যতা লাভ করেছে তা সযত্নে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অঙ্কেই হোক, পাঠেই হোক, বা ভূগোল শিক্ষা, পদার্থবিদ্যা বা বিদেশী ভাষা শিক্ষাতেই হোক স্কুলের বাইরে দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিন্তনের উদ্রেক করে, ঐ সব

পদ্ধতির কৃতিত্ব তার উপরেই নির্ভর করে। তাঁরা শিশুকে কোনো কিছু কাজ করতে দেয়, পড়া করে কোনো কিছু শিখতে বলে না, এবং করে দেখার কাজটা এমন ধরনের হয় যা চিন্তন, বা যোগসূত্রগুলোর উদ্দেশ্যমূলক নিরীক্ষণ দাবী করে ; এতে স্বভাবতই শিক্ষা হয়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিন্তন জাগানোর অর্থ এই যে, তাকে এমন কিছুর ইঙ্গিত করতে হবে, যা রুটিন-মাফিকও নয়, আর খামখেয়ালীও নয়,—অর্থাৎ এমন কিছু, যা নতুন কোনো কিছু (অর্থাৎ যা অনিশ্চিত ও সমস্যাপূর্ণ) উপস্থাপিত করবে, অথচ ফলপ্রসূ সাড়া যোগাতে উপস্থিত অভ্যাসের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে যুক্ত থাকবে। ফলপ্রসূ সাড়া হ'ল সেই ধরনের সাড়া যা কোনো "প্রত্যক্ষ ফল" সম্পাদন করবে। যেখানে কাজের সাথে পরিণামকে মানসিক ভাবে যোগ করা যায় না, সে রকমের আকস্মিক কাজের সাথে উক্ত কাজের প্রভেদ থাকে। কাজেই বিদ্যার্জনে প্রণোদিত করার জন্য যখন কোনো পারস্পরিক অবস্থা বা অভিজ্ঞতার প্রস্তাব আসে, তখন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে, ওর মধ্যেকার সমস্যাটা নিয়ে—সমস্যাটা কি গুণবিশিষ্ট তাই নিয়ে।

কথাটা ভাবতে গেলে প্রথমে মনে হতে পারে যে,—চলিত স্কুল পদ্ধতি-গুলি বুঝি এই মানদণ্ড অনুযায়ী ভালো নম্বরই পাবে। সমস্যা দেওয়া, প্রশ্ন করা, বাড়ীতে কাজ দেওয়া, কাঠিন্যকে বড়ো করে দেখানো, এ সব তো স্কুলের কাজের একটা বড় অংশ। কিন্তু খাঁটি সমস্যা এবং সমস্যার ভান, বা নকল সমস্যার মধ্যে পার্থক্য বিচার করা অপরিহার্য। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো এই পার্থক্য বিচারের সহায়ক। (ক) কেবল সমস্যা ছাড়া এর মধ্যে আর কিছু আছে কি? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনো পরিস্থিতির মধ্যে প্রশ্নটি স্বভাবতঃই জাগে কি? না এ একটা স্বতন্ত্র জিনিস,—কেবল স্কুলের কোনো আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষাদান করা হিসাবেই এই সমস্যা। একি এমন কোনো ধরনের প্রচেষ্টা, যা শিক্ষার্থীকে স্কুলের বাইরে পর্যবেক্ষণ করতে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে নিযুক্ত করবে? (খ) এ কি শিক্ষার্থীর নিজের সমস্যা, না, তা শিক্ষকের বা পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা? একি কেবল এই কারণেই শিক্ষার্থীর সমস্যা করে নেওয়া হয়েছে যে, সে এ নিয়ে কাজ না করলে উপযুক্ত নম্বর পেতে পারে না, বা প্রমোশন পেতে পারে না, বা শিক্ষকের অনুমোদন

লাভ করতে পারে না? সহজেই দেখা যাবে যে, এই প্রশ্ন দুটো সংশ্লিষ্ট। একই উদ্দেশ্যে পৌঁছোবার দুটো পথ। কোনো অভিজ্ঞতা কি এমন এক ধরনের ব্যক্তিগত বিষয় যা নিজগুণেই সংশ্লিষ্ট যোগসূত্রগুলিকে উদ্দীপিত করতে এবং পর্যবেক্ষণ করতে নির্দেশিত করবে, এবং অনুমান করতে এবং অনুমান পরীক্ষা করতে পরিচালিত করবে, অথবা তা বাইরে থেকে চাপানো হয়েছে এবং শুধু বাইরের কোনো প্রয়োজন মেটাবার জন্যই শিক্ষার্থীর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনুচিন্তনমূলক অভ্যাসের বিকাশ সাধন কল্পে, প্রচলিত প্রথাকে যে পরিমাণে উপযোগী করে নেওয়া হয়, উপরোক্ত ধরনের প্রশ্ন আমাদিকে সেটাই স্থির করবার পক্ষে একটা অবকাশ দিতে পারে। সাধারণ স্কুলকক্ষের ভৌতিক সাজ-সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা, অভিজ্ঞতার বাস্তব পরিস্থিতি উপস্থাপিত করার পরিপন্থী। দৈনন্দিন জীবনের যে সব পরিস্থিতি নানা বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করে, ওখানে তার সাদৃশ্য কি আছে? প্রায় প্রতিটি জিনিসই শোনবার, পড়বার, যা বলে দেওয়া হয় ও যা পড়ে নেওয়া হয় তার পুনরাবৃত্তির উপরেই অতিরিক্ত মূল্য অর্পণের সাক্ষ্য দেয়। জীবনের দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনে, বাড়ীতে ও খেলার মাঠে বিভিন্ন জিনিস ও লোকের সঙ্গে কর্মতৎপর সংযোগ সম্বলিত বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে ওসব ব্যবস্থার যে পরিমাণ বৈসাদৃশ্য থাকে তার অত্যুক্তি করা অসম্ভব। অন্যান্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়, বা স্কুলের বাইরে বই পড়ে, ছেলেমেয়েদের মনে যে সব প্রশ্ন ওঠে, তার সাথে স্কুল ব্যবস্থা বহুলাংশে তুলনারও অযোগ্য। শিশুরা স্কুলের বাইরে কেন এতো প্রশ্ন করে (এবং উৎসাহ পেলে প্রশ্ন করে করে বড়োদের কেন উত্যক্ত করে তোলে); অন্যদিকে আবার স্কুল-পাঠ্য বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলের মস্ত অভাব কেন, কেউ কোনো দিন তার ব্যাখ্যা করেন নি। যে অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা স্বভাবতঃই নিজেদের আভাসিত করে তোলে এবং স্কুলের রীতিগত অবস্থা সে অভিজ্ঞতাকে কতোদূর যুগিয়ে দেয়—এই দুইয়ের মধ্যে লক্ষণীয় বৈষম্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রশ্নটির উপর একটা আলোকপাত করা হবে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলা-কৌশলের যতো উন্নতিই হোক না কেন, তাতে এই অবস্থার পুরো প্রতিকার হবে না। এই ব্যবধান অতিক্রম করার পূর্বে, কাজ করার জন্য আরও বেশী বাস্তব জিনিস, দ্রব্য

সামগ্রী, কল-কৌশল ও কাজের সুযোগ যোগাড় করতে হবে। এবং যেখানে শিশুরা কাজ করতে, এবং কাজ করার কালে যা কিছু দেখা যায়, তার আলোচনা করতে নিযুক্ত থাকে, সেখানে দেখা যায় যে, পড়াবার অপেক্ষাকৃত নীরস অবস্থাতেও, শিশুদের জিজ্ঞাসা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় এবং সংখ্যায় বাড়ে; এবং মীমাংসার প্রস্তাবও উচ্চমানের, নানা প্রকারের ও খোলাখুলি ধরনের হয়।

যে সমস্ত জিনিস-পত্র ও কাজকর্ম বাস্তব সমস্যার উদ্ভব করে, তার অভাব হেতু, শিক্ষার্থীর সমস্যা তার নিজের সমস্যা হয় না, অথবা কেবল শিক্ষার্থী হিসাবেই তার নিজের সমস্যা হয়, মানুষ হিসাবে নয়। কাজেই এই ধরনের সমস্যার সাথে বোঝাপড়া করে যে ওস্তাদী আয়ত্ত হয়, বিদ্যালয় কক্ষের বাইরের জীবনে খাটানোর ক্ষেত্রে তার শোচনীয় অপচয় ঘটে। শিক্ষার্থীর সমস্যা থাকে, কিন্তু তা হল শিক্ষকের দেওয়া উদ্ভট প্রয়োজনগুলির মেটানোর সমস্যা। শিক্ষার্থীর সমস্যা দাঁড়ায় শিক্ষক কি চান তা বের করা; এবং আবৃত্তি, পরীক্ষা ও বাহ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষক কিসে তুষ্ট থাকেন,—সেই সব সমস্যার সমাধান করা। তখন আর বিষয়-বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। গণিত, ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে চিন্তার বিষয়-বস্তুও থাকে না এবং সুযোগও মেলে না। সুযোগ মেলে দক্ষতা সহকারে বিষয়-বস্তুকে শিক্ষকের প্রয়োজন উপযোগী করার মধ্যে। শিক্ষার্থী শিক্ষা করে, কিন্তু তার অজ্ঞাতসারেই তার পাঠের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় স্কুল-ব্যবস্থা ও স্কুল কর্তৃত্বের চলিত-রীতি ও আদর্শ;—নামকরা "পাঠ্য বিষয়" নয়। এই ভাবে যে ধরনের চিন্তন আহ্বান করা হয়, তা খুব ভালো হলেও কৃত্রিম ও একদর্শী হয়। আর খুব মন্দ হলে, শিক্ষার্থীর সমস্যা কি করে বিদ্যালয় জীবনের প্রয়োজন মেটানো যায় তা না হয়ে, সমস্যা দাঁড়ায় কি করে "লোক দেখানো" উপায়ে তা মেটানো যায়। অথবা সমস্যা মেটানোর যথেষ্ট কাছাকাছি এসে, অতিরিক্ত ঘষাঘষি না করে কি করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়। এ সমস্ত ফন্দির ফলে যে বিচার-বুদ্ধি গঠিত হয়, তাকে চরিত্রের বাঞ্ছনীয় শ্রীবৃদ্ধি বলা যায় না। এই সব উক্তি যদি চলিত স্কুল পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা অতিরঞ্জিত চিত্র দিয়ে থাকে, তা হলে তা অন্ততঃ এই বিষয়টা স্পষ্ট করবে যে, যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে এ রকমের করতে হয় যে, চিন্তামূলক জিজ্ঞাসার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সেটি স্বাভাবিকভাবে সমস্যার সৃষ্টি করবে, তা হলে সেখানে এমন এক

রকমের সক্রিয় অনুধাবনের প্রয়োজন হবে যার মধ্যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সামগ্রীর প্রয়োগ থাকে।

(২) কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠিন্য বা দুর্বোধ্যতা দেখা দিলে তার সাথে বোঝাপাড়া করতে যে সব বিচার বিবেচনার দরকার হয়, তা যোগানোর জন্য হাতে "তথ্য" রাখতেই হবে। শিক্ষকেরা কোনো "বিকাশমান" পদ্ধতি অনুসরণ করে কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে ভেবে, কিছু বের করতে বলেন, যেন সুতোর মতো তারা নিজেদের মাথার মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়েই তা বের করতে পারে। চিন্তনের বিষয়-বস্তু,—চিন্তা নয়, পরন্তু তা হল কাজ, তথ্য, ঘটনা ও জিনিসের নানাবিধ সম্পর্ক। অন্য কথায়, ফলপ্রসূ চিন্তনের পূর্বেই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বা তা এখন পেতে হবে। যে সব অভিজ্ঞতা বর্তমান, উপস্থিত কাঠিন্যের সাথে যোঝবার জন্য তারা সঙ্গতি যোগায়। বাধা-বিঘ্ন চিন্তনের অপরিহার্য উদ্দীপক, কিন্তু সকল বাধা-বিঘ্নই চিন্তন উদ্রেক করে না। সময়ে সময়ে বাধা-বিঘ্ন শিক্ষার্থীকে অভিভূত করে, নিরুৎসাহিত করে এবং সমস্যার তলও তারা পায় না। কোনো জটিল পরিস্থিতিকে যথেষ্ট পরিমাণে সেই সব পরিস্থিতির মতো হতে হবে, যা নিয়ে এর আগেই চর্চা করা হয়েছে এবং তার ফলে, তা নিয়ে কাজ করতে যে সব উপায়ের দরকার হয় তার উপর শিক্ষার্থীদের কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে। শেখাবার কলা-কৌশলের একটা বড়ো অংশ হবে নতুন সমস্যার কাঠিন্যকে এমনভাবে বড়ো করে দেখানো যাতে চিন্তাশক্তি নাড়া খেয়ে সজীব হয়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে তার পরিসরকে এমনভাবে ছোটো করা উচিত যাতে সমস্যার মধ্যে অভিনব উপাদান থাকার জন্য সেখানে স্বাভাবিক বিভ্রান্তি যেমন হবে, তেমনি তাতে এমন কতক কতক আলোকবিন্দু থাকবে যার থেকে সহায়তামূলক ইঙ্গিতও আসতে পারে।

কোন্ মনস্তাত্ত্বিক উপায় অবলম্বন করে অনুচিন্তনের বিষয়-বস্তু যোগানো হবে, সে কথা একদিক দিয়ে অবান্তর। স্মৃতি, পর্যবেক্ষণ, পাঠ, কথা,—এর সবই তথ্য যোগাড় করার প্রশস্ত পথ। এর কোন্‌টি থেকে কতোটা তথ্য নেওয়া হবে, তা নির্ভর করে হাতের কাছে থাকা বিশিষ্ট সমস্যাটার সুনির্দিষ্ট গুণের উপরে। যে সমস্ত জিনিস বহিরিন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থাপিত করা হয় শিক্ষার্থী যদি তার সাথে ততোদূর সুপরিচিত থাকে যে, সে স্বাধীন

ভাবেই সংলগ্ন তথ্যাবলী মনে করতে পারে, তাহলে সে সব জিনিস পর্যবেক্ষণ করার উপরে পীড়াপীড়ি করা নিরর্থক। অবশ্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার উপরে অনাবশ্যক ও পঙ্গুকারী নির্ভরশীলতা উদ্রেক করা সম্ভব হতে পারে। যে সমস্ত জিনিসের গুণাবলী চিন্তাধারা পরিচালিত করতে সাহায্য করে, কোনো ব্যক্তিই তার সবগুলো জিনিসের কোনো সংগ্রহশালা সঙ্গে নিয়ে চলতে পারে না। কোনো সুশিক্ষিত মন হল সেই মন, যার পেছনে, বলতে গেলে সর্বাধিক সঙ্গতি থাকে, এবং "যে মন" তার পুরানো অভিজ্ঞতা "কি বলে" তা পর্যালোচনা করে দেখতে অভ্যস্ত। অন্যদিকে এমন কি, কোনো সুপরিচিত জিনিসেরও কোনো গুণ বা সম্বন্ধ হয়ত এর আগে লক্ষ্য করা হয় নি ; আবার যা লক্ষ্য করা হয়নি হয়ত সেই তথ্যটাই হাতের প্রশ্নটিকে বোঝবার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দাবী আসেই। পর্যবেক্ষণকে যেমন, তেমনি পড়ার এবং "বলার" বিষয়কে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও এই নিয়মই খাটে। স্বভাবতঃই প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ অধিকতর স্পষ্ট ও জীবন্ত। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে। এবং সব ক্ষেত্রেই শিক্ষার একটা অপরিহার্য অংশ হ'ল, একজনের অব্যবহিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতাকে অন্যান্যের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুপূরণ করার সক্ষমতা অর্জন করা। তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্য, তা সে পড়া থেকেই হোক আর শোনা থেকেই হোক, অন্যান্যের উপর অতিরিক্ত আস্থা রাখা নিন্দনীয়। কিন্তু সর্বাধিক আপত্তিকর বিষয় হ'ল এই সম্ভাব্যতা যে, হাতের প্রশ্নের জন্য শিক্ষার্থী নিজে যে সব জিনিসকে খাপ খাইয়ে নেবে, এবং প্রয়োগ করবে, শিক্ষার্থীকে সে সব জিনিস যোগাড় না করে দিয়ে, অন্য সূত্রে, যেমন বই বা শিক্ষক দিয়ে, তার প্রশ্নটির একটা পূর্বপ্রস্তুত মীমাংসা যোগাড় করে দেওয়া।

এ কথার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই যে, স্কুলে অন্যে যে সংবাদ যোগায়, তা যেমন অত্যধিক, তেমনই অত্যল্প। আবৃত্তি ও পরীক্ষাতে পুনরুক্তির উদ্দেশ্যে সংবাদ জড়ো করা ও আয়ত্ত করা নিয়ে অতিরিক্ত তোড়জোড় চলে। জ্ঞানের যে অর্থ সংবাদ, তা-ই হয়ে দাঁড়ায় কার্যকারী মূলধন, হয়ে দাঁড়ায় পরবর্তী জিজ্ঞাসা, আবিষ্কার ও জ্ঞান লাভের অপরিহার্য সঙ্গতি। সংবাদ-কেই সচরাচর তার নিজ উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা হয়, এবং তখন উদ্দেশ্য

দাঁড়ায় সেই জাতীয় জ্ঞানকে স্তূপীকৃত করা এবং জায়গা মতো তাই জাহির করা। এটি হল নিশ্চল হিমঘরের আদর্শ এবং সেটি শিক্ষামূলক বিকাশের প্রতিকূল। এ রকমের জ্ঞান কেবল চিন্তনের সুযোগই ব্যাহত করে না, পরন্তু চিন্তন পদ্ধতিকেই জলায় ডুবিয়ে মারে। জমিতে হরেক রকমের আবর্জনার স্তূপ থাকলে তার উপরে কেউ বাড়ী করতে পারে না। যে সব শিক্ষার্থী তাদের "মনগুলোকে" এমন সব বস্তু দিয়ে পুরে রেখেছে যার বুদ্ধিগত প্রয়োগ তাঁরা কোনো কালেই করেনি, তাঁরা চিন্তা করতে চেষ্টা করলে তাঁদের চিন্তাশক্তি নিশ্চয়ই ব্যাহত হবে। যা সঠিকভাবে খাঁটি তা বেছে নিতে তাঁরা অভ্যস্ত নয় এবং তার বিচার করার কোনো মানও তাঁদের নেই; সেখানে সব কিছুই থাকে কোনো নিষ্প্রাণ নিথর স্তরে। অন্যদিকে এ প্রশ্নও বিচার সাপেক্ষ যে, যদি সংবাদ আহরণ শিক্ষার্থীর নিজ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়ে অভিজ্ঞতা লাভে যথার্থ ভাবে ক্রিয়া করত, তা হলে সে এখন যতোটা পাচ্ছে, তার থেকে তাঁর আরও বেশী রকমের পুস্তক, চিত্র ও আলোচনার সঙ্গতি থাকার দরকার হতো কিনা।

(৩) চিন্তনের মধ্যে ঘটনা, তথ্যাবলী ও অর্জিত জ্ঞানের অনুবন্ধ হ'ল, ইঙ্গিত, অনুমিতি, আনুমানিক অর্থ, কল্পনা ও পরীক্ষা সাপেক্ষ ব্যাখ্যা,—এক কথায় ধারণা। সযত্ন পর্যবেক্ষণ ও অনুস্মৃতি, যা দেওয়া আছে, যা আগে থেকেই উপস্থিত আছে, কাজেই যা সুনিশ্চিত তা স্থির করে দেয়। যা উপস্থিত নেই, পর্যবেক্ষণ তা দিতে পারে না। পর্যবেক্ষণ ও অনুস্মৃতি প্রশ্নকে রূপ দেয়, স্বচ্ছ করে এবং তার স্থান চিহ্নিত করে দেয়; কিন্তু তার উত্তর যোগাতে পারে না। উত্তর যোগানোর উদ্দেশ্যেই অভিক্ষেপন, উদ্‌ভাবন উদ্‌ভাবনী দক্ষতা এবং পরিকল্পনা প্রভৃতি এসে পড়ে। তথ্যাবলী নানা ইঙ্গিত "জাগায়", এবং কেবল সুনির্দিষ্ট তথ্যাবলীর সাথে সম্পর্ক বিবেচনা করেই আমরা ইঙ্গিতের যাথার্থ্য দেখতে অগ্রসর হই। কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্যে তখন পর্যন্ত আসলে যা "থাকে", ইঙ্গিত তাকে ছাড়িয়ে যায়। ইঙ্গিত সম্ভাব্য ফলাফলের এবং যা যা করতে "হবে" তার পূর্বাভাস দেয়, কিন্তু তথ্যাবলীর, অর্থাৎ যা করা হয়ে গেছে তার পূর্বাভাস দেয় না। অনুমিতি সকল সময়েই অজানাকে জানতে চায়,—এ যেন জানা থেকে অজানাতে ঝাঁপ দেওয়া।

এই অর্থে চিন্তা, (অর্থাৎ ইঙ্গিত-বহ বিষয়, উপস্থাপিত বিষয় নয়) সৃজনশীল,—অভিনবত্বের দিকে এক অভিযান বিশেষ। এর মধ্যে কিছুটা উদ্‌ভাবনশীলতা থাকে। অবশ্য এর মধ্যে যা কিছুর ইঙ্গিত থাকে, তাকে অবশ্যই "কোনো না কোনো" প্রসঙ্গে সুপরিচিত হতেই হবে; কোনো অভিনবত্বকে, অর্থাৎ উদ্‌ভাবনশীল পরিকল্পনাকে, যে নতুন আলোতে দেখা যাবে, যে বিভিন্ন প্রয়োগে খাটানো হবে, তার সাথেই তা জুড়ে থাকে। যখন নিউটন্ তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের কথা চিন্তা করছিলেন, তখন তাঁর চিন্তার সৃজনশীল দিকটিকে চিন্তনীয় বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে দেখা যায় নি। সে সব জিনিস সুপরিচিতই ছিল; এবং তাঁর অনেকগুলোই অতি সাধারণ ধরনেরই ছিল,—যেমন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, ওজন, দূরত্ব, বস্তুর পরিমাণ, সংখ্যার বর্গফল ইত্যাদি। এ সব জিনিসের মধ্যে কোনো মৌলিক ধারণা ছিল না। এ সব ছিল নিরূপিত তথ্য। কোনো অজানিত প্রসঙ্গে এই সব চেনা জিনিসের যে "প্রয়োগ" করা হয়েছিল তার মধ্যেই ছিল তাঁর মৌলিকতা। প্রতিটি লক্ষণীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রতিটি শ্রেষ্ঠ উদ্‌ভাবনী রচনা, এবং প্রতিটি প্রশংসনীয় শিল্পকলা সৃজনের ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে। কেবল নির্বোধ লোকেরাই সৃজনশীল মৌলিকতাকে অতি-প্রাকৃতিক ও অতি-কল্পিত বিষয়ের সহিত একীভূত করে; বাকী লোকে স্বীকার করে যে, মৌলিকতার পরিমাপ থাকে দৈনন্দিন জিনিসের সেই ধরনের প্রয়োগের মধ্যে যা আগে অন্যের মাথায় আসেনি। বস্তুতঃ কাজটাই অভিনব, কিন্তু যে সব উপাদান দিয়ে কাজটা সংগঠিত, তা অভিনব নয়।

এর থেকে যে শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আসে তা এই যে, বিচার-বিবেচনায় যে ধরনের অভিক্ষেপন আগে ধারণায় আসেনি তার সংশ্লিষ্ট "যাবতীয়" চিন্তনই মৌলিক। যখন কোনো তিন বছরের শিশু কাঠের ব্লক দিয়ে কি কি করা যায় তা আবিষ্কার করে, অথবা যখন কোনো ছয় বছরের শিশু পাঁচ পয়সার সাথে পাঁচ পয়সা রেখে কি করতে পারা যায় তা দেখে, তখনই সে একজন যথার্থ আবিষ্কারক, যদিও পৃথিবীর আর সব লোকের কাছেই এটা জানা কথা। এখানে অভিজ্ঞতার যে অবিমিশ্র উৎকর্ষ ঘটে তা আর এক দফা যোগ হওয়ার জন্য নয়, পরন্তু নতুন গুণ দিয়ে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য। সমবেদী পর্যবেক্ষকদের কাছে ছোটো শিশুদের স্বতঃ-

প্রবৃত্ত কাজের যে মাধুর্য থাকে, তা হ'ল এই বুদ্ধিগত মৌলিকতার উপলব্ধির জন্য। শিশুরা নিজে নিজে যে আনন্দ উপভোগ করে, তা হ'ল এই বুদ্ধিগত গঠনমূলকতার আনন্দ, সৃজনশীলতার আনন্দ,—শব্দটিকে যেন ভ্রান্ত অর্থে না ধরা হয়।

যে শিক্ষানীতি বার করতে আমি মুখ্যভাবে জড়িত তা এ নয় যে, যদি স্কুলের বিভিন্ন ব্যবস্থা, আবিষ্কার অর্থে শিক্ষালাভের সহায়ক হয়, এবং অন্যেরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যা ওপর থেকে ঢালতে থাকে, তা জমা করার সহায়ক না হয়, তা হলে শিক্ষকেরা তাদের কাজকর্ম কম নিষ্পেষণকারী ও শ্রান্তিকর বোধ করবেন; এমন কি এ কথাও নয় যে, সে ব্যবস্থা দিয়ে শিশু ও যুবকদের বুদ্ধিগত সৃজনশীলতার ব্যক্তিগত আনন্দ দেওয়া সম্ভব হবে,—যদিও এ সব কথা বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ। আমি যা বলতে চাই তা এই যে, কোনো চিন্তা, কোনো ধারণাই সম্ভবতঃ ধারণারূপে একজনের কাছ থেকে আর একজনের মধ্যে চালান করা যায় না। যখন কোনো ধারণা কারও কাছে বলে দেওয়া হয়, তখন তার কাছে তা হয়ে দাঁড়ায় আর একটা ঘটনা,—ধারণা নয়। বলে দেওয়া ধারণাটি, প্রশ্নটি হৃদয়ঙ্গম করতে এবং কোনো সাদৃশ্য ধারণা বিবেচনা করতে উদ্দীপিত করতে পারে; কিম্বা সেটি তার বুদ্ধিগত আগ্রহকে নিষ্পেষিত করতে এবং চিন্তনে তার উদীয়মান প্রচেষ্টাকে দাবিয়ে দিতেও পারে। কিন্তু সে "সরাসরি" যেটি পায় সেটি কোনো ধারণা হতে পারে না। একটি সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াই করেই, কেবল তাঁর নিজের পথের সন্ধান ও আবিষ্কার করতে যেয়েই, সে চিন্তা করতে পারে। যখন পিতামাতা বা শিক্ষক চিন্তনকে উদ্দীপিত করার শর্তাবলী যোগাড় করে দিয়েছেন, এবং কোনো যৌথ-অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর ক্রিয়াকলাপের প্রতি সমবেদী মনোভাব গ্রহণ করেছেন, তখন শিক্ষাতে প্ররোচিত করার স্বার্থে কোনো দ্বিতীয় পক্ষ যা-কিছু করতে পারেন তার সবই করা হয়ে যায়। বাকী কাজ প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লোকটির। সে যদি নিজের সমস্যা পূরণের পরিকল্পনা করতে না পারে (অবশ্য পৃথক ভাবে নয়, শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে একযোগে), এবং তার পথ বের করতে না পারে, তা হলে তার শিক্ষালাভ হবে না। এমন কি সে যদি শতকরা একশত ভাগও বিশুদ্ধভাবে উত্তর দিতে পারে, তা হলেও

না। আমরা হাজার হাজার পূর্বপ্রস্তুত ধারণা সরবরাহ করতে পারি, এবং তা করেও থাকি। কিন্তু আমরা এদিকটা লক্ষ্য করতে তৎপর নই যে, যে লোকটি শিখছে, সে এমন কোনো ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে নিযুক্ত আছে কিনা যেখানে তার নিজের কর্মতৎপরতাই তাঁর ধারণাবলী, অর্থাৎ অর্থের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও তার বিভিন্ন যোগসূত্র, সঞ্চার করবে, সমর্থন করবে এবং দৃঢ়ভাবে বন্ধন করবে। তার অর্থ এ নয় যে, শিক্ষক দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবেন। পূর্বপ্রস্তুত বিষয়বস্তু যোগানোর এবং কি রকম বিশুদ্ধভাবে তার পুনরাবৃত্তি হয় তা শ্রবণ করার বিকল্প ব্যবস্থা কোনো নিশ্চল অবস্থা নয়, পরন্তু তা কোনো ক্রিয়াশীলতার মধ্যে অংশ গ্রহণ করা, তাতে ভাগ নেওয়া। এই রকম অংশীদারী কাজের মধ্যে শিক্ষকও একজন শিক্ষার্থী, এবং শিক্ষার্থীও তার অজ্ঞাতসারেই একজন শিক্ষক। মোটামুটিভাবে দু'দিকেই, শেখাবার ও শেখবার সচেতনতা যতো কম থাকে তাতেই ভালো।

(৪) আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন ধারণা হল, তা সে সরল অনুমানই হোক আর গুরুভার তত্ত্বই হোক, সম্ভাব্য মীমাংসার পূর্বানুমিত জ্ঞান। ধারণা হ'ল কোনো ক্রিয়াশীলতা এবং তার যে পরিণাম এখনো ধরা পড়েনি, এই দুইয়ের নিরবচ্ছিন্নতা বা যোগসূত্রের পূর্বানুমিত জ্ঞান। কাজেই ধারণার উপরে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চালিয়েই ধারণার পরীক্ষা করা হয়। ধারণাবলীর কাজ হল অধিকতর পর্যবেক্ষণ, অনুস্মরণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ দেখানো এবং তার ব্যবস্থা করা। ধারণা হল শিক্ষালাভের মধ্যবর্তী বিষয়, তার চূড়ান্ত বিষয় নয়। এর আগে আমাদের দেখানোর সুযোগ হয়েছে যে, সকল শিক্ষাসংস্কারকগণই চিরাচরিত শিক্ষার নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে নিন্দায় পঞ্চমুখ। তাঁরা বার থেকে ঢেলে শেখানো এবং তাকে স্পঞ্জের মতো শোষণ করা শিক্ষানীতি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন; তাঁরা কঠিন ও প্রতিরোধী পাষাণে যেমন ছিদ্র করে কিছু ঢোকানো হয় তেমনি করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়-বস্তু ঢোকানোর প্রথাকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু কোনো ধারণাকে কোনো অভিজ্ঞতালাভের সাথে একাত্ম করতে, এবং যাতে পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ বিস্তৃত ও অধিকতর নিখুঁত হতে পারে সেইভাবে অভিজ্ঞতার রূপ দিতে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন হয় তা আনা

খুব সহজ নয়। ক্রিয়াশীলতাকে, এমন কি, স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াশীলতাকেও অতি সহজে শুধু মানসিক কোনো-কিছু বলে ধরা হয়। এটি নাকি মাথার মধ্যে খাঁচাবন্দী থাকে, অথবা কেবল স্বরযন্ত্রের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।

যদিও সকল সফল শিক্ষাপদ্ধতিই শিক্ষালব্ধ ধারণাকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, তথাপি এই প্রয়োগমূলক অনুশীলনকে কখনো কখনো পূর্বে যা শেখা হয়েছে তাকে "সুনিশ্চিত" করা, এবং তাকেই সুচারুরূপে প্রয়োগের জন্য অধিকতর ব্যবহারিক দক্ষতা লাভের কৌশলরূপে ব্যবহার করা হয়। এতে খাঁটি ফললাভ হয় এবং তা অবজ্ঞার বস্তু নয়। কিন্তু অধ্যয়নসূত্রে যা লাভ করা হয়েছে, তাকে প্রয়োগ করার অভ্যাসের মধ্যে কোনো মুখ্য বৌদ্ধিক গুণ থাকা উচিত। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, কেবল চিন্তন হিসাবেই চিন্তন অসম্পূর্ণ। খুব ভালো হলেও, চিন্তার বিষয়বস্তু পরীক্ষা সাপেক্ষ; এ বিষয়-বস্তু হল বিভিন্ন ইঙ্গিত ও আভাস বিশেষ। চিন্তার বিষয়-বস্তু, অভিজ্ঞতার বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে বোঝাপড়া করার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ পদ্ধতি। যে পর্যন্ত তাকে এই সব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হয় সে পর্যন্ত তার পুরো তাৎপর্য ও বাস্তবতার অভাব দেখা যায়। কেবল প্রয়োগই তাকে পরীক্ষা করে, এবং কেবল পরীক্ষাই তার পুরো অর্থ যোগায় ও তার বাস্তবতাবোধ আনে। চিন্তনের বিষয়-বস্তুকে ব্যবহারে না খাটালে সেটি তার নিজের গড়া এক অদ্ভুত জগতে কোনো একটা পৃথক বস্তুর সামিল হয়ে পড়ে। যে সমস্ত দর্শন (যার সম্বন্ধে দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে বলা হয়েছে) "মনকে" পৃথক করে নিয়ে জগতের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে, সে সব দর্শনের মূলে এমন কোনো এক শ্রেণীর অনুচিন্তনরত বা তাত্ত্বিক লোক ছিলেন কি, যাঁরা তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বাধা-নিষেধ হেতু তাঁদের ধারণাবলীকে কাজে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করে দেখতে অক্ষম হয়েছিলেন? বিষয়টি সম্বন্ধে গুরুতরভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে। এর ফলেই হয়ত তাঁরা তাঁদের নিজেদের চিন্তার মধ্যেই ফিরে এসেছেন, যেন চিন্তা করাই চিন্তনের উদ্দেশ্য।

যাই হোক, এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, স্কুলে যা শিক্ষা করা হয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা অদ্ভুত কৃত্রিমতা জড়ানো থাকে। এ কথা বলা চলে না যে, বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীই জ্ঞাতসারে বিষয়-বস্তুকে

অবাস্তব বলে মনে করে; কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, তাদের প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তু যে ধরনের বাস্তবতা জ্ঞাপন করতে চায়, স্কুলের বিষয়-বস্তুর মধ্যে তার মতো কিছু থাকে না। স্কুলের বিষয়-বস্তু থেকে তারা সে ধরনের বাস্তবতা আশা না করতেই শেখে; তারা আবৃত্তি, পড়াশেখা ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই স্কুলের বিষয়-বস্তুর বাস্তবতা ধরে নিতে অভ্যস্ত হয়। স্কুলের বিষয়-বস্তু যে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অক্রিয় থাকবে তা তো একটা কমবেশী মামুলী কথা। এর থেকে দু'রকমের কুফল আসে। সাধারণ অভিজ্ঞতা যতোটা সমৃদ্ধ হওয়া উচিত, ততোটা হয় না; স্কুলের শিক্ষা এই অভিজ্ঞতাকে উর্বর করে না। এবং আধা-বোঝা ও বদ্‌হজমী বিষয়-বস্তুকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং এতেই অভ্যস্ত হওয়ার ফলে যে মনোভাবের সৃষ্টি হয়, তা চিন্তা শক্তি ও কর্মক্ষমতাকে দুর্বল করে।

চিন্তনের ফলপ্রসূ বিকাশ সাধনের উপযোগী সদর্থক ব্যবস্থার ইঙ্গিত করার জন্যই আমরা চিন্তনের নিরর্থক দিকটা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। যেখানে স্কুল বিভিন্ন শ্রমশালা, শিল্পশালা, বাগ-বাগিচা দিয়ে সাজানো, যেখানে অভিনয়, আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূলা স্বচ্ছন্দভাবে চলে, সেখানে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করা এবং ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত করার জন্য বিভিন্ন সংবাদ ও ধারণাকে আহরণ করা ও প্রয়োগ করার সুযোগ-সুবিধা থাকে। সেখানে ধারণাবলী নিঃসঙ্গ থাকে না, তারা এক একটা পৃথক দ্বীপ রচনা করে না। তারা জীবনের স্বাভাবিক গতিকে প্রাণচঞ্চল ও সমৃদ্ধ করে। বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ তার নিজ ধর্ম দ্বারা এবং কর্ম নির্দেশিত করতে তার ন্যস্ত স্থান দ্বারা প্রাণচঞ্চল হয়।

"সুযোগ-সুবিধা" রয়েছে কথাটা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বলা হয়। এর অপপ্রয়োগ করা ঠিক নয়। শারীরিক ও গঠনমূলক ক্রিয়া-কলাপ ভৌতিকরূপে, অর্থাৎ কেবল দৈহিক দক্ষতা অর্জন করার উপায় হিসাবে, নিয়োজিত করা সম্ভবপর; কিম্বা তাকে প্রায় একতরফাভাবে "বৈষয়িক" অর্থাৎ অর্থাগমের উদ্দেশ্যে খাটানো চলে। কিন্তু এ ধরনের ক্রিয়া-কলাপের গুণ যে কেবল ভৌতিক বা পেশাদারী,—"কৃষ্টিমূলক" শিক্ষার সমর্থকদের পক্ষে এরূপ ধরে নেওয়ার ঝোঁক সেই সব দর্শনেরই সৃষ্টি, যা মনকে অভিজ্ঞতার ধারা থেকে, কাজেই জিনিসের উপরে এবং জিনিসের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়া

থেকে, আলাদা করে রাখে। যখন "মানসিক" ব্যাপারটিকে কোনো স্বয়ং-সম্পূর্ণ আলাদা রাজ্য বলে ধরা হয়, তখন দৈহিক ক্রিয়াশীলতা ও গতিবিধিরও অনুরূপ দশা ঘটে। ভালো হলেও, ওসব জিনিসকে বড় জোর কেবল মনের বাহ্যিক উপাঙ্গরূপেই ধরে নেওয়া হয়। ওরা দৈহিক প্রয়োজন মেটাবার ও বাহ্যিক শোভনতা ও আরামের জন্য অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু ওরা মনের কোনো অপরিহার্য স্থান অধিকার করে না। আর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ করতেও ওরা কোনো অপরিহার্য ভূমিকা নেয় না। কাজেই কোনো উদার-নীতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থাৎ যে শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেই ব্যবস্থাতে, ওদের কোনো স্থান নেই। যদি এ শিক্ষার মধ্যে ওরা একান্তই এসে পড়ে, তা হলে তার কারণ হল বৈষয়িক প্রয়োজনের প্রতি সাধারণ লোকের অনুমোদন। ওরা সমাজের শিরোমণিদের শিক্ষাক্ষেত্রে আক্রমণ চালাবে,—এ কথা মুখে আনারও অযোগ্য। মনের স্বাতন্ত্র্যমূলক ধারণা থেকে অনিবার্যরূপে এই সিদ্ধান্তই আসে, কিন্তু মন প্রকৃত পক্ষে কি, আমরা যখন তা উপলব্ধি করি, অর্থাৎ আমরা যখন দেখি যে "মন" হল অভিজ্ঞতার বিকাশলাভের ক্ষেত্রে কোনো উদ্দেশ্যমূলক ও নির্দেশকারী অনন্য উপাদান, তখন এই যুক্তি অনুসারেই ঐ সিদ্ধান্ত লোপ পায়।

যদিও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই এমন ভাবে সুসজ্জিত করা বাঞ্ছনীয় যে, তাতে করে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিস্থিতির সাদৃশ্যমূলক সক্রিয় অনুধাবনের ভিতর দিয়ে সংবাদ ও ধারণাকে আহরণ করবার ও তা পরীক্ষা করাবার সুযোগ পাবে, তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে সজ্জিত করতে বহুদিন লাগবে। কিন্তু এই অবস্থায় শিক্ষকের হাত গুটিয়ে থাকা এবং যে পদ্ধতি স্কুলের জ্ঞানকে আলাদা করে রাখে, তাতেই লেগে থাকার অজুহাত হতে পারে না। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি বিজ্ঞপ্তিই পাঠ্য-বস্তুর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপক ও অধিকতর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটা আড়াআড়ি সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ আনে। শ্রেণী কক্ষের শিক্ষা তিন অবস্থায় পড়ে। সর্বাধিক অবাঞ্ছনীয়, প্রতিটি "পড়াকে" স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ বলে ধরে নেয়া। এই অবস্থা শিক্ষার্থীর উপরে কোনো একটা বিষয়ের বিভিন্ন পাঠ্যাংশের মধ্যে, বা বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে, সংযোগ-সূত্র আবিষ্কারের দায়িত্ব অর্পণ করে না। শিক্ষার্থী যাতে তার উপস্থিত

পাঠকে হৃদয়ঙ্গম করতে তার আগেকার পাঠকে সুসম্বদ্ধরূপে কাজে লাগাতে পারে, এবং বর্তমান পাঠ যাতে পূর্বার্জিত বিষয়টিকে আরও প্রাঞ্জল করতে পারে,—বিজ্ঞতর শিক্ষকেরা সে দিকে লক্ষ্য রাখেন। এতে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু স্কুলের বিষয়-বস্তু এ ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র থাকে। কেবল দৈবযোগ ছাড়া, বিদ্যালয়-বহির্ভূত অভিজ্ঞতাকে অমার্জিত ও অপেক্ষাকৃত বিচার-শূন্য অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। সে অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের অধিকতর বিশুদ্ধ ও ব্যাপক বিষয়-বস্তুর পরিমার্জিত ও সম্প্রসারণশীল প্রভাবের আওতায় আনা হয় না। আবার, এই শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার সহিত সংমিশ্রিত করে নিয়ে, একে বাস্তবতার রূপ দিয়ে প্রেরণামূলক ও সারগর্ভ করা হয় না। সর্বোত্তম শিক্ষাপ্রণালী এই আন্তঃ-সংযোগ ঘটানোর বাঞ্ছনীয়তার হিসাব রাখে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে দু'দিকের সংযোগস্থল ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে আবিষ্কার করবার একটা অভ্যাসগত মনোভাব গঠনে প্রবৃত্ত করে।

সারাংশ

শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি সেই পরিমাণেই ঐক্যবদ্ধ হয়, যে পরিমাণে তা চিন্তনের সদভ্যাস গঠনে কেন্দ্রীভূত হয়। যদিও এ কথা নির্ভুল চিন্তার একটা পদ্ধতি আছে, তবুও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, চিন্তনই হ'ল শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা লাভের পদ্ধতি। অতএব পদ্ধতির সারাংশ চিন্তনের সারাংশের সঙ্গে একাত্ম। এই সারাংশ হল,—প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষার্থীকে একটা খাঁটি পরিবেশ পেতে হবে, তার এমন কোনো নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াশীলতা থাকতে হবে, যার মধ্যে কাজের নিজ গুণেই তার স্বার্থবোধ থাকবে; দ্বিতীয়তঃ, এই পরিস্থিতির মধ্যেই চিন্তনের উদ্দীপকরূপে একটা প্রকৃত সমস্যা বিকাশ লাভ করবে; তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর হাতে তথ্য থাকবে এবং তা নিয়ে কাজ করার জন্য সে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ করবে; চতুর্থতঃ, তার মাথায় আনুমানিক মীমাংসা আসবে এবং তার সুশৃঙ্খল বিকাশের জন্য সে দায়ী থাকবে; পঞ্চমতঃ, প্রয়োগের মাধ্যমে ধারণা পরীক্ষা করা, তার অর্থ পরিষ্কার করা, এবং নিজেই যাতে তার বৈধতা আবিষ্কার করতে পারে তার জন্য তাঁর সুযোগ-সুবিধাও থাকবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পদ্ধতির স্বরূপ

১। বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতির একত্ব

শিক্ষা প্রসঙ্গে ত্রিমূর্তি হল বিষয়-বস্তু, পদ্ধতি ও পরিচালন বা প্রশাসন। সাম্প্রতিক কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা প্রথম দুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। যে বর্ণনা প্রসঙ্গে এই দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তার থেকে এদের জট ছাড়িয়ে, এখন এদের স্বরূপ বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার। যেহেতু পদ্ধতি বিষয়টিই এর আগের অধ্যায়ের বিচার-বিবেচনার সবচেয়ে কাছাকাছি, সেহেতু সেটি নিয়েই আমরা আরম্ভ করব; কিন্তু তা করার আগে আমাদের তত্ত্বের একটি সংশ্লেষের দিকে প্রত্যক্ষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে। এটি হল বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতির পারস্পরিক সম্বন্ধ। যে তত্ত্বকে দার্শনিক ভাষায় দ্বৈতবাদ বলে, সেই মন এবং পদার্থ-ও-মানুষ সম্বলিত জগৎ যে দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রাজ্য এই ধারণা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছায় যে, শিক্ষার পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তু আলাদা আলাদা জিনিস। এ অবস্থায় বিষয়-বস্তু, প্রকৃতি-ও-মানুষ সম্বলিত জগতের ঘটনা ও মূল নিয়মাবলীর কোনো পূর্বপ্রস্তুত ও সুসম্বদ্ধ শ্রেণীবদ্ধতায় পরিণত হয়। আর পদ্ধতির কাজের এলাকা থাকে সেই সব পন্থার বিচার-বিবেচনার মধ্যে, যে পন্থায় এই পূর্ববর্তী বিষয়-বস্তুকে সর্বোত্তমরূপে মনের সামনে উপস্থাপিত করা যায়, এবং তা দিয়ে মনের উপর ছাপ দেওয়া যায়, কিম্বা সেই সব পন্থার বিচার-বিবেচনা, যাতে করে মনকে বার থেকে বিষয়-বস্তুর উপর খাটানো যায়, এবং এই করে তাকে আয়ত্তে আনা ও অধিকারে রাখা সহজ করা যায়। মনকে যদি স্বয়ম্ভর বলে ধরা যায়, তা হলে অন্ততঃ তত্ত্বের দিকে দিয়ে, নিজধর্মী মনের কোনো বি-জ্ঞান থেকে শিক্ষালাভ পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব আহরণ করা চলে। যে বিষয়-বস্তুতে পদ্ধতি খাটাতে হবে তার সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকলেও তা করা চলে।

যেহেতু যাঁরা বিষয়-বস্তুর বিবিধ শাখাতে বাস্তবিকই বিজ্ঞ, তাঁরা এ পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সেই হেতু চলিত অবস্থা এই বক্রোক্তির অবকাশ আনে যে, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, মনের তথাকথিত পদ্ধতি-বিজ্ঞান হিসাবে, শিক্ষণ-বিজ্ঞানের কোনো মূল্য নেই,—তা কেবল হাতের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে শিক্ষকের গভীর ও নির্ভুল পরিচিতির অপরিহার্যতা লুকিয়ে রাখার একটা আবরণ মাত্র।

কিন্তু যে হেতু চিন্তন হল কোনো সমাপ্য ফলের দিকে বিষয়-বস্তুর নির্দেশিত গতি, এবং মন হল এই ক্রিয়াধারারই সুবিবেচিত ও অভিপ্রেত পর্যায়, সেই হেতু ওরকম কোনো খণ্ডিত ধারণা মূলতঃ মিথ্যা। বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু যে সংগঠিত, তা-ই এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, তার উপরে বুদ্ধি-বৃত্তি খাটানো হয়েছে, অর্থাৎ বিজ্ঞানকে পদ্ধতি-মাফিক করা হয়েছে। বিবিধ প্রাণীর সাথে সাধারণ পরিচিতি-জাত বিবিধ স্থূল ও বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলির সযত্ন পরীক্ষণ, সুচিন্তিত অনুপূরণ ও বিন্যাস দ্বারা পর্যবেক্ষণ, স্মরণ ও জিজ্ঞাসার সহায়করূপে যে সমস্ত যোগসূত্র বের করা হয়েছে, সুসম্বদ্ধ জ্ঞানের শাখা হিসাবে প্রাণী-বিদ্যা তারই প্রতিরূপ। এই সকল তথ্য শিক্ষার কোনো প্রারম্ভিক স্তর যোগানোর পরিবর্তে, শিক্ষার একটি সম্পাদিত স্তরই চিহ্নিত করে। পদ্ধতি হল, বিষয়-বস্তুর সেই প্রকারের বিন্যাস, যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকরী। কোনো কালেই পদ্ধতি বিষয়-বস্তুর বাইরে থাকে না।

যিনি বিষয়-বস্তু দুরস্ত করছেন তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে পদ্ধতি কিরূপ? এখানেও তা বাইরের কিছু নয়, তা কেবল উপাদানের কার্যকরী ব্যবস্থা। কর্মকুশলতা অর্থে সেই প্রকার ব্যবস্থা বোঝায়, যা উপাদানকে কাজে লাগায় (কোনো উদ্দেশে খাটায়), এবং তাতে ন্যূনতম সময় ও শক্তি খরচ করে। আমরা কাজ করার কোনো "পন্থার" পার্থক্য দেখতে পারি, এবং সেটির আলোচনাও করতে পারি; কিন্তু উপাদান দুরস্ত করার পন্থারূপেই সেটি বর্তমান। পদ্ধতি বিষয়-বস্তুর বিরোধী নয়। পদ্ধতি হল, বাঞ্ছিত ফলের দিকে বিষয়-বস্তুর কার্যকর পরিচালনা। পদ্ধতি খামখেয়ালী ও অবিবেচিত কাজের বিরোধী; অবিবেচিত অর্থে অপ-প্রয়োগমূলকতাই সূচিত হয়।

যখন বলি যে, পদ্ধতির অর্থ হ'ল উদ্দেশ্যের দিকে বিষয়-বস্তুর নির্দেশিত

গতি, তখন কথাটা একটা বিধিবদ্ধ উক্তি হয়ে ওঠে। একটি দৃষ্টান্ত এর আধেয় যোগাতে পারে। প্রত্যেক কলাবিদেরই তাঁর কাজ করার একটা পদ্ধতি, একটা কৌশল আছে। যেমন পিয়ানো বাজানো ;—এটা এলোমেলো ভাবে ঘাটের উপর ঠোকামারা নয়। এ হল সুশৃঙ্খলভাবে ঘাটগুলোর সদ্ব্যবহার করা ; এবং এই সুশৃঙ্খল গতি এমন কিছু নয়, যা পিয়ানো নিয়ে কাজ করার আগে থেকেই শিল্পীর হাতের বা মাথার মধ্যে পূর্বপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে। যে বাঞ্ছিত ফললাভের জন্য পিয়ানো হাত ও মাথাকে নিয়োজিত করে, সেই কর্মপরম্পরার বিন্যাসের মধ্যেই শৃঙ্খলা দেখা যায়। শৃঙ্খলা হল, বাদ্যযন্ত্র হিসাবে পিয়ানোর উদ্দেশ্য সাধনে পিয়ানোর কাজকে সুনির্দেশিত করা। "শিক্ষা-বিজ্ঞান" সংক্রান্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এই কথাই খাটে। একমাত্র পার্থক্য এই যে, পিয়ানো এমন একটা যন্ত্র-কৌশল যা একটি মাত্র উদ্দেশ্যের জন্যই পূর্বে তৈরী হয়। কিন্তু লেখা পড়ার উপাদান অসংখ্য প্রকারের কাজে লাগানোর যোগ্য। যদি আমরা, একটা পিয়ানো যতো অসংখ্য রকমের সুর সৃষ্টি করতে পারে, সে কথা এবং বিভিন্ন সুরেলা ফল পাবার জন্য কৌশলের যতো রকম বিচিত্রতার দরকার হয়, তার কথা বিবেচনা করি, তাহলে কিন্তু, এমন কি, সে ক্ষেত্রেও উক্ত দৃষ্টান্ত খাটতে পারে। যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক, পদ্ধতি হল কোনো উদ্দেশ্যের জন্য কোনো উপাদানকে কার্যকরীভাবে নিয়োজিত করা।

অভিজ্ঞতার ধারণায় ফিরে গিয়ে এই সব বিচার-বিবেচনাকে একটা সাধারণ রূপ দেওয়া যেতে পারে। কোনো কিছু চেষ্টা করার এবং তার পরিণামে কোনো কিছু ভোগ করার মধ্যে যে যোগসূত্র থাকে, তার উপলব্ধি হিসাবে অভিজ্ঞতা হল একটা ক্রিয়া-প্রণালী বিশেষ। এই ক্রিয়া-প্রণালী যে ধারা নেয় তার নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা থেকে পৃথকভাবে, বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতির মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। কেবল একটি ক্রিয়াশীলতার মধ্যেই ব্যক্তি যা করে এবং তার পরিবেশ যা করে তার দুটোই থাকে। যে পিয়ানো বাদকের যন্ত্রটির উপরে সম্পূর্ণ দখল আছে, তাঁর পক্ষে পিয়ানোর অবদান ও তাঁর নিজের অবদানের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো অবকাশ নেই। যে কোনো রকমের সুগঠিত ও সুগম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই—যেমন, স্কেটিং, বাক্যালাপ, সঙ্গীত শ্রবণ, ভূদৃশ্য উপভোগ ইত্যাদিতে, ব্যক্তির পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তুর

পদ্ধতির মধ্যে বিচ্ছেদের কোনো সচেতনতা থাকে না। ঐকান্তিক খেলা ও কাজের ক্ষেত্রেও এই জিনিসই ঘটে।

যখন কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করার পরিবর্তে আমরা কোনো অভিজ্ঞতা নিয়ে অনুচিন্তন করি, তখন আমরা অনিবার্যরূপে আমাদের নিজেদের মনোভাব, এবং যে সব জিনিসের উপরে আমরা ঐ মনোভাব পোষণ করি, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করি। যখন কেউ খাচ্ছেন, তখন তিনি কোনো খাদ্য খাচ্ছেন; তখন তিনি তাঁর কাজটাকে খাওয়া "আর" খাদ্যের মধ্যে ভাগ করেন না। কিন্তু তিনি যদি এই কাজটারই কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করেন, তা হলে তার প্রথম কাজই হবে ঐরূপ পার্থক্য করা। একদিকে তিনি পুষ্টিকর পদার্থের গুণাবলী পরীক্ষা করবেন, এবং অন্যদিকে সত্তার আত্মসাৎ করা, ও হজম করার ক্রিয়া পরীক্ষা করবেন। অভিজ্ঞতার উপর এ রকমের অনুচিন্তন, আমরা "যা নিয়ে" অভিজ্ঞ হই (অভিজ্ঞাত বিষয়) এবং "যে ভাবে" অভিজ্ঞ হই, তার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। যখন আমরা এই পার্থক্যের নামকরণ করি, তখন তার জন্যে বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতি এই শব্দ দুটি ব্যবহার করি। এক দিকে থাকে জিনিসটি অর্থাৎ যেটিকে দেখি, শুনি, পছন্দ করি, ঘৃণা করি, কল্পনা করি; অন্যদিকে থাকে কাজটি, যেমন দেখা, শোনা, পছন্দ করা, ঘৃণা করা, কল্পনা করা ইত্যাদি।

এ পার্থক্য এতো স্বাভাবিক, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতো গুরুত্ব-পূর্ণ যে, আমরা একে চিন্তনের পার্থক্য বলে না ধরে, অস্তিত্বের একটা পার্থক্য বলে ধরে নিতে আত্যন্তিক প্রবণতা দেখাই। এর পরে, আমরা কোনো আত্ম, এবং পরিবেশ বা জগতের মধ্যে বিভাজন করি। পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তুর দ্বিত্বের মূলে রয়েছে এই বিভাজন। অর্থাৎ, আমরা ধরে নিই যে, জানা, অনুভব করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি বিষয় কোনো নিঃসঙ্গ আত্ম বা "মনের" অধিকারে থাকে, এবং তখন একে কোনো স্বতন্ত্র বিষয়-বস্তুর উপরে খাটানো যায়। আমরা ধরে নিই যে, যে সব জিনিস বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আত্মসত্তার বা মনের অধিকারে থাকে, বিষয়-বস্তুর সক্রিয় শক্তির বিচিত্র ধরন থেকে স্বতন্ত্রভাবেই তাদের ক্রিয়া-প্রণালীর নিজ নিজ বিধি-নিয়ম আছে। মনে করা হয় যে, এই সব বিধি-নিয়মই পদ্ধতি যোগায়। আমরা যদি ধরে নিই যে লোকে খাদ্য ছাড়াই খেতে পারে, কিম্বা, খাদ্যবস্তুর সাথে কাজে

নিযুক্ত থাকার "কারণে" চোয়াল, গলার মাংসপেশী, পাকস্থলীর হজম ক্রিয়া সংক্রান্ত গড়ন ও গতি ইত্যাদির কোনো নিজ সত্তা নেই, তাহলে সে রকম উক্তিও অর্থশূন্য হবে। যে পৃথিবীর মধ্যে খাদ্যবস্তু রয়েছে, কোনো জীবিত সত্তার অঙ্গাবয়ব যেমন সেই পৃথিবীর এক নিরবচ্ছিন্ন অংশ, ঠিক সেইরূপই দৃষ্টি, শ্রুতি, পছন্দ, কল্পনা ইত্যাদির সামর্থ্য পৃথিবীর বিষয়-বস্তুর সাথে অপরিহার্যরূপে যুক্ত। এরা বস্তুর উপরে ফল ফলাবার স্বতন্ত্র ক্রিয়া না হয়ে, পরিবেশ যে পথে অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে কাজ করে, তারই অধিকতর বাস্তব রূপ। অল্প কথায়, অভিজ্ঞতা,—মন ও পৃথিবীর, কর্তা ও কর্মের, পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তুর, কোনো সংমিশ্রণ নয়। পরন্তু তা কেবল কোনো বহুবিচিত্র (আক্ষরিক অর্থে অগণিত) শক্তিপুঞ্জের একমাত্র বিরামহীন পারস্পরিক ক্রিয়া।

অভিজ্ঞতার গতিশীল একত্ব যে ধারায় বা যে দিকে চলে, তা "নিয়ন্ত্রিত" করার উদ্দেশ্যে আমরা "তা কেন ?" এবং "তা কি ?"—এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ করি। যদিও যথার্থ হাঁটা, খাওয়া, বা শেখা ছাড়িয়ে, হাঁটবার, খাবার বা দেখবার "পথ" নেই, তবুও কোনো বিশেষ ক্রিয়ার মধ্যে এমন কয়েকটি উপাদান থাকে, যা ঐ ক্রিয়াকে অধিকতর সফলতার সহিত নিয়ন্ত্রণ করার চাবিকাঠি দেয়। এই সব উপাদানের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিলে তাদের উপলব্ধি আরও স্পষ্ট হয় (অন্যান্য উপাদান সাময়িক ভাবে পিছনে পড়ে যায় এবং দৃষ্টির বাইরে চলে যায়)। অভিজ্ঞতা "কি প্রকারে" অগ্রসর হয়, তার কোনো ধারণা পেলে, অভিজ্ঞতা যাতে অধিকতর কৃতকার্যতার সহিত চলতে পারে সে জন্য কোন্ কোন্ উপাদান সংগ্রহ করতে হবে, বা বদলাতে হবে সে সম্বন্ধে আমরা নির্দেশ পাই। এতে এই কথাটাকেই বিশদ করে বলা হয় যে, একজন লোক যদি এমন কতকগুলো উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধি যত্ন সহকারে লক্ষ্য করতে থাকেন, যার মধ্যে কতকগুলো ভালো বাড়ছে, আর বাকীগুলো তেমন বাড়ছে না, তাহলে, যে সব বিশেষ পারি-পার্শ্বিক অবস্থার উপরে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর করে, তিনি তা বের করতে পারেন। এই শর্তাবলী কোনো সুশৃঙ্খল ক্রমপর্যায় অনুযায়ী বর্ণনা করলে উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির কোনো পদ্ধতি বা উপায় বা ধরন পাওয়া যায়। উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ এবং অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ বিকাশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়

ক্ষেত্রেই ঠিক্ ঠিক্ যে উপাদান সর্বোত্তম প্রগতির পক্ষে অনুকূল, তা ধরা সহজ নয়। পরন্তু সফলতা ও বিফলতার ক্ষেত্রের বিচার-বিশ্লেষণ, এবং সূক্ষ্ম ও ব্যাপক তুলনাই কারণগুলোর আবিষ্কৃতিকে সহজ করে। যখন আমরা এই কারণগুলোকে সুশৃঙ্খল ভাবে সাজাই, তখন আমরা কার্যক্রমের একটা পদ্ধতি বা কৌশল পাই।

পদ্ধতিকে বিষয়-বস্তু থেকে আলাদা করে নেওয়ায় শিক্ষায় যে সব দোষ আসে, তার কয়েকটি বিবেচনা করে দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়।

(১) প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতার মূর্ত পরিস্থিতি অবহেলিত হয় (এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই বলেছি)। মূর্ত ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া, কোনো পদ্ধতির আবিষ্কার হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে, তার পর্যবেক্ষণ থেকেই পদ্ধতি আহৃত হয়, এবং এর পরের বারে যাতে তা আরও ভালো করে ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে তা করা হয়। কিন্তু যা থেকে শিক্ষাবিদগণ পদ্ধতি বা সর্বোত্তম বিকাশের ক্রম সম্বন্ধে কোনো ধারণা পেতে পারেন, শিক্ষা ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে, শিশু ও যুবকদের পক্ষে সে রকমের প্রত্যক্ষ ও স্বাভাবিক অভিজ্ঞতালাভের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা খুব কমই থাকে। এখানে অভিজ্ঞতা এমন এক রকমের বাধ্যতামূলক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আসে যে, তা অভিজ্ঞতা সফল হওয়ার স্বাভাবিক ধারার উপরে কোনো আলোকপাত করে না। এ অবস্থায় শিক্ষকদের কাছে কর্তৃত্বপূর্ণভাবে "পদ্ধতি" পেশ করতে হয়, অথচ শিক্ষকদের নিজেদের বুদ্ধিগত পর্যবেক্ষণের সহজ প্রকাশকেই পদ্ধতি বলে ধরা উচিত। এ অবস্থায় বিভিন্ন পদ্ধতির একটা যান্ত্রিক একরূপতা থাকে, যা নাকি সকল মনের ক্ষেত্রেই এক রকম হবে। যে ক্ষেত্রে নমনীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে এমন কোনো পরিবেশ যোগিয়ে চালু করা হয় যে, সে পরিবেশ কাজের ও খেলাধূলার মধ্যে সাক্ষাৎ ব্যাপৃতি আনতে সমর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে নিরূপিত পদ্ধতিগুলি ব্যক্তি অনুযায়ী বদলাবে। কারণ এ কথা নিশ্চিত যে, কোনো কিছু করতে যাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধরন থাকে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, শৃঙ্খলা ও স্বার্থবোধ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে তার জন্য দায়ী বিষয়-বস্তু থেকে পদ্ধতির আলাদা ধারণাই। যখন বিষয়-বস্তুর কার্যকারী ব্যবস্থাকে বিষয়-বস্তু থেকে বিভিন্ন ও

পূর্বপ্রস্তুত কোনো কিছু বলে ধরে নেওয়া হয়, তখন এদের মধ্যে যে সম্পর্কটা থাকে না বলে ধরে নেওয়া হল, তাকে স্থাপন করার জন্য কেবল তিনটি সম্ভাব্য উপায় থাকে। এর একটি হল, উত্তেজনা, সুখের আবেগ ও রসনা তৃপ্তির সদ্ব্যবহার। আর একটি হল, মন না দেওয়ার পরিণামকে দুঃখদায়ক করা। আমরা অনিষ্টের আতঙ্ক সৃষ্টি করে অসংলগ্ন বিষয়-বস্তুর প্রতি সংশ্লিষ্ট মনোবৃত্তির উদ্রেক করতে পারি। অথবা কোনো কারণ না দেখিয়ে লোকটিকে সরাসরি চেষ্টা নিয়োজিত করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে পারি। আমরা "সঙ্কল্পের" অব্যবহিত চাপের উপর আস্থা রাখতে পারি। কার্যতঃ শেষোক্ত পদ্ধতিটি কেবল তখনই কার্যকারী হয় যখন অশাস্তিজনক ফলাফলের ভয় দেখিয়ে সেটিতে প্ররোচিত করা হয়।

(৩) তৃতীয়তঃ, শিক্ষা করা কাজটাকে তার নিজ গুণেই কোনো একটা প্রত্যক্ষ ও সচেতন উদ্দেশ্য বানানো হয়। স্বাভাবিক অবস্থায়, বিদ্যালাভ কোনো বিষয়-বস্তুর সাথে নিযুক্ত থাকারই ফল ও পুরস্কার। শিশু জ্ঞাতসারে হাঁটা বা কথা বলা শুরু করে না, শুরু করে অন্যান্যের সঙ্গে কথোপকথন ও অধিকতর আদান-প্রদানের আবেগ প্রদর্শন করা থেকে। সে তার প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপের ফলে শিক্ষালাভ করে। কোনো শিশুকে শেখানোর সুন্দরতর পদ্ধতি, যেমন পড়তে শেখানো, একই পথ অনুসরণ করে। যাঁরা শেখান, তাঁরা শিশুর যে কিছু শিখতে হবে, এই ভেবে সেটির প্রতি শিশুর মনোযোগ নিবিষ্ট করেন না, এবং এই ভাবে তাঁর মনোভাব আত্মসচেতন ও বাধ্যতা-মূলক করান না। তাঁরা তাঁর ক্রিয়াকলাপকে কাজে নিযুক্ত করেন, এবং কাজে নিযুক্ত থাকার ফলেই শিশু শেখে। সংখ্যা বা অন্য কিছু নিয়ে কাজ করার অধিকতর ফলপ্রসূ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এই কথাই সত্য। কিন্তু যখন আবেগ ও অভ্যাসকে তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফলের দিকে এগিয়ে দেবার জন্য বিষয়-বস্তু ব্যবহৃত হয় না, তখন তা কেবল শিখতে হবে, এমন একটা কিছু হ'য়ে দাঁড়ায়। তার উপরে শিক্ষার্থীরও এই মনোভাব থাকে যে, তাঁকে তা শিখতে হবে। সতর্ক ও নিবিড় সাড়া যোগাবার পক্ষে এর থেকে বেশী প্রতিকূল কোনো অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। যুদ্ধ অপেক্ষা বিদ্যালাভে সম্মুখ আক্রমণ অধিকতর অপচয়কর। তার অর্থ এ নয় যে, শিক্ষার্থীদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠে নিযুক্ত করতে হবে।

তার অর্থ এই যে, বাস্তব কারণে এবং বাস্তব উদ্দেশ্যেই তাঁদের নিযুক্ত করতে হবে, কেবল কিছু শিখতে হবে বলে নয়। কোনো অভিজ্ঞতা পূরণের ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তুর কি স্থান তা যখন শিক্ষার্থী উপলব্ধি করে, তখনই ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

(৪) চতুর্থতঃ, মন ও বিষয়বস্তুর বিচ্ছেদ সম্বলিত ধারণার প্রভাবে পদ্ধতি কোনো একটা কাটা-ছেড়া রুটিনে পরিণত হবার উপক্রম হয়,—অনুসরণ করে কোনো একটা যান্ত্রিকরূপে ব্যবস্থিত কার্যক্রমের। কেউ বলতে পারেন না যে, কতো স্কুল কক্ষে তথাকথিত পদ্ধতির অনুমোদন অনুসারে, গণিত ও ব্যাকরণ আবৃত্তি করার সময়ে ছেলেমেয়েদের কতগুলো পূর্বপ্রস্তুত মৌখিক সঙ্কেতের মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। আলোচ্য প্রসঙ্গকে সরাসরি আক্রমণ করতে উৎসাহিত করার পরিবর্তে, ধরে নেওয়া হয় যে, সঠিক পদ্ধতি একটাই আছে এবং সেটারই অনুসরণ করতে হবে। সাদাসিধে লোকের মতো এটাও ধরে নেওয়া হয় যে, যদি শিক্ষার্থীরা তাদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কোনো নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের ধাঁচে করে, তা হলে কালক্রমে তাঁদের মানসিক অভ্যাসও অনুরূপ হবে। যে ভাবে পড়াতে হবে, সে সম্বন্ধে শিক্ষকদের কাছে ব্যবস্থাপত্র ও নক্শা বিলি করার সাথে শিক্ষণ-তত্ত্ব একাত্ম,—এই বিশ্বাস শিক্ষণ-তত্ত্বের যতো অখ্যাতি এনেছে, আর কিছুতে ততো অখ্যাতি আনেনি। নমনীয়তা ও উদ্যোগ সহকারে পর্যালোচনা করা সেই জাতীয় কোনো ধারণারই বৈশিষ্ট্য, যে ধারণা অনুযায়ী পদ্ধতি কোনো সমাপ্য বিকাশের জন্য বিষয়-বস্তুর সুব্যবস্থা করার একটা উপায় হয়ে ওঠে। যা মনকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কর্মতৎপরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, যান্ত্রিক অনমনীয় কঠোরতা সেই জাতীয় কোনো তত্ত্বেরই অপরিহার্য অনুসিদ্ধান্ত।

২। পদ্ধতির সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত রূপ

সংক্ষেপে বলা যায় যে, শিক্ষণ-পদ্ধতি কোনো কলাবিদ্যার পদ্ধতি,—উদ্দেশ্য দ্বারা বুদ্ধিগম্যরূপে নির্দেশিত কর্ম। কিন্তু কোনো চারুকলার বৃত্তিও কেবল প্রস্তুতিহীন অনুপ্রেরণার বিষয় নয়। অতীতে যারা বিশেষ কৃতি হয়েছেন তাদের ক্রিয়াপ্রণালী ও তার ফলাফল পর্যালোচনা করা অপরিহার্য।

সর্বকালেই কোনো ঐতিহ্য বা কোনো কলাপীঠ বিদ্যমান থাকে। এটি প্রথমে নতুন ছাত্রদের প্রভাবিত এবং অনেক সময়েই বিমোহিত করার পক্ষে পর্যাপ্ত-রূপে সুনির্ধারিত থাকে। কলার প্রতিটি শাখাতেই, কলাকারদের পদ্ধতি বিবিধ সামগ্রী ও সাধকের সঙ্গে নিবিড় পরিচিতির উপরে নির্ভর করে। চিত্রকরকে ক্যান্‌ভাস্‌, রং, বুরুশ এবং তার সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োগ-কৌশল জানতে হবে। এই জ্ঞান লাভ করার জন্য বিষয়মুখী সামগ্রীর প্রতি তাঁর অব্যাহত ও নিবিড় মনোযোগ থাকা প্রয়োজন। কি সফল হল, কি বিফল হল তা দেখার জন্য কলাকারকে তাঁর নিজের প্রচেষ্টার অগ্রগতি বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। একদিকে পূর্বপ্রস্তুত বিধি-নিয়ম অনুসরণ করা, অন্যদিকে স্বভাবসুলভ গুণের প্রতি আস্থা রাখা ; একদিকে সাময়িক অনুপ্রেরণা, অন্যদিকে অনির্দেশিত কঠিন পরিশ্রম,—এরূপ বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো গতি নেই বলে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তা প্রতিটি কলার কার্যক্রম দিয়ে খণ্ডিত হয়।

যা-কিছুকেই সাধারণ পদ্ধতি বলে বলা যায়, অতীতের জ্ঞান, সামগ্রীর চলিত প্রয়োগ-কৌশল, সর্বোত্তম ফল পাবার উপায় ইত্যাদি তার উপাদান যোগায়। ফল পাবার জন্য কতকগুলি মোটামুটিভাবে স্থায়ী পদ্ধতি ক্রম-পুঞ্জিত হয়ে গচ্ছিত থাকে। এগুলি অতীত অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ দ্বারা অনুমোদিত। ব্যক্তির পক্ষে এগুলি উপেক্ষা করা বিপজ্জনক। অভ্যাস-গঠন সংক্রান্ত আলোচনা কালে যেমন বলা হয়েছে, (পূর্বে দেখুন ৬৪ পৃঃ) সর্বদাই এই বিপদ থাকে যে, এই সমস্ত পদ্ধতি যন্ত্রবৎ ও অনমনীয় হয়ে পড়বে, এবং ব্যক্তির উদ্দেশ্য সাধনার্থে তাঁর ক্ষমতার অধীনে থাকার পরিবর্তে তার উপরেই সেটা কর্তৃত্ব করবে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, যে প্রবর্তনকারী স্থায়ী কোনো-কিছু প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিও প্রাচীন মনীষাকে কাজে খাটান ; তাঁর কাছে বা তাঁর সমালোচকদের কাছে তার যতোটা প্রকাশ পায় তার থেকে তিনি বেশী করেই সেটাকে খাটান। তিনি তাকে নতুন ভাবে ব্যবহার করেন, এবং এই ভাবে তার রূপান্তর ঘটান।

শিক্ষারও একটা নিজস্ব সাধারণ পদ্ধতি আছে ; এ মন্তব্যের প্রয়োগ যদিও শিক্ষকের ক্ষেত্রেই বেশী স্পষ্ট করে দেখা যায়, তথাপি শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও কথাটা সমান ভাবে খাটে। অনুরূপ জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে অপরের অভিজ্ঞতা যে পদ্ধতিকে সর্বাধিক কার্যকারী বলে প্রমাণ করেছে, সেই সব

পদ্ধতির অধিকারী হওয়াই তাঁর শিক্ষালাভের এক অংশ এবং সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[১] এই সাধারণ পদ্ধতিগুলি কোন ক্রমেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মৌলিকতার ব্যক্তিগত পন্থায় কাজ করার বিরোধী নয়। বিপরীতপক্ষে, তারা ঐ কাজেই শক্তি যোগায়; কারণ, এমন কি, কোনো ব্যাপকতম সাধারণ পদ্ধতির সঙ্গেও ব্যবস্থিত নিয়মের আমূল পার্থক্য থাকে। শেষোক্ত নিয়ম কাজের প্রত্যক্ষ নির্দেশক; প্রথমোক্ত পদ্ধতি উপায় ও উদ্দেশ্যের প্রতি আলোকপাতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করে—অর্থাৎ, ক্রিয়া করে বুদ্ধির মাধ্যমে, বার থেকে চাপানো হুকুমের সাথে তাল রেখে নয়। এমন কি, কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত কৌশলকে ওস্তাদের মতো খাটানোর যোগ্যতাও কোনো শিল্পী-সুলভ কাজের নির্ভর-পত্র যোগায় না, কারণ শেষোক্ত কাজটি প্রাণ-সঞ্চারক ধারণার উপরেও নির্ভর করে।

অন্যদের-খাটানো পদ্ধতির জ্ঞান যদি যা করতে হবে তা না বলে দেয়, কিম্বা তৈরী আদর্শও না যোগায়, তা হলে সে জ্ঞান কি ভাবে ক্রিয়া করে? কোনো পদ্ধতিকে বুদ্ধিগম্য বলার অর্থ কি? একজন চিকিৎসকের কথা ধরুন। আর কোনো বৃত্তিই, তাঁর নিজস্ব বৃত্তি থেকে বেশী করে "কারণ নির্ণয় ও ব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির জ্ঞান" দাবী করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রোগ কিন্তু "এক ধরনের" বা অবিকল এক হয় না। চলিত প্রথাকে বুদ্ধি খাটিয়ে প্রয়োগ করতে হলে তাকে বিশেষ ক্ষেত্রটির জরুরী অবস্থার উপযোগী করে নিতে হবে, তা সে প্রথার পিছনে যতো সম্মতিই থাক না কেন। কাজেই চিকিৎসক নিজে যে সব জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং ব্যবস্থার "চেষ্টা করবে" স্বীকৃত কার্য-বিধি তারই ইঙ্গিত দেয়। চলিত প্রথা হ'ল সেই সব দৃষ্টিকোণ যা নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে হবে। যা বিশেষ করে দেখতে হবে, চলিত প্রথা তারই ইঙ্গিত করে, এবং এই ভাবেই সেটা বিশেষ ক্ষেত্রের গুণাবলীর নিরীক্ষাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে। চিকিৎসক যে পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট, তার সুরাহার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত ভঙ্গিকে, নিজস্ব পন্থাকে (ব্যষ্টিগত পদ্ধতি), কার্যবিধির সাধারণ নিয়মের নিম্নস্তরে রাখা হয় না, বরং তা সাধারণ নিয়ম দিয়ে সুগম ও সুনির্দেশিত হয়। অতীতে যে

১। মনস্তাত্ত্বিক ও যুক্তিতাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে পরে এই বিবরটি বিশদ করা হয়েছে।

সব মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি ও ব্যবহারিক কৌশল কার্যোপযোগী বলে স্বীকৃত হয়েছে, এই দৃষ্টান্তটি শিক্ষকের কাছে সেগুলির জ্ঞান থাকার মূল্য দেখিয়ে দেয়। যখন এ সব পদ্ধতি তাঁর সাধারণ বুদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাঁর এবং তাঁর কাজের পরিস্থিতির মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ায় তখন এরা অকাজেরও অধম। কিন্তু যে অনন্য অভিজ্ঞতা লাভে তিনি নিযুক্ত, তার প্রয়োজন, সঙ্গতি ও কাঠিন্যের সুরাহার জন্য বুদ্ধিগম্য সহায়করূপে যদি তিনি ঐ জ্ঞান আয়ত্ত করে থাকেন, তা হ'লে তার গঠনমূলক মূল্য থাকে। শেষ পর্যন্ত, যেহেতু "সব কিছুই" নির্ভর করে তাঁর সাড়ার পদ্ধতির উপরে, সেই হেতু তার নিজের সাড়ার মধ্যে অতীতে অপরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের যতোটা তিনি খাটাতে পারেন ততোটাই সেটি কাজে লাগে। বস্তুতঃ, তার উপরেই অনেক কিছু নির্ভর করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই বর্ণনার প্রতিটি শব্দ শিক্ষার্থীর পদ্ধতির অর্থাৎ যে ভাবে শিক্ষালাভ করা হয় তার প্রতিও সরাসরি প্রযোজ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই হোক, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই হোক, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, পাঠ্যবিষয়কে আয়ত্ত করা ও তাকে বিশদ করার জন্য ছাত্রদের কাছে আদর্শ পদ্ধতি যোগানো যায়, তা হলে এমন আত্মপ্রতারণার মধ্যে পড়তে হবে যে, তার পরিণাম দাঁড়াবে শোচনীয় (পূর্বে দেখুন, ২২১পৃঃ)। যে কোনো ক্ষেত্রেই, একজনকে তার নিজের প্রতিক্রিয়া করতেই হবে। অন্যান্যে, বিশেষ করে যারা সিদ্ধহস্ত হয়েছেন, তাঁরা অনুরূপ ক্ষেত্রে, যে নির্দিষ্ট বিধি বা আদর্শ বা সাধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন, তার নির্দেশ সেই পরিমাণেই হিতকর বা অহিতকর হয়, যে পরিমাণে তা একজনের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে অধিকতর বুদ্ধিগম্য করে, বা তাঁর নিজের বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ বাতিল করে দিতে প্ররোচিত করে।

চিন্তনের মৌলিকতা সম্বন্ধে পূর্বে যা বলা হয়েছে (২০৯পৃঃ) তা যদি পীড়াদায়ক বলে মনে হয়, অর্থাৎ যা মানুষের সাধ্যাতীত শিক্ষার দাবী করে, —তাহলে বলতে হয় যে, আসল বাধা হ'ল, আমরা কোনো কুসংস্কারে ভূতাবিষ্ট হয়েছি। আমরা মন সম্বন্ধে একটা সর্বাত্মক ধারণা খাড়া করেছি এবং বুদ্ধিগম্য পদ্ধতিকে সকলের পক্ষেই এক বলে ধরে নিই। এর পরে বিভিন্ন লোককে মনের দিক থেকে পরিমাণগত পার্থক্য দিয়ে বিচার করি।

কারণ বিভিন্ন লোকের মধ্যে সে পার্থক্য থাকেই। তা যদি হয় তাহলে সাধারণ লোকেরা সাধারণ হবে বলেই আশা করা যায়। আর ধরে নেওয়া হয় যে, কেবল অসাধারণ লোকদেরই মৌলিকতা থাকে। মৌলিকতার যে পরিমাণে অভাব থাকে, একজন সাধারণ ছাত্র, একজন প্রতিভাবান ছাত্র থেকে সেই পরিমাণে অন্যরূপ হয়। কিন্তু মন সম্বন্ধে এ রকম সর্বাত্মক ধারণা অলীক। একজন লোকের সক্ষমতার পরিমাণের তুলনায় আর একজন লোকের সক্ষমতা কতোখানি, তা দিয়ে শিক্ষকের কোনো প্রয়োজন নেই। তা তাঁর কাজের প্রসঙ্গে অবান্তর। তাঁর যা প্রয়োজন তা এই যে, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অর্থ হয়, প্রতিটি লোক যেন তাঁর নিজের ক্ষমতাকে সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই খাটাবার সুযোগ-সুবিধা পায়। মন, ব্যক্তিগত পদ্ধতি ও মৌলিকতা (এরা পরিবর্তনযোগ্য শব্দ) উদ্দেশ্যমূলক বা নির্দেশিত কার্যের "গুণ" সূচিত করে। আমরা যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কাজ করি তা হ'লে এমন কি চলিত মানদণ্ডেও আমরা এখনকার চেয়ে বেশী মৌলিকতার বিকাশ সাধন করতে পারব। প্রত্যেকের উপরে তথাকথিত কোনো একই রকমের সাধারণ পদ্ধতি চাপিয়ে দিলে তা খুব অসাধারণ ক্ষেত্র ছাড়া সকলকেই মাঝারি করে তুলবে। এবং সাধারণ থেকে মৌলিকতা কতোটা ব্যতিক্রান্ত, তা দিয়ে মৌলিকতার মাপ নিলে সেখানে দেখা দেবে উৎকেন্দ্রিকতা। এইভাবে আমরা অধিকাংশ লোকের বৈশিষ্ট্যমূলক গুণের শ্বাসরোধ করি এবং কেবল বিরল দৃষ্টান্ত ছাড়া (যেমন ডারউয়িনের ক্ষেত্রে) বিরল প্রতিভাকে কোনো অহিতকর গুণ দিয়ে সংক্রমিত করি।

৩। ব্যষ্টিগত পদ্ধতির প্রলক্ষণ

চিন্তনের অধ্যায়ে জ্ঞানলাভ পদ্ধতির সবচেয়ে দরকারী সাধারণ লক্ষণগুলি দেওয়া হয়েছে। এগুলি হ'ল অনুচিন্তনশীল পরিস্থিতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য : সমস্যা, তথ্যাবলী যোগাড় ও বিশ্লেষণ, ইঙ্গিত ও ধারণাবলীর অভিক্ষেপণ ও পরিবর্ধন, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রয়োগ ও যাচাই ; তৎপ্রসূত সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা। শেষ পর্যন্ত, কোনো সমস্যার উপর কোনো ব্যক্তির পদ্ধতি বা বোঝবার ধরনের নির্দিষ্ট উপাদানগুলি দেখা যাবে তার স্বাভাবিক প্রবণতা

ও অর্জিত অভ্যাস ও স্বার্থবোধের মধ্যে। একজনের মৌলিক সহজ সামর্থ্য, তাঁর অতীত অভিজ্ঞতা এবং পছন্দ, আর একজনের থেকে যে ভাবে অন্যরূপ হবে, তাঁর পদ্ধতিও সেই ভাবে অন্যরূপ হবে। যাঁরা এ সব বিষয় নিয়ে পুর্বেই গবেষণা করেছেন, তাঁদের কাছে এমন খবর আছে, যা দিয়ে শিক্ষকেরা বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সাড়া বুঝতে সক্ষম হন, এবং এই সব সাড়াকে অধিকতর কর্মকুশলতায় পরিচালিত করতে পারেন। শিক্ষক যে সব ব্যক্তি-গত পরিচিতি লাভ করেন, শিশু-পর্যবেক্ষণ, মনোবিজ্ঞান, এবং সামাজিক পরিবেশের জ্ঞান তার অনুপূরণ করে। কিন্তু পদ্ধতিগুলি যাঁর যাঁর ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতা, অনুক্রমণ ও আক্রমণের ধরন অনুযায়ীই হয়ে থাকে, এবং কোনো তালিকাই তার রূপ ও রং-এর বিচিত্রতা শেষ করতে পারে না।

তবুও এমন কয়েকটি মনোভাবের নাম করা যেতে পারে যা বিষয়-বস্তুর সঙ্গে কার্যকরী ও বুদ্ধিগম্যরূপে যোঝবার বিভিন্ন উপায়ের কেন্দ্রীয় বিষয় হতে পারে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে—দ্ব্যর্থহীনতা, বিমুক্ত-চিত্ততা, একাগ্রচিত্ততা (বা সর্বান্তকরণতা), এবং দায়িত্বশীলতা।

(১) দ্ব্যর্থহীনতার অর্থ কি তা হা-বাচক বাক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেয়ে না-বাচক বাক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা সহজতর। আত্ম-সচেতনতা, কুণ্ঠা ও বাধা-নিষেধ হ'ল এর ভয়ঙ্কর শত্রু। এরা দেখায় যে, ব্যক্তি তাঁর বিষয়-বস্তুর সাথে অব্যবহিত ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। মাঝখানে এমন কিছু এসেছে যা গৌণ ফলের দিকে সংশ্লিষ্টতাকে বাঁকা পথে চালিয়ে দিতে চায়। কোনো আত্ম-সচেতন লোক আংশিকভাবে অন্যে তার কাজ সম্বন্ধে কি ভাবছে তাই নিয়ে ভাবে। শক্তি ভিন্ন পথে পরিচালিত হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় ক্ষমতার হ্রাস ও ধারণার বিভ্রান্তি। কোনো মনোভাবকে অবলম্বন করা আর সেই মনোভাবের প্রতি সচেতন থাকা কোনো ক্রমেই এক কথা নয়। প্রথম অবস্থা স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক ও সরল। এ অবস্থা, ব্যক্তি এবং তিনি যা করেছন তার মধ্যে সর্বাত্মক সম্বন্ধ থাকার নিদর্শন। পরবর্তী অবস্থাও যে অস্বাভাবিক হতেই হবে তা নয়। তা সময়ে সময়ে ভ্রান্ত অনুক্রমণ পদ্ধতির শুদ্ধি এবং যে উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে তার কার্যকারীতার উন্নতি বিধানকল্পে সহজতম পথ; যেমন, গলফ্ খেলোয়াড়দের, পিয়ানো বাদকদের, ও গণ বক্তাদের কোনো কোনো সময়ে তাদের নিজ নিজ অবস্থান-স্থল ও

নড়ন-চড়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। কিন্তু এ প্রয়োজন "হল" সাময়িক ও অস্থায়ী। এ দিকটা ঠিকমত থাকলে, যা করতে হবে তার সম্পর্কেই লোকে নিজের কথা ভাবে, ভাবে নিজেকে উদ্দেশ্য সাধনের বিবিধ উপায়ের একটি উপায়রূপে,—কোনো টেনিস্ খেলোয়াড় যেমন মারের "অনু-ভূতি" পাবার জন্য প্রাক্‌টিস করে। অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তি নিজেকে কার্যনির্বাহী সজ্ঘটকদের অংশরূপে ভাবে না, পরন্তু একটি পৃথক বিষয় বলে মনে করে—যেমন একজন খেলোয়াড় দর্শক মণ্ডলীর উপর কি প্রতিক্রিয়া হবে তাই ভেবে কোনো ভাবমূর্তি ধারণ করে ; কিম্বা তাঁর নড়ন-চড়ন কি ধারণা জন্মাবে তাই ভেবে আকুল হয়। দ্ব্যর্থহীনতা শব্দ দিয়ে যা বলতে চাওয়া হচ্ছে, তার একটা ভালো নাম হল দৃঢ়-প্রত্যয়। একে আত্ম-প্রত্যয় শব্দের সাথে মিশিয়ে ফেলা ঠিক হবে না, কারণ আত্ম-প্রত্যয় এক রকমের আত্ম-সচেতনতা, বা "ধৃষ্টতাও" হতে পারে। ব্যক্তি তাঁর মনো-ভাব সম্বন্ধে যা ভাবে বা, বোধ করে, তা দৃঢ়-প্রত্যয় নয় ; দৃঢ়-প্রত্যয় প্রতিবর্তী ক্রিয়া নয়। ব্যক্তিকে যা কিছু করতে হবে, যে অকপটতা সহকারে ব্যক্তিকে সেটির দিকে ধাবিত হতে হবে, দৃঢ়-প্রত্যয় তাই নির্দেশ করে। শব্দটি ব্যক্তির নিজের ক্ষমতার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সংজ্ঞাত প্রত্যয় নির্দেশ করে না,—নির্দেশ করে পরিস্থিতির সম্ভবনাদির প্রতি অজ্ঞাত প্রত্যয়। শব্দটি পরিস্থিতির প্রয়োজনগুলির সমকক্ষতা সূচিত করে।

শিক্ষার্থীরা যে লেখাপড়া করছে, বা শিক্ষালাভ করছে, তা তাদের জোর করে জানানো যে আপত্তিজনক সে কথা আমরা এর আগেই বলেছি, (দেখুন পৃষ্ঠা, ২২২)। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে তারা যে মাত্রায় এ বিষয়ে জ্ঞাত হয়, ঠিক সেই মাত্রাতেই তারা পড়ছেও "না", শিখছেও "না"। তারা একটা দ্বিধাগ্রস্ত ও জটিল মন নিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর যা করতে হবে তার থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে, শিক্ষার্থীর কাজের প্রতি শিক্ষকের কি মনোভাব হবে, তাতে যখন মনকে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন যে-কোনো পদ্ধতিই সংশ্লিষ্টতা ও কাজের দ্ব্যর্থহীনতাকে ব্যাহত করে। এই অবস্থা চলতে থাকলে, শিক্ষার্থীর অসহায়ভাবে হাতড়ানো, লক্ষ্যশূন্য হয়ে এদিক ওদিক তাকানো এবং বিষয়-বস্তু যা উপস্থিত করে, তার বাইরে সঙ্কেত খোঁজ করার একটা ঝোঁক বরাবরের জন্য সৃষ্টি হয়। বাইরে থেকে ইঙ্গিত ও নির্দেশ পাওয়ার

ভরসা, এবং এক কুয়াশাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত অবস্থা, সেই নিশ্চয়তার স্থান নেয় যা নিয়ে শিশুরা (এবং যারা "শিক্ষা" দ্বারা কৃত্রিম হয়নি তারা) জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিগুলোর মুখোমুখী হয়।

২। বিমুক্ত-চিত্ততা

আমরা দেখেছি যে, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থবোধ থাকার আনুষঙ্গিক গুণ। কারণ এর অর্থ হ'ল ভাগ নেওয়া, অংশ গ্রহণ করা, এবং কোনো আন্দোলনে পক্ষ নেওয়া। এ জন্য এমন একটি মনোভাব থাকার আরও বেশী প্রয়োজন, যা, সব দিক থেকেই বিভিন্ন ইঙ্গিত ও উপযুক্ত সংবাদকে সক্রিয়ভাবে স্বাগত জানাবে। উদ্দেশ্যের অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, অগ্রদৃষ্ট উদ্দেশ্যাবলী কোনো পরিবর্তনশীল অবস্থার উপকরণ। এগুলি হ'ল সেই সব মাধ্যম যার দ্বারা কাজের গতি নিয়ন্ত্রিত থাকে। এরা পরিস্থিতির অধীন, কাজেই পরিস্থিতি এদের অধীন নয়। এরা সেই চূড়ান্ত অর্থে উদ্দেশ্য নয়, যার দিকে সব কিছুকেই বাঁকাতে হবে এবং উৎসর্গ করতে হবে। যে যে রূপ নিয়ে এরা পূর্বদৃষ্ট হয়, তাতে এরা কোনো পরিস্থিতিকে বিকাশের পথে পরিচালিত করার "মাধ্যম" হয়ে ওঠে। কোনো নিশানা, গুলি ছোড়ার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নয়; নিশানা হ'ল, বর্তমান গুলি ছোড়াকে কেন্দ্রীভূত করার একটা সুনির্দিষ্ট উপকরণ। মনের বিমুক্ততার অর্থ হ'ল, যে পরিস্থিতিটি পরিষ্কার করতে হবে, তার উপরে আলোকপাত করতে পারে, এবং এভাবে বা ওভাবে কাজ করার পরিণাম নিরূপণের সহায়ক হতে পারে, এ রকমের যে কোনো একটি বা প্রতিটি বিবেচনার প্রতি মনের প্রবেশ-পথকে সুগম রাখা। অপরিবর্তনীয় বলে ধার্য হয়েছে, এ রকমের উদ্দেশ্য সাধনে কর্মকুশলতা, এবং সঙ্কীর্ণরূপে বিমুক্ত মন, সহাবস্থান করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিগম্য ক্রমবিকাশের অর্থ হ'ল, দিগন্তের অবিরাম সম্প্রসারণ, এবং এর ফলস্বরূপ নতুন উদ্দেশ্য ও নতুন সাড়া গঠন। যে সমস্ত দৃষ্টিকোণ এ পর্যন্ত পরকীয় ছিল, তাদের স্বাগত জানাবার সক্রিয় প্রবণতা ছাড়া, যে সমস্ত বিচার-বিবেচনা বর্তমান উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন করে তাকে আমল দেওয়ার সক্রিয় ইচ্ছা ছাড়া, এই ফল ঘটানো অসম্ভব। ক্রমবিকাশের সামর্থ্য বজায় রাখা ঐ বুদ্ধিগত আতিথেয়তার পুরস্কার। মনের একগুঁয়েমি

ও পক্ষপাতদুষ্টতার নিকৃষ্টতম ফল এই যে, এরা বিকাশের পরিপন্থী, এরা নতুন উদ্দীপকের প্রতি মনের দুয়ার রুদ্ধ রাখে। বিমুক্ত-চিত্ততা শিশুসুলভ মনোভাব বজায় রাখে; নিরুদ্ধ-চিত্ততার অর্থ দাঁড়ায় বুদ্ধির অকাল বার্ধক্য।

কার্যক্রমের একরূপতা এবং অবিলম্বে বাহ্যিক ফল পাওয়ার অত্যধিক আকাঙ্ক্ষাই স্কুলে বিমুক্ত-চিত্ত মনোভাবের প্রধান শত্রু। যে শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে যুঝতে বিচিত্র কর্মধারার অনুপ্রবেশ ও সুযোগকে ব্যাহত করেন, তিনি শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির উপরে পরদা টেনে দেন, এবং এইভাবে শিক্ষকের মন যে পথ অনুমোদন করে, কেবল সেই পথের প্রতিই শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আটকে রাখেন। সম্ভবতঃ পদ্ধতির অনমনীয়তার প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার প্রধান কারণ এই যে, এতে দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে পরিমাপনসাধ্য শুদ্ধ ফল পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। "উত্তর" পাওয়ার উদ্যমই, অনমনীয় ও যান্ত্রিক পদ্ধতির উদ্যমকে বহুলাংশে ব্যাখ্যা করে। জোরাজুরি করা এবং অতিরিক্ত চাপ দেওয়ার মূলেও এই কারণ থাকে, এবং সতর্ক বুদ্ধিগত স্বার্থের উপরে তার ফলও এই হয়।

বিমুক্ত-চিত্ততা এবং রিক্ত-চিত্ততা এক জিনিস নয়। "সরাসরি ভিতরে চলে আসুন, বাড়ীতে কেউ নেই"—এই রকমের কোনো সঙ্কেত ঝুলিয়ে রাখা আতিথেয়তার সমার্থক নয়। কিন্তু এক জাতীয় ক্রিয়াহীনতা আছে যা বিকাশলাভের সারাংশ। তা হ'ল অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত হতে দেওয়া, স্থির হতে দেওয়া, সুপক্ব হতে দেওয়া। ফলাফলকে (বাহ্যিক উত্তর ও মীমাংসা) ত্বরান্বিত করা যেতে পারে; কিন্তু কর্ম-প্রণালীকে জোর করে চাপানো ঠিক নয়। এরা পরিণতির জন্য নিজ নিজ সময় নেয়। যদি সকল শিক্ষক এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন যে, বিশুদ্ধ উত্তর প্রস্তুত করা নয়, মানসিক ক্রিয়া-প্রণালীর গুণই শিক্ষাসঞ্জাত ক্রমবিকাশের পরিমাপ, তা হলে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হতো।

৩। একাগ্রচিত্ততা

"দ্ব্যর্থহীনতা" প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, এই শব্দেও তার অনেক কথাই খাটে। কিন্তু এখানে এই শব্দটির অভিপ্রেত অর্থ হ'ল, স্বার্থবোধের "সম্পূর্ণতা"

—উদ্দেশ্যের একত্ব ; যে সব অবদমিত, অথচ ক্রিয়ারত অপ্রকাশ্য উদ্দেশ্যের স্থানে স্বীকৃত লক্ষ্য কেবল একটা মুখোশ বিশেষ, সেই সব উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি। এই একত্ব মানসিক অখণ্ডতার তুল্য। নিমগ্ন হওয়া, সমাহিত হওয়া, বিষয়-বস্তুর নিজগুণেই তার সাথে পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়া এই একত্বের পুষ্টি সাধন করে। পক্ষান্তরে খণ্ডিত স্বার্থবোধ এবং এড়িয়ে যাওয়া এই একত্বকে ধ্বংস করে।

বুদ্ধিগত অখণ্ডতা, সততা ও অকৃত্রিমতা, গোড়ায় সচেতন উদ্দেশ্যের বিষয় নয়, পরন্তু সেগুলি সক্রিয় সাড়ার গুণ। অবশ্য সচেতন অভিপ্রায়ই এ সব গুণকে আয়ত্ত করতে উৎসাহিত করে, কিন্তু আত্ম-প্রতারণা খুবই সহজ। বাসনা জরুরী। যখন অপরের দাবী ও ইচ্ছা বাসনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে, তখন তা সহজেই অবচেতনে ও গভীরে বিতাড়িত হয়। অপরের দাবী অনুযায়ী কোনো কর্মধারাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করা, এবং তাতে আত্মসমর্পণ করা প্রায় অসম্ভব। এর ফলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বা অপরকে ঠকানোর একটা সুচিন্তিত প্রয়াস দেখা দিতে পারে। কিন্তু সচরাচর এর যা ফল হয়, তা হ'ল কোনো বিভ্রান্ত ও খণ্ডিত স্বার্থের মধ্যে নিজের আসল অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তির বিমূঢ় থাকা। ব্যক্তি একই সঙ্গে দু'টি মনিবের সেবা করতে চেষ্টা করে। সামাজিক সহজপ্রবৃত্তি, অন্য সকলকে তুষ্ট করার ও তাঁদের অনুমোদন লাভ করার প্রবল বাসনা, সামাজিক শিক্ষা, কর্তব্য ও কর্তৃত্বের সাধারণ বোধবুদ্ধি, শাস্তির আশঙ্কা, —এর সব কিছুই, "পাঠে মনোযোগ দেওয়ার" বা, আর যা কিছুর প্রয়োজন, তার সাথে তাল রাখার উদ্যমহীন প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয়। তাঁদের কাছ থেকে যা আশা করা যায়, শান্ত ছেলেরা তাই করতে চায়। শিক্ষার্থী সংজ্ঞাতভাবে মনে করে যে, সে এটাই করছে। কিন্তু তার নিজের বাসনাগুলো লোপ পায় না। সেগুলোর প্রকাশ অবদমিত থাকে মাত্র। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনোযোগের টানাটানি তিক্তকর; "সচেতন ইচ্ছা" সত্ত্বেও গভীরের বাসনা, —চিন্তার মুখ্য ধারা, গভীরতর প্রক্ষোভমূলক সাড়া ইত্যাদি ধার্য করে। মন, নাম দেওয়া বিষয়-বস্তু ছেড়ে ঘুরে বেড়ায়, এবং যা অপরিহার্যরূপে অধিকতর কাম্য তাতে নিবিষ্ট থাকে। এর ফল দাঁড়ায় একটা ব্যবস্থিত খণ্ডিত মনোযোগ এবং এর মধ্যেই বাসনার কপট অবস্থা প্রকাশ পায়।

যদি কেউ তাঁর স্কুলের বা বর্তমান সময়ের সেই সব অভিজ্ঞতা স্মরণে আনেন, যেখানে আপাত দৃষ্টিতে তিনি কাজে নিযুক্ত হলেও তার সাথে তাঁর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য যুক্ত হয়নি, তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে এই খণ্ডিত মনোযোগ,—দোমনা ভাব,—কতো ব্যাপক। আমরা এতে এতো অভ্যস্ত হই যে, আমরা স্বীকার করেই নিই যে, এটা কিছু পরিমাণে থাকা অবশ্যম্ভাবী। তা হতে পারে; কিন্তু যদি তাই হয়, তা হলে বুদ্ধির দিক দিয়ে এর যে কু-ফল হয়, তার সম্মুখীন হওয়া আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি যখন কোনো বিষয় নিয়ে সংজ্ঞাতভাবে চেষ্টা করছেন (বা "চেষ্টা করছেন" দেখাবার জন্য চেষ্টা করছেন) এবং তাঁর কল্পনা-শক্তি তাঁর অজ্ঞাতসারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধিকতর রুচিপূর্ণ ব্যাপারে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তখন চিন্তনের অব্যবহিতরূপে প্রাপ্তব্য শক্তির যে অপচয় হচ্ছে, তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে সঙ্গে যে সব অভ্যাসগত আত্ম-প্রতারণা এবং বাস্তবতা সম্বন্ধে বিভ্রান্ত বুদ্ধি লালিত হয়, তা বুদ্ধিগম্য ক্রিয়াশীলতার কৃতিত্বের দিক দিয়ে অধিকতর ধূর্ত, এবং অধিকতর স্থায়ীভাবে পঙ্গুকারী। বাস্তবতার দ্বৈতমান,—একটি ব্যক্তিগত, কম-বেশী লুকান স্বার্থের জন্য, আর একটি সর্বসাধারণের এবং স্বীকৃত স্বার্থের জন্য,—আমাদের অধিকাংশেরই মানসিক ক্রিয়ার অখণ্ডতা ও সম্পূর্ণতাকে ব্যাহত করে। এতে সচেতন চিন্তন ও মনোযোগ, এবং আবেগপূর্ণ অন্ধ বেদন ও বাসনার মধ্যে যে খণ্ডিত অবস্থা স্থাপিত হয়, তাও সমান গুরুতর। শিক্ষার বিষয়-বস্তু নিয়ে সুচিন্তিত কাজ করা ক্লেশকর ও উদ্যমহীন হয়। মনোযোগ যোগশূন্য হয়ে ভ্রাম্যমাণ হয়। যে সব প্রসঙ্গে মন উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—তার স্বীকৃতি নেই, কাজেই বুদ্ধির দিক দিয়ে এটি অবৈধ। এদের সাথে কাজ কারবার মানে চোরা কারবার। কোনো উদ্দেশ্যসম্বলিত সুচিন্তিত জিজ্ঞাসা দিয়ে সাড়া নিয়ন্ত্রণ করলে যে শৃঙ্খলা আসে, তা পণ্ড হয়। এর থেকেও মন্দ ফল যা হয় তা হল এই যে, গভীরতম সংশ্লিষ্টতা ও কল্পনার সর্বাধিক রুচিসম্পন্ন অভিযান অসময়ে আসে এবং লুকান থাকে। (সর্বাধিক রুচি সম্পন্ন এই কারণে যে, এরাই বাসনার নিকটতম জিনিস কেন্দ্র করে থাকে)। এরা এমন সব পথ ধরে কাজের মধ্যে প্রবেশ করে, যে পথের স্বীকৃতি নেই। পরিণাম বিবেচনা দ্বারা সংশোধন সাপেক্ষ নয় বলে এরা নীতিজ্ঞানহীন।

একদিকে প্রকাশ্য, লোকায়ত ও সামাজিক দায়িত্বশীল কর্মভার, অন্য দিকে অপ্রকাশ্য অনিয়ন্ত্রিত ও চিন্তনের অবদমিত স্বেচ্ছাচার,—মনের এইরূপ দ্বিধা-বিভক্তির অনুকূল ব্যবস্থা স্কুলে দেখতে পাওয়া কঠিন নয়। যাকে কখনো কখনো "দুর্দান্ত শৃঙ্খলা" অর্থাৎ বাইরের দমনমূলক চাপ বলা হয়,তাতে এমন একটা ঝোঁকই থাকে। যে কাজ করতে হবে তার বহির্ভূত পুরস্কারের মাধ্যমে প্রেষণা যোগানোরও সদৃশ ফল হয়। যা কিছুই স্কুল শিক্ষাকে শুধু প্রস্তুতি পর্বে পরিণত করে তা-ই এই দিকে কাজ করে (পুর্বে দেখুন, ৭১ পৃঃ)। উদ্দেশ্যাবলী শিক্ষার্থীর বর্তমান বোধশক্তির বাইরে থাকে বলে, ন্যস্ত কাজে সরাসরি মনোযোগ আনবার জন্য অন্যান্য সংঘটক বের করতে হয়। এতে কিছু পরিমাণে সাড়া জাগানো যায়, কিন্তু যে সব বাসনা ও বেদন নিয়োজিত হয় না, তাদের নিশ্চয়ই অন্য নির্গমন পথ দেখতে হবে। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া কম গুরুতর বিষয় নয়; চিন্তার প্রয়োগ থেকে স্বতন্ত্রভাবেই কাজে দক্ষতা আনবার জন্য এই অনুশীলন প্রকল্পিত হয়। স্বয়ংচল দক্ষতা সৃষ্টি করা ছাড়া, এরূপ অনুশীলনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। বিশ্ব-প্রকৃতি মানসিক শূন্যতা মেনে নিতে চায় না। যখন চিন্তন ও প্রক্ষোভ অব্যবহিত ক্রিয়াশীলতার বিষয়-বস্তুর মধ্যে কোনো নির্গমন পথ পায় না, তখন তাদের কি অবস্থা চলছে বলে শিক্ষকেরা মনে করেন? যদি এগুলো কেবল সাময়িকভাবে স্থগিত থাকতো, কিম্বা, এমন কি শুধু বেদনহীনও থাকতো, তা হলেও বিষয়টা ততো বেশী গুরুতর হতো না। কিন্তু তারা লোপ পায় না, বিরত হয় না; অবদমিত হয় না, কেবল করণীয় বিষয় সম্বন্ধেই অবদমিত থাকে। তারা নিজ নিজ বিভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খল ধারা অনুসরণ করে। মানসিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্যে যা সহজাত, যা স্বতঃস্ফূর্ত এবং জীবন্ত, তা অব্যবহৃত ও অপরীক্ষিত থাকে; এবং যে অভ্যাস জন্মায়, তা এমন হয় যে, উক্ত গুণাবলী সর্বজনীন ও প্রকাশ্য উদ্দেশ্যের স্বার্থে ক্রমেই কম প্রাপ্তব্য হয়।

৪। দায়িত্ব

বুদ্ধিগত মনোভাবের একটি উপাদান হিসাবে, দায়িত্বের অর্থ হল, পূর্বেই কোনো পূর্বকল্পিত বিষয়ের সম্ভাব্য পরিণামকে বিবেচনা করার

প্রবণতা; এবং বুঝে-সুঝে সেই পরিণামকে গ্রহণ করা। গ্রহণ করার অর্থ, একে হিসাবে ধরা, কাজে স্বীকৃতি দেওয়া, কেবল মৌখিক সম্মতি দেওয়া নয়। আমরা দেখেছি যে, মূলতঃ ধারণা হ'ল কোনো বিহ্বলকর পরিস্থিতির সমাধানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতি, অর্থাৎ সাড়া প্রভাবিত করতে পারে, এমন রকমের পূর্বাভাস। এটা মনে করা খুবই সহজ যে, কোনো উক্তির বা কোনো প্রস্তাবিত সত্যের বিভিন্ন সংশ্লেষ বিচার বিবেচনা করার আগেই একজনে তা গ্রহণ করতে পারে, অর্থাৎ বিষয়টা গ্রহণ করাতে আরও কি কি বিষয় মেনে নেওয়া হল, তার কেবল একটা দ্রুত বা ভাসা ভাসা নিরীক্ষা চালিয়েই বিষয়টা গ্রহণ করতে পারে। এ অবস্থায় পর্যবেক্ষণ ও পরিচিতি, এবং বিশ্বাস ও সম্মতি হয়ে দাঁড়ায় বার থেকে উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি অলস সম্মতির নামান্তর।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অল্প কয়েকটি তথ্য ও সত্য নিয়ে, অর্থাৎ গৃহীত বলে মনে করা হয়েছে এমন কয়েকটি বিষয় নিয়ে কাজ করা অনেক ভালো; অর্থাৎ যদি বুদ্ধি খাটিয়ে অল্প কয়েকটি পরিস্থিতি ততোদূর পর্যন্ত প্রস্তুত করা যায়, যেখানে দৃঢ়-প্রত্যয়ের অর্থ হবে বাস্তব-সম্পৃক্ত,—অর্থাৎ যেখানে তথ্যাবলী ও ফলাফলের অগ্রদর্শন দ্বারা প্রত্যাশিত আচরণের সাথে নিজেকে কিছু পরিমাণে একাত্ম করা যায়। স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের অকারণ জটিলতার এবং নানা পাঠ ও পড়ার গাদাগাদির সর্বাধিক স্থায়ী কুফল শুধু দুর্ভাবনা, স্নায়বিক পীড়ন এবং তৎপ্রসূত ভাসা ভাসা জ্ঞান নয় (যদিও এ সব গুরুতর বিষয়); পরন্তু তা হল একটা বিষয়কে বাস্তবিকরূপে জানবার ও বিশ্বাস করার মধ্যে যে কি বস্তু থাকে, তা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারার ব্যর্থতা। বুদ্ধিগত দায়িত্বের অর্থ হল এই দিকে একটা কঠোর মানদণ্ড গ্রহণ করা। যা আয়ত্ত করা হয়েছে তার তাৎপর্যের অনুসরণ করা। এবং সেই তাৎপর্য অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস দিয়েই এই মানদণ্ড খাড়া করা যায়।

কাজেই আমরা যে মনোভাবের কথা বিবেচনা করছি, তার আর এক নাম হল বুদ্ধিগত "পুঙ্খানুপুঙ্খতা"। এক রকমের পুঙ্খানুপুঙ্খতা আছে যা অবিমিশ্র ভৌতিক; যা কোনো বিষয়ের যাবতীয় খুঁটিনাটির একটা যান্ত্রিক, শ্রান্তিকর ও পৌনঃপুনিক অনুশীলন সূচিত করে। বুদ্ধিগত পুঙ্খানুপুঙ্খতা হল কোনো জিনিসের আগাগোড়া দর্শন করা। সেটি উদ্দেশ্যের এমন

কোনো একত্বের উপর নির্ভর করে, খুঁটিনাটিগুলো যার অধীন হবে। এটি একগাদা অসংলগ্ন খুঁটিনাটির উপস্থাপনের উপর নির্ভর করে না। যে দৃঢ়তার সহিত কোনো উদ্দেশ্যের পূর্ণ তাৎপর্যের বিকাশ সাধন করা হয়, তার মধ্যেই এই মনোভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, বার থেকে চাপানো এবং নির্দেশিত কার্যক্রমের প্রতি মনোযোগে এই মনোভাব থাকে না, তা সে মনোযোগ যতোই "বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন" হোক না কেন।

সারাংশ

যে পন্থায় অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তু সব চেয়ে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়ে বিকাশ লাভ করে, তার বর্ণনাই পদ্ধতি। যেখানে বিচারাধীন বিষয়-বস্তু, এবং ব্যক্তিগত ভঙ্গী ও ধরনের মধ্যে কোনো সংজ্ঞাত পার্থক্য থাকে না, সেই অভিজ্ঞতাধারার পর্যবেক্ষণ থেকেই পদ্ধতি অনুমিত হয়। পদ্ধতিকে পৃথক কোনো-কিছু বলে ধরে নেওয়াও যা, বস্তু সম্বলিত পৃথিবী থেকে মন ও আত্ম-সত্তার পৃথকীকরণের ধারণাও তাই। এরূপ ধারণা শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভকে কোনো বিধিবদ্ধ, যান্ত্রিক ও বাধ্যতামূলক রূপ দেয়। যদিও পদ্ধতিগুলি নিজ নিজ রূপ নেয়, তবুও পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার থাকা, এবং যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সাধারণ সাদৃশ্য থাকার জন্য, অভিজ্ঞতা যে পথে ফলপ্রসূ হয় তার স্বাভাবিক ধারা সম্বন্ধে কিছু কিছু রূপরেখা চিহ্নিত করা যেতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের ভাঙ্গর দিক থেকে বলতে গেলে, উত্তম পদ্ধতির বিভিন্ন লক্ষণ হল,—ঋজু আচরণ, নমনীয় বুদ্ধিগম্য উৎসাহ বা শিক্ষালাভের সংস্কার-বিমুক্ত সঙ্কল্প, উদ্দেশ্যের অখণ্ডতা, নিজের কর্মতৎপরতার, এমন কি, চিন্তনেরও দায়িত্ব গ্রহণ।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিষয়-বস্তুর স্বরূপ

১। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিষয়-বস্তু

মূল নিয়মের দিক থেকে, বিষয়-বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তার বেশী আর কিছু বলার নেই (পূর্বে দেখুন পৃঃ১৭৪)। উদ্দেশ্য সম্বলিত কোনো পরিস্থিতির বিকাশের পথে যে সমস্ত তথ্যকে পর্যবেক্ষণ, স্মরণ, অধ্যয়ন ও আলোচনা করা হয়, এবং তার থেকে যে সমস্ত ধারণার ইঙ্গিত আসে, তাই নিয়েই বিষয়-বস্তু গঠিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে, অর্থাৎ যে সমস্ত পাঠ্য-বিষয় নিয়ে পাঠক্রম গঠিত হয় তার সঙ্গে এই উক্তিটিকে যোগ করে, একে আরও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হল এই যে, লেখা, পড়া, গণিত, ইতিহাস, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, আধুনিক ও বিদেশী ভাষা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের সংজ্ঞার্থের তাৎপর্য কি?

আমাদের আলোচনাতে এর পূর্বে যা যা স্থির হয়েছে তার দুটি বিষয়ে ফিরে আসা যাক। শিক্ষা-অভিযানে শিক্ষকের ভূমিকা হ'ল সেই পরিবেশ যোগান যা সাড়া উদ্দীপিত করে, এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষাধারাকে নির্দেশিত করে। শেষ বিশ্লেষণে, শিক্ষক যা করতে পারেন তার "সব কিছুই" হ'ল উদ্দীপকের রূপান্তর করা, যাতে সাড়া যতোদূর সম্ভব নিশ্চিতরূপে, অভিপ্রেত বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত মানসতা গঠন করতে পারে। স্পষ্টতঃই বিভিন্ন পাঠ বা পাঠক্রমের বিষয়-বস্তু এইরূপ পরিবেশ যোগানোর কাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অন্য বিষয়টি হ'ল, যে সব অভ্যাস গঠিত হয় তাকে তাৎপর্য দেবার জন্য কোনো সামাজিক পরিবেশ থাকার অপরিহার্যতা। আমরা যাকে স্বাভাবিক শিক্ষা বলেছি, তাতে বিষয়-বস্তুকে সরাসরি সামাজিক আদান-প্রদানের ছাঁচের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যক্তি যাঁদের সঙ্গে থাকেন, তাঁরা যা বলেন ও করেন, এই ছাঁচ তারই প্রতিরূপ। এই তথ্যটি বিধিবদ্ধ

বা পরিকল্পিত শিক্ষাদানের বিষয়-বস্তুর বোধগম্যতার সন্ধান দেয়। কোনো আদিম সমাজ-সমষ্টির নানা ক্রিয়াকর্ম ও ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে যে সব গল্প, ঐতিহ্য, গান, মন্ত্র-তন্ত্র জড়িত থাকে, তার মধ্যে একটা যোগসূত্র দেখা যায়। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে যে সব অর্থাবলী দানা বেঁধে এসেছে, এবং সমষ্টি যাকে এতো মূল্যবান মনে করেন যে, একেই তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের ধারণার সঙ্গে একাত্ম করতে চান, ঐ সব ঐতিহ্যিক বিষয় তারই প্রতিরূপ। এই বিষয়গুলি তাঁদের দৈনন্দিন আহার, শিকার, যুদ্ধ ও সন্ধির, এবং বস্ত্র, বাসন, ঝুড়ি তৈরী প্রভৃতি দক্ষতার কোনো অংশ নয় বলে, নাবালকদের উপরে জ্ঞাতসারে এগুলোর ছাপ দিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময়, যেমন নামকরণ প্রভৃতি ব্রতাদির অনুষ্ঠানে, তীব্র প্রক্ষোভমূলক ভাবাতিশয্য নিয়েও এই কাজ করা হয়। গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষরূপে প্রয়োজনীয় রীতিনীতি পরিচালিত করা থেকে, তাঁদের অতিকথা, কাহিনী ও নানাবিধ আক্ষরিক সংকেতকে চিরায়ত করার জন্যই জ্ঞাতসারে অধিকতর যত্ন নেওয়া হয়। কারণ প্রথমোক্ত বিষয়ের মতো শেষোক্ত বিষয় সাধারণ ক্রিয়া-কৌশলের সূত্রে আহরণ করা যায় না।

যখন সামাজিক গোষ্ঠী অধিকতর জটিল হয়, যখন অধিক সংখ্যক দক্ষতার প্রয়োজন হয়, এবং বাস্তবতার দিক থেকেই হোক বা গোষ্ঠীর বিশ্বাস অনুযায়ীই হোক, এ সব দক্ষতা গোষ্ঠীর অতীত অভিজ্ঞতাপ্রসূত আদর্শ ধারণাবলীর উপর নির্ভর করে, তখন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সামাজিক জীবনের আধেয় অধিকতর সূত্রবদ্ধ হয়ে আসে। যেমন পূর্বেই বলেছি যে, সম্ভবতঃ সচেতনতার সহিত সমষ্টিগত জীবনের পর্যালোচনা করা এবং তার মধ্যে যে সমস্ত তাৎপর্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাকে নিষ্কাষিত করা এবং তাকে কোনো সুসঙ্গত ব্যবস্থাতে নিয়মাবদ্ধ করার পিছনে মুখ্য প্রেরণা হল সমষ্টিগত জীবনধারাকে চিরস্থায়ী করা। এর জন্যই নাবালকদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনবোধ দেখা দেয়। একবার বাছাই করা, সূত্রায়ন করা ও সংগঠন করার রাস্তায় চলতে আরম্ভ করলে, তার আর নির্দিষ্ট সীমা থাকে না। লেখা ও মুদ্রণের উদ্ভাবন ঐ ক্রিয়া-প্রণালীকে অপরিমেয় গতিশক্তি দান করে। পরিশেষে, গোষ্ঠীর অভ্যাস ও আদর্শের সাথে স্কুলপাঠ্য বিষয়-বস্তুর যে যোগসূত্র থাকে, তা ছদ্মবেশ ধারণ করে চাপা পড়ে যায়। ঐ সব বন্ধন

এতো শিথিল হয়ে যায় যে, সময়ে সময়ে মনে হয় যে, কোন যোগসূত্র যেন ছিলোই না; যেন কোনো বিষয়-বস্তু নিজের স্বতন্ত্র স্বার্থেই জ্ঞান হয়ে উপস্থিত রয়েছে; কোনো সামাজিক মূল্যবোধের ধার না ধরেই, অধ্যয়ন যেন শুধু জ্ঞানের স্বার্থেই জ্ঞান লাভ করার একটা কর্মানুষ্ঠান। যেহেতু বাস্তব কারণ বশতঃ এই ঝোঁক প্রতিরোধ করা নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ (পূর্বে দেখুন পৃঃ ১১-১২), সেই হেতু যে যোগসূত্র অতো সহজেই দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, তাকে দৃষ্টিতে আনা এবং পাঠক্রমের মুখ্য অংশগুলোর সামাজিক আধেয়, এবং তার ন্যস্ত কর্মকে কিছু বিশদ ভাবে দেখিয়ে দেওয়াই আমাদের এই তাত্ত্বিক আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়গুলো বিবেচনা করা দরকার। বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বর্তমান জ্ঞান অপেক্ষা শিক্ষকের অনেক বেশী জ্ঞান থাকার তাৎপর্য হ'ল সুনির্দিষ্ট আদর্শ যোগান, এবং অপরিণতদের স্থূল ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন সম্ভাব্যতাকে নিজের কাছে প্রকট করা। (১) উপস্থিত সমাজ জীবনের যে সব তাৎপর্য জ্ঞাপন করা বাঞ্ছনীয়, স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের উপাদান তাকে মূর্ত ও বিশদ ভাষায় রূপান্তরিত করে। কৃষ্টির যে সব সার উপাদানকে চিরস্থায়ী করতে হবে, বিষয়-বস্তু শিক্ষকের কাছে সেটাই পরিষ্কার করে তুলে ধরে; এবং এমন সংগঠিতরূপে তুলে ধরে যে, তাৎপর্যগুলোকে আদর্শান্বিত করা না হলে শিক্ষককে যে সব এলোমেলো প্রচেষ্টা করতে হতো তার হাত থেকে তিনি রক্ষা পান। কাজকর্ম করার পরিণতিরূপে অতীতকালে যে সব ধারণা আয়ত্ত করা হয়েছে তার জ্ঞান ছোটদের প্রতীয়মান আবেগপূর্ণ ও লক্ষ্যহীন প্রতিক্রিয়াগুলির তাৎপর্য বুঝতে শিক্ষককে সাহায্য করে এবং এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে সেই ধারায় পরিচালিত করার উদ্দীপক যোগায়, যাতে ঐ সব প্রতিক্রিয়া কোনো সার্থক রূপ নিতে পারে। শিক্ষক সঙ্গীতের বিষয় যতো বেশী জানেন ততোই তিনি শিশুর অসংলগ্ন সঙ্গীত আবেগের সম্ভাব্যতাকে উপলব্ধি করতে পারেন। সংগঠিত বিষয়-বস্তু শিক্ষকের অভিজ্ঞতার মতোই বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সুপক্ক পরিণতিকে উপস্থাপিত করে, কারণ এই সব অভিজ্ঞতা একই জগৎ থেকে আহৃত এবং ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা ও প্রয়োজনের অনুরূপ হয়ে গড়ে উঠেছে। বিষয়-বস্তু, পূর্ণত্ব বা অভ্রান্ত মনীষা উপস্থাপিত করে না। কিন্তু নতুন

অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার প্রাপ্তব্য বিষয়ের মধ্যে বিষয়-বস্তুই সর্বোত্তম, এবং সে অভিজ্ঞতা অন্ততঃ কোনো কোনো দিকে উপস্থিত জ্ঞান ও শিল্প সৃষ্টির মধ্যে যে সব কৃতিত্ব রয়েছে তাকে ছাড়িয়েও যেতে পারে।

অন্য কথায় শিক্ষকের দিক থেকে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় হ'ল কাজ করার উপযুক্ত বিভিন্ন সঙ্গতি ও তাঁর প্রাপ্তব্য মূলধন। কিন্তু তরুণদের অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে বিষয়-বস্তুর দূর-ব্যবধান কেবল প্রতীয়মানই নয়; তা বাস্তবও বটে। কাজেই শিক্ষার্থীর বিষয়-বস্তু পূর্ণ-বয়স্কদের সূত্রবদ্ধ, দানাবাঁধা ও সুসম্বদ্ধ বিষয়-বস্তুর, অর্থাৎ কলা-গ্রন্থে ও কলাসৃষ্টিতে তা যে ভাবে থাকে, তার প্রতিরূপ হয় না, হতে পারে না। বড়োদের গ্রন্থবদ্ধ বিষয়-বস্তু, ছোটো-দের বিষয়-বস্তুর বিভিন্ন "সম্ভাব্যতার" প্রতীক, তার বর্তমান অবস্থার নয়। তা প্রত্যক্ষভাবে বিশেষজ্ঞের বা শিক্ষকের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রবেশ করে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মধ্যে নয়। পাঠ্য পুস্তকের ও অন্যান্য পূর্বাবস্থিত জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করার মধ্যে যে সব ভ্রান্তি রয়েছে, তার বেশীর ভাগের জন্যই দায়ী শিক্ষক ও ছাত্রের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়-বস্তুর পার্থক্য মনে না রাখা। বিষয়-বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের মনোভাবের মধ্যে এতো বেশী পার্থক্য থাকে বলেই, মানব-প্রকৃতির গড়ন ও গুণ সম্বন্ধে মূর্ত জ্ঞান থাকার খুব বেশী প্রয়োজন হয়। শিক্ষক বাস্তবে যা উপস্থাপিত করেন, শিক্ষার্থী কেবল প্রতীকরূপেই তাকে পুনরুপস্থাপিত করে। অর্থাৎ শিক্ষক ইতিপূর্বেই যে বিষয়গুলো জেনেছেন, শিক্ষার্থী সেগুলো কেবল শিখছেন। কাজেই দুজনের সমস্যা আমূল তফাত। যখন শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাকেন তখন বিষয়-বস্তুকে পুরোপুরি তাঁর দখলে রাখতে হয়। তাঁর মনোযোগ দেওয়া উচিত শিক্ষার্থীর মনোভাব ও সাড়ার দিকে। শিক্ষকের ন্যস্ত কাজ হ'ল, বিষয়-বস্তুর সাথে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সূত্রে শিক্ষার্থীকে বুঝতে পারা; আর শিক্ষার্থীর মন অবশ্যই তাঁর নিজের উপরে থাকবে না, থাকবে আলোচ্য বিষয়ের উপর। বিষয়টা একটু অন্যভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, শিক্ষক বিষয়-বস্তুর মধ্যেই নিজেকে নিযুক্ত রাখবেন না, নিযুক্ত রাখবেন শিক্ষার্থীর উপস্থিত প্রয়োজন ও সামর্থ্যের সাথে বিষয়-বস্তুর ক্রিয়া-বিক্রিয়ায়। কাজেই কেবল পাণ্ডিত্যই যথেষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডিত্যের বা বিষয়-বস্তুকে পূর্ণ দখলে রাখার এমন কতক গুণ আছে, যা আলাদাভাবে নিলে,

শেখাবার পথে বাধার সৃষ্টি করে, "যদি" শিক্ষকের অভ্যাসগত মনোভাব, শিক্ষার্থীর নিজের অভিজ্ঞতার সাথে বিষয়-বস্তুর যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া হচ্ছে, তার প্রতি তৎপর "না" থাকে। প্রথমতঃ শিক্ষকের জ্ঞান শিক্ষার্থীর জানা বিষয়ের পাল্লা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এর মধ্যে এমন সব মূল নিয়ম থাকে, যা অপরিণত শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও স্বার্থবোধের বাইরে। শিক্ষকের জ্ঞান, নিজগুণে এবং নিজে থেকেই শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার জীবন্ত জগৎ উপস্থাপিত করে না; যেমন, মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে কোনো জ্যোতির্বিদের জ্ঞান একটি শিশু যে কক্ষে থাকে তার সাথে শিশুর পরিচয়লব্ধ জ্ঞান উপস্থাপিত করে না। দ্বিতীয়তঃ, অর্জিত পাণ্ডিত্যের উপাদান সংগঠিত করার পদ্ধতি, বিদ্যারম্ভকারীর পদ্ধতি থেকে অন্যরূপ। এ কথা সত্য নয় যে, ছোটদের অভিজ্ঞতা অসংগঠিত, অর্থাৎ তা ভিন্ন ভিন্ন টুকরো জিনিসের আধার। কিন্তু তা সংগঠিত হয়েছে আকর্ষণের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক কেন্দ্র-গুলিকে ঘিরে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, শিশুর বাড়ীই তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞানের সাংগঠনিক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। তার অঞ্চলের মধ্যে তার চলাফেরা, তার বিদেশ ভ্রমণ, তার বন্ধুদের অলীক কাহিনী, সেই সব বন্ধন যোগায়, যা তার টুকরো খবরগুলোকে একত্র করে রাখে। কিন্তু ভূগোল বিশা-রদের ভূগোল, অর্থাৎ যিনি এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার বিভিন্ন সংশ্লেষকে পূর্বেই স্পষ্ট ও পুষ্ট করেছেন, তাঁর ভূগোল সংগঠিত হয় নানাবিধ তথ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে,—এই তথ্যাবলী তাঁর বাড়ী, দৈহিক গতিবিধি বা বন্ধুদের সাথের সম্পর্কের ভিত্তিতে থাকে না। যিনি বিজ্ঞ তাঁর কাছে বিষয়-বস্তু সুদূরপ্রসারী, নিখুঁত ভাবে নির্ধারিত এবং যুক্তি অনুসারে পার-স্পরিক সূত্রে সম্পর্কযুক্ত। যিনি শিখছেন, তার কাছে বিষয়-বস্তু তরল, আংশিক এবং তার ব্যক্তিগত বৃত্তির সম্পর্কে যুক্ত। শেখাবার সমস্যা হ'ল বিশেষজ্ঞের পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের দিকে ছাত্রের অভিজ্ঞতাকে গতিশীল রাখা। এর থেকেই প্রয়োজন দেখা দেয় যে, শিক্ষককে বিষয়-বস্তু এবং ছাত্রের প্রয়োজন ও সামর্থ্য,—দুটো বিষয়কেই জানতে হবে।

২। শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়-বস্তুর সম্প্রসারণী করণ

তথ্যাবলীকে বিপর্যস্ত না করে, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার মধ্যে বিষয়-বস্তুর ক্রমবিকাশের মোটামুটি তিনটি নমুনাগত পর্যায় চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমাবস্থায়, জ্ঞান অবস্থান করে বুদ্ধিগম্য যোগ্যতার আধেয়রূপে,—কাজ করার ক্ষমতারূপে। এই জাতীয় বিষয়-বস্তু বা জ্ঞাত উপাদান, জিনিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা পরিচিতিতে প্রকাশ পায়। পরে, জ্ঞাপিত জ্ঞান বা সংবাদের মাধ্যমে এই উপাদান ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত ও গভীর হতে থাকে। সর্বশেষে, একে বিবর্ধিত, এবং ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত সংগঠিত উপাদানে পরিণত করা হয়—এমন একজনের উপাদানে পরিণত করা হয় যিনি বিষয়টিতে, আপেক্ষিক অর্থে, একজন বিশেষজ্ঞ।

(১) লোকের কাছে যে সব জ্ঞান প্রথম আসে, এবং যে জ্ঞান সবচেয়ে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তা হ'ল "কি করে করতে হয়,"—সেই জ্ঞান। যেমন, কি করে হাঁটতে হয়, কথা বলতে হয়, পড়তে হয়, লিখতে হয়, স্কেট্ করতে হয়, সাইকেল চড়তে হয়, মেসিনের তত্ত্বাবধান করতে হয়, হিসাব করতে হয়, ঘোড়া চালাতে হয়, জিনিস বিক্রি করতে হয়, লোক সামলাতে হয়, এ রকমের অসংখ্য কাজ। যে সহজ-প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়া কোনো উদ্দেশ্যের প্রতি অভিযোজিত হয়, তাকে অলৌকিক জ্ঞান মনে করার যে জনপ্রিয় ঝোঁক রয়েছে তা যুক্তিহীন হলেও, জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধিগত নিয়ন্ত্রণকে একাত্ম করার যে প্রবল ঝোঁক থাকে সেটি তারই সাক্ষ্য দেয়। যখন শিক্ষা, জ্ঞানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারণার প্রভাবে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সূত্রবদ্ধ তথ্য ও সত্যাবলী ছাড়া আর সব কিছুকেই উপেক্ষা করে, এবং এ কথা বুঝতে অক্ষম হয় যে, সব সময়েই প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক বিষয়-বস্তু এমন এক কর্মতৎপর ক্রিয়ারূপে বর্তমান থাকে যার মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও বস্তু নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে হয়,—তখনই শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তুকে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়। ফলে তা এমন কিছু হয়ে দাঁড়ায় যে সেটা মুখস্থ করতে হবে, এবং দাবী করলে তার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। বিপরীত পক্ষে, বিকাশের স্বাভাবিক ধারার স্বীকৃতি সর্বক্ষেত্রেই সেই সব পরিস্থিতি নিয়ে শুরু করে যার মধ্যে

"করে শেখা" থাকে। বিবিধ কলা ও বৃত্তি পাঠক্রমের উদ্যোগ পর্ব গঠন করে। কারণ এরাই, কি করে উদ্দেশ্য সম্পাদনে অগ্রসর হতে হয়, তা জানবার প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে থাকে।

জ্ঞানসূচক জনপ্রিয় শব্দাবলী সর্বক্ষেত্রেই জ্ঞানের সঙ্গে কর্মে যোগ্যতার সম্বন্ধ বজায় রাখে। বিদ্বৎ সমাজসৃষ্ট দর্শনগুলো এই সম্বন্ধটা হারিয়েছে। ইংরেজি কেন্ ও ক্যান্ শব্দ সাদৃশ্য। মনোযোগের অর্থ কোনো কিছুর যত্ন নেওয়া, অনুরাগ এবং কল্যাণের আশা উভয় অর্থেই। খেয়াল করার অর্থ কোনো উপদেশকে কাজে পরিণত করা, যেমন ছেলে মায়ের কথা খেয়াল করে,—এবং কোনো কিছুর যত্ন নেওয়া, যেমন ধাত্রী ছোটো শিশুদের প্রতি খেয়াল রাখে। চিন্তাশীল এবং বিবেচক হওয়া মানে অন্যান্যের দাবীর প্রতি লক্ষ্য রাখা। ইংরেজি এ্যাপ্রিহেন্সন্ শব্দটির মানে অবাঞ্ছিত পরিণামের আশঙ্কাও হতে পারে, আবার বুদ্ধিগত উপলব্ধিও হতে পারে। উত্তম বুদ্ধি বা বিচার বুদ্ধি থাকার অর্থ, অবস্থানুযায়ী আচরণ করতে জানা। প্রভেদ করা, কেবল পার্থক্য করার জন্যই পার্থক্য করা নয়, যাকে চুল-চেরা অভ্যাস বলে নিন্দা করা হয়—এর অর্থ হ'ল, কাজ করার সম্পর্কে কোনো ব্যাপারের মধ্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা। জ্ঞান বা বিজ্ঞতা শব্দ, জীবনের সঙ্গত পরিচালনার সঙ্গে যোগ কখনো হারায়নি। কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই জ্ঞানের মুখ্য অর্থ দাঁড়িয়েছে কর্ম-বিচ্ছিন্ন একটা সংবাদ ভাণ্ডার। কৃষক, নাবিক, বণিক, চিকিৎসক ও শ্রমশালার গবেষকের মনে জ্ঞানের এ অর্থ কখনোই উদয় হয় না।

জিনিস-পত্র নিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে করতেই জিনিসের সঙ্গে পরিচিতি বা ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। যে জিনিস-পত্রের সঙ্গে আমরা সর্বাধিক সুপরিচিত তা হ'ল আমাদের সচরাচর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি—যেমন চেয়ার, টেবিল, কলম, কাগজ, কাপড়-জামা, খাদ্যবস্তু, ছুরি, কাঁটা ইত্যাদি সাধারণ স্তরের জিনিস। পরে একজনের পেশা অনুযায়ী এরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিনিসে পৃথকীকৃত হয়। পরিচিতি শব্দটি জিনিসের জ্ঞান সম্বন্ধে যে ঘনিষ্ঠ ও প্রক্ষোভ-মূলক অর্থ ইঙ্গিত করে, জিনিসকে কোনো উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজে খাটানোর ফলেই সে জ্ঞান দানা বেঁধে আসে। আমরা জিনিসটিকে নিয়ে বা জিনিসটির উপরে, বার বার এতো কাজ করছি যে, তা কি ভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করবে তা পূর্বেই অনুমান করতে পারি,—এই হ'ল ঘনিষ্ঠ পরিচিতির অর্থ। কোনো

ঘনিষ্ঠ জিনিসের সম্পর্কে আমরা প্রস্তুত থাকি। সে জিনিস আমাদিকে অতর্কিতে আক্রমণ করে না বা আমাদের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে ছলনাও করে না। এই দৃগ্‌ভঙ্গী একটা ঘরোয়া বা বন্ধুতার ভাব সূচিত করে, সূচিত করে একটা সহজভাব বা দীপ্তি। অন্যদিকে, যে সব জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করতে অনভ্যস্ত, তা হয়ে দাঁড়ায় অদ্ভুত, অপরিচিত, নিষ্প্রাণ, অতি-পরোক্ষ ও "অমূর্ত"।

(২) কিন্তু জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায় সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা হয়ত আমাদের বোধশক্তিকে ঘোলাটে করে দেবে। নির্দিষ্ট কারিগরি শিক্ষার ফলে যে জ্ঞান আসে, তা ছাড়া আর প্রায় সব জ্ঞানই এই পর্যায়ভুক্ত। উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজের ধরনের মধ্যে মানুষ নিয়ে কাজ করাও থাকে, আবার জিনিস নিয়ে কাজ করাও থাকে। মেলামেশার আবেগ ও আদান-প্রদানের অভ্যাসকে অন্যান্যের সঙ্গে সফল সম্বন্ধ বজায় রাখার উপযোগী করে নিতে হয়। ফলে সমাজ-জ্ঞানের এক বৃহৎ ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। এই আন্তর্যোগাযোগের ফলে একজনে আর সব লোকের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে। তাঁরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলে, এবং তাঁদের কাছে যা বলা হয়েছে, ফিরে সে কথাও বল্লে। এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে ব্যক্তির যতো আগ্রহ বা সংশ্লিষ্টতা থাকে, তার বিষয়-বস্তু ততোই তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্যের সঙ্গে কর্মতৎপর সংযোগ আমাদের নিজস্ব বিষয়ের এমন একটা ঘনিষ্ঠ ও জীবন্ত অংশ যে, "এখানে আমার অভিজ্ঞতা শেষ হ'ল, তোমার অভিজ্ঞতা আরম্ভ হ'ল," এ রকম বলার মতো কোনো সুস্পষ্ট রেখা টানা অসম্ভব। যৌথ কাজে অংশীদার হওয়ার জন্য, অন্যান্যে তাঁদের কর্মাংশের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের কাছে যা বলে, তা তখনই আমাদের কর্মাংশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়। চোখ বা হাতের মতো কানও অভিজ্ঞতা লাভের সমান সমান অঙ্গ। চোখের দিগন্তের বাইরে যা ঘটে, তার বিবরণ পড়ার জন্য চোখকে কাজে লাগানো হয়। আমরা যে সব জিনিস ঘ্রাণ করতে বা ধরতে পরি, তার মতোই স্থান ও কাল হিসাবে বহু দূরবর্তী জিনিসও আমাদের কাজের ফলাফলকে প্রভাবিত করে। যে সব জিনিস প্রকৃতই আমাদিকে সংশ্লিষ্ট করে তার কোনো বিবরণ যদি আমাদের হাতের কাজ করতে সহায়তা করে, সে বিবরণও আমাদের ব্যক্তিগত অভি-

জ্ঞতার মধ্যে এসে পড়ে। এই জাতীয় বিষয়-বস্তুকে জ্ঞাতব্য-বিষয় (সংবাদ) বলে।

ব্যক্তিগত কাজ করার মধ্যে আদান-প্রদানের স্থান আমাদিকে স্কুলের জ্ঞাপনীয় বিষয়-বস্তুর মূল্য আন্দাজ করতে নির্ণায়ক যোগায়। কোনো ছাত্র যে প্রশ্নটির সাথে জড়িত, জ্ঞাতব্য বিষয় কি সে প্রশ্নটির থেকে স্বাভাবিক-ভাবে ওঠে? তা কি তাঁর অধিকতর প্রত্যক্ষ পরিচিতির সাথে খাপ খায়, যাতে ঐ পরিচিতির কার্যকারিতা বাড়ে এবং তার অর্থ গভীর হয়? যদি জ্ঞাপনীয় বিষয় এই প্রয়োজন দুটি মেটায় তা হলে তা শিক্ষামূলক। কতো-খানি পড়া হল বা শোনা হল, তার কোনো গুরুত্ব নেই, অন্যদিকে পড়া শোনা যতো বেশী হয় ততোই ভালো "যদি" তাতে ছাত্রের প্রয়োজন থাকে, এবং সে তাকে তাঁর নিজের কোনো পরিস্থিতিতে খাটাতে পারে।

কিন্তু এই সব প্রয়োজন তত্ত্বতঃ সূত্রস্থ করা যতো সহজ কার্যতঃ খাটানো ততো সহজ নয়। আধুনিক কালে, আন্তর্যোগাযোগের ক্ষেত্রের প্রসার, আকাশের বহুদূরবর্তী স্থান এবং ইতিহাসের অতীত ঘটনাবলীর পরিচিতি লাভের উপযুক্ত যন্ত্রপাতির রচনা, সংবাদ,—প্রামাণ্য এবং প্রমাণ-হীন,—লিপিবদ্ধ করা ও বণ্টন করার জন্য মুদ্রাযন্ত্র ও অন্যান্য কৌশলের সহজলভ্যতা, এক বিশালকায় জ্ঞাতব্য বিষয়-বস্তু সৃষ্টি করেছে। এ সব সংবাদ শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে রূপান্তরিত করা অপেক্ষা, তা দিয়ে তাঁকে অভিভূত করা অনেক সহজ। সহজেই এ সব সংবাদ আর একটা অদ্ভুত জগৎ গঠন করে, এবং এই জগৎ ব্যক্তিগতরূপে পরিচিত জগতের উপর স্থাপিত হয়। শিক্ষার্থীর একমাত্র সমস্যা দাঁড়ায়, স্কুলের প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করা ও প্রমোশন পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই অদ্ভুত জগৎটার বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা। সম্ভবতঃ আজকাল প্রায় সকল লোকের কাছেই জ্ঞান শব্দের সর্বাধিক বিশিষ্ট নিগূঢ় অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্যান্যের দ্বারা নির্ণীত তথ্য ও সত্যাবলী। অর্থাৎ যে সব উপাদান সারি-সারি এট্‌লাস্‌, জ্ঞানকোষ, ইতিহাস, আত্মজীবনী, ভ্রমণ কাহিনী ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরূপে লাইব্রেরীর তাকে তাকে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে,—তাই হল জ্ঞান।

উপাদানের এই চমকপ্রদ বিস্ময়কর স্তূপ, মানুষের অজ্ঞাতসারে জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধীয় ধারণাকে প্রভাবিত করেছে। যে সমস্ত উক্তি ও প্রস্তাবের মধ্যে

জ্ঞান,—অর্থাৎ সমস্যার সঙ্গে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতার ফলাফল,—দানা বেঁধে জমা হয়ে পড়েছে সেগুলোকেই আসল জ্ঞান বলে। এইভাবে অনুসন্ধানের ফলাফলরূপে এবং অধিকতর অনুসন্ধানের সঙ্গতিরূপে জ্ঞানের যে স্থান রয়েছে, তার থেকে স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানের বিবরণীকেই জ্ঞান বলে ধরা হয়। অতীত বিজয়ের লুণ্ঠিত সামগ্রী দ্বারা মানুষের মনকে কারা-বন্দী করা হয়। অস্ত্রশস্ত্র নয়, অজানিতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কার্যাবলী নয়, কেবল-মাত্র লুণ্ঠিত সামগ্রী ব্যবহার করেই জ্ঞানের অর্থ, তথ্য ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংবাদ-জ্ঞাপক বিবিধ প্রস্তাবের সঙ্গে জ্ঞানের এই প্রকার একাত্মীকরণ যখন নৈয়ায়িক ও দার্শনিকদের কাঁধে চেপেছে, তখন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে এই আদর্শ শিক্ষাকেও প্রায় পূর্ণ শাসনে রেখেছে। ফলে "পাঠক্রমের" বহুলাংশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে সংবাদ বণ্টন করে ও প্রতিটি পাঠ্য বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন পাঠে বিভাগ করে নিয়ে, এই সম্পূর্ণ ভাণ্ডারটিকে ধারাবাহিক পাঠমালারূপে উপস্থাপিত করে। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ভাণ্ডারটি ক্ষুদ্র ছিল। সুতরাং আদর্শ ছিল সেটি সম্পূর্ণ এবং সর্বতোভাবে দখল করা। কিন্তু তা এখন এতো বোঝাই হয়েছে যে এর সবটা কোনো একজন লোকের আয়ত্তে আনা যে অসম্ভব সেটি অতিশয় সুস্পষ্ট। কিন্তু এতে শিক্ষার আদর্শ তেমন সংক্রমিত হয়নি। বিদ্যার প্রতিটি শাখাতেই অল্প-সল্প জ্ঞান অর্জন করা কিম্বা অন্ততঃ কোনো নির্বাচিত বিষয় সমষ্টির মধ্যে এরূপ করা এখনো সেই মূলনীতিই রয়েছে, এবং এই দিয়েই প্রাথমিক স্কুল থেকে আরম্ভ করে কলেজ পর্যন্ত একটা পাঠক্রম গঠন করা হয়। এর সহজ অংশগুলো দেওয়া হয় প্রথম বছরগুলোতে, আর কঠিন অংশ দেওয়া হয় পরে।

এহেন অবস্থা থেকেই শিক্ষাদাতার অভিযোগ আসে যে, শিক্ষা ছাত্রের চরিত্রে প্রবেশ করে না, তার আচরণকে প্রভাবিত করে না; আপত্তি আসে মুখস্থ করার কাজ ও মুখস্থ বিদ্যার বিরুদ্ধে; তথ্যাবলী নিয়ে ভূতাবিষ্ট থাকার বিরুদ্ধে; চুল-চেরা পার্থক্যের প্রতি গভীর অনুরক্তি, এবং নিয়ম ও তত্ত্বের বিকৃত-বোধের বিরুদ্ধে। যে জ্ঞান প্রধানতঃ পরোক্ষ,—অন্যান্য লোকের জ্ঞান,—তা কেবল শব্দগতই থেকে যেতে চায়। শব্দাবলীতে সন্নিবেশিত

হয় বলে যে সংবাদ আপত্তিকর তা নয়; কারণ সংবাদ-বিনিময় শব্দাবলীর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কিন্তু যা জ্ঞাপন করা হয় তা যে পরিমাণে বিদ্যার্থীর অভিজ্ঞতার মধ্যে সংগঠিত না হয়, বিজ্ঞপ্তি সেই পরিমাণে কেবল শব্দেই পরিণত হতে থাকে; অর্থাৎ নিছক ইন্দ্রিয়-উদ্দীপক ও অর্থহীন থেকে যায়। তখন তা যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া আহ্বান করার পক্ষে ক্রিয়া করে, বিবৃতির পুনরাবৃত্তি করার জন্য স্বরযন্ত্রের সদ্ব্যবহার করার যোগ্যতা আনে, হাত দিয়ে লেখবার বা "আঁক" কষার যোগ্যতা আনে।

জ্ঞাত থাকার অর্থ অবধারিত থাকা; কোনো সমস্যা নিয়ে ফলপ্রসূ পর্যালোচনা এবং তার মীমাংসার জন্য অনুসন্ধানের প্রতি, এবং মীমাংসা করার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব স্থাপনের জন্য, বিষয়-বস্তুর উপর প্রয়োজনীয় দখল থাকা। অবধারিত জ্ঞান হল সেই উপাদান কোনো সংশয়াপন্ন পরিস্থিতিতে যা স্বীকৃত, মীমাংসিত, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্চিতরূপে অবলম্বন করা যায়। অবধারিত জ্ঞান সংশয় থেকে আবিষ্কারের দিকে এক ধরনের মানস সেতু। এটির হ'ল, কোনো বুদ্ধিমান মধ্যস্থের ন্যস্তকর্ম। এই জ্ঞান মানব জাতির পূর্ব অভিজ্ঞতার মোট ফলাফলকে প্রাপ্তিযোগ্য আকারে, নতুন অভিজ্ঞতার তাৎপর্যকে বৃদ্ধি করার সংঘটক রূপে, সংক্ষিপ্ত ও লিপিবদ্ধ করে রাখে। যখন কারও কাছে বলা হয় যে, ব্রুটাশ্ সিজারকে হত্যা করেছিল, বা বলা হয় যে, কোনো বৎসরের ব্যাপ্তিকাল তিন শত পঁয়ষট্টি ও এক চতুর্থাংশ দিন, বা এই যে, বৃত্তের পরিধি তার ব্যাসের অনুপাতে ৩.১৪১৫, তখন শ্রোতা অপরের লব্ধ জ্ঞানই পায়। কিন্তু তাঁর নিজের কাছে তা হয়ে দাঁড়ায় আরো জানবার উদ্দীপক বিশেষ। তার দিক থেকে "জ্ঞান" আয়ত্ত করা নির্ভর করে যা জ্ঞাপন করা হয়েছে তার প্রতি তাঁর সাড়ার উপরে।

৩। বিজ্ঞান বা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান

বিজ্ঞান হ'ল, জ্ঞানের সর্বোত্তম চারিত্রিক রূপ। এর সীমার মধ্যে বিজ্ঞান হ'ল, জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ পরিণতির প্রতিরূপ,—জ্ঞানের পূর্ণতা। বিজ্ঞানের পাল্লার মধ্যে যা কিছু জানা থাকে তা নির্ভুল, সুনিশ্চিত, মীমাংসিত, সংশয়-

হীন। বিজ্ঞান হ'ল তাই, যা "দিয়ে" আমরা চিন্তা করি, যা "নিয়ে" চিন্তা করি,—তা নয়। বিজ্ঞানের গুরুগম্ভীর অর্থে জ্ঞানকে,—জনমত, অনুমান, দূরকল্পন এবং শুধুমাত্র সংস্কার প্রভৃতি থেকে আলাদা করা হয়। জ্ঞানের মধ্যে বিষয়-বস্তুকে এমন ভাবে সুনির্ধারিত করা হয় যে তা "এই রূপই" হবে, অন্যরূপ বলে সংশয় থাকবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাদিকে সচেতন করিয়ে দেয় যে, "বিষয়-বস্তুর" বুদ্ধিগম্য নিশ্চয়তা, আর "আমাদের" নিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য আছে। বলতে গেলে আমরা যেন সহজ প্রতীতির জন্যই সৃষ্ট হয়েছি; অল্পে বিশ্বাস করা যেন আমাদের প্রকৃতিগত। বিশৃঙ্খল মন অনিশ্চয়তা ও বুদ্ধিগত সংশয় নিয়ে থাকতে বিমুখ,—মন যেন স্বীকৃতি দিতেই তৎপর। মন পছন্দ করে, জিনিস যেমন আছে তেমনই থাকুক, অনড় থাকুক, পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই সেটা চলুক। ঘনিষ্ঠতা, জনমত ও বাসনার উপযোগিতাকে সহজেই সত্যের মানদণ্ড করে নেয়,—করে নেয় অজ্ঞতা, অভিমত ও চলিত ভ্রমের বশ্যতা স্বীকার। শিক্ষার ক্ষেত্রে, এ সব জিনিস অজ্ঞতার চাইতেও বড়ো শত্রু। এই জন্যই সক্রেটিস্‌কে বলতে হয়েছিল যে, অজ্ঞতার সচেতনতাই বিজ্ঞতার প্রতি ফলপ্রসূ অনুরক্তির আরম্ভ; আর ডিকার্টেকে বলতে হয়েছে যে, সংশয়ই বিজ্ঞানের সূতিকাগার।

৫ পূর্বে আলোচনা করেছি যে, বিষয়-বস্তু বা তথ্যের এবং ধারণাবলীর মূল্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যাচাই করে নিতে হয়। এরা মূলে পরীক্ষা সাপেক্ষ এবং অস্থায়ী। আমাদের হঠকারী স্বীকৃতি ও ঘোষণার অভিরুচি ও বিচার-বিমুখতা এই সঙ্কেত করে যে, আমরা স্বভাবতঃই পরীক্ষা প্রণালীকে সংক্ষেপ করতে তৎপর। আমরা অগভীর এবং অব্যবহিতরূপে অদূরদর্শী প্রয়োগ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। তথ্য ও ধারণা যদি মাঝারি রকম সন্তোষজনক কাজ করে, তা হলেই আমরা খুশী হয়ে ধরে নিই যে, আমাদের অঙ্গীকার সমর্থিত হয়েছে। এমন কি, বিফলতার ক্ষেত্রেও আমাদের তথ্যাবলী ও চিন্তনের অসম্পূর্ণতা ও অশুদ্ধতার উপরে দোষ না দিয়ে আমরা দোষ দিতে চাই আমাদের মন্দ ভাগ্য ও অবস্থা বিপর্যয়ের উপরে। মন্দ পরিণামকে আমাদের প্রকল্পগুলোর ভ্রান্ত ও শর্তগুলোর অসম্পূর্ণ অনুসন্ধানের উপর না চাপিয়ে (এবং এই ভাবে প্রথমটির জন্য পুনর্বিবেচনা করার উপাদান, এবং পরেরটির জন্য সম্প্রসারণের উদ্দীপক যোগাড় করে), দোষ চাপাই প্রতিকূল অদৃষ্টের

উপরে। এমন কি, আমাদের প্রকল্পের ঐ দশা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ধারণাগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার জন্য আমরা গৌরব বোধও করি।

এই সমস্ত প্রকৃতিগত প্রবণতা এবং এর থেকে যে সব কুফল আসে, তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান সতর্ক প্রহরীর প্রতিরূপে কাজ করে। শর্তাধীনে চিন্তনকে পরিচালিত করবার জন্য এবং কার্যক্রম ও ফলাফলকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য মানবজাতি যেগুলোর আস্তে আস্তে পত্তন করেছে, বিজ্ঞানের মধ্যে সেই সব বিশেষ যন্ত্রকৌশল ও নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। বিজ্ঞান হাতে তৈরী জিনিস (অর্জিত শিল্পকলা), স্বতঃস্ফূর্ত কিছু নয়; শিক্ষালব্ধ, সহজ-প্রকৃতিজাত নয়। প্রকৃতপক্ষে এটিই শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অনন্যসাধারণ ও অমূল্য স্থান নির্দেশ করে; আবার অন্যদিকে, সেই সব বিপদও নির্দেশ করে যা বিজ্ঞানের যথার্থ ব্যবহার ক্ষুণ্ণ করে। বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় ব্রতী না হলে কার্যকারীরূপে নির্দেশিত চিন্তা ধারার জন্য মানুষ এ পর্যন্ত যে সব উৎকৃষ্ট সাধকের উদ্ভাবন করেছে তা আয়ত্ত হয় না। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি যে কেবল সর্বোৎকৃষ্ট সাধকের প্রয়োগ না করেই জিজ্ঞাসা ও শিক্ষাকে পরিচালিত করে তা নয়, পরন্তু জ্ঞানের পূর্ণ অর্থ বুঝতেও সে অক্ষম হয়। কারণ যে সমস্ত লক্ষণ প্রমাণিত দৃঢ়-প্রত্যয় থেকে মতামত ও সম্মতিকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করে, ব্যক্তি তার সাথে পরিচিত হয় না। অপরপক্ষে, যেহেতু বিজ্ঞান অতি বিশিষ্ট কলাকৌশলের শর্তাধীনে জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গরূপে চিহ্নিত করে, সেই হেতু বিজ্ঞানের ফলাফল তার নিজের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে বহুদূরে থাকে। বিজ্ঞানের এই নিঃসঙ্গতাকে জনপ্রিয় ভাষায় বিমূর্ত আখ্যা দেওয়া হয়। যখন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই নিঃসঙ্গতা দেখা দেয়, তখন পূর্বপ্রস্তুত বিষয়-বস্তু উপস্থাপন করার সাথে যে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, সেটি অন্যান্য প্রকারের বিজ্ঞপ্তি থেকে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে আরও বেশী করে দেখা দেয়।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষণ-পদ্ধতিরূপে। প্রচলিত ধারণা এই যে, বিজ্ঞান হল সংগঠিত বা সুসম্বদ্ধ জ্ঞান। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, উক্ত সংজ্ঞা এই প্রচলিত ধারণার বিরোধী। এ বিরোধ অবশ্য অগভীর, এবং যখন বিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞার্থ পূর্ণ করা হয়, তখন আর এ বিরোধ থাকে না। সংগঠন নয়, পরন্তু আবিষ্কারের উপযুক্ত পদ্ধতি দ্বারা যে জাতীয় সংগঠন করা হয় তাই বিজ্ঞানকে সুচিহ্নিত

করে। একজন কৃষক যে মাত্রায় পারদর্শী, সেই মাত্রাতেই তার জ্ঞান সুসম্বদ্ধ হয়। উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সম্পর্ক-ভিত্তিতেই তা সংগঠিত হয়, সংগঠিত হয় ব্যবহারিকরূপে। জ্ঞান হিসাবে এর সংগঠন (অর্থাৎ পর্যাপ্তরূপে পরীক্ষিত ও স্থিরীকৃত হওয়ার প্রসংশনীয় অর্থে), শস্য ও গৃহপালিত পশুর সম্পর্কে এর যে সংগঠন হয়েছে, সেই জ্ঞানেরই আনুষঙ্গিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিষয়-বস্তু সংগঠিত হয় আবিষ্কার-অভিযানের সার্থক পরিচালনের সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গে, জ্ঞানাহরণের কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্মভাররূপে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে যে জাতীয় নিশ্চয়তা থাকে তার বিবেচনা এই উক্তির উপরে আলোকপাত করবে। এ হ'ল "বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন" নিশ্চয়তা,—ন্যায়সম্মত নির্ভর-পত্র। অতএব বৈজ্ঞানিক সংগঠনের আদর্শ এই যে এর প্রতিটি ধারণা ও বর্ণনা এমন ধরনের হবে যা অন্য কিছু থেকে গড়ে উঠবে, আবার অন্যান্য কিছুতে পরিচালিত করবে। ধারণা ও প্রতিপাদন পরস্পরকে ধারণ করে, সমর্থন করে। "পরিচালিত করা এবং নিশ্চিত করা" এই দ্বৈত সম্বন্ধই হল, ন্যায়সম্মত ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শব্দ দুটির অর্থ। জল সম্বন্ধে রাসায়নিকের মনে যে ধারণা থাকে তার চেয়ে জলের সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে, যেমন পান করা, কাপড় কাচা, ও জমির সেচের কাজের মধ্যে বেশী ধারণা পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীর "এইচ২O" রূপে জলের বর্ণনা, জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে স্থান ও প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী শ্রেয়। এই সাঙ্কেতিক বর্ণনা, জলের প্রকৃতিকে এমন এক ধরনে বর্ণনা করে, যা জলকে অন্যান্য জিনিসের জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে, এবং যিনি তা বোঝেন, তাঁর কাছে কি করে এই ধারণায় পৌছানো গেল এবং জিনিসের গঠন সম্বন্ধে অন্যান্য টুকরো জ্ঞানের উপরে এর তাৎপর্য কি তা নির্দেশ করে দেয়। সঠিক ভাবে বলতে গেলে এই বর্ণনা জলের বিষয়-মুখী সম্পর্ক সম্বন্ধে এর স্বচ্ছতা, তরলতা, স্বাদগন্ধহীনতা তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা প্রভৃতির মতোই একটি গুণের বর্ণনা থেকে অধিক কিছু দেখায় না। জলের এই সব সম্পর্ক যতো সত্য, জল যে দুই অণু হাইড্রোজেন আর এক অণু অক্সিজেন দিয়ে গড়া, তাও ততো সত্য। কিন্তু তথ্য নির্ধারণকল্পে আবিষ্কারের কাজ চালানোর "বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে", শেষোক্ত সম্পর্কই মূল বিষয়। কাজেই বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যরূপে সংগঠিত জ্ঞানের উপর একজনে যতো বেশী জোর দেন, বিজ্ঞানের

সংজ্ঞার্থের মধ্যে পদ্ধতির প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দিতে তিনি ততো বেশী বাধ্য থাকেন। কারণ পদ্ধতি সেই জাতীয় সংগঠন সংজ্ঞাপন করে যার গুণে বিজ্ঞান হ'ল বি-জ্ঞান।

৪। বিষয়-বস্তুর সামাজিক রূপ

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা স্কুলের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ ও পড়াশুনার বিষয় হাতে নেব, এবং জ্ঞানের যে অভিব্যক্তির কথা আমরা সম্প্রতি আলোচনা করছিলাম, তার ধারাবাহিক ক্রমপর্যায়রূপ ঐ ক্রিয়াকলাপ ও পড়াশুনার আলোচনা করব। বিষয়-বস্তুর সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। কারণ আমাদের পূর্ববর্তী মন্তব্য প্রধানতঃ তার বুদ্ধিগম্য দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এমন কি, অত্যাবশ্যক জ্ঞানের মধ্যেও প্রসার ও গভীরতার পার্থক্য থাকে। এমন কি, যে সব তথ্য ও ধারণা বাস্তব সমস্যার প্রাসঙ্গিক, এবং যারা উদ্দেশ্য দ্বারা প্ররোচিত হয় তাদের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। কারণ উদ্দেশ্যের সামাজিক পাল্লা এবং সমস্যার সামাজিক গুরুত্বের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। সম্ভাব্য উপাদান নির্বাচনের ক্ষেত্র অতিশয় বিস্তীর্ণ থাকার জন্য, শিক্ষার পক্ষে (বিশেষতঃ অত্যধিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষা ছাড়া আর সব পর্যায়েই) সামাজিক মূল্যবধারণের কোনো মানদণ্ড ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

সকল জ্ঞাতব্য বিষয় এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়-বস্তু সমাজ জীবনের অবস্থাধীনেই বের করা হয়েছে, এবং সামাজিক উপায়ে প্রচার-প্রচলন করা হয়েছে। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে, বর্তমান সমাজের সভ্যদের ধাত গঠনে এবং সাজ-সরঞ্জাম যোজনায় তার সব কিছুরই সমান মূল্য রয়েছে। যে কোনো পাঠক্রমের প্রকল্পকে বর্তমান সমষ্টিগত জীবনের প্রয়োজনের উপযোগী পাঠ্য বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যে যৌথ জীবন যাপন করি, তার উন্নতি বিধান কল্পে ঐ প্রকল্পকে এমন ভাবে বাছাই করতে হবে, যাতে অতীত থেকে ভবিষ্যৎ আরও ভালো হয়। অধিকন্তু পাঠক্রম পরিকল্পনাকালে অপরিহার্য বিষয়কে প্রথম স্থান দিতে হবে, পরিমার্জনাকে রাখতে হবে দ্বিতীয় স্থানে। যে সব জিনিস সামাজিক হিসাবে সবচেয়ে অত্যাবশ্যক, অর্থাৎ যার মধ্যে ব্যাপক জনসমষ্টি অংশ নেয়, সেই বিষয়গুলোই সারগর্ভ।

যে সমস্ত বিষয় বিশেষ বিশেষ সমষ্টির প্রয়োজন এবং কারিগরি অনুধাবন উপস্থাপিত করে, তা গৌণ। এ কথা সত্য যে, শিক্ষা প্রথমে হবে মানবিক এবং কেবল তার পরেই হবে পেশাদারী। কিন্তু যারা কথাটা বার বার বলেন, তাঁদের মনে মানবিক শব্দের অর্থে থাকে কোনো অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শ্রেণীর কথা, থাকে সেই পণ্ডিত শ্রেণীর কথা যারা অতীতের আদর্শান্বিত ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেন। তাঁরা ভুলে যান যে যে মাত্রায় কোনো উপাদান মানুষ হিসাবে মানুষদের সার্বস্বার্থ সংযুক্ত করে, উপাদান সেই মাত্রাতেই আদর্শান্বিত হয়।

যা প্রশস্তরূপে মানবিক, পাঠক্রম গঠনে সেই সমস্ত মানদণ্ডের সদ্ব্যবহারের উপরেই গণতান্ত্রিক সমাজ তার স্থিতির জন্য অনন্যরূপে নির্ভরশীল হয়ে থাকে। গণতন্ত্র সে স্থানে সমৃদ্ধিলাভ করতে পারে না, যে স্থানে শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তু নির্বাচনের কালে সাধারণের জন্য সংকীর্ণভাবে প্রকল্পিত উপযোগীতা-মূলক উদ্দেশ্যের প্রতি মুখ্য লক্ষ্য রাখা হয়, আর অল্প সংখ্যক লোকের জন্য প্রকল্পিত হয় উচ্চশিক্ষা। এই অবস্থাই হ'ল কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিজাত শ্রেণীর ঐতিহ্য। গণতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য যা সারগর্ভ, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে লিখন-পঠন-গণিতের "সারগর্ভ-, তার" ধারণা তার অজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞাতসারে এটাই ধরে নেয়া হয় যে, গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবে পরিণত করা যায় না। ধরে নেওয়া হয় যে, অতীত কালের মতো ভবিষ্যতেও জীবিকা অর্জন করা, "জীবিকা নির্বাহ করা" প্রায় সকল স্ত্রী-পুরুষের পক্ষেই এমন ধরনের কাজ করা সূচিত করবে, যা তাৎপর্যপূর্ণ নয়; যা স্বচ্ছন্দভাবে বেছে নেওয়া যায় না। যারা ও-সব কাজ করে তাদের পক্ষে তা মর্যাদাপূর্ণও নয় এবং যারা যে কাজ করে সে কাজের উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের স্বীকৃতিও নেই; এবং সেটি কেবল আর্থিক পারিতোষিকের খাতিরেই অন্যের নির্দেশ মতো তাদের করতে হয়। এই ধরনের জীবনযাত্রার জন্য, এবং কেবল এই উদ্দেশ্যেই বৃহৎ সংখ্যক লোকের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সারগর্ভ বিষয় হ'ল, পড়া, লেখা, বানান, গণিত, এবং কিছু পরিমাণে দৈহিক নৈপুণ্য, যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা। যে শিক্ষাকে উদারনীতিক বলা হয়, এই অবস্থা তাকেও অনুদারতা দ্বারা সংক্রামিত করে। জনসাধারণের গভীরতম সমস্যাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে যে জ্ঞান ও শৃঙ্খলা আসে,

তা না থাকার বিনিময়ে এই শিক্ষা কিছু পরিমাণে পরগাছা স্বরূপ হয়ে ওঠে। যে কোনো পাঠক্রমকে, যার মধ্যে সামাজিক দায়িত্বের স্বীকৃতি আছে তাকে, এমন পরিস্থিতি উপস্থাপিত করতে হবে, যেখানে সমস্যাগুলো একসঙ্গে জীবন যাপন করার সমস্যাগুলোর প্রাসঙ্গিক হবে এবং যেখানে পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞাপন, সামাজিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সামাজিক স্বার্থবোধ বিকাশের পরিপোষক হবে।

সারাংশ

শিক্ষার বিষয়-বস্তুর মধ্যে প্রধানতঃ সেই সব তাৎপর্য থাকে, যা বর্তমান সমাজ-জীবনকে আধেয় যোগায়। সমাজ-জীবনের নিরবচ্ছিন্নতার অর্থ এই যে, এই সব তাৎপর্যের অনেকটাই অতীতের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এসে পড়েছে। সমাজ-জীবন যতো বেশী জটিল হয়ে ওঠে, এই সব উপাদানের সংখ্যা ও তাৎপর্য ততো বাড়তে থাকে। তখন, নতুন বংশাবলীর মধ্যে যাতে এই সব উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রচলিত হতে পারে, সে জন্য এগুলোর বাছাই করতে হয়, সূত্র নির্ধারণ করতে হয়, এবং সংগঠন করতে হয়। কিন্তু ঠিক এই করতে গিয়েই বিষয়-বস্তুকে অপরিণতদের বর্তমান অভিজ্ঞতার তাৎপর্য বোধের সহায়ক বিষয় থেকে পৃথক ভাবে এমন ভাবে তুলে ধরার উপক্রম করা হয়, যেন বিষয়-বস্ত তার নিজগুণেই মূল্যবান। একটি বিকাশমান নাগরিকের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শিক্ষার বিষয়-বস্তুকে সংগঠিত না করেই, শিক্ষার্থী যাতে বিষয় বস্তুর ধরা-বাঁধা উক্তিগুলোকে আয়ত্ত করতে পারে ও তাদের আবৃত্তি করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে শিক্ষাদাতারা সেই ভাবে তাদের কাজের পরিকল্পনা করতে প্রলুব্ধ হন। যখন তরুণেরা কোনো সমাজ-ভিত্তিক ও ব্যবহারিক কর্মতৎপর নিয়োজন নিয়ে শিক্ষা আরম্ভ করে, এবং বৃহত্তর অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদত্ত ধারণা ও তথ্যাবলী তরুণদের অধিকতর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে আত্মীকৃত হয়ে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও নিয়মের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখনই সদর্থক মূলনীতি বজায় থাকে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পাঠক্রমে খেলাধূলা ও কাজকর্ম

১। শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজনের স্থান

আংশিকভাবে শিক্ষা সংস্কারকদের প্রচেষ্টা, শিক্ষামনোবিজ্ঞানের প্রতি অধিকতর আগ্রহ, এবং স্কুল-কক্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে বিগত পুরুষে পাঠক্রমে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিদ্যার্থীদের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য থেকে এবং সামর্থ্য নিয়ে শুরু করার বাঞ্ছনীয়তা, এই তিন দিক থেকেই বলবৎ হয়েছে। এবং শিশু ও যুবকেরা স্কুলের বাইরে যে ধরনের খেলাধূলা ও কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে পাঠক্রমের মধ্যে সেই ধরনের ক্রিয়াশীলতার সূত্রপাত করা হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান, প্রাচীন তত্ত্বের সাধারণ ও পূর্ব-প্রস্তুত ধী-গুণাবলীর স্থানে এক শ্রেণীর জটিল সহজ-প্রবৃত্তিজাত ও আবেগ-প্রবণ ঝোঁক প্রতিস্থাপিত করেছে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, স্কুলে শিশুরা যদি তাদের স্বাভাবিক আবেগকে কাজে লাগাবার উপযুক্ত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ পায়, তা হ'লে তারা স্কুলে যেতে আনন্দ পায়, তাদের তত্ত্বাবধান করার বোঝা কমে যায় এবং তাদের পক্ষে শিক্ষালাভ করা সহজতর হয়।

কখনো কখনো হয়ত কেবল এই সব কারণেই ক্রীড়া-কৌতুক ও গঠনমূলক নিয়োজনের আশ্রয় লওয়া হয়; এবং এই সঙ্গে স্কুলের "নিয়মিত" কাজের একঘেয়েমি ও পীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু এ সব কাজকে কেবল রুচিসই চিত্তবিক্ষেপ হিসাবে খাটানোর কোনো কারণ নেই। মানসিক জীবন সম্বন্ধীয় গবেষণা,—আবিষ্কার-অন্বেষণ করা, বস্তু ও হাতিয়ার নিয়ে কাজ করা, নির্মাণ করা এবং আমোদ প্রমোদের আবেগানুভূতি প্রকাশ করার বিভিন্ন সহজাত প্রবণতার মৌলিক মূল্য ব্যক্ত করেছে। যখন এই সমস্ত সহজ-প্রবৃত্তি প্রণোদিত অনুশীলন স্কুলের নিয়মিত কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তাতে শিক্ষার্থীর পূর্ণসত্তা

নিয়োজিত হয়, স্কুলের ভিতরের ও বাইরের জীবনের কৃত্রিম ব্যবধান হ্রাস পেয়ে বহুবিধ স্পষ্টতঃ শিক্ষামূলক সামগ্রী ও কর্মপ্রণালীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মনোবৃত্তি জাগে, এবং যে ধরনের সহযোগী মেলামেশা জ্ঞাপিত বিষয়কে সামাজিক কাঠামোতে স্থাপন করে, তার যোগাড় হয়। অল্প কথায়, খেলাধূলা ও কর্মকেন্দ্রিক কাজকে পাঠক্রমের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান দেওয়ার কারণ সাময়িক সুবিধা ও ক্ষণিক চিত্তবিনোদন নয়, পরন্তু তার ভিত্তি হল বুদ্ধিগত ও সামাজিক। এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা ছাড়া ফলপ্রসূ শিক্ষা-লাভের স্বাভাবিক অবস্থা আনা সম্ভব নয়; অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করার কাজটি স্কুলের চাপানো কোনো কাজ না হয়ে, হবে উদ্দেশ্যমূলক,—অর্থাৎ যার নিজস্ব একটা উদ্দেশ্য আছে, এ রকম ক্রিয়াকলাপের উপবৃদ্ধি। আরও সুনির্দিষ্টরূপে বলতে গেলে খেলাধূলা করা ও কাজকর্ম করা অবগতির প্রথম পর্যায়ের লক্ষণগুলোর সাথে পদে পদে মেলে, আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখেছি যে, এর মধ্যে থাকে, কি করে বিভিন্ন জিনিস করতে হয় তা শেখা; আর থাকে ঐ কাজ করতে গিয়ে যে সব সামগ্রী ও কর্মপ্রণালীর সাথে পরিচিতি ঘটে, তাও। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সংজ্ঞাত দর্শনের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত গ্রীকদের মধ্যে কলা ও বিজ্ঞানের জন্য একটি শব্দ ব্যবহৃত হতো, —Texun। প্লেটো জ্ঞানের বর্ণনা দিয়েছিলেন, চামার, ছুতার, বাজনাদার প্রভৃতি শ্রেণীর জ্ঞানের বিশ্লেষণের ভিত্তির উপরে। এবং তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, এদের শিল্পকলার মধ্যে উদ্দেশ্য থাকে, বস্তু বা সামগ্রীর উপর প্রভুত্ব থাকে, প্রয়োগ কৌশলের নিয়ন্ত্রণ থাকে,—থাকে কার্যক্রমের নির্দিষ্ট ধারা। এবং বুদ্ধিগত দক্ষতা বা কলাসৃষ্টির জন্য এর সব কিছুই জানা দরকার।

অবশ্য শিশুরা স্কুলের বাইরে খেলাধূলা ও কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে বলে, বহু শিক্ষকের মনে হয়েছে যে, স্কুলে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন বিষয় নিয়েই শিশুদের সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। যে ভাবেই হোক শিশুরা যা নিশ্চয়ই করবে, তার পুনরাবৃত্তি করার দিক হিসাবে স্কুলের সময় অতীব মূল্যবান। কোনো কোনো সামাজিক অবস্থায় এই যুক্তির গুরুত্ব থাকে। যেমন প্রথম প্রবর্তনকারীদের আমলে বাইরের বৃত্তি সুনির্দিষ্টরূপে একটা মূল্যবান বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষা দিত। অন্যদিকে এই সব বৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট পুস্তক এবং অন্যান্য

জিনিসও দুর্লভ এবং অনধিগম্য ছিলঃ কোনো সঙ্কীর্ণ ও স্থূল পরিবেশের মধ্যে থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল ঐ সব উপকরণ যেখানেই এই ধরনের অবস্থা চালু আছে, সেখানেই স্কুলের কাজকর্মকে পুস্তকের মধ্যে নিবিষ্ট রাখার স্বপক্ষে অনেক কিছু বলার থাকে। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরিস্থিতি অনেকটা অন্য রকমের। তরুণেরা যে সব কাজে নিযুক্ত হতে পারে, সে সব কাজ বিশেষতঃ নগরাঞ্চলে, বেশীর ভাগই শিক্ষা বিরোধী। শিশু-শ্রমিক নিষিদ্ধ করা যে একটা সামাজিক কর্তব্য হয়েছে, সেটিও এই কথার সাক্ষ্য দেয়। অন্যদিকে, ছাপানো বিষয়কে এত সস্তা করা হয়েছে যে সেটি অত্যন্ত ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। এবং বুদ্ধিগত চর্চার সুযোগ-সুবিধাও এত বেড়েছে যে, পুরানো ধরনের পুঁথিগত কাজের শক্তি সেকালে যা ছিল, একালে তা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকাংশ অবস্থাতেই বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিক্ষালব্ধ কোনো ফল হ'ল খেলাধূলা ও কাজকর্মের উপজাত ফল। এ সব অবস্থায়, শিক্ষালব্ধ ফল হ'ল আনুষঙ্গিক,—প্রাথমিক নয়। কাজেই যে শিক্ষামূলক ক্রমবিকাশ হয় তা কম বেশী আকস্মিক। অনেক কাজকর্মই উপস্থিত শ্রমশিল্পভিত্তিক সমাজের দোষ-ত্রুটির অংশীদার। এই সকল দোষ-ত্রুটি যথার্থ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রায় মারাত্মক। ক্রীড়া-কৌতুক, পরিবেশের পরিণত বয়স্ক জীবনধারার অপকর্ষ ও উৎকর্ষ উভয়েরই পুনরুত্থাপন ও সমর্থন করে। স্কুলের ন্যস্ত কাজ হ'ল এমন পরিবেশ স্থাপন করা যার মধ্যে ক্রীড়া-কৌতুক ও ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হবে অভিপ্রেত মানসিক ও নৈতিক ক্রমবিকাশকে সহজ করার প্রসঙ্গে। কেবল ক্রীড়া কৌতুক এবং হাতের কাজ ও সামগ্রী সম্বলিত অনুশীলন প্রবর্তন করাই যথেষ্ট নয়। যে পন্থায় এ সব জিনিসকে কাজে খাটানো হয়, সেই পন্থার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে।

২। প্রাপ্তব্য বিভিন্ন নিয়োজন

স্কুলে যে সব ক্রিয়াকলাপ ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, শুধু তার একটা তালিকা দেখলেই বোঝা যায় যে, হাতের কাছেই জিনিসের কি রকম সমৃদ্ধ

ক্ষেত্র রয়েছে। কাগজ, কার্ডবোর্ড, চামড়া, কাপড়, সুতা, কাদা, বালি, ধাতু ইত্যাদি নিয়ে হাতিয়ারের সাহায্যে বা বিনা হাতিয়ারেই কাজ করা হয়। যে সব ক্রিয়াপ্রণালীকে কাজে লাগানো হয়, তা হ'ল ভাঁজ করা, কাট-ছাঁট ও ফোঁড়া-ফুড়ি করা, ছাঁচে ঢালাই করা, কাদার কাজ করা, প্যাটার্ন বা ছাঁচ তৈরী করা, গরম ও ঠাণ্ডা করা ইত্যাদি। এর সাথে থাকে হাতুড়ি, করাত, ফাইল ইত্যাদি সাধকের চারিত্রিক ক্রিয়া। বাইরে যাওয়া, বাগানের কাজ, রান্না, সেলাই, ছাপার কাজ, বই বাঁধানো, বোনার কাজ, পেণ্ট করা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়, গল্প বলা, পড়া, লেখা, ইত্যাদি কাজের সামাজিক লক্ষ্য সম্বলিত সক্রিয় অনুধাবন (কেবল ভবিষ্যতের ব্যবহারের উপযুক্ত দক্ষতা লাভের জন্য নয়) এবং আরও অসংখ্য খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ, বিভিন্ন নিয়োজনের কতক কতক ধরন নির্দেশ করে।

শিক্ষাবিদের সমস্যা হ'ল, এই সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শিক্ষার্থীকে এমন সব পন্থায় নিযুক্ত করা, যাতে একদিকে যেমন শ্রমদক্ষতা ও কারিগরি পারদর্শীতা লাভ করা যায়, এবং এই কাজের মধ্যে অব্যবহিত সন্তুষ্টি আসে ও পরবর্তী কার্যোপযোগীতার প্রস্তুতি হয়, অন্যদিকে তেমনি এই সব নিয়োজন "শিক্ষালাভের" অধীনস্থ থাকে,—অর্থাৎ বুদ্ধিগত ফলাফলের ও সমাজবদ্ধ মানসতা গঠনের অনুগামী থাকে। এই মূল নীতি কি সূচিত করে?

প্রথমতঃ, এই নীতি কতকগুলো অভ্যস্ত প্রথাকে বাতিল করে দেয়। যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্র ও হুকুমের অনুসরণ করে, কিম্বা ব্যতিক্রমহীন পূর্বপ্রস্তুত নমুনাকে পুনরুত্থাপিত করে, তা পেশীয় নৈপুণ্য দিতে পারে, কিন্তু তাতে উদ্দেশ্যের উপলব্ধি ও বিস্তারের প্রয়োজন হয় না। কিম্বা তা (এই কথাই অন্য ভাবে বলতে গেলে) উপায় নির্বাচন ও অবলম্বন করার জন্য বিচার বুদ্ধির প্রয়োগের অবকাশ আনে না। যাকে ঠিক ঠিক হাতের কাজের শিক্ষানবিসি বলা হয়, কেবল তাতেই নয়, পরন্তু অনেক ঐতিহ্যিক কিণ্ডারগার্টেনের অনুশীলনমালাতেও এখানেই ভুল করেছে। অধিকন্তু, ভুল করার সুযোগ একটা আনুষঙ্গিক প্রয়োজন। ভুল করা কোনো কালেই বাঞ্ছনীয় নয়; ভুল করার কথা এই কারণে ওঠে যে, যে সব উপাদান ও হাতিয়ার ভুল করার সম্ভাবনা নিষিদ্ধ করে, তা নির্বাচন করার জন্য অত্যধিক প্রযত্ন, ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সীমাবদ্ধ করে দেয়,

বিচার-বুদ্ধিকে ন্যূনতম পরিমাণে সঙ্কুচিত করে, এবং এমন সব প্রণালী অবলম্বন করতে বাধ্য করে, যা জীবনের জটিল পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অতিপরোক্ষ। এ ভাবে যে ক্ষমতা লাভ করা হয় তা কাজের সময় খাটানো যায় না। এ কথা খুবই সত্য যে তরুণেরা তাঁদের কার্য-নির্বাহী ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করতে এবং তাঁদের ক্ষমতার বাইরের প্রকল্পকে নির্বাচিত করতে তৎপর। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যোগ্যতার সীমাটাও শিখতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের মতো এই সীমাও পরিণামের অভিজ্ঞতা দিয়ে শেখা হয়। এখানে আশঙ্কা থাকে যে, তরুণেরা অতিশয় দুরূহ প্রকল্পে হাত দিয়ে কেবল তাল-গোল পাকিয়েই ফেলবে ; এবং তাতে কেবল স্থূল ফলই পাবে না (যা ছোট ব্যাপার), পরন্তু স্থূল মানদণ্ডেও অভ্যস্ত হবে (যা গুরুতর ব্যাপার)। কিন্তু শিক্ষার্থী যদি সময় থাকতে তার কর্মকুশলতার স্বল্পতা উপলব্ধি করতে না পারে, এবং তার ফলে যে সব অনুশীলনের সাহায্যে তার ক্ষমতা পুষ্ট হতে পারে, তার জন্যে উদ্দীপক না পায়, তা হলে সে দোষ হবে শিক্ষকেরই। এদিকে শিক্ষার্থীকে খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অতি নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রিত খণ্ড খণ্ড কাজে নিযুক্ত করে নিয়ে বাহ্যিক পূর্ণাঙ্গতা লাভ করানোর চেয়ে, তার সৃজনশীল ও গঠনমূলক মনোভাবকে বাঁচিয়ে রাখা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কোনো জটিল কাজের যে অংশগুলো শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের মধ্যে থাকে, সেগুলোকে নির্ভুল ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমাধা করার উপর জোর দেওয়া যেতে পারে।

অজ্ঞাত কারণে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার প্রতি সন্দেহ, এবং তার ফলে নিয়ন্ত্রণ করার আতিশয্য, উপকরণ যোগানোর ক্ষেত্রেও যেমন দেখা যায় শিক্ষকের আদর্শের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা যায়। শ্রমশালাতে, হাতের কাজ শেখানোর কর্মশালাতে, ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনে ও মণ্টেশ্বরীর শিশুভবনে, সর্বত্রই অশোধিত উপাদানের ভয় দেখা যায়। যে সমস্ত উপাদানকে ইতিপূর্বেই মনের পূর্ণাঙ্গকারী কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তারই চাহিদা থাকে। এই চাহিদা কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজনের বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রেও যতো দেখা যায়, উচ্চশিক্ষার পুঁথিগত বিদ্যার ক্ষেত্রেও ততো দেখা যায়। এ কথা সত্য যে, এই ধরনের উপাদান শিক্ষার্থীর ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রিত রেখে তার ভুলভ্রান্তি রোধ করবে। কিন্তু এ ধারণা প্রতারণামূলক যে, কোনো শিক্ষার্থী এই ধরনের

উপাদান নিয়ে কাজ করলে, ঐ উপাদানকে প্রথমে রূপ দেওয়ার সময় যে সব বোধবুদ্ধি খাটানো হয়েছে, শিক্ষার্থী কোনো প্রকারে তাও আত্মস্থ করে নেবে। কেবল অশোধিত উপাদান নিয়ে আরম্ভ করে এবং তাকে সদুদ্দেশ্যে খাটিয়েই, পুনর্গঠিত উপাদানের মধ্যে যে সব বোধবুদ্ধি নিহিত রয়েছে, শিক্ষার্থী তা লাভ করতে পারে। কার্যতঃ, সুগঠিত উপাদানের প্রতি অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে গাণিতিক গুণাবলী অতিরঞ্জিত হয়ে আসে; কারণ আয়তন, আকার ও অনুপাত সম্বন্ধীয় বিষয়, এবং তার থেকে যে সব সম্পর্ক আসে, বুদ্ধি সেই সব ভৌত বিষয়ের মধ্যেই তার লাভ দেখতে পায়। কিন্তু যে সব উদ্দেশ্যে ঐ সব উপাদানের প্রতি মনোযোগের দরকার, সেই সব উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার ফলে যখন উপাদানের উপলব্ধি জন্মে, কেবল তখনই ঐ সব উপাদান "জানা হয়"। কোনো উদ্দেশ্য যতো বেশী মানসিক হয়,—অর্থাৎ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে সব উদ্দেশ্যের আবেদন আছে, ঐ উদ্দেশ্যটি তার যতো নিকটবর্তী হয়,—জ্ঞান ততোই বাস্তব হয়। যখন কোনো ক্রিয়াশীলতার উদ্দেশ্য উক্ত গাণিতিক গুণ নিরূপণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তার জ্ঞান হয় কেবল কারিগরি জ্ঞান।

কোনো কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজনের যে প্রধানতঃ "গোটা বিষয়ের" সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত, তা, ঐ নীতিরই আর একটি স্বীকৃতি বিশেষ। শিক্ষার উদ্দেশ্যে "গোটা বিষয়," ভৌত বিষয় নয়। বুদ্ধির দিক দিয়ে কোনো "গোটা বিষয়ের" উপস্থিতি নির্ভর করে সংশ্লিষ্টতা বা স্বার্থবোধের উপরে; তা গুণগত,—কোনো পরিস্থিতির প্রতি আগ্রহের সম্পূর্ণতা। উপস্থিত উদ্দেশ্যের ধার না ধরে কেবল সুদক্ষ ক্রিয়া-কৌশল গঠনে অতিরিক্ত ব্রতী হওয়া, উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন অনুশীলন পদ্ধতির পরিকল্পনার মধ্যে সর্বদাই প্রকাশ পায়। শ্রমশালার কাজের মধ্যে রাখা হয় নির্ভুলভাবে পরিমাপ করার কাজের চাপ, যাতে পদার্থবিদ্যার মৌলিক এককগুলোর জ্ঞান আয়ত্তে আসে। যে সমস্ত সমস্যা এই সব একককে গুরুত্বপূর্ণ করে, তার সাথে যোগ না রেখেই, বা, যে সমস্ত পরিকল্পিত ক্রিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতির হাত দিয়ে ব্যবহার করাকে সাবলীল করে, তা বাদ দিয়েই মাপামাপি শুরু করা হয়। আবিষ্কার ও পরখ করার যে সব উদ্দেশ্য ক্রিয়াকৌশলকে তাৎপর্যপূর্ণ করে, তার থেকে স্বতন্ত্রভাবেই ক্রিয়াকৌশলকে আয়ত্ত করা হয়। কিণ্ডারগার্টেনের কাজগুলো

কিউব, গোলক ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাপন করার জন্য, এবং নিপুণভাবে জিনিসকে খাটাতে পারবার কিছুটা অভ্যাস গঠনের জন্য পরিকল্পিত হয় (কারণ সব সময়েই সব কিছুই "ঠিক এই এই ভাবে করতে হবে")। অধিকতর প্রাণবন্ত উদ্দেশ্যের অভাবটি ব্যবহৃত উপাদানের তথাকথিত প্রতীকতা দ্বারা পরিপূরিত হয় বলে মনে করা হয়। হাতের কাজ করার প্রশিক্ষণকে কোনো পর্যায়-ক্রমিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ন্যস্ত কর্মে পরিণত করা হয়, যাতে পর পর এক একটি হাতিয়ারের উপর এবং নির্মাণ কার্যের নানাবিধ উপকরণের উপর কারিগরি যোগ্যতা আসতে পারে—এ যেন বিভিন্ন গাঁটের জট ছাড়ানোর মতো। যুক্তি দেখানো হয় যে, আসল নির্মাণ কার্যে হাত দেওয়ার আগে, হাতিয়ার গুলো "কি করে" ব্যবহার করতে হয় তা শিখতেই হবে,—যেন শিক্ষার্থীরা নির্মাণের কার্য প্রণালীর মধ্যে দিয়ে সেই "কি করে"-টা শিখতে পারে না। শব্দ মুখস্থ করার বিকল্প ব্যবস্থারূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কর্মকেন্দ্রিক প্রয়োগের প্রতি পেস্টালজির ন্যায্য পীড়াপীড়ি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে "বস্তু পাঠের" সেই সব প্রকল্পই রেখে গেছে, যেগুলি নির্বাচিত বস্তুর সবগুলি গুণের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচিতি ঘটানোর জন্য অভিপ্রেত হয়েছিল। এখানেও একই ভুল দেখা যায়। কারণ সব ক্ষেত্রেই এটা ধরে নেওয়া হয় যে, বুদ্ধি খাটিয়ে বস্তু ব্যবহার করার আগে তার গুণাবলী জানতেই হবে। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য বুদ্ধি খাটিয়ে (অর্থাৎ উদ্দেশ্য নিয়ে) জিনিসপত্রকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়কে স্বাভাবিক ভাবে খাটানো হয়। কারণ তাতে যে গুণাবলী উপলব্ধ হয়, কার্যসাধনের মধ্যে সেগুলোকেই উপকরণ হিসাবে গণ্য করতে হয়। যখন একটি ছেলে একখানা ঘুড়ি তৈরী করছে, তখন কাঠের রোয়া ও কাঠের অন্যান্য গুণাবলী, আয়তন, কোণ, বিভিন্ন অংশের আনুপাতিক হিসাব ইত্যাদির প্রতি ঐ ছেলেটির যে মনোবৃত্তি থাকে, তার সাথে অন্য একটি ছেলের—যে ছেলেটি একখানা কাষ্ঠফলক নিয়ে বস্তুমুখী পাঠ করছে, এবং যার কাছে কাঠের ও কাঠের গুণাবলীর একমাত্র ন্যস্ত কর্ম ছিল তাঁর "পড়া-করার" বিষয়-বস্তুরূপে কাজ করা, তাঁর মনোবৃত্তির পার্থক্য দেখুন।

শিক্ষাদান ক্ষেত্রে "সরল" ও "জটিল" বিষয় সম্বন্ধে যে সব ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, তার কারণ হল কোনো পরিস্থিতির কার্মিক বিকাশই যে মনের উদ্দেশ্যে কোনো "গোটা জিনিসকে" গঠন করে, তা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ

হওয়া। যে লোকটি একটি বিষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তার কাছে সহজ বিষয় হ'ল তাঁর উদ্দেশ্য—অর্থাৎ তিনি যে ভাবে উপাদান, হাতিয়ার বা কারিগরি কর্মপ্রণালী কাজে লাগাতে চান, কাজে পরিণত করার প্রণালীটা যতো জটিলই হোক না কেন। উদ্দেশ্যের একত্ব, এবং তার সাথে সে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ থাকে তার প্রতি একাগ্রচিত্ততা, কর্ম-ধারার মধ্যে যে সব উপাদানকে গ্রাহ্য করতে হবে তাদের সহজ করে আনে। কোনো "গোটা" কাজকে সামগ্রিক ভাবে চালু রাখার পথে প্রতিটি উপাদান যে অংশ দেয় উদ্দেশ্যের একত্ব সেই অনুসারে তাকে "একটি মাত্র" অর্থ দেয়। কর্ম-প্রণালীর মধ্যে দিয়ে যাওয়া শেষ হওয়ার "পরে" তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গুণ ও সম্পর্ককে উপাদান বলা হয়, এবং প্রতিটি উপাদানের এক একটি নির্দিষ্ট অর্থ দাঁড়ায়। যে ভ্রান্ত ধারণার কথা বলা হয়েছে, তা হল ওস্তাদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা, অর্থাৎ যে দেখাতে উপাদান আগে থেকেই বর্তমান থাকে এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজ থেকে উপাদান পৃথক হয়ে থাকে। আর এটিই প্রথম শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ জিনিস বলে উপস্থাপিত হয়।

কিন্তু এখন একটি সদর্থক উক্তির সময় হয়েছে। কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজন কোনো কিছু করার উপস্থাপন, পড়াশুনোর নয়। এ ছাড়া তার শিক্ষা-মূলক তাৎপর্য থাকে কোনো সামাজিক পরিস্থিতির নমুনা তুলে ধরার মধ্যে। মানুষের মৌলিক সর্বজনীয় স্বার্থ, খাদ্য, গৃহ, পরিধেয় ও গৃহস্থালীর সরঞ্জামকে এবং উৎপাদন, বিনিময় ও বিষয় ভোগের কল-কৌশলকে কেন্দ্র করে চলে। জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন—এবং এই প্রয়োজনকে যে সব বেশভূষা দিয়ে সাজানো হয়,—এই দুটো দিকের উপস্থাপনই মানুষের সহজ প্রবৃত্তিকে গভীরে নাড়া দেয়। এ সব প্রয়োজন সামাজিক গুণবিশিষ্ট নানাবিধ ঘটনা ও নিয়মনীতি দ্বারা পরিপৃক্ত।

বাগানের কাজ, কাপড়-বোনার কাজ, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, রান্না ইত্যাদি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত মৌলিক মানবিক স্বার্থকে স্কুলের সঙ্গতির মধ্যে টেনে আনলে, স্কুলকে কেবল ভাত কাপড়ের মূল্য দেওয়া হবে বলে যে অভিযোগ আসে, তা এ সব কাজের গোড়ার কথাটা দেখে না। যদি মানব গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোক তাঁদের শ্রমশিল্পকেন্দ্রিক নিয়োজনের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ছাড়া আর কিছু দেখতে না পাওয়া সত্ত্বেও এটা ধরেই

নেয় যে, সত্তা বজায় রাখার জন্য ওগুলো সহ্য করতে হবেই তাহলে দেখা যাবে যে দোষটা কিন্তু বৃত্তির নয়, পরন্তু দোষ রয়েছে সেই ব্যবস্থার মধ্যে যার অধীনে শ্রমশিল্প পরিচালিত হয়। সমসাময়িক জীবনে অর্থনীতিক উপকরণগুলোর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরও বেশী করে এই প্রয়োজন এনে দিয়েছে যে, শিক্ষাব্যবস্থাকে শ্রমব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক আধেয় ও সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্ত করতে হবে। কারণ স্কুলে কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজন আর্থিক লাভের জন্য পরিচালিত হয় না, পরিচালিত হয় তার নিজ নিজ আধেয়'র জন্য। অবান্তর প্রসঙ্গ ও মজুরি আদায়ের চাপ থেকে মুক্ত থাকাতে, স্কুলের বৃত্তি এমন ধরনের অভিজ্ঞতা যোগায়, যা নিজ গুণেই মূল্যবান। এরা যথার্থই উদার গুণবিশিষ্ট।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বাগানের কাজ ভবিষ্যৎ মালী তৈরী করার জন্য বা মনোরম উপায়ে কালক্ষেপ করার জন্য শেখাবার প্রয়োজন নেই। জাতির ইতিহাসে কৃষি ও বাগ-বাগিচার যে স্থান ছিল, এবং বর্তমান সমাজ সংস্থার মধ্যে এরা যে স্থান অধিকার করে আছে, বাগানের কাজ সেই জ্ঞানের মধ্যেই প্রবেশ-পথ খুলে দেবে। শিক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত কোনো পরিবেশের মধ্যে এ কাজ চালালে তা হয়ে দাঁড়ায়, চারা গাছগুলির বৃদ্ধি, জমির রসায়ন, আলো, বায়ু ও আর্দ্রতার নির্দিষ্ট ক্রিয়া, ক্ষতিকর ও সহায়ক জীবাণু ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যাবলী অনুশীলন করার উপায় মাত্র। উদ্ভিদ্ বিদ্যার প্রথম পাঠের মধ্যে এমন কোনো জিনিস নেই, যা বীজকে পল্লবিত করার জন্য যত্ন-প্রসঙ্গে, জীবন্তরূপে উপস্থাপিত করা না যায়। এ ক্ষেত্রে, বিষয়-বস্তুটি উদ্ভিদ্-বিদ্যা নামক একটি বিকট পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে জীবন-বিধির অন্তর্ভুক্ত হবে ; এবং অধিকন্তু সেটি জমি, প্রাণী-জীবন ও মানব-সম্পর্ক সম্বলিত ঘটনাচক্রের সঙ্গে তার স্বাভাবিক অনুবন্ধে স্থাপিত হবে। শিক্ষার্থীরা যতো পরিণত হতে থাকবে, ততোই তাঁরা এমন সব উৎসাহব্যঞ্জক সমস্যাদি উপলব্ধি করবে, যেগুলি বাগান করার প্রাথমিক সরাসরি উৎসাহ ছাড়াই আবিষ্কারের জন্য অনুধাবন করা যেতে পারে। এ সব সমস্যা বীজ অঙ্কুরিত হওয়া, উদ্ভিদের পুষ্টি, ফলফলাদির পুনরুৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে জড়িত। এইভাবে ক্ষেত করার আগ্রহ, সুচিন্তিত বুদ্ধিগত অনুসন্ধানে রূপান্তরিত হয়।

কাঠের কাজ, রান্না এবং পূর্বের তালিকার অন্যান্য যাবতীয় স্কুল-নিয়ো-

জনের সম্পর্কেও এই দৃষ্টান্তটি খাটে। এই প্রসঙ্গে বলা সঙ্গত যে, জাতির ইতিহাসে, নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামাজিক বৃত্তি থেকেই ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে। নানাবিধ হাতিয়ার ও কল-কবজার ব্যবহার থেকেই আস্তে আস্তে পদার্থবিদ্যা বিকাশলাভ করেছে; পদার্থবিদ্যার যে গুরুত্বপূর্ণ শাখাকে বলবিদ্যা বলা হয়, তার নামের মধ্যেই তার আদি অনুষঙ্গের সাক্ষী রয়েছে। মানুষের প্রথম ও প্রধান বুদ্ধিগত আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে লীভ্যার, চাকা, আনত সমতল ইত্যাদি; এবং তা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে কিছু কম বুদ্ধিগত নয়। বিগত পুরুষে তড়িৎ বিজ্ঞানের যে বিশাল প্রসার ঘটেছে, তা কার্য ও কারণ-রূপে যোগাযোগ, যানবাহন, শহর ও বাড়ী আলোকিত করা, এবং সস্তায় মাল তৈরী করার নানাবিধ উপায়ের প্রতি বৈদ্যুতিক সংঘটকের প্রয়োগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অধিকন্তু এগুলো সামাজিক উদ্দেশ্য; এবং যদিও এরা ব্যক্তিগত লাভের উপায়ের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, ঐ সংঘটক-গুলি তাঁর কারণ নয়; সেটি এই কারণে হয়েছে যে এ সব ব্যবস্থাকে ব্যক্তি-গত ব্যবহারের দিকে বাঁকানো হয়েছে:—এই অবস্থা স্কুলের উপরে আগামী পুরুষের মনে সর্বসাধারণের বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে এই সব সংঘটকের যোগসূত্রকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এই ভাবেই রং করা, রং ছাড়ানো, ধাতুর কাজ করা ইত্যাদি বৃত্তির মাধ্যমে রসায়ন সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে, রসায়ন শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রকারের নতুন নতুন কাজে লাগছে।

বর্তমানে গণিত অতি উচ্চস্তরের বিমূর্ত বিজ্ঞান। কিন্তু জ্যামিতির আক্ষরিক অর্থ হল জমির মাপ। সামগ্রীর পরিমাণের খেয়াল রাখার জন্য এবং মাপ-জোখ করার জন্য সংখ্যা যখন প্রথমে উদ্ভাবিত হয়েছিল, তার চেয়েও সংখ্যার প্রয়োগ আজকের দিনে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই সব বিচার-বিবেচনা (যা যে কোনো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা যেতে পারে), জাতির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তের বা গোড়ার হাতুড়ে স্তরের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য যুক্তি প্রমাণ দেওয়া নয়। পরন্তু এই বিচার-বিবেচনা, বিভিন্ন ক্রিয়াশীল নিয়োজনকে বৈজ্ঞানিক পাঠের সুযোগ-সুবিধারূপে ব্যবহার করার সম্ভাব্যতাই দেখিয়ে দেয়। এই সম্ভাব্যতা, আগের যে কোনো কালের চেয়ে

একালে অনেক বেশী। সমষ্টিগত মানব জীবনের অতীতের দিকেই তাকাই, আর তার ভবিষ্যতের দিকেই তাকাই, সমাজের দিক থেকে এই সব সুযোগ-সুবিধা একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য পৌর ও অর্থবিজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করার সর্বাধিক প্রত্যক্ষ পথ রয়েছে সমাজ জীবনে শ্রমশিল্প সংস্থার স্থান ও ন্যস্ত কর্মের বিচার-বিবেচনার মধ্যে। বয়স্ক ছাত্রদের জন্যও সমাজ বিজ্ঞান অধিকতর কম বিমূর্ত ও বিধিবদ্ধ হবে, যদি তাকে বিজ্ঞান হিসাবে (সূত্রবদ্ধ জ্ঞান হিসাবে) কম ব্যবহার করা যায় এবং শিক্ষার্থী যে সব সমাজ সমষ্টির মধ্যে অংশ নেয়, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে বিষয়-বস্তুকে যে ভাবে দেখা যায়, তাকেই যদি প্রত্যক্ষ বিষয়-বস্তুরূপে বেশী ব্যবহার করা যায়।

বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে বিভিন্ন নিয়োজনের সম্পর্ক যতো ঘনিষ্ঠ, বিজ্ঞানের পদ্ধতির সঙ্গে তার সম্পর্কও অন্ততঃ ততো ঘনিষ্ঠ। যে সব যুগে নিত্যকার জীবনের পদার্থ ও কর্ম-প্রণালীর প্রতি, বিশেষতঃ যারা হাতের কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল তাদের প্রতি বিদ্বান লোকদের অবজ্ঞা ছিল, সেই সব যুগেই বিজ্ঞানের প্রসার মন্থর ছিল। এই অবজ্ঞার ফলে পণ্ডিতেরা সাধারণ তত্ত্ব থেকে, প্রায় তাঁদের মাথার মধ্যে থেকেই, ন্যায়ের যুক্তিতর্ক দিয়ে জ্ঞানের বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন। আলের মধ্যে মোম-মাখা সুতা জড়িয়ে চামড়ার মধ্যে ফোঁড় দেওয়া থেকে বিদ্যা আসবে এটা ভাবা যতো অর্থহীন, ভৌত পদার্থের উপর বা ভৌত পদার্থ নিয়ে কাজ করে, যেমন পাথরের উপর এসিড ঢেলে কি হয় তা দেখে, বিদ্যা আসবে এই রকম ভাবাটাও তাঁদের কাছে ততোই অর্থহীন ছিল। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বলিত পদ্ধতির উদ্ভব প্রমাণ করেছে যে, সংলগ্ন অবস্থা নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখলে ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ন্যায়ের নিঃসঙ্গ যুক্তিতর্কের চেয়ে জ্ঞান লাভ করার ঠিক ঠিক পদ্ধতির একটা শ্রেষ্ঠতর নমুনা যোগায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি বিকাশলাভ করেছে সপ্তদশ এবং তার পরবর্তী কয়েক শতকে। এবং যখন মানুষের ব্যবহারের জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখবার প্রশ্নের মধ্যে মানুষের নানা স্বার্থ কেন্দ্রীভূত হল, তখন এই পদ্ধতিই জ্ঞানলাভের সর্ববাদীসম্মত উপায় হয়ে দাঁড়াল। যে সকল ক্রিয়াশীল বৃত্তির মধ্যে ব্যবহারের উপযোগী পরিবর্তন সাধন করার অভিপ্রায়ে ভৌত জিনিসের উপর "হাতিয়ার" চালানো হয়, সেই সব বৃত্তিই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির সর্বাধিক প্রাণবন্ত পরিচয়-পত্র হয়ে ওঠে।

৩। কাজকর্ম ও খেলাধূলা

যাকে কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজন বলা হয়েছে, তার মধ্যে কাজও থাকে, আবার খেলাও থাকে। খেলাধূলা ও শ্রমের কাজকে যতো পরস্পর বিরোধী বলে ধরা হয়, মৌলিক অর্থে কিন্তু তারা আদৌ তা নয়। এই প্রচণ্ড প্রভেদের জন্য অবাঞ্ছনীয় সামাজিক অবস্থাই দায়ী। খেলা ও কাজ উভয়ের মধ্যেই জ্ঞাতসারে একটা স্বীকৃত উদ্দেশ্য থাকে; এবং অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন উপাদান ও কর্মপ্রণালীর নির্বাচন এবং অভিযোজনও থাকে। এদের মধ্যে যে পার্থক্য তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সময় ব্যবধানের ব্যাপার। এই সময়-ব্যবধান উপায় ও উদ্দেশ্যের যোগসূত্রের প্রত্যক্ষতাকে প্রভাবিত করে। খেলাধূলার মধ্যে স্বার্থবোধ অধিকতর প্রত্যক্ষ। যখন বলা হয় যে খেলাধূলার মধ্যে কর্মতৎপরতাই তার একটা নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং তার আর কোনো না-দেখা উদ্দেশ্য নেই, তখন তাতে প্রত্যক্ষতারই ইঙ্গিত মেলে। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় যে, খেলার মধ্যের কর্মতৎপরতা ক্ষণস্থায়ী, এবং এর মধ্যে অগ্রে দৃষ্টি রাখার বা অনুধাবন করার উপযুক্ত কোনো উপকরণ থাকে না, তাহ'লে তা ভুল হবে। যেমন, শিকার করা বয়স্ক লোকদের একটা অতি সাধারণ খেলা। কিন্তু এর মধ্যে অগ্রদৃষ্টি, এবং একজনে যার প্রতি প্রহরা রাখছেন তা দিয়ে তার উপস্থিত কর্মতৎপরতার পরিচালন স্পষ্টতঃই দেখা যায়। কোনো "সময়ানুরূপ" ক্রিয়া যেন নিজ থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ,—যখন কোনো কর্মতৎপরতাকে এই অর্থে তার নিজ উদ্দেশ্য বলা হয়, তখন সেটি হয়ে ওঠে অবিমিশ্র ভৌতিক কাজ এবং তার কোনো অর্থ হয় না (দেখুন পৃঃ ১৩৫)। সংশ্লিষ্ট লোকটি হয় একেবারে অন্ধভাবেই সচল থাকছেন, সম্ভবতঃ অবিকল অনুকরণবশতঃ, নয়তো তিনি উত্তেজনার মধ্যে আছেন, যে অবস্থাটা অবশ্য তার মন ও নার্ভের পক্ষে ক্ষয়কারী। কিণ্ডার-গার্টেনের খেলার কয়েকটি ধরনের মধ্যে এই দু'রকমের ফলই দেখা যায়; তার মধ্যে খেলার ধারণা এতো বেশী প্রতীকগত যে, কেবল বয়স্ক লোকেরাই সে বিষয় সচেতন থাকেন। সেখানে শিশুরা যদি তাদের নিজেদের মনোমত একেবারে বিভিন্ন কোনো ধারণা দিয়ে বুঝে না নিতে পারে, তা হলে, হয় তারা কোনো সম্মোহনী বিহ্বলতার মধ্যে চলতে থাকে, নয়তো কোনো

সরাসরি উত্তেজনার প্রতি সাড়া দিতে থাকে।

এই সব মন্তব্যের সার কথা এই যে, কোনো নির্দেশকারী ধারণারূপে খেলার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং সেটাই এর কর্মপরম্পরাকে অর্থদান করে। যাঁরা খেলছেন তাঁরা যে কেবল একটা কিছু করছেন (শরীর চালনা করছেন) তা নয়, পরন্তু তাঁরা কিছু একটা করতে, কোনো একটা ফল ঘটাতে "চেষ্টা করছেন।" এই মনোভাবের মধ্যে একটা পূর্বানুমিত অগ্রদৃষ্টি থাকে। সেটাই তাঁদের উপস্থিত সাড়াকে উদ্দীপিত করে। পূর্বানুমিত ফল অবশ্য জিনিস-পত্রের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপার না হয়ে, কোনো পরবর্তী ক্রিয়ার রূপ নিয়ে আসে। কাজেই খেলাধূলা হয়ে থাকে স্বচ্ছন্দগতি-বিশিষ্ট ও নমনীয়। যখন কোনো নির্দিষ্ট বাহ্যিক পরিণতি চাওয়া হয়, তখন উদ্দেশ্যটাকে কিছু পরিমাণ অবিচলিত ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে হয়, এবং যে ফল মনস্থ করা হয় তা যতো জটিল হয় এবং তার জন্যে কোনো দীর্ঘ মধ্যবর্তী অভিযোজন-কার্যক্রমের যতো দরকার হয়, অবিচলিত ভাবটির প্রয়োজন ততো বেশী বাড়ে। যখন মনস্থ করা কাজটা অন্য কোনো ক্রিয়া, তখন বেশী দূরে তাকাবার দরকার হয় না। এবং তা সহজে এবং বার বার বদলানো সম্ভব। যদি কোনো শিশু একটি খেলনার নৌকা তৈরী করতে থাকে তাহলে তাকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে লেগে থাকতে হবে। এবং একই ধারণা নিয়ে পরপর কতকগুলো কাজ পরিচালিত করতে হবে। যদি সে "নৌকা নৌকা খেলতে থাকে" তা হলে যে জিনিসটা নৌকার কাজ করছে, শিশু ইচ্ছে করলেই তাকে বদলাতে পারে, এবং তার খেয়াল মতো নতুন উপকরণ নিতে পারে। সে কল্পনাসূত্রে চেয়ার, কাঠের ফলক, পাতা, অন্য টুকরো জিনিসকে নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারে যদি তা কোনো কর্মতৎপরতাকে চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য মেটায়।

অতি অল্প বয়সে শিশুরা পুরাপুরি খেলার তৎপরতা আর পুরাপুরি কাজের তৎপরতার মধ্যে সময়-ভেদ ধরতে পারে না। বস্তুতঃ এ দুইয়ের মধ্যে ঐ সময়ে সে রকম ভেদও থাকে না। ভেদ থাকে কেবল জোর দেওয়ার উপরে। এমন কি, খুব ছোটো শিশুরাও কোনো কোনো স্পষ্ট ফল পেতে চায়, এবং তা ঘটাতে চেষ্টা করে। আর কিছু না হলেও অন্যের কাজের

মধ্যে ভাগ নেওয়ার ব্যগ্র উৎসাহই সেটা সম্পন্ন করে। শিশুরা "সাহায্য" করতে চায়; বড়োদের যে সব কাজ বাহ্যিক পরিবর্তন আনে শিশুরা তাতে নিযুক্ত হওয়ার জন্য অস্থির হয়। যেমন দেখা যায়, খাবার টেবিল সাজানো, বাসন ধোয়া, গৃহপালিত প্রাণীদের তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি কাজে। তাদের খেলাধূলার মধ্যে তারা তাদের নিজেদের খেলনা ও হাতিয়ার তৈরী করতে উৎসাহ দেখায়। পরিণত হওয়ার সাথে সাথে যে কাজ প্রত্যক্ষ ও দর্শনযোগ্য ফলাফল দেয় না, তার উপর থেকে তাদের উৎসাহ চলে যায়। খেলা তখন ছেবলামিতে পরিণত হয়। এবং যদি তারা এতে জমে যায় তা হলেই দুর্নীতি আসে। সকলের পক্ষেই, নিজ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা চেতনা-বোধ ও আন্দাজ পাওয়ার জন্যে দর্শনযোগ্য ফলাফল অত্যাবশ্যক। যখন ভান-করা, ভান-করা বলে স্বীকৃতি পায় তখন শুধু কল্পনা দিয়েই বিষয় তৈরী করার ফন্দি এতো সহজ-সাধ্য হয় যে, তা ব্যক্তিকে কোনো প্রগাঢ় কাজে উদ্বুদ্ধ করে না। যখন তরুণেরা যথার্থই খেলছে তখন তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তখন তাদের মনোবৃত্তিতে থাকে এক গুরুগম্ভীর নিবিষ্ট-চিত্ততা। যখন বিষয়মুখী কাজ এ রকমের উদ্দীপনা যোগাতে বিরত হয়, তখন আর এই মনোবৃত্তি বজায় রাখা যায় না।

যখন বেশ দূরবর্তী কোনো নির্দিষ্ট ধরনের ফলাফল পূর্বেই দেখা যায়, এবং তা পাওয়ার জন্য অবিরাম প্রয়াস নিয়োজিত হয় তখনই খেলা কাজের রূপ নেয়। খেলার মতো কাজও উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াশীলতাকে চিহ্নিত করে। কাজকে বাহ্যিক ফলাফলের অধীন করা হয় বলে কাজ যে খেলা থেকে পৃথক তা নয়। পৃথক এই জন্য যে, ফল পাওয়ার ধারণাটা দীর্ঘতর কর্মধারার সূচনা করে। নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের দাবী বাড়ে, এবং উপায় নির্বাচন করতে এবং তা রূপায়িত করতে বেশী বুদ্ধি খাটাতে হয়। এই বর্ণনা বাড়াতে গেলে, লক্ষ্য, স্বার্থবোধ ও চিন্তন অধ্যায়ে যে সব কথা বলা হয়েছে তারই পুনরুল্লেখ করা হবে। তবুও, কাজের মধ্যে কর্মতৎপরতার কোনো দূরবর্তী বৈষয়িক ফললাভের বশ্যতা থাকে, এ ধারণাটা যে কেন এত প্রচলিত, তা এক্ষেত্রে অনুসন্ধেয়।

এই বশ্যতার চরম আকৃতি, যেমন নীরস একঘেয়ে খাটুনি, এর একটা সূত্র ধরিয়ে দেয়। যে ক্রিয়াশীলতা বাইরের চাপে বা বাধ্যতামূলক ভাবে

চলতে থাকে, সেটা ঐ ক্রিয়ার সঙ্গে কোনো গুরুত্ব জড়ানো থাকে বলে চালানো হয় না। কাজের ধারাটা নিজ ধর্মানুযায়ী তুষ্টিদায়ক নয় ; তা কেবল কোনো শাস্তি এড়ানোর জন্য, বা কাজ শেষ হওয়ার পরে কোনো পুরস্কার লাভের জন্য করা হয়। যা মূলতঃ বিকর্ষণধর্মী তা বরদাস্ত করা হয় অধিকতর বিকর্ষণধর্মী অন্য কিছু রোধ করার জন্য কিম্বা কাজের সাথে অন্যের গেঁথে-দেওয়া কোনো কিছু লাভ করার জন্য। অবিমুক্ত আর্থিক ব্যবস্থার অধীনে এ হেন পরিস্থিতি থাকতে বাধ্য। কর্মসংস্থা বা শিল্পসংস্থা, আবেগানুভূতি ও কল্পনাশক্তিকে নিয়োগ করার স্বার্থে কোনো প্রস্তাবই রাখে না। কাজ হয়ে দাঁড়ায় কম-বেশী একটানা যান্ত্রিক খাটুনি। কেবল কাজটা সম্পূর্ণ করার বাঁধাবাঁধিই কর্মীকে কাজে চালু রাখে। কিন্তু কোনো কাজের উদ্দেশ্যকে সেই কাজেরই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কাজই কাজের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত,—তার নিজের ধারারই একটা অংশ। এই অবস্থাতে চেষ্টার যে উদ্দীপনা আসে তা অতি ভিন্ন ধরনের। মধ্যবর্তী কাজের সাথে যার কোনো সংশ্রব নেই সে ধরনের ফল পাওয়ার চিন্তা থেকে যে উদ্দীপক আসে, উক্ত উদ্দীপনা তার থেকে বিশেষ বিভিন্ন। পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, স্কুলে অর্থকরী চাপ না থাকার দরুন সেখানে পরিণত জীবনের শ্রমসংস্থাগুলিকে এমন ভাবে চালু করার সুযোগ থাকে যে, তাতে বৃত্তি তার নিজ উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজের অন্যতম ফলরূপে, প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে নয়—তার আর্থিক স্বীকৃতিও থাকে, তা হলে তা বৃত্তির তাৎপর্যকে আরও বাড়াতে পারে।

যেখানে নীরস একঘেয়ে খাটুনি থাকে, বা বার থেকে চাপানো কোনো কাজের বোঝা সারা করার দরকার থাকে, সেখানে অনবরত খেলার দাবী থাকে ; কিন্তু তা বিকৃত হওয়ার উপক্রম হয়। কর্মের সাধারণ ধারাটি আবেগানুভূতি ও কল্পনাশক্তিকে পর্যাপ্ত উদ্দীপক যোগাতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে অবকাশের সময়ে যে কোনো ধরনের উপায় অবলম্বন করে ঐ সব উদ্দীপনার উদ্ধত দাবী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তখন লোকে জুয়াখেলা, মদ্যপান ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। কিম্বা অবস্থা যখন অত চরমে যায় না, তখন অশোভন কৌতুকের আশ্রয় নেয় ; যা কিছু তৎক্ষণিক তুষ্টি দেয় তার আশ্রয় নেয়। শ্রান্তি অপনোদন করার অর্থ শক্তির পুনঃসঞ্চার। মানব

প্রকৃতির কোনো দাবিই—তা সে বেশী জরুরী হোক বা কম জরুরী হোক—এড়িয়ে যাবার বিষয় নয়। এই প্রয়োজন অবদমিত করা যায়—এ রকম ভাবা নিছক প্রতারণাপূর্ণ; এবং যে নীতিবাগীশ ঐতিহ্য এই প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করেছে, তা অনেক কুফলও ফলিয়েছে। যদি শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক-ভাবে অবসর বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা না যোগায়, এবং এই সুযোগ-সুবিধা খোঁজ করার ও বের করার সামর্থ্যলাভের মানসে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না দেয়, তা হ'লে অবদমিত সহজ প্রবৃত্তিগুলো সর্বপ্রকারের অবৈধ নির্গমন দ্বার খুঁজে নেবে-এবং কখনো তা হবে প্রকাশ্য আবার কখনো তা হবে অলীক কল্পনা চরিতার্থ করার কাজে সীমাবদ্ধ। পুনরুজ্জীবনমূলক অবকাশ বিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো দায়িত্বই নেই। কেবল সম্যক স্বাস্থ্যের স্বার্থেই নয়, সম্ভব হলে আরও বেশী করে মনের অভ্যাসের উপরে এর স্থায়ী পরিণামের স্বার্থেই এটির প্রয়োজন। এই দাবীর উত্তরেও আবার কলাকেই আশ্রয় করতে হবে।

সারাংশ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে অবগতির প্রাথমিক বিষয়-বস্তু হ'লো, কি রকম করে মোটামুটি সরাসরি ধরনের কাজ করতে হয়। এই মূল নিয়মের শিক্ষাগত প্রতিরূপ হ'ল, যে সমস্ত সহজ বৃত্তি তরুণদের ক্ষমতাকে আহ্বান করে, এবং যা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সাধারণ নমুনার অনুরূপ হয়, অবিচলিত ভাবে সেই সমস্ত বৃত্তির সদ্ব্যবহার করা। যখন কোনো কাজের নিজ নিজ তাৎপর্যবোধেই কাজ করে যাওয়া হয়, তখন জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি ও বলবিদ্যার বিভিন্ন নিয়ম সন্ধানে দক্ষতা ও সংবাদ আয়ত্তে আসে। এ সব কাজের সামাজিক রূপ থাকার কারণে, এরা অর্জিত দক্ষতা ও জ্ঞানকে এমন গুণ দেয়, যা স্কুলের বাইরের পরিস্থিতির মধ্যেও স্থানান্তরিত করা যায়।

খেলা ও কাজের মনস্তাত্ত্বিক প্রভেদকে তাদের অর্থতাত্ত্বিক প্রভেদের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলা গুরুত্বপূর্ণ। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, খেলাধূলার নিরূ-পিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমোদ-প্রমোদও নয়, লক্ষ্যশূন্যতাও নয়। এর

বৈশিষ্ট্য হ'ল, কর্মের নিরবচ্ছিন্নতাকে তার ফলাফলের সম্পর্কে নিরূপণ না করে তার উদ্দেশ্যকে ধরা হয় একই ধারায় আরও বেশী কর্মতৎপরতারূপে। ক্রিয়াকলাপ যখন বেশী জটিল হতে থাকে তখন সুনির্দিষ্ট অর্জিত ফলাফলের দিকে বেশী মনোযোগ আসার জন্যে ক্রিয়াকলাপও বেশী অর্থসমন্বিত হয়। এই ভাবে ক্রীড়া ক্রমে ক্রমে কর্মে পর্যবসিত হয়। এই দুটো পর্যায়ই সমভাবে সচ্ছন্দ, এবং মৌলিকরূপে সঙ্কল্পিত। যে অর্থনীতিক ব্যবস্থা আমোদ-প্রমোদকে ধনশালী ব্যক্তিদের অলস উত্তেজনায় পরিণত করে, এবং দরিদ্র লোকদের কাজকর্মকে রুচিহীন পরিশ্রমে পরিণত করে, তার থেকে ছাড়পত্র পেলে দুটোর মধ্যেই সমান সচ্ছন্দতা ও সঙ্কল্প দেখা যায়।

মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী কাজ হ'ল এমন একটা ক্রিয়াশীলতা যার মধ্যে তার নিজেরই অংশরূপে তার পরিণামের প্রতি লক্ষ্য থাকে। যখনই কাজের পরিণাম কোনো আলাদা উদ্দেশ্যরূপে ক্রিয়াশীলতার বাইরে থাকে, এবং ক্রিয়াশীলতা এই উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায়মাত্র হয়, তখনই কাজ হয়ে দাঁড়ায় বাধ্যতামূলক পরিশ্রম। যে কাজ খেলার ভঙ্গী দিয়ে পরিব্যাপ্ত, সে কাজই হ'ল কলা (আর্ট)। একে রীতিগতভাবে কলা আখ্যা না দিলেও গুণগত ভাবে তার ঐ উপাধিই প্রাপ্য।

ষোড়শ অধ্যায়

ভূগোল ও ইতিহাসের বিশিষ্টতা

১। প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপের অর্থ-ব্যাপকতা

কোনো ক্রিয়ার শুধু ভৌত রূপ এবং তার অর্থ-সম্পদ ধারণ-শক্তির মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তার চেয়ে বিস্ময়কর বোধ করি আর কিছুই নেই। বার থেকে দেখলে, কোনো জ্যোতির্বিদ দূরবীনের মধ্যে দিয়ে যে ভাবে তাকান একটি ছোটো বালক এই নলটির মধ্যে দিয়ে সেইভাবে তাকায়। উভয় ক্ষেত্রেই থাকে একটা কাঁচ ও ধাতুর বিন্যাস, একটা চোখ, আর দূরে কোনো এক আলোকণা। তবুও কোনো এক সন্ধিক্ষণে জ্যোতির্বিদের ক্রিয়া কোনো ভূ-খণ্ডের জন্মকথার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে, এবং তারই আধেয়রূপে, নক্ষত্রখচিত আকাশ সম্বন্ধে যা কিছু জানা আছে তাও থাকতে পারে। ভৌত অর্থে, বর্বরতা থেকে অগ্রগতির পথে মানুষ এই ভূ-পৃষ্ঠে যা সাধন করেছে, তা কেবল এর উপরে একটা আঁচড়ের মতো, যার দাগ দূর থেকে দেখাও যায় না, যদিও এই দূরত্ব শুধু সৌর মণ্ডলের বিস্তারের তুলনায়ও যৎ-সামান্য। তবুও "অর্থের" দিক দিয়ে, যা সাধন করা হয়েছে তা বর্বরতা থেকে সভ্যতার পার্থক্যেরই পরিমাপ। যদিও ভৌত দৃষ্টিতে, মানুষের ক্রিয়াকলাপ কিছু মাত্রায় বদলেছে, তবুও এই ক্রিয়াকলাপের সাথে যে সব অর্থ বিকাশ লাভ করেছে তার তুলনায় এই পরিবর্তন যৎসামান্য। একটা কাজ যে কি পরিমাণ অর্থ লাভ করতে পারে তার কোনো সীমা টানা যায় না। যে সমস্ত যোগসূত্রের প্রসঙ্গে কাজটাকে স্থাপন করা হয়, তার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে। এই যোগসূত্র ধারণায় আনতে কল্পনার বিস্তারও অফুরন্ত।

অর্থ আয়ত্ত ও আবিষ্কার করতে মানুষের কর্মনিষ্ঠতার যে সুবিধা আছে, তা তাঁর শিক্ষাকে কোনো হাতিয়ার তৈরী বা পশুকে অভ্যস্ত করার কাজ থেকে বিভিন্ন রূপ দেয়। অভ্যস্তি কর্মকুশলতা আনে; তাৎপর্যের বিকাশ করে না। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে খেলাধূলা ও কাজ কর্মের মধ্যে যে ধরনে নিযুক্ত

থাকার কথা বলা হয়েছে তার সর্বশেষ শিক্ষাসংক্রান্ত গুরুত্ব এই যে, ঐ সকল নিয়োজন এইরূপ তাৎপর্য বিস্তারের পক্ষে সর্বাধিক প্রত্যক্ষ সাধকত্ব যোগায়। উপযুক্ত অবস্থাধীনে চালু করলে ঐ সমস্ত কাজ ও খেলা বুদ্ধিগম্য বিবেচনার এক অপরিসীম বিস্তীর্ণ পাল্লাকে সংগ্রহ করা ও মনে রাখার চুম্বক স্বরূপ হয়। তারা সংবাদকে স্বাগত জানায় এবং তাকে আত্তীকরণের জীবন্ত কেন্দ্র যোগায়। যখন কেবল সংবাদের নিজ স্বার্থেই সংবাদ মনে রাখার জন্য খণ্ডে খণ্ডে সংবাদ যোগানো হয়, তখন তা জীবন্ত অভিজ্ঞতার উপর স্তরীভূত হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু যখন কোনো কর্মতৎপরতাকে তার নিজ স্বার্থেই অনুধাবন করা হয়, এবং সেই কর্মতৎপরতার কোনো উপকরণ হয়ে সংবাদ কর্মে প্রবেশ করে,—তা সে কোনো উপায়রূপেই হোক, বা কর্মের লক্ষ্যের আধেয় বাড়ানোর জন্যেই হোক,—তখন তা জ্ঞানসূচক হয়। যা জ্ঞাপন করা হয়, তা প্রত্যক্ষলব্ধ পরিজ্ঞানের মধ্যে দ্রবীভূত হয়। তখন ব্যক্তি যে সমষ্টির অন্তর্গত, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সেই সমষ্টির অভিজ্ঞতার মোট ফলাফলকে গ্রহণ করতে ও দ্রবীভূত করতে সমর্থ হয়; এবং সে অভিজ্ঞতার মধ্যে সমষ্টির সুদীর্ঘকালীন দুর্ভোগ ও দুর্বিপাকের ফলাফলের কথাও থাকে। এবং এরূপ দ্রাবকের এমন কোনো নির্দিষ্ট পরিপৃক্ত-সংখ্যা থাকে না, যে জন্য আরও সংবাদ দ্রবীভূত হওয়া অসম্ভব হয়। নবতর কৌতূহল নবতর গ্রহণ-যোগ্যতা আনে, এবং নবতর সংবাদ নবতর কৌতূহল জাগায়।

বিভিন্ন কর্মতৎপরতা যে ধরনের অর্থ দিয়ে সমৃদ্ধ হয়, তা ভৌত-প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। কথাটা সহজ স্বতঃসিদ্ধ। একে তার শিক্ষাগত প্রতিরূপে রূপান্তরিত করলে অবশ্য এর অর্থ বেড়ে যায়। এভাবে রূপান্তরিত করলে তার এই অর্থ দাঁড়ায় যে, অন্য অবস্থাতে যা-কিছু সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ক্রিয়া, বা, শুধু বিভিন্ন ধরনের কারিগরি দক্ষতা হতে পারত, ভূগোল ও ইতিহাসের বিষয়-বস্তু তাকে পশ্চাৎভূমি ও বহির্দৃষ্টি, অর্থাৎ বুদ্ধিগম্য পটভূমিকা যোগায়। আমরা আমাদের নিজেদের ক্রিয়াকলাপকে তার স্থান ও কালের যোগসূত্রে স্থাপন করতে যতো বেশী সক্ষম হই, ততোই তা তাৎপর্যপূর্ণ আধেয় লাভ করে। আমরা যে স্থানের অধিবাসী এবং যে কালের প্রচেষ্টার নিরবচ্ছিন্ন বহিঃপ্রকাশের উত্তরাধিকারী ও বাহক, তার দৃশ্য আবিষ্কার

করতে গিয়ে হৃদয়ঙ্গম করি যে, আমরা কোনো অকিঞ্চিৎকর নগরের নাগরিক নই। এইভাবে, আমাদের নিত্যকার সাধারণ অভিজ্ঞতা তার ক্ষণস্থায়ী রূপ পরিত্যাগ করে একটা স্থায়ী সত্তা লাভ করে।

অবশ্য যদি ভূগোল ও ইতিহাস পূর্বপ্রস্তুত পাঠ্যরূপে শেখানো হয়,—যেহেতু কাউকে স্কুলে পাঠানো হয়েছে, সেই হেতু তাকে তা পড়তে হবে, এই ভাবে শেখানো হয়, তাহলে সহজেই নিত্যকার অভিজ্ঞতা থেকে যা বহু দূরবর্তী ও পরকীয় সেই সব জিনিস সম্বন্ধে বহু সংখ্যক উক্তি শিক্ষা করা যায়। কর্মনিষ্ঠতা ভাগ হয়ে যায়, এবং দুটি পৃথক জগৎ সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের কার্যাবলী থাকে, তার কোনো আন্তঃপরিবর্তন হয় না; সাধারণ অভিজ্ঞতা তার যোগসূত্র লাভ করে পরিবর্ধিত তাৎপর্য লাভ করে না এবং যা কিছু পাঠ করা হয় তা অব্যবহিত কর্মতৎপরতার মধ্যে প্রবেশ করে জীবন্ত ও বাস্তব রূপ নেয় না। এমন কি, সাধারণ অভিজ্ঞতা পূর্বে যে অবস্থায় সঙ্কীর্ণ কিন্তু প্রাণবন্ত ছিল, তাও আর সে অবস্থায় থাকে না। বরং তা তার সচলতা এবং ইঙ্গিতগুলির প্রতি বেদনশীলতার কিছুটা হারায়। অনঙ্গীভূত সংবাদের বোঝা দিয়ে সেটি ভারাক্রান্ত ও কোণঠাসা হয়ে যায়। বেশী অর্থ লাভ করার জন্য তার যে নমনীয় প্রতিবেদনশীলতা ও সতর্ক আকুলতা থাকে, তা চলে যায়। জীবনের সরাসরি স্বার্থবোধ থেকে পৃথকভাবে সংবাদের স্তূপ আহরণ করা মানে মনকে শুকিয়ে কাঠ করে তোলা। ফলে মনের স্থিতিস্থাপকতা লোপ পায়।

স্বাভাবিক অবস্থাতে, যে ক্রিয়ার মধ্যে তার নিজ কারণেই নিযুক্ত হওয়া যায়, তা তার অব্যবহিত গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ সমর্পিত হয়ে তার অর্থ বাড়বে বলে তা নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করে না—অর্থ খুঁজে বের করে। কৌতূহল কোনো আকস্মিক নিঃসঙ্গ সম্পত্তি নয়; অভিজ্ঞতা হ'ল কোনো একটা সচল পরিবর্তনশীল জিনিস। তার মধ্যে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে যে সব নানাবিধ যোগসূত্র থাকে, কৌতূহল হ'ল তারই অপরিহার্য পরিণাম। এই সব যোগসূত্র উপলব্ধি করার প্রবণতার নামই কৌতূহল। শিক্ষাদাতাদের কাজ হ'ল, এমন এক পরিবেশ যোগানো যাতে অভিজ্ঞতার এই সম্প্রসারণ কৃতকার্যতার সহিত পুরস্কৃত হতে পারে, এবং নিরবচ্ছিন্ন রূপে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। কোনো এক বিশিষ্ট ধরনের পরিবেশের মধ্যে

সেই রকম একটা ক্রিয়াশীলতাকে এমনভাবে আটকে রাখা দরকার যাতে যে অর্থটা দাঁড়ায় তা কেবল এই ক্রিয়াশীলতারই প্রত্যক্ষ ও সহজবোধ্য পৃথক পরিণাম হয়ে ওঠে। কোনো একটা লোক রান্না করতে পারে, হাতুড়ি পেটাতে পারে বা হাঁটতে পারে ; এবং এ সব কাজের যে পরিণাম দাঁড়ায় তা আক্ষরিক বা ভৌত অর্থে রান্না করা, হাতুড়ি পেটানো বা হাঁটার পরিণাম থেকে তার মনকে একটুও দূরে না নিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজটার পরিণাম সুদূরপ্রসারীই থাকে। হাঁটার মধ্যে স্থান পরিবর্তন এবং প্রতিরোধী ভূ-খণ্ডের প্রতিক্রিয়া থাকে, এবং যেখানেই বস্তু আছে সেখানেই এই বাধার শিহরণ অনুভূত হয়। এর° মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও নার্ভতন্ত্রের গঠনপ্রণালী থাকে ; বলবিদ্যার মূল নিয়মও থাকে। রান্না করা হ'ল তাপ ও বাষ্পের সদ্ব্যবহার করা, যার ফলে খাদ্যবস্তুর রাসায়নিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়। এর সাথে খাদ্যবস্তু হজম হওয়ার ও শরীরের পুষ্টির যোগও আছে। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বাধিক বিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সর্বাধিক জ্ঞানও এর সবগুলো পরিণাম ও যোগসূত্র প্রত্যক্ষ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিক্ষার কর্মভার হ'ল এটা দেখা যে, এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ এমনভাবে ও এমন শর্তাধীনে পরিচালিত হয়, যাতে এই যোগসূত্রগুলো যতোদূর সম্ভব উপলব্ধির উপযুক্ত হয়। "ভূগোল শিক্ষা করা" হল, কোনো ক্রিয়ার স্থানে-ব্যাপ্তি-সংক্রান্ত বহিঃ-প্রাকৃতিক যোগসূত্রাদিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা বৃদ্ধি। "ইতিহাস শিক্ষা করা" হল মূলতঃ এই ক্রিয়ার বিভিন্ন মানবিক যোগসূত্রকে বুঝতে পারার ক্ষমতা বৃদ্ধি। কারণ যাকে নিয়মাবদ্ধ পাঠ্যরূপে ভূগোল বলা হয়, তা হ'ল আমরা যে প্রাকৃতিক মাধ্যমে বাস করি, এবং যার সম্পর্কে আমাদের বিশিষ্ট কার্যাকার্য ব্যাখ্যা রাখে, সে সম্বন্ধে অন্য লোকের অভিজ্ঞতাতে যা-কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে তারই তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত একটা কাঠামো। এই ভাবেই নিয়মাবদ্ধ ইতিহাস পাঠ হ'ল, যে সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে আমাদের নিজেদের জীবন একসূত্রে গাঁথা এবং যাদের সাথে সম্পর্কসূত্রে আমাদের রীতিনীতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বোধগম্য হয়, তাদের ক্রিয়াকলাপ ও দুর্ভোগ সম্বন্ধে জানা তথ্যাবলীর একটা কাঠামো।

২। ইতিহাস ও ভূগোলের অনুপূরক রূপ

ইতিহাস ও ভূগোল—প্রকৃতি-পাঠসহ ভূগোল, যার কারণ এখনি দেওয়া হবে, বিদ্যালয়ের অত্যুৎকৃষ্ট সংবাদজ্ঞাপক পাঠ্য বিষয়। পড়াবার বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতি পরীক্ষা করলে এটি পরিষ্কার হবে যে, এদের সংবাদ জীবন্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে যাবার এবং কেবল বিচ্ছিন্ন সংবাদের স্তূপ হয়ে জমবার মধ্যের পার্থক্যটি নির্ভর করে, এই সব পাঠ মানুষ ও ভৌত-প্রকৃতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অনুগমন করে কিনা—তার উপরে। অবশ্য এই অনুগামিতাই বিষয় দুটি পড়াবার ন্যায্যতা যোগায়। যেহেতু কোনো বিষয়বস্তু শেখানো ও শেখা রীতিগত হয়ে গেছে, কেবল সেই হেতুই তাকে যথাযথ শিক্ষামূলক উপাদান বলে গ্রহণ করতে হবে, এই বিপদ ইতিহাস ভূগোলের শিক্ষায় যতো থাকে আর কিছুতে ততো থাকে না। অভিজ্ঞতার সার্থক রূপান্তর সাধনের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষণীয় উপাদানের একটা ন্যস্ত কর্ম থাকে, এরূপ কোনো দার্শনিক হেতুর ধারণাকে, হয়, আসার কল্পনা, নয়, যা করতেই হচ্ছে, তার সমর্থনে বড়ো বড়ো কথা বলে মনে করা হয়। "ইতিহাস" এবং "ভূগোল" শব্দদ্বয় কেবল সেই বস্তুই মনে আনে যা পুরুষানুক্রমে স্কুলের অনুমোদন লাভ করে আসছে। এই বিষয়-বস্তুর বিশালতা ও বিচিত্রতা, বিষয়টির উদ্দেশ্যমূলকতার এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এটির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এর শিক্ষণ প্রণালীকে বিচার করে দেখতে আমাদের নিরুৎসাহিত করে। কিন্তু যদি শিক্ষায় সাঙ্গীকরণ ও সামাজিক নির্দেশকের ধারণা কোনো হাস্যকর প্রহসন না হয়, তা হলে পাঠক্রমে ইতিহাস ও ভূগোলের মতো বিশালকায় বিষয়-বস্তুকে একটা যথার্থ সমাজকেন্দ্রিক ও বুদ্ধিকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার বিকাশের মধ্যে কোনো সাধারণ কর্তব্যের প্রতীক হতেই হবে। এই কর্তব্য স্পষ্ট করে বোঝা গেলে, যে জিনিস শেখানো হয়, এবং যে পদ্ধতিতে তা শেখানো হয় তাকে পরীক্ষা করে ছেঁকে নেওয়ার মানদণ্ডরূপে সে কর্তব্যকে নিয়োগ করতে হবে।

ইতিহাস ও ভূগোলের কৃত্য কর্মের বিষয় বলা হয়েছে। এটি হ'ল, জীবনের অধিকতর প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগকে প্রসঙ্গ, পটভূমি ও বহির্দৃষ্টি দিয়ে সমৃদ্ধ ও বিমুক্ত করা। যদিও ভূগোল ভৌত-প্রকৃতির দিকে

এবং ইতিহাস সমাজের দিকে জোর দেয়, তথাপি তা একই আলোচ্য বিষয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন জোর। কারণ বিষয়টা হ'ল মানুষের সম্মিলিত জীবন। এই সম্মিলিত জীবন, এর নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পদ্ধতি ও সঙ্গতি, কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা মহাকাশে সংঘটিত হয় না, আবার কোনো শূন্য স্থানেও ঘটে না। তা ঘটে ভূ-পৃষ্ঠে। নাট্যাভিনয়ের দৃশ্যপট তার নাটকীয় উপস্থাপনের সঙ্গে যে সম্পর্ক রাখে, কোনো ভৌত-প্রকৃতির এই সমাবেশ সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সেরূপ সম্পর্ক রাখে না। যে সামাজিক ঘটনাবলী ইতিহাস রচনা করে, ভৌত-প্রকৃতি তার মজ্জায় প্রবেশ করে। ভৌত-প্রকৃতিই হ'ল সামাজিক ঘটনাবলীর মাধ্যম। ভৌত-প্রকৃতি প্রাথমিক উদ্দীপক যোগায়, বাধাবিঘ্ন আনে, সঙ্গতি দেয়। এর নানাবিধ শক্তিপুঞ্জের উপর ক্রমবর্ধনশীল আধিপত্য বিস্তারই,—সভ্যতা। যখন মানবিক গুরুত্ববিশিষ্ট পাঠের সঙ্গে ভৌত-প্রকৃতি সম্বলিত ভূগোল পাঠের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উপেক্ষা করা হয়, তখন ইতিহাস, সন তারিখের তালিকা তৈরীতে অধঃপতিত হয়,—আর তার সাথে আঁটা থাকে "গুরুত্বপূর্ণ" লেবেলধারী ঘটলাবলীর বর্ণনামূলক তালিকা। অন্যথায় তা হয়ে দাঁড়ায় কোনো সাহিত্যিক ছায়ামূর্তি, কারণ বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ইতিহাসে ভৌত পরিবেশ হ'ল কেবল রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট।

অবশ্য ভূগোলের শিক্ষামূলক প্রভাব থাকে প্রাকৃতিক তথ্যাবলীর সঙ্গে সামাজিক ঘটনাবলীর তুল্য সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের বিভিন্ন পরিণামের মধ্যে। ভূগোলের প্রাচীন সংজ্ঞা হ'ল মানুষের বাসস্থানরূপে পৃথিবীর বর্ণনা। এই সংজ্ঞা ভূগোলের শিক্ষাসংক্রান্ত বাস্তবতা ব্যক্ত করে। কিন্তু এই সংজ্ঞা দেওয়া যতো সহজ, প্রাণবন্ত মানবিক সম্পর্ক-সম্বলিত সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক বিষয়-বস্তু উপস্থাপিত করা ততো সহজ নয়। মানুষের আবাসস্থল, অনুধাবন, সফলতা ও বিফলতাই হ'ল সেই সমস্ত বিষয়, যা ভৌগোলিক তথ্যাবলীকে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে গণ্য করার হেতু যোগায়। কিন্তু এই দুটো দিক এক সঙ্গে ধরে রাখার জন্য কোনো অভিজ্ঞ ও কর্ষিত কল্পনা শক্তির প্রয়োজন হয়। যখন এই বন্ধন ছিন্ন হয়, তখন ভূগোল হয়ে দাঁড়ায় কোনো অসংলগ্ন ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডস্তূপ। এই অবস্থাতেই একে বেশীর ভাগ দেখা যায়। মনে হয় যেন বিষয়টা কোনো বুদ্ধিগত টুকিটাকির ছেঁড়া-ফাড়া বেশবিন্যাস।

এখানে কোনো পর্বতের উচ্চতা, ওখানে কোনো নদীর স্রোতপথ এ, শহরে কি পরিমাণ কাষ্ঠ ফলক তৈরী হয়, ও-বন্দরে কতো টন্ মালের জাহাজ আসে, অমুক জেলার সীমানা, তমুক রাজ্যের রাজধানী ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারই যেন ভূগোল।

মানুষের বাসস্থানরূপে পৃথিবী সভ্যতাদ্যোতক, এবং একতাবদ্ধ। তথ্যাবলীর পাঁচমিশালী হিসাবে দেখলে তা চিত্তবিক্ষেপকারী, এবং কল্পনাপ্রসঙ্গে নিষ্ক্রিয়। ভূগোল এমন একটা বিষয়, যা প্রথমে কল্পনা জাগায়, এমন কি, অলীক কল্পনাও জাগায়।

অভিযান, পর্যটন ও আবিষ্কারের সঙ্গে যে বিস্ময় ও গৌরব জড়ানো থাকে, ভূগোল তাতে অংশ নেয়। বিচিত্র অধিবাসী ও পরিবেশ, এবং সুপরিচিত দৃশ্যাবলী থেকে তাদের প্রভেদ, অসীম উদ্দীপনা যোগায়। গতানুগতিকতার একঘেয়েমি থেকে মন মুক্তি পায়। যদিও স্থানিক বা আবাসিক ভূগোল প্রাকৃতিক পরিবেশ পুনর্গঠনের স্বাভাবিক প্রারম্ভিক স্থল, তথাপি তা সেই কাজেই শেষ হয় না। তা হয়ে দাঁড়ায় অজানিতের মধ্যে বেরিয়ে পড়ার বুদ্ধিগম্য প্রারম্ভিক স্থল। আবাসিক ভূগোলপাঠকে যদি তার বাইরের বিশাল পৃথিবীর মধ্যে উপনীত হওয়ার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা না হয়, তা হ'লে বস্তুপাঠ যেমন কেবল সুপরিচিত বস্তুর গুণাবলীকেই সংক্ষেপ করে, আবাসিক ভূগোলও সেইরূপ প্রাণহীন হয়। কারণ একই। কল্পনাশক্তি তার খাদ্য পায় না। পরন্তু যা কিছু জানা আছে কল্পনাশক্তিকে তারই সংক্ষিপ্তাবৃত্তি, তালিকাভুক্তি ও পরিশোধনের কাজ দিয়ে দাবিয়ে রাখা হয়। কিন্তু যখন, যে সুপরিচিত কচার বেড়া গ্রামীণ তালুকদারের সীমানা চিহ্নিত করে, তাকেই বড়ো-বড়ো জাতির সীমানা বোঝাবার সঙ্কেত করা হয়, তখন এমন কি, কচার বেড়াও তাৎপর্য পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সূর্যালোক, বায়ু, স্রোতের জল, ভূ-পৃষ্ঠের অসমতলতা, নানাবিধ শ্রমশিল্প, রাজকর্মচারী ও তাঁদের কর্তব্য,—এর সব কিছুই স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যায়। যদি এরূপ মনে করা হয় যে, তাদের তাৎপর্য তাদের গণ্ডীর মধ্যেই আরম্ভ ও শেষ হয়েছে, তা হলে তা এমন এক অদ্ভুত তথ্য হয়ে দাঁড়াবে যা খেটে খেটে শিখতে হবে। এর পাল্লার মধ্যে অন্যভাবে অদ্ভুত ও অজানা অধিবাসী ও সামগ্রী এনে অভিজ্ঞতার সীমা সম্প্রসারণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করলে,

এই ব্যবহার দ্বারা ঐ সব তথ্যের রূপ বদলে যাবে। দূর দূর দেশ থেকে সূর্যালোক, বায়ুপ্রবাহ, জলস্রোত, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এসে চিন্তাশক্তি-কেও দূর দূর দেশে পরিচালিত করবে। এই চিন্তাধারার অনুসরণ করা হ'ল মনকে বৃহত্তর করা,—এর মধ্যে অতিরিক্ত খবর গাদা করে নয়, পরন্তু পূর্বে যা কিছু গতানুগতিক ধারায় এসেছে তাকেই তাৎপর্য দিয়ে পুনর্গঠন করা।

ভৌগোলিক পাঠ্যের যে সমস্ত শাখা বা পর্যায়, বৈশিষ্ট্যসূচক বা পৃথক হয়ে পড়তে চায়, এই মূল নিয়ম তাদেরও সহযোজিত রাখে। গাণিতিক বা জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত, প্রাকৃতিক, স্থানিক বিবরণ সংক্রান্ত, রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক ভূগোল, সকল শাখারই নিজ নিজ একটা দাবি আছে। কি করে এদের সমন্বয় করা যায়? প্রতিটি শাখা থেকে এতোখানি বা অতো-খানি করে নিয়ে কোনো বাহ্যিক মীমাংসা করে? যদি এ কথাটা অনুক্ষণ মনের মধ্যে রাখা না হয় যে, কোনো বিষয়-বস্তুর শিক্ষামূলক ভারকেন্দ্র থাকে তার সাংস্কৃতিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, তা হলে আর কোনো পদ্ধতিই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কেন্দ্র থেকে দেখলে যে-কোনো উপাদানই প্রাসঙ্গিক হয়। অবশ্য মানবিক ক্রিয়াকলাপ ও সম্পর্ক বোঝবার স্বার্থে তার যতোদূর প্রযোজন হয় সেটা ধরেই এটা করা হয়। পৃথিবীকে সৌরজগতের এক অঙ্গরূপে বুঝে নেওয়া ছাড়া, শীতল ও অত্যুষ্ণ অঞ্চলের সভ্যতার বিভিন্নতা, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর শিল্প ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশিষ্ট রচনাকৌশল বুঝতে পারা যায় না। অর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ এক দিকে সামাজিক আদান-প্রদান ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে, অন্যদিকে সেটি প্রাকৃতিক অবস্থাদিকেও প্রতিফলিত করে। এই সব আলোচ্য বিষয়কে বিশিষ্ট রূপ দেওয়া বিশেষজ্ঞদের কাজ। এদের পারস্পরিক ক্রিয়া সামাজিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সত্তারূপেই মানুষকে সংশ্লিষ্ট করে।

প্রকৃতি-পাঠকে ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত করা নিঃসন্দেহে জোরাজুরি করা মনে হবে; আক্ষরিক অর্থে তা তাই। কিন্তু শিক্ষার ধারণাতে এখানে কেবল একটি বাস্তবতাই রয়েছে; এবং শিক্ষাবৃত্তিতে এর যে দুটো নাম রয়েছে তা দুঃখের বিষয়। কারণ নামের ভিন্নতা, অর্থের একত্ব লুকিয়ে

রাখতে চায়। পৃথিবী ও প্রকৃতি সমার্থক শব্দ হওয়া উচিত, এবং ভূগোল-পাঠ এবং প্রকৃতি-পাঠও সমার্থক হওয়া উচিত। সকলেই জানেন যে, বহু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন টুকিটাকি নিয়ে কাজ করার ফলে বিষয়বস্তু টুকরো টুকরো হওয়ার জন্য প্রকৃতি-পাঠের ক্ষতি হয়েছে। কোনো একটা অঙ্গরূপে ফুলের কথা বাদ দিয়ে তার বিভিন্ন অংশ পাঠ করা হয়েছে, গাছ বাদ দিয়ে ফুল পড়ানো হয়েছে; যে জমি, বায়ু ও আলোর মধ্যে, এবং মাধ্যমে, উদ্ভিদ বেঁচে থাকে, সে সব কথা বাদ দিয়ে উদ্ভিদ পড়ানো হয়। এর ফল দাঁড়ায় আলোচ্য বিষয়গুলির অনিবার্য প্রাণহীনতা। যার প্রতি মনোযোগ আহ্বান করা হয় তা এত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে যে, তা কল্পনা শক্তির কোনো খোরাক যোগায় না। এখানে আগ্রহের এত অভাব থাকে যে, যে প্রাকৃতিক তথ্য ও ঘটনা মনকে আকর্ষণ ও ধারণ করতে পারে, সেটাকেই অতিকথা দিয়ে সাজিয়ে বিশ্বপ্রাণবাদের পুনঃপ্রবর্তন করা যায় কিনা সে বিষয়ে একটা গুরুতর প্রস্তাব উঠেছিল। অসংখ্য ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর অর্থহীন নরত্ব আরোপ করবার চেষ্টা হয়েছিল। পদ্ধতিটা অর্থহীন, কিন্তু সেটি কোনো মানবিক বাতাবরণের বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্ত করেছিল। তথ্যগুলোকে তাদের প্রসঙ্গ থেকে বের করে নিয়ে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। তারা আর পৃথিবীর মালিকানাতে ছিল না; কোথাও তাদের কোনো স্থায়ী নিবাস ছিল না। ফলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে, কৃত্রিম ও ভাব-রসাত্মক অনুসঙ্গেরই প্রশ্রয় নিতে হতো। এর আসল প্রতিকার হ'ল, প্রকৃতি-পাঠকে "বিশ্বপ্রকৃতি" পাঠে পরিণত করা, টুকরো খবরের পাঠ নয়; যে পরিস্থিতির মধ্যে ঐ সব খণ্ডাংশ জন্মায় এবং যার মধ্যে তারা ক্রিয়া করে, তার থেকে তাদের পুরাপুরি সরিয়ে অর্থশূন্য করে তার পাঠ নয়। পৃথিবীকে যেমন তার সকল সম্পর্ক নিয়ে দেখা হয় প্রকৃতিকে তেমনি কোনো পূর্ণ সত্তা-রূপে জ্ঞান করলেই তার ঘটনাঘটন মানব জীবনের সঙ্গে তার মিলন ও সমবেদিতার স্বাভাবিক সম্পর্কে আসে; তখন আর কোনো কৃত্রিম প্রতিকল্পের প্রয়োজন হয় না।

৩। ইতিহাস ও বর্তমান সমাজ জীবন

যে নিঃসঙ্গতা ইতিহাসের সঞ্জীবনীশক্তি বিলোপ করে, তা হ'ল সমাজ জীবনের বর্তমান ধরন ও সংশ্লিষ্টতা থেকে তার বিচ্ছেদ। কেবল অতীত হিসাবেই অতীত এখন আর আমাদের ব্যাপার নয়। যদি তা সম্পূর্ণরূপেই বিগত ও সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তার প্রতি আমাদের কেবল একটি ভঙ্গীই থাকবে। মৃতেরা তাদের মৃতকে গোরস্থ করুক। কিন্তু অতীতের জ্ঞান, বর্তমানকে বোঝবার চাবিকাঠি। ইতিহাস অতীত নিয়ে কাজ করে, কিন্তু তা বর্তমানেরই ইতিহাস। আবিষ্কার, উদ্‌ঘাটন, আমেরিকা উপ-নিবেশীকরণ, পশ্চিমের দিকে পথ প্রদর্শনকারী গতি, অভিবাসন ইত্যাদি বিষয়ের বুদ্ধিগম্য চর্চা, যুক্তরাষ্ট্র আজ যে রূপ নিয়ে বর্তমান, যার মধ্যে আমরা এখন বাস করি,—তারই চর্চা হওয়া উচিত। যখন সংগঠন হয়ে চলেছে, সে সময়কার কর্ম-প্রণালীর চর্চা যা-কিছু সরাসরি আয়ত্ত করার পক্ষে অসম্ভব জটিল তাকে বোধগম্য করে। সম্ভবতঃ জনন-পদ্ধতিই উনিশ শতকের শেষার্ধের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কৃতি। এর মূল নিয়ম এই যে, কোনো জটিল সৃষ্টির মধ্যে সূক্ষ্মদৃষ্টি পাওয়ার পথ হল, তার তৈরী হওয়া কালীন কার্য প্রণালীর সন্ধান পাওয়া, তার ক্রমবিকাশের ক্রমপর্যায়ের মধ্যে দিয়ে তার অনুসরণ করা। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বর্তমান সামাজিক অবস্থাকে তার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু জনন-পদ্ধতিকে যদি কেবল এই অর্থেই প্রয়োগ করা হয় তা হলে তা একতরফা কাজ হবে। কথাটার এ অর্থও হয় যে, অতীত ঘটনাবলীকে জীবন্ত বর্তমান থেকে আলাদা করে নিলে তার অর্থ থাকে না। ইতিহাসের নির্ভুল প্রারম্ভিক স্থল হল কোনো না কোনো সমস্যাবহুল বর্তমান পরিস্থিতি।

কয়েকটি ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য বিবেচনার্থে এই সাধারণ নিয়মটিকে সংক্ষেপে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইতিহাস পাঠে অগ্রসর হওয়ার স্বাভাবিক পন্থা-রূপে, সাধারণতঃ জীবনী পাঠের পদ্ধতি অনুমোদন করা হয়। যে সব ঐতিহাসিক কাহিনী অন্যভাবে বিমূর্ত ও অবোধ্য, মহামানবদের এবং বীর ও নেতৃবৃন্দের জীবনী, তাকে মূর্ত ও জীবন্ত করে। যে সমস্ত জটিল ও সমস্যাকীর্ণ ঘটনা প্রবাহ স্থানে ও কালে এত বেশী বিস্তৃত যে, কেবল কোনো

উচ্চশিক্ষিত অভ্যস্ত মনই তার অনুসরণ ও উদ্‌ঘাটন করতে পারে, জীবন-চরিত তাকে জাজ্বল্যমান চিত্রে সংক্ষিপ্ত করে। এই মূল নিয়মের মনস্তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু এই সকল মহাজন যে যে সামাজিক পরিস্থিতির প্রতীক, তার সাথে সংশ্রব না রেখে, যখন এই নিয়মকে অল্প কয়েকজন লোকের কীর্তির অতিরঞ্জিত অভিক্ষেপণের কাজে নিয়োগ করা হয়, তখন এই নিয়মের অপব্যবহার ঘটে। যে সব অবস্থা কোনো এক ব্যক্তিকে জাগ্রত করে, এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপ যে সব অবস্থার প্রতি সাড়া মাত্র, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জীবনচরিত যখন কেবল সেই ব্যক্তির কীর্তির বিবরণরূপে বর্ণিত হয়, তখন তা ইতিহাসের অধ্যয়ন হয় না। কারণ তার মধ্যে সামাজিক জীবনের অধ্যয়ন নেই। সামাজিক জীবন হল মানুষের সম্মিলিত জীবনের ব্যাপার। উক্ত ক্ষেত্রে আমরা পাই কেবল একটি চিনির প্রলেপ। এই প্রলেপ সংবাদের কোনো কোনো অংশকে গলাধঃকরণ করা সহজ করে তোলে—এই মাত্র।

সম্প্রতি, ইতিহাস শেখার ভূমিকারূপে আদিম অধিবাসীদের জীবন ধারার প্রতি খুব মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এখানেও এর মূল্যাবধারণের একটা ঠিক ও একটা বেঠিক পদ্ধতি রয়েছে। বর্তমান অবস্থার আপাত প্রতীয়মান পূর্বপ্রস্তুত ধরন ও জটিলতা এবং সহজ প্রতীয়মান বাঁধাধরা প্রকৃতি, তার স্বরূপের মধ্যে সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করার পক্ষে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক। আদিম অবস্থার সাহায্যে বতমান পরিস্থিতির মৌলিক উপাদনগুলোকে খুব সহজ আকারে পাওয়া যেতে পারে। কাজটা একখণ্ড বস্ত্রের বুনাট উদ্‌ঘাটনের মতো। বস্ত্রখণ্ডের বুনাট এত জটিল এবং চোখের এত নিকটে হতে পারে যে, তার ছকের বৃহত্তর ও স্থূলতর আকৃতি উদ্‌ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রকল্প দেখা যায় না। আমরা স্বেচ্ছায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বর্তমান পরিস্থিতিকে সরল করতে পারি না, কিন্তু আদিম জীবনের আশ্রয় নিলে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যেরূপ ফল পাবার আশা করি সেরূপ ফল পেতে পারি। এ ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক এবং সংগঠনমূলক কাজের ধরন সর্বনিম্ন পর্যায়ে পরিণত হয়। যখন এই সামাজিক লক্ষ্যকে উপেক্ষা করা হয়, তখন আদিম জীবনের পর্যালোচনা কেবল কোনো একটা রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাময় বর্বর প্রকৃতির পুনরাবৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

আদিম ইতিহাস শ্রমশিল্পীয় ইতিহাসের ইঙ্গিত করে। কারণ বর্তমান অবস্থাকে অধিকতর সহজবোধ্য উপাদানে বিভক্ত করার জন্য আদিম অবস্থার মধ্যে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ হল যা করে জীবিকা, বাসস্থান ও সংরক্ষণের মৌলিক সমস্যা মেটানো হয়েছে তাকে হৃদয়ঙ্গম করা; এবং মানব জাতির প্রথমাবস্থায় কি করে এ সব সমস্যার মীমাংসা করা হয়েছে, তা দেখে নিয়ে যে সুদীর্ঘ পথে চলতে হয়েছে, এবং পর পর যে সমস্ত রচনা-কৌশল দ্বারা জাতিকে কৃষ্টির পথে অগ্রসর করানো হয়েছে, সে সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা। মানব জাতির শিল্পকেন্দ্রিক ইতিহাস, সমাজ-জীবনের দুটো গুরুত্ব-পূর্ণ পর্যায়ের মধ্যে যে সূক্ষ্মদৃষ্টি দিতে পারে ইতিহাসের আর কোনো পর্যায়ের পক্ষেই তা দেওয়া সম্ভব নয়। এ কথাটা বোঝাবার জন্যে ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা সম্বলিত বিতর্কের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই ইতিহাস আমাদের কাছে সেই সব ধারাবাহিক রচনা কৌশলের জ্ঞান উপস্থাপিত করে যা দিয়ে সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির স্বার্থে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগ করা হয়েছে। শিল্পকেন্দ্রিক ইতিহাস এইভাবে সামাজিক অগ্রগতির ধারাবাহিক কারণ ব্যক্ত করে। এর অন্য অবদান হল, আমাদের সম্মুখে সেই সমস্ত জিনিস রাখা, যা মূলতঃ সকল মানুষের সার্বিক স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থ নৈতিক ইতিহাস সাধারণ মানুষের কর্মতৎপরতা, বৃত্তি ও ভাগ্য সম্বন্ধে যে ভাবে পর্যালোচনা করে, ইতিহাসের আর কোনো শাখা তা করে না। যে জিনিসটা প্রত্যেক ব্যক্তিকে "অবশ্যই" করতে হবে তা হল প্রাণে বাঁচা; যে জিনিসটা সমাজকে অবশ্যই করতে হবে, তা হল সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করা, এবং এটাও দেখা যে, তাঁকে যেন এই দানের ন্যায্য প্রতিদান দেওয়া হয়।

অর্থ-নীতিক ইতিহাস অধিকতর মানবিক, অধিকতর গণতান্ত্রিক, কাজেই রাষ্ট্রীয় ইতিহাস থেকে অধিকতর বিমুক্ত। এই ইতিহাস নৃপতির রাজ্য ও ক্ষমতার উত্থান পতন নিয়ে পর্যালোচনা করে না,—পর্যালোচনা করে বিশ্বপ্রকৃতির উপর কর্তৃত্বের মাধ্যমে সেই জনগণের সার্থক বিমুক্তি নিয়ে, যাঁদের সাধারণ হিতার্থে ক্ষমতা ও রাজ্য বর্তমান থাকে।

অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অপেক্ষা শিল্পীয় ইতিহাস প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের

সংগ্রাম, সফলতা ও বিফলতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অধিকতর প্রত্যক্ষ ও প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করে। অপরপক্ষে, যখন রাজনীতিক ইতিহাসকে যুবকদের বোধগম্যতার স্তরে নামানো হয়, তখন তা সহজেই সামন্ততান্ত্রিক ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করে। কারণ যে পথ অনুসরণ করে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের সদ্ব্যবহার করতে শিখেছে, শিল্পকেন্দ্রিক ইতিহাস মূলতঃ সেই পথেরই বর্ণনা। যে কালে মানুষ নিজের স্বার্থসাধনে প্রধানতঃ অন্য মানুষের পেশী শক্তির সুবিধা নিত, সেকাল থেকে আরম্ভ করে, যেকালে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গতিকে এতদূর শাসনাধীনে এনেছে যে, কার্যতঃ না হলেও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপরে মানুষ যৌথ মালিকানা বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, শ্রমশিল্পের ইতিহাস মুখ্যতঃ সেই কালান্তরেরই বর্ণনা। যখন কর্মের ইতিহাসকে, জমি, বন ও খনির সদ্ব্যবহারের শর্তাবলীকে, শস্য ও গৃহপালিত পশুকর্ষণ করাকে এবং বৃহদাকার উৎপাদন ও বণ্টনকে হিসাবের বাইরে রাখা হয়, তখন ইতিহাস শুধু সাহিত্যিক উপাদানে পরিণত হতে চায়—হয়ে পড়তে চায় কোনো অতিকথা সম্বলিত সেই মানবগোষ্ঠীর ছন্দোবদ্ধ অতিকাহিনী যারা ভূমণ্ডলের উপর খেয়ে বাঁচবার পরিবর্তে নিজেদের উপরেই খেয়ে বাঁচতে চেয়েছিল।

সম্ভবতঃ সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিহাসের সর্বাধিক উপেক্ষিত শাখা হ'ল বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস। আমরা সবেমাত্র বুঝতে আরম্ভ করেছি যে, যে মহামানবেরা মানুষের নিয়তির উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তাঁরা রাজনীতিক, সেনানায়ক, বা কূটনীতিবিদ নন, পরন্তু তাঁরা হলেন, সেই আবিষ্কারক ও রচনা কৌশলিগণ যাঁরা মানুষের হাতে দিয়েছেন সম্প্রসারণশীল ও নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতার বিভিন্ন সাধক। এতে আরও আছেন সেই সমস্ত কলাকার ও কাব্যকার যারা মানুষের সংগ্রাম ও জয় পরাজয়কে এরূপ ভাষায়, চিত্রে ও ছন্দে বা লেখায় প্রচার করেছেন যে, এ সব জিনিসের অর্থ অন্যান্যের কাছে সার্বিকরূপে বোধগম্য হয়েছে। সামাজিক সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে শক্তিপুঞ্জের ক্রমবর্ধমান অভিযোজন সংক্রান্ত ইতিহাসরূপে শিল্প-কেন্দ্রিক ইতিহাসের একটা সুবিধা এই যে, এই ইতিহাস জ্ঞানলাভ করার নানাবিধ পদ্ধতি ও ফলাফল সম্বলিত অগ্রগতি বিচার-বিবেচনা করার সুযোগ যোগায়। বর্তমানে, মানুষ বুদ্ধি ও বিচারকে সাধারণ ভাষায় প্রশংসা করতে অভ্যস্ত;

এদের মৌলিক গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক সময়েই শিক্ষার্থীরা গতানুগতিক ইতিহাস পাঠ শেষ করে এসে, হয় মনে করে যে, মানুষের বোধবুদ্ধি এমন একটা স্থবির রাশি যা শ্রেষ্ঠতর পদ্ধতির আবিষ্কার দ্বারা উন্নতিলাভ করেনি, নয়তো ব্যক্তিগত বিচক্ষণতা জাহির করা ছাড়া বুদ্ধি কোনো একটা নগণ্য ঐতিহাসিক উপকরণ মাত্র। অবশ্যই, যে ইতিহাস সহজভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, বর্বরতা থেকে সভ্যতার পথে আসতে মানুষের সকল অগ্রগতিই কি ভাবে বুদ্ধিগত আবিষ্কার ও রচনা কৌশলের উপর নির্ভর করেছে, আরও বুঝিয়ে দেয় যে, ইতিহাসের লেখার মধ্যে যে সব বিষয় সাধারণতঃ সর্বাধিক 'প্রাধান্য লাভ করে থাকে তার বেশীর ভাগই আনুসঙ্গিক বিষয়, কিম্বা এমন কি, যা বুদ্ধির পক্ষেও অতিক্রম করার প্রতিবন্ধক,—জীবনে মনকে যে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, তার যথার্থ উপলব্ধিকে ধীরে ধীরে মনের মধ্যে সঞ্চারিত করার পক্ষে সে ইতিহাস পাঠ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ পন্থা পরিকল্পনা করা যায় না।

এই হিসাবে পর্যালোচনা করলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইতিহাস সর্বাধিক স্বাভাবিক ভাবেই একটা নৈতিক মূল্য লাভ করে। যে সচ্চরিত্রতার নৈতিকতা বর্ণহীন নিরপরাধবোধ থেকে বেশী কিছু জ্ঞাপন করে, তার জন্যে সমষ্টিগত জীবনের বর্তমান আকৃতির মধ্যে সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা অত্যাবশ্যক। ঐতিহাসিক জ্ঞান এই সূক্ষ্মদৃষ্টি যোগাতে সাহায্য করে। ইতিহাস উপস্থিত সমাজ বুনানির টানা-পড়েনের বিশ্লেষণের, এবং যে শক্তিপুঞ্জ এর ছক বয়ন করেছে তাকে জানাবার একটা যন্ত্রস্বরূপ। সমাজকেন্দ্রিক বুদ্ধি কর্ষণের জন্য ইতিহাসের প্রয়োগ, এর নৈতিক তাৎপর্য দেয়। ইতিহাসকে এমন এক ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীর ভাণ্ডাররূপে ব্যবহার করাও সম্ভব যার মধ্যে থেকে দৃষ্টান্ত এনে এই গুণ বা ঐ দোষের উপর বিশিষ্ট নীতিশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এরূপ শিক্ষার মধ্যে ইতিহাসের নৈতিক প্রয়োগ ততোটা থাকে না যতোটা থাকে কম-বেশী খাঁটি বিষয়-বস্তু দিয়ে নৈতিক ধারণাকে সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা। খুব ভালো ফল হলেও এতে একটা অস্থায়ী প্রক্ষোভমূলক দীপ্তি সৃষ্টি হয় মাত্র। আর খুব মন্দ ফল হলেও এতে নীতিবাচকতার উপর একটা বেদনহীন উদাসীনতা আসতে পারে। যে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে লোকে অংশ গ্রহণ করে, তার একটা অধিকতর বুদ্ধিগম্য ও সমবেদী

বোধগম্যতাতে ইতিহাস যে সহায়তা দিতে পারে, তাই হ'ল একটা চিরস্থায়ী ও গঠনমূলক নৈতিক সম্পত্তি।

সারাংশ

অভিজ্ঞতার প্রকৃতিই এরূপ যে, প্রথমে এর মধ্যে জ্ঞাতসারে যা কিছু দেখা যায়, তার সংশ্লিষ্টতা তাকে অতিক্রম করে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। এই সব যোগসূত্র বা সংশ্লিষ্টতা চেতনায় আনলে অভিজ্ঞতার তাৎপর্য বৃদ্ধি পায়। কোনো অভিজ্ঞতা প্রথম দৃষ্টিতে যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন তাতে তার বিভিন্ন উপলব্ধ যোগসূত্রের পাল্লা বেড়ে গিয়ে ক্রমে তার তাৎপর্যকে অসীম সমৃদ্ধি দিতে পারে। অন্যান্য লোকের সঙ্গে স্বাভাবিক আদান-প্রদানই হ'ল এই বিকাশ ঘটানোর সহজতম উপায়। কারণ আদান-প্রদানই সমষ্টির অভিজ্ঞতার, এমন কি, জাতির অভিজ্ঞতার সহিত ব্যক্তির অব্যবহিত অভিজ্ঞতাকে জুড়ে দেয়। স্বাভাবিক আদান-প্রদান কথাটার অর্থ হ'ল, এর মধ্যে কোনো যৌথ স্বার্থবোধ বা কোনো সার্বিক স্বার্থবোধ থাকা। তার ফলে এক জনের দেবার এবং আর একজনের নেবার আগ্রহ হয়। কোনো বিষয় সম্বন্ধে বলে বা বর্ণনা করে আর একজনের ধারণা জন্মানো, আর সে তার কতোখানি মনে রাখলো, আর আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি করতে পারলো, তা পরীক্ষা করে দেখার পদ্ধতি, আদান-প্রদান পদ্ধতির বিপরীত।

প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাৎপর্যকে সম্প্রসারিত করার জন্য ইতিহাস ও ভূগোল হ'ল স্কুলের দুটি বড়ো সঙ্গতি। পূর্ব অধ্যায়ে যে সব কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজনের কথা বলা হয়েছে, তা ভৌত-প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই স্থানে ও কালে সম্প্রসারিত হতে থাকে। যদি কেবল বাহ্যিক কারণ বশতঃ বা কেবল দক্ষতা লাভের জন্য এই সব বৃত্তি শেখানো না হয়, তা হলে এদের প্রধান শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্য এই দাঁড়ায় যে, এরা ইতিহাস ও ভূগোলে বর্ণিত বৃহত্তর তাৎপর্যপূর্ণ জগতের মধ্যে প্রবেশ করার সর্বাধিক সরাসরি ও আগ্রহব্যঞ্জক পথ যোগায়। যদিও ইতিহাস মানবিক সংশ্লিষ্টতা, এবং ভূগোল ভৌত-প্রকৃতির যোগসূত্র ব্যক্ত করে, তবুও এরা একই জীবন্ত পূর্ণতার দুটি দিক। কারণ মানুষের সমষ্টিগত জীবন ভৌত-প্রকৃতির মধ্যেই চলতে থাকে; বহিঃপ্রকৃতি কোনো একটা আকস্মিক সমাবেশরূপে বিদ্যমান নয়, পরন্তু তা বিকাশলাভেরই একটা নির্দিষ্ট উপকরণ ও মাধ্যমরূপে বিদ্যমান।

সপ্তদশ অধ্যায়

পাঠক্রমে বিজ্ঞান

১। যুক্তি-তাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে তার সূত্র ধরে দেখা যায় যে কোনো মীমাংসিত ও নিশ্চিত বিষয়-বস্তু আয়ত্ত করার জন্য, সুবিবেচিতরূপে পর্যবেক্ষণ, চিন্তন ও পরীক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করার পরিণতিরূপে যে জ্ঞান আসে, সেই জ্ঞানই বিজ্ঞান। এর মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসকে পুনরীক্ষণ করার জন্য একটা বুদ্ধিগম্য ও অবিরত চেষ্টা থাকে; তার মধ্যে যা কিছু ভ্রান্তি থাকে তাকে দূরীভূত করে তার বিশুদ্ধতা বাড়ানো হয়, এবং সর্বোপরি তাকে এমন রূপ দেওয়া হয় যে, তাতে নানাবিধ তথ্যের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যতোদূর সম্ভব স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। সকল জ্ঞানের মতো বিজ্ঞানও কর্মতৎপরতার কোনো পরিণতি বিশেষ এবং সেটি পরিবেশের মধ্যে কোনো না কোনো একটা পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে জ্ঞান লাভ হয় তার গুণ হ'ল তার কর্মনিয়ন্ত্রণকারী উপকরণ, কর্মের কোনো প্রাসঙ্গিক ফল নয়। যুক্তিসম্মত এবং শিক্ষাসম্মত ভাবে উভয় দিক থেকেই বিজ্ঞান হ'ল অবগতির পূর্ণাঙ্গীকরণ, কোনো জ্ঞানের শেষ পর্যায়।

সংক্ষেপে, বিজ্ঞান যে কোনো জ্ঞানের বিভিন্ন "যুক্তসঙ্গত" সংশ্লেষের সম্যক উপলব্ধিকেই সূচিত করে। যা-কিছু জানা, তার উপরে কোনো আকৃতি চাপানো যৌক্তিক শৃঙ্খলা নয়; সে শৃঙ্খলা হ'ল জ্ঞানের সেই সঙ্গত আকৃতি যা দিয়ে তা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। কারণ তার অর্থ এই যে, বিষয়-বস্তুর বর্ণনাটি এমন ধরনের যে, যিনি তা বোঝেন তাঁর কাছে, যে সমস্ত অঙ্গীকার থেকে সেটি এসেছে এবং যে সমস্ত সিদ্ধান্ত সূচিত করে, তাকে ব্যক্ত করে (পূর্বে দেখুন পৃঃ ২৫০)। সুযোগ্য প্রাণীবিদ্যাবিৎ যে ভাবে কয়েকখানা অস্থি থেকে কোনো প্রাণীর আকৃতি পুনর্গঠন করতে পারেন, সেই ভাবেই গণিত কিম্বা পদার্থ বিদ্যার কোনো বর্ণনার আকৃতি থেকে, একজন বিশেষজ্ঞ, যে

তথ্য-পরম্পরার মধ্যে ঐ বর্ণনার স্থান আছে, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা গঠন করতে পারেন।

অনভিজ্ঞ লোকের কাছে অবশ্য এই পূর্ণাঙ্গ আকৃতি একটা প্রতিবন্ধক। যেহেতু জ্ঞানের প্রসারকেই তার নিজ উদ্দেশ্যরূপে ধরে নিয়ে এবং তারই সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, এই বিষয়-বস্তুর বর্ণনা দেওয়া হয়, ঠিক সেই হেতু, নিত্যকার জীবনের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক লুকানো থাকে। যিনি বিশেষজ্ঞ ন'ন, তার কাছে অস্থিগুলো কৌতূহল মাত্র। যে পর্যন্ত তিনি প্রাণীবিদ্যার মূল নিয়মগুলি আয়ত্ত না করবেন, সে পর্যন্ত ওগুলো দিয়ে তাঁর পক্ষে কিছু গঠন করার চেষ্টা হবে এলোমেলো ও অন্ধ প্রকৃতির। শিক্ষার্থীর স্থান থেকে দেখলে, বৈজ্ঞানিক আকৃতি হল কোনো আদর্শ যা আয়ত্ত করতে হবে, যা থেকে শুরু করতে হবে, এমন কোনো প্রারম্ভিক স্থান নয়। তা সত্ত্বেও কার্যতঃ অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়কে কতকটা সরল করে নিয়ে শিক্ষাদান আরম্ভ করা হয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দাঁড়ায় তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা। শিক্ষার্থী সঙ্কেত চিহ্নগুলির অর্থের চাবি ছাড়াই সেগুলো শেখে। যে সমস্ত বস্তু ও ক্রিয়ার সঙ্গে সে সুপরিচিত, তার সাথে সম্পর্ক সন্ধান করার যোগ্যতা ছাড়াই সে এক রাশ কারিগরি সংবাদ আয়ত্ত করে,—অনেক সময় কেবল একটা অদ্ভুত বুলি আয়ত্ত করে।

মনে করা হয় যে বিষয়-বস্তুকে পূর্ণাঙ্গ আকৃতিতে উপস্থাপিত করলেই বুঝি বিদ্যালাভের রাজপথ খুলে যাবে—এই ধরনের একটা প্রচণ্ড ঝোঁকও দেখা যায়। এ ধারণা থেকে বেশী স্বাভাবিক আর কি হতে পারে যে, সুযোগ্য জিজ্ঞাসীরা যে স্থানে শেষ করেছেন, সে স্থান থেকে আরম্ভ করলে তরুণদের অনেকটা সময় ও শক্তি বাঁচবে, এবং তারা অপ্রয়োজনীয় ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবে। শিক্ষার ইতিহাসে এর পরিণতি বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এমন পাঠ্য পুস্তক নিয়ে তাঁদের বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করে যে, তাঁর মধ্যে বিশেষজ্ঞের বিন্যাস অনুযায়ী বিষয়-বস্তুর প্রসঙ্গ সাজানো থাকে। সর্বপ্রথমে দেওয়া হয় কারিগরি ধারণা আর তার সংজ্ঞা। খুব প্রাথমিক পর্যায়েই বিভিন্ন সূত্রের সাথে পরিচয় ঘটানো হয়; আর ভালোর থেকে ভালো হলেও, কি করে ঐ সব সূত্রে পৌছানো গেল সে সম্বন্ধে অল্প-

সহজ বলে দেওয়া হয়। সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ সুপরিচিত বিষয়-বস্তুকে বৈজ্ঞানিক কায়দায় ব্যবহার করতে শেখার পরিবর্তে বিদ্যার্থীরা একটা বিজ্ঞান শেখে মাত্র। অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া বিদ্যার্থীর পদ্ধতিই কলেজের শিক্ষায় চাপানো হয়; কলেজের ধরন চালু করা হয় উচ্চ বিদ্যালয়ে, এবং এইভাবে নীচের দিকে চলতে থাকে। কিন্তু বিষয়টা কি করে সহজবোধ্য হতে পারে সেটা বাদ পড়ে যায়।

যে কালানুক্রমিক পদ্ধতি বিদ্যার্থীর অভিজ্ঞতা নিয়ে আরম্ভ করে এবং তারই থেকে সঙ্গত বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাতে বিকাশ লাভ করে, সে পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী, বা বিশেষজ্ঞের যৌক্তিক পদ্ধতির পার্থক্য দেখিয়ে অনেক সময় তাকে "মনস্তাত্ত্বিক" পদ্ধতি বলা হয়। এতে আপাত-দৃষ্টিতে যে সময়টা নষ্ট হয়, উত্তম বোধগম্যতা এবং জীবন্ত আগ্রহ তাকে পুরণ করার থেকেও বেশী কিছু করে। বিদ্যার্থী যা শেখে সে অন্ততঃ তা বোঝে। অধিকন্তু নিত্যকার জীবনের পরিচিত বিষয়-বস্তুর মধ্যে থেকে নির্বাচিত সমস্যা সম্পর্কে, বিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতিতে তাঁদের পুর্ণাঙ্গ জ্ঞানে উপনীত হয়েছেন, সেই পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই বিদ্যার্থীও তাঁর পাল্লার মধ্যের বিষয়-বস্তু নিয়ে কাজ করার স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করে; এবং যে সব বিষয়ের অর্থ কেবল প্রতীকগত তাঁর অধ্যয়নের ফলে যে মানসিক বিভ্রান্তি ও বুদ্ধিগত অরুচি আসে, তা তারা এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়। যেহেতু অধিকাংশ বিদ্যার্থীই বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ হতে চলছেন না, সেই হেতু বিজ্ঞানীরা যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেই সব দূরপাল্লার ও পরোক্ষ বিষয়ের অনুকরণে নিযুক্ত না থেকে, বৈজ্ঞানিক "পদ্ধতিটার" অর্থ কি, সেই সম্বন্ধে কিছুটা সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ-পর্যন্ত "যতোদুর কাজ করা হয়েছে" ছাত্রেরা হয়ত ততোদূর যেতে পারবে না, কিন্তু তারা যথার্থরূপে যতোদূর পর্যন্ত যাবে, তাতে তারা নিশ্চিত ও বুদ্ধিদীপ্ত থাকবে। এবং এ কথাও নির্বিবাদে বলা যায় যে, অল্প যে ক'জনে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ হতে অগ্রসর হবেন তাঁদেরও শুধু স্তূপীকৃত বিশুদ্ধ কারিগরি প্রতীকভিত্তিক সংবাদে বিহ্বল হয়ে যতোটা প্রস্তুতি হতো, তার থেকে ভালো প্রস্তুতিই হবে। যাঁরা নিজ নিজ ক্ষমতাবলে বিজ্ঞানের সঙ্গে গতানুগতিক বিজ্ঞতাপুর্ণ পরিচয় লাভের চোরাবালি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হ'ন বাস্তবিক পক্ষে তাঁরাই কৃতী

বিজ্ঞানী হ'ন।

যাঁরা এক বা দুই পুরুষ আগে বহু বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে শিক্ষায় বিজ্ঞানের স্বীকৃতি পাবার জন্যে কঠিন চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রত্যাশার তুলনায়, এ পর্যন্ত যে ফল পাওয়া গেছে, তার পার্থক্য বেদনাদায়ক। হারবার্ট স্পেন্সারের জিজ্ঞাসা ছিল, জ্ঞানের সর্বাধিক মূল্য কি? তিনি এই মীমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন যে, সব দিক দিয়েই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই হ'ল সর্বাধিক মূল্যবান। কিন্তু তাঁর যুক্তি-তর্ক অজ্ঞাতসারে ধরে নিয়েছিল যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পূর্বপ্রস্তুত আকারে পরিজ্ঞাপন করা চলে। যে সব "পদ্ধতি" দ্বারা আমাদের নিত্যকার ক্রিয়াকলাপের বিষয়-বস্তু বৈজ্ঞানিক আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়, তা বাদ পড়ার ফলে, যে পদ্ধতিটি দ্বারা বিজ্ঞান বি-জ্ঞান হয়েছে সেটিকেই অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুরূপ পরিকল্পনার উপরে শিক্ষাদান চলেছে। কিন্তু বিষয়-বস্তুকে কারিগরি-অর্থে-শুদ্ধ, বৈজ্ঞানিক আকৃতিতে বর্ণনা করার সাথে কোনো ইন্দ্রজাল জড়িত নেই। যখন তা এই আকৃতিতে শিক্ষা করা হয়, তখন তা একরাশ নিষ্ক্রিয় সংবাদ হয়ে পড়ে থাকে। অধিকন্তু এর বর্ণনার ঢং সাহিত্য-সম্মত বর্ণনার ধরন থেকে বিভিন্ন। কাজেই সেটা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ফলপ্রসূ সংযোগ থেকে আরো দূরে নিয়ে যায়। তা হলেও এ কথা আসে না যে, বিজ্ঞান শেখাবার পক্ষে যে দাবী উঠেছিল তা অন্যায্য ছিল। কারণ ঐ ভাবে যে বস্তু শেখানো হয়, শিক্ষার্থীর কাছে তা বিজ্ঞান "নয়"।

যদিও জিনিসপত্র ধরা-ছোঁয়া করা এবং শ্রমশালার অনুশীলন, অবরোহী প্রথা অনুযায়ী সাজানো পাঠ্যপুস্তক থেকে অনেক ভালো ব্যবস্থা, কিন্তু তা নিজে থেকেই প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদিও ঐ সব কাজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এক অপরিহার্য অংশ, তবুও তা গতানুগতিকরূপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গঠন করে না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভৌত পদার্থ নিয়ে কাজ করা যেতে পারে, কিন্তু এ সব পদার্থ ও তাদের কাজে লাগানোর ধরন, স্কুলের বাইরের বস্তু এবং তাকে কাজে লাগানোর ধরন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। যে সমস্যা নিয়ে কাজ করা হয়েছে সেটা "কেবল" বিজ্ঞানের সমস্যাই হতে পারে,—অর্থাৎ যা কেবল তাঁর মাথায়ই আসবে যিনি বিষয়টার বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্বে থেকেই পরিচিত হয়েছেন। বিষয়-বস্তুর

অন্তর্গত কোনো সমস্যার সঙ্গে শ্রমশালার অনুশীলনের যোগসূত্রের সংশ্রব ছাড়াই হাতের কারিগরিতে দক্ষতা লাভের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবিষ্ট থাকতে পারে। অনেক সময় লেবরেটরি এবং আদি ধর্ম,—উভয়েরই আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম থাকে। [১]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লখ করা হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক উক্তি বা যুক্তি-সঙ্গত আকৃতি, সঙ্কেত বা প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার নির্দেশ করে। অবশ্য এ কথাটা ভাষার সব রকম প্রয়োগের ক্ষেত্রেই খাটে। কিন্তু কথিত ভাষায়, মন সরাসরি প্রতীক থেকে প্রতীক-নির্দিষ্ট জিনিসে গমন করে। সুপরিচিত জিনিসের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ এত নিকট যে, মন প্রতীকের উপর থেমে যায় না। এখানে কেবল বস্তু ও ঘটনার জন্যই প্রতীক ধার্য হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আর একটা প্রয়োগ আছে। আমরা দেখেছি যে, এই পরিভাষা, আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেকার জিনিসের সরাসরি ব্যবহারিক প্রয়োগের স্থানে বসানোর জন্য পরিকল্পিত হয় না; পরিকল্পিত হয় কোনো জ্ঞানকেন্দ্রিক কাঠামোতে স্থাপিত জিনিসের উপস্থাপনের জন্য। চূড়ান্ত অর্থে অবশ্য তারা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির পরিচিত জিনিসকেই নির্দেশ করে। কিন্তু অব্যবহিত-রূপে তারা জিনিসের সাধারণ প্রসঙ্গে জিনিসকে চিহ্নিত করে না, পরন্তু তাকে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার শব্দাবলীতে রূপান্তরিত করে। পরমাণু, অণু, রাসায়নিক সঙ্কেত চিহ্ন, পদার্থবিদ্যা পাঠে গাণিতিক প্রতিজ্ঞা,—এদের সবারই কোনো একটা মৌলিক বুদ্ধিগত মূল্য থাকে; এবং কেবল পরোক্ষ-ভাবেই তাদের কোনো কার্যগত মূল্য থাকে। এরা বিজ্ঞানের কাজ চালিয়ে যাওয়ার যন্ত্রপাতির প্রতীক। অন্যান্য সাধকের মতো কেবল ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারাই এদের তাৎপর্য শিখতে পারা যায়। আমরা জিনিসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এদের অর্থ বোঝাতে পারি না, পরন্তু যখন এরা জ্ঞান লাভের কৌশলের অংশরূপে নিয়োজিত হয় তখনই এদের কাজ দেখিয়ে তাদের বোঝাতে পারি।

১। সদর্থক দিক থেকে, বাগান, কর্মশালা, ইত্যাদির কাজ থেকে যে সব সমস্যা ওঠে তার মূল্য বিবেচনা করা যেতে পারে। এই সব সমস্যা আরও ভালো করে অনুধাবন করার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও যন্ত্রপাতি যোগান দেওয়া লেবরেটরিকে একটা অতিরিক্ত সঙ্গতি-রূপে কাজে লাগানো যেতে পারে।

এমন কি, জ্যামিতির বৃত্ত, সমচতুর্ভুজ ইত্যাদিও নিত্য-পরিচিত বৃত্ত ও সমচতুর্ভুজ থেকে ভিন্ন আকৃতির দেখায়; এবং গাণিতিক বিজ্ঞানের মধ্যে যতোই অগ্রসর হওয়া যায়, নিত্যকার অভিজ্ঞতার জিনিস থেকে তাদের দূরত্ব ততোই বেড়ে যায়। যে সমস্ত গুণ ব্যাপ্তিশীল সম্পর্কাদি সম্বন্ধে জ্ঞান অনুধাবনের জন্য কাজে লাগে না, তাকে বাদ দেওয়া হয়। আর, যা এই উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ, তার উপরেই জোর দেওয়া হয়। যদি কেউ তার অধ্যয়নে প্রচুর অগ্রসর হন, তা হলে তিনি দেখবেন যে এমন কি, ব্যাপ্তিশীল জ্ঞানের পক্ষে যা তাৎপর্যপূর্ণ তার স্থানেও ক্রমে ক্রমে এমন সব গুণ আসে যা অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানকে সুগম করে,—হয়ত রাশির সাধারণ সম্পর্কের জ্ঞানও এসে যেতে পারে। ধারণামূলক সংজ্ঞার মধ্যে, ব্যাপ্তিশীল আকৃতি, আয়তন ও দিক-নির্দেশ সম্বন্ধে যাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এমন কি, সে রকমের কিছুও থাকবে না। এ কথার অর্থ এ নয় যে, এগুলো অবাস্তব মানসিক রচনা; পরন্তু তা এটাই সূচিত করে যে, প্রত্যক্ষ ভৌতিক গুণকে কোনো বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের সাধকে,—বুদ্ধিগত সংগঠনের সাধকে,—রূপান্তরিত করা হয়েছে। প্রতিটি যন্ত্রের ক্ষেত্রেই বস্তুর প্রাথমিক অবস্থাকে, কোনো উদ্দেশ্য খাটানোর অধীন রেখেই রূপান্তরিত করা হয়েছে। যা গুরুত্বপূর্ণ তা বস্তুর আদি অবস্থা নয়, পরন্তু কোনো উদ্দেশ্য সাধনে সেটি যে-রূপে অভিযোজিত হয়েছে সেটাই। একটা কলের গঠনের মধ্যে যতো পদার্থ ঢুকেছে সেগুলির নাম করতে পারলেই যে কলটা সম্বন্ধে একজনের জ্ঞান থাকবে, তা নয়, পরন্তু যিনি সেগুলির প্রয়োগ জানেন এবং কি কি কারণে সেগুলি ঐভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা বলতে পারেন, কল সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁরই থাকবে। এইভাবেই, যে সমস্যার মধ্যে কোনো গাণিতিক ধারণা ক্রিয়া করে, এবং ঐ সমস্যার সমাধানে ঐ ধারণার বিশিষ্ট উপযোগিতা কি, যিনি তা দেখতে পান তিনিই ঐ ধারণা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছেন। বিভিন্ন সংজ্ঞা, নিয়ম ও সঙ্কেত "জানা" মানে কোনো কলের বিভিন্ন অংশ যে যে কাজ করে তা না জেনে, ঐ অংশগুলোর নাম জানার মতো। কোনো উপাদান যে ব্যবস্থার অঙ্গ, এবং সেই ব্যবস্থার মধ্যে ঐ উপাদান কি সম্পাদন করে, সেটা জানাই হল তার বুদ্ধিগত আধেয় বা অর্থ।

২। বিজ্ঞান ও সমাজ-প্রগতি

সামাজিক স্বার্থবিশিষ্ট বিভিন্ন নিয়োজনের মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞান বিকাশ লাভ করে, সে জ্ঞানকে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ যৌক্তিক আকৃতি দেওয়া হয়, তাহ'লে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সেটির কি স্থান হবে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সাধারণভাবে এর উত্তর এই যে, বিজ্ঞান চিরাচরিত উদ্দেশ্যগুলোর প্রতি অনুরক্তি থেকে মনের বিমুক্তি চিহ্নিত করে, এবং নতুন উদ্দেশ্যের নিয়মিত অনুধাবনকে সম্ভবপর করে তোলে। কর্মক্ষেত্রে, বিজ্ঞান হ'ল প্রগতির সঙ্ঘটক। অনেক সময় এই মনে করা হয় যে, পূর্বেই যে উদ্দেশ্য ধার্য করা হয়েছে তার নিকটবর্তী হওয়াই প্রগতি। কিন্তু সেটি হল প্রগতির নাবালক অবস্থা। কারণ তাতে কেবল কাজ করার উপায়ের উন্নতি, বা কারিগরি অগ্রগতিরই দরকার হয়। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রগতির ধরনের মধ্যে থাকে, পূর্ববর্তী উদ্দেশ্যকে সমৃদ্ধ করা এবং নতুন উদ্দেশ্যকে গঠন করা। কামনা-বাসনা কোনো অনড় রাশি নয়; আবার প্রগতির অর্থও কেবল অধিক পরিমাণে পরিতুষ্টি লাভ নয়। পরিবর্ধিত কৃষ্টি, এবং ভৌত প্রকৃতির উপর নবতর আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে, নবতর বাসনা-কামনা এবং নবতর গুণ বিশিষ্ট পরিতুষ্টির দাবি জাগে; কারণ সে ক্ষেত্রে, বুদ্ধি, কর্মের নবতর সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে। নতুন নতুন সম্ভবনার অভিক্ষেপন, কর্ম সম্পাদনের জন্য নতুন নতুন উপায়ের সন্ধানে পরিচালিত হয়। এইভাবে প্রগতি সাধিত হয়। অন্যদিকে আবার, যে সমস্ত বস্তু এখনো ব্যবহৃত হয়নি, তার আবিষ্কারও, নবতর উদ্দেশ্যের সঙ্কেত আনে।

কর্ম সম্পাদনের বিভিন্ন উপায়ের নিয়ন্ত্রণকে পূর্ণাঙ্গ করার পক্ষে বিজ্ঞানই যে মুখ্য উপায়, ভৌত প্রকৃতির বিভিন্ন রহস্যের উপরে বুদ্ধিগত কর্তৃত্ব স্থাপনের পরে নানাবিধ উদ্ভাবন-কৌশলের যে বৃহৎ ফলন হয়েছে তা তারই সাক্ষ্য দেয়। শিল্প-বিপ্লব নামক উৎপাদন ও বণ্টন প্রণালীর যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে তা বিজ্ঞানেরই ফল। রেলওয়ে, বাষ্পচালিত জলযান, বৈদ্যুতিক মোটর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন, বেলুনযান ইত্যাদি সকল জিনিসই, জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগের মহান সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু যে সমস্ত অনতি রোমাঞ্চকর উদ্ভাবন-কৌশল দ্বারা প্রকৃতি-

বিজ্ঞানকে আমাদের নিত্যকার জীবনের সহায়ক করা হয়েছে তা বাদ দিলে এ সমস্ত জিনিসের বিশেষ গুরুত্ব থাকে না।

এ কথা স্বীকার্য যে, এইভাবে যে প্রগতি সাধিত হয়েছে তা বহুলাংশে প্রযুক্তি-মূলক। এই প্রগতি, মানুষের উদ্দেশ্যের গুণকে পরিবর্তন না করে, বরং মানুষের পূর্ববর্তী কামনা বাসনাদির তুষ্টি সাধনের কার্যকারী উপায়কে যুগিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, কোনো আধুনিক সভ্যতাই সর্বতো-ভাবে গ্রীক্ সভ্যতার সমকক্ষ হয়নি। কল্পনা ও প্রক্ষোভমূলক মানসত্তার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়ার পক্ষে বিজ্ঞান এখনো অতি সাম্প্রতিক। লোকে তাদের উদ্দেশ্য পূরণার্থে অধিকতর দ্রুত ও সুনিশ্চিত ধারণা লাভ করে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক আলোক সম্পাতের পূর্বে যেরূপ ছিল এখনো সে-রকমই আছে। এই পরিস্থিতি শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে বিজ্ঞানকে এমন-ভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব দেয় যে তাতে বিজ্ঞান যেন কেবল হস্ত-পদাদির ভৌত বিস্তার হয়ে না থেকে কল্পনা ও অনুভূতির চিরাভ্যস্ত মনোভাবকে সংশোধিত করে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ইতিমধ্যেই জীবনের উদ্দেশ্য ও কল্যাণ সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধারাকে সেই পরিমাণে পরিবর্তন করেছে যাতে তা এই দায়িত্বের ধরন, এবং যে উপায়ে তা পূরণ করা যায়, সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দিতে পারে। বিজ্ঞান, মানুষের ক্রিয়াশীলতার মধ্যে ফলপ্রসূ হয়ে, যে সমস্ত ভৌত প্রতিবন্ধক মানুষের কাছ থেকে মানুষকে পৃথক রেখেছিল তা দূর করেছে। তাতে আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রচুর বিস্তার লাভ করেছে এবং মানুষের নানাবিধ স্বার্থের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে। তার সাথে এসেছে মানব জাতির স্বার্থে ভৌত-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাব্যতার বদ্ধমূল ধারণা; এবং এইভাবে সেটি মানুষকে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে না দিয়ে বরং তাকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পরিচালিত করেছে। প্রগতির আদর্শের সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সম-কালীনতা নিছক কাকতালীয় ঘটনা নয়। এই অগ্রগতির পূর্বে মানুষেরা স্বর্ণ যুগকে রেখেছিলেন কোনো সুদূর প্রাচীনের মধ্যে। এখন তাঁরা এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হ'ন যে, সঙ্গতরূপে বুদ্ধি খাটালে এককালে যে সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী বলে বিবেচিত হতো, আজ তা দূর করা সম্ভব।

উৎসন্নকারী রোগ প্রশমিত করা এখন আর স্বপ্ন নয়; দারিদ্র্য দূর করার আশা এখন আর অতিকল্পন নয়। বিজ্ঞান মানুষকে বিকাশের ধারণার সঙ্গে সুপরিচিত করেছে। ব্যবহারিকরূপে, এই বিকাশ ফলপ্রসূ হয় আমাদের সর্বজনীন মানব সম্পত্তির অব্যাহত ও ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে।

কাজেই বিজ্ঞানের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োগের সমস্যা হ'ল এমন বোধ-বুদ্ধি সৃষ্টি করা, যার মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকবে যে, মানুষের দ্বারাই মানবীয় বিষয় পরিচালন করা সম্ভব। শিক্ষার ভিতর দিয়ে অভ্যাসের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বদ্ধমূল করার অর্থ হল, হাতুড়ে নিয়ম থেকে মুক্তিলাভ করা, এবং হাতুড়ে নিয়মের কার্যক্রম যে গতানুগতিকতা সৃষ্টি করে তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া। অভিজ্ঞতালব্ধ শব্দটি, তার সাধারণ অর্থে "পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত" বোঝায় না, বরং যা স্থূল, যা যুক্তিসিদ্ধ নয়, তাই বোঝায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বলিত বিজ্ঞানের অভাবজনিত অবস্থার প্রভাবে, অতীতের সকল প্রভাবশালী দর্শনের মধ্যেই অভিজ্ঞতা ছিল হেতু ও যুক্তির বিরোধী। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অর্থ ছিল সেই জ্ঞান, যা স্তূপীকৃত অতীত দৃষ্টান্ত থেকে পুঞ্জীভূত হয়েছে, এবং যার কোনোটিরই মূল-নিয়মের মধ্যে কোনো সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকে না। ভেষজ-বিদ্যা অভিজ্ঞতালব্ধ ছিল বলার অর্থ এই যে তা বিজ্ঞানলব্ধ ছিল না, বরং তা ছিল এক ধরনের পেশা, যেটি কম-বেশী এলোমেলো ধরনে রোগ দেখার ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা করার উপরে জমে উঠেছিল। ঐ ধরনের পেশা হল অবশ্যম্ভাবীরূপে খেয়ালখুশী মাফিক চিকিৎসা করা এবং এর সাফল্য নির্ভর করে দৈবের উপরে। এ ধরনের চিকিৎসা প্রতারণা ও হাতুড়ে বৈদ্যগিরি হয়ে পড়তেই পারে। যে শ্রম-ব্যবস্থা "অভিজ্ঞতাবলে" নিয়ন্ত্রিত হয়, তা বুদ্ধির গঠনমূলক প্রয়োগকে নিষিদ্ধ করে; অতীতে যে ছাঁচ ঢালাই করা হয়েছে, সেটি তার অনুকরণমূলক ও দাসসুলভ অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অর্থ হল, অতীত অভিজ্ঞতাকে মনের ভৃত্যরূপে ব্যবহার করার সম্ভাব্যতা, মনের মনিবরূপে নয়। এর অর্থ এই যে, অভিজ্ঞতাকে কোনো বুদ্ধিগম্য বা যুক্তিসিদ্ধ গুণ দেওয়ার জন্য যুক্তি অভিজ্ঞতার মধ্যে ক্রিয়া করবে, তার বাইরে নয়। অভিজ্ঞতা যুক্তিসিদ্ধ হলে, তা বিজ্ঞান হয়। কাজেই বিজ্ঞানের ক্রিয়াফল হল অভিজ্ঞতার স্বরূপ এবং তার স্বভাবগত সম্ভাবনাদি সম্বন্ধে

মানুষের ধারণার পরিবর্তন করা। এই নিদর্শন অনুসারেই বিজ্ঞান যুক্তির ধারণা ও ক্রিয়াকে পরিবর্তিত করে। অভিজ্ঞতা থেকে বহুদূরবর্তী, পরোক্ষ, স্বতন্ত্র এবং জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্যুত কোনো মহিমময় রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু হওয়ার পরিবর্তে, যুক্তিকে দেখা যায় অভিজ্ঞতার স্বরাজ্যের মধ্যেই : যুক্তিকে দেখা যায় সেই উপকরণ রূপে, যা দিয়ে অতীত অভিজ্ঞতা পরিশোধিত হয়ে আবিষ্কার ও অগ্রগতির সাধকে রূপান্তরিত হয়।

লৌকিক কথায় "বিমূর্ত" শব্দের সাথে যেন একটা বদনাম রয়েছে। শব্দটি যে কেবল যা কিছু নিগূঢ় ও দুর্বোধ্য তাকেই সূচিত করে তাই নয়, পরন্তু জীবন থেকে যা বহুদূরবর্তী তাও সূচিত করে। কিন্তু কর্মতৎপরতায় সুচিন্তিত পরিচালনার মধ্যে বিমূর্তন একটা অপরিহার্য প্রলক্ষণ। কোনো পরিস্থিতিরই আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি ঘটে না। অভ্যাস নতুন ঘটনার প্রতি এমন আচরণ করে যে তাতে মনে হয় যেন তা পুরানো ঘটনার সাথেই একাত্মক। কাজেই যখন কোনো পৃথক বা অভিনব উপাদান, তখনকার উদ্দেশ্যের সম্পর্কে তুচ্ছ ধরনের হয় তখন সেরূপ আচরণই যথেষ্ট হয়। কিন্তু যখন কোনো নতুন উপাদান বিশিষ্ট মনোযোগ দাবী করে, তখন বিমূর্ত সূত্র কাজে না লাগালে একমাত্র আশ্রয় থাকে খামখেয়ালী প্রতিক্রিয়া করার। কারণ বিমূর্তন, পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তু থেকে সুবিবেচিতরূপে যা নতুনের সঙ্গে যোঝবার সহায়ক হতে পারে, তাকেই নির্বাচিত করে। বিমূর্তন নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য, অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত তাৎপর্যকে জ্ঞাতসারে স্থানান্তর করা সূচিত করে। বিমূর্তনই বুদ্ধিমত্তার অনন্য ধমনী,—অন্য কোনো অভিজ্ঞতার নির্দেশকরূপে পাওয়ার জন্য কোনো এক অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রূপায়ণ।

বিজ্ঞান পূর্ববতী বিষয়-বস্তুর উপর খুব বেশী পরিমাণে এই ক্রিয়া চালায়। যা কিছুই বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত এবং একান্ত অব্যবহিত, বিজ্ঞান তার থেকে অভিজ্ঞতাকে মুক্ত করার প্রতি লক্ষ্য রাখে। অন্যান্য অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তুর সঙ্গে তার যা-কিছু এক হয়ে থাকে, বিজ্ঞান তাকে আলাদা করে আনার জন্য লক্ষ্য রাখে, এবং যেহেতু তা এক-রকমের, সেইহেতু তাকে "আরও" প্রয়োগের জন্য রক্ষা করতে চায়। কাজেই সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে

বিজ্ঞান এক অপরিহার্য উপকরণ। ঠিক যেভাবে কোনো অভিজ্ঞতা ঘটে, তার মধ্যে এমন অনেক কিছু থাকে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে দামী হলেও অনন্যসাধারণ ও অপুনরাবৃত্ত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই উপকরণ আকস্মিক, পরন্তু যে রূপরেখাটি বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকে সেটিই হ'ল সারগর্ভ। এক পরিস্থিতির মধ্যে যা-কিছু অনন্য, অর্থাৎ ব্যক্তির অনন্য-সাধারণতা এবং অবস্থার আনুষঙ্গিকতার উপর নির্ভরশীল, তা অন্যান্যের জন্য প্রাপ্তব্য নয়। সুতরাং যা-কিছু বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকে তা যদি বিমূর্ত করে উপযুক্ত প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা না হয়, তা হলে অভিজ্ঞতাটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটির মূল্যও কার্যতঃ পুরাপুরি লোপ পেতে পারে। কিন্তু বিমূর্তন, এবং বিমূর্ত করে যা তুলে আনা হয়, বাক্যে তা লিপিবদ্ধ করলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সার মূল্যকে মানব জাতির চিরস্থায়ী অধিকারে রাখা হয়। কখন এবং কিভাবে তার আরও প্রয়োগ হতে পারে, তা কেউ পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে আগেই দেখতে পারে না। বিজ্ঞানী তার বিমূর্ত সূত্র বিকাশের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারীর মতো। সে জানে না যে, কে তাঁর জিনিস ব্যবহার করবে বা কখন তা করাবে। কিন্তু বুদ্ধিগত সাধকের প্রয়োগের উপযোগিতার পাল্লা অন্যান্য কারিগরি সাধক থেকে অশেষ প্রকারে অধিকতর নমনীয়।

সামান্যীকরণ বিমূর্তকরণেরই ওপিঠ। তাহ'ল কোনো নতুন মূর্ত অভি-জ্ঞতার ক্ষেত্রে কোনো বিমূর্ত সূত্রের ক্রিয়াশীলতা,—নতুন পরিস্থিতিকে পরিষ্কার ও পরিচালন করবার জন্য তার সম্প্রসারণ। কোনো বিমূর্ত সূত্র যাতে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যর্থ স্তোকবাক্যে পর্যবসিত হওয়ার পরিবর্তে ফল-প্রসূ হয়, সেই জন্য এই সব সম্ভাব্য প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য। মূলতঃ, সামান্যীকরণ একটা সামাজিক কূট-কৌশল। যে কালে লোকে তাদের নানাবিধ স্বার্থকে এক তরফা কোনো এক সাম্প্রদায়িক বিষয়ের সহিত একাত্ম করত, তাদের সামান্যীকরণও সেই রকম সঙ্কীর্ণ ছিল। তাদের দৃগ্‌ভঙ্গী কোনো ব্যাপক ও বিমুক্ত নিরীক্ষার উপযোগী ছিল না। মানুষের চিন্তাধারা সঙ্কুচিত স্থান ও স্বল্প কালের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল,—সীমিত ছিল তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতির মধ্যে। এই রীতিনীতিই ছিল তাদের সকল সম্ভাব্য মূল্যবোধের মানদণ্ড। বৈজ্ঞানিক বিমূর্তন ও সামান্যীকরণ "যে কোনো"

মানুষের দৃষ্টিকোণকে গ্রহণ করারই সামিল, তা সে ব্যক্তি স্থানে ও কালে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। মূর্ত অভিজ্ঞতার শর্তাবলী ও অনুকাহিনী থেকে এই বিমুক্তি একদিকে যেমন বিজ্ঞানের পরোক্ষতার, "বিমূর্ততার", সাক্ষ্য দেয়, অন্যদিকে তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ফলপ্রসূ অভিনব প্রয়োগের বিস্তৃত ও বিমুক্ত পাল্লাকেও প্রকাশ করে।

যা-কিছু বিমূর্ত করা হয়, বিভিন্ন আখ্যা ও প্রতিজ্ঞা তাকে লিপিবদ্ধ করে, স্থির-নিশ্চিত করে এবং জ্ঞাপন করে। কোনো অভিজ্ঞতার যে অর্থ মুক্ত করা হয়, তা শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না। একে কোনো স্থানীয় বাসস্থান দখল করতে হবে। বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন অর্থকে ভৌত অবস্থান স্থল, এবং দেহ প্রদান করে। কাজেই সূত্রায়ন কোনো পশ্চাৎ-চিন্তা বা উপফল নয়, চিন্তনের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যেই তা অপরিহার্য। লোকে এমন বহু জিনিস জানে যা তারা প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু সে জ্ঞান ব্যবহারিক, প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত রূপে থাকে। একজন লোকে তা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারে; সে কর্মকুশলতার সঙ্গে তা নিয়ে কাজ করতে পারে। শিল্পী ও কর্মচারীদের জ্ঞান সাধারণতঃ এই অবস্থাতে থাকে। কিন্তু তা ব্যক্তিগত, স্থানান্তর-সাপেক্ষ নয়, এবং তা যেন সহজ প্রবৃত্তিমূলক। কোনো অভিজ্ঞতার তাৎপর্যকে সূত্রবদ্ধ করার জন্য একজনকে সংজ্ঞাতভাবে অন্যান্যের অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করতে হবে। তাঁকে অবশ্যই এমন কোনো দৃষ্টিকোণ বের করতে হবে যার মধ্যে অন্যান্যের অভিজ্ঞতা এবং নিজের অভিজ্ঞতা উভয়ই থাকে। তা না হলে তার বিজ্ঞপ্তি বুঝতে পারা যায় না। সে এমন কোনো ভাষা বলবে যা আর কেউ জানে না। যদিও অন্যান্যের কাছে অভিজ্ঞতাকে প্রাণবন্তরূপে তাৎপর্যপুর্ণ করে বর্ণনা দিতে গেলে সাহিত্যিক কলাই সর্বোত্তম সফলতা দান করে, তথাপি বিজ্ঞানের শব্দ-বিন্যাস পরিকল্পিত হয় অন্য এক ধরনে। এতে প্রতীক দিয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের অর্থকে এমনভাবে প্রকাশ করা যায় যে, সংলগ্ন বিজ্ঞান যিনি পড়েন, তিনি তা বুঝতে পারেন। কান্তিবিন্যাসংক্রান্ত রূপায়ণ লোকের কাছে অভিজ্ঞতার সেই অর্থকেই ব্যক্ত ও জোরদার করে, যা তাঁর আগেই জানা থাকে; বৈজ্ঞানিক সূত্র, রূপান্তরিত অর্থ সম্বলিত নতুন অভিজ্ঞতা গঠনের জন্য লোককে সাধক যোগায়।

মোট কথা, নতুন অভিজ্ঞতার অভিক্ষেপন ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান, বুদ্ধির সেই কর্মভারকে উপস্থাপিত করে, যা অভ্যাসের গণ্ডী থেকে মুক্তিলাভ করে সুব্যবস্থিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণরূপে, এবং মাত্রা অনুযায়ী, অভিজ্ঞতার অনুধাবন করে। বিজ্ঞানই সংজ্ঞাত অগ্রগতির,—আকস্মিক অগ্রগতির নয়, একমাত্র সাধক। এবং যদিও বা এর সাধারণতা এবং ব্যক্তিগত অবস্থা থেকে দূরবর্তিতা, এর উপরে এক রকমের কারিগরিতা ও নিঃসঙ্গতা অর্পণ করে, তবুও এই সব গুণ অসার দূরকল্পী জল্পনা-কল্পনা থেকে অনেক পৃথক। জল্পনা-কল্পনা, ব্যবহারিক বৃত্তি থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন থাকে। বিজ্ঞানকে সাময়িক-ভাবে আলাদা করে নেওয়া হয়, যাতে পরবর্তী মূর্তকর্মে তার ব্যাপকতর ও স্বচ্ছন্দতর প্রয়োগ হতে পারে। এক রকমের অলস তত্ত্বকথা আছে, যেটি ব্যবহারিক কাজের বিরোধী। কিন্তু খাঁটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যবহারিক কাজের সম্প্রসারণ ও নতুন নতুন সম্ভাবনার দিকে পরিচালনের সংঘটকরূপে ব্যবহারিক কাজের মধ্যেই পড়ে।

৩। শিক্ষায় প্রকৃতিবাদ ও মানবতাবাদ

এক রকমের শিক্ষাগত ঐতিহ্য, সাহিত্য ও ইতিহাসের পক্ষ নিয়ে বিজ্ঞা-নের বিরোধিতা করে। এই স্বার্থদ্বয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যের বিবাদ সহজেই ঐতিহাসিক সূত্রে ব্যাখ্যা করা যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের পত্তন হবার পূর্বেই, সাহিত্য, ভাষা ও এক রকমের সাহিত্যিক দর্শন, সকল উচ্চ-তর বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞানকে স্বভাবতঃই তার স্থান জয় করে নিতে হয়েছে। কোনো শক্তিশালী ও সুরক্ষিত স্বার্থই সহজে তার একচেটিয়া অধিকার ছেড়ে দেয় না। কিন্তু যে দিক দিয়েই দেখা যায়, ভাষা ও সাহিত্যিক সৃষ্টি যে একচেটিয়ারূপে মানবীয় গুণবিশিষ্ট, এরূপ ধারণা মিথ্যা, এবং তা উভয়বিধ অধ্যয়নেরই শিক্ষাসংক্রান্ত সদ্ব্যবহারকে খর্ব করার উপক্রম করে। মানব জীবন শূন্যস্থানে বিরাজ করে না, আবার বহিঃ-প্রকৃতিও কেবল তার অভিনয়কেই মঞ্চস্থ করার রঙ্গশালা নয় (পূর্বে দেখুন ২৭৬ পৃঃ)। বহিঃপ্রকৃতির ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রা সীমা-বদ্ধ। তার জীবনগতি,—হার বা জিত উভয় অর্থে—নির্ভর করে সেই ধরনের

উপরে যে ধরনে ভৌতপ্রকৃতি তার মধ্যে প্রবেশ করে। মানুষের নিজ বিষয়ের সুবিবেচিত নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে ব্যবহারে লাগাবার সক্ষমতার উপরে। আবার এই সক্ষমতা নির্ভর করে ভৌতপ্রকৃতির ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে মানুষের সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকার উপরে। বিশেষজ্ঞের কাছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যাই হোক না কেন, শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে তা হল মানবীয় কার্যকলাপের শর্তাবলীর জ্ঞান। যে মাধ্যমের ভিতর দিয়ে সামাজিক আদান-প্রদান চলতে থাকে, এবং তার উপর্যুপরি বিকাশের ক্ষেত্রে যে সকল উপায় ও প্রতিবন্ধক থাকে, সে সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকাই হ'ল, সেই জ্ঞানের অধীশ্বর হওয়া যা পুরাপুরি মানবতাগুণবিশিষ্ট। যিনি বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ, তিনি,—যে সমস্ত সংগ্রামের ফলে মানুষ গতানুগতিক ও খাম-খেয়ালী পথ থেকে, প্রকৃতির কাছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বশ্যতা থেকে, প্রকৃতিকে ইন্দ্রজালরূপে ব্যবহার করার প্রয়াস থেকে, বুদ্ধিগম্য আত্ম-প্রসন্নতা লাভ করেছে,—সে সম্বন্ধেও অজ্ঞ। এ কথা খুবই সত্য যে বিজ্ঞানকে এক রাশ বিধিবদ্ধ ও কারিগরি অনুশীলনরূপে শেখানো যেতে পারে। যেখানেই পৃথিবী সম্বন্ধীয় সংবাদ জ্ঞাপনকে তার নিজ উদ্দেশ্য বানানো হয় সেখানেই এমনটা ঘটে। কৃষ্টি সাধনে এ ধরনের শিক্ষার ব্যর্থতা মানবীয় বিষয়ের প্রতি প্রাকৃতিক বিষয়ের বিরোধাভাসের সাক্ষ্য দেয় না, সাক্ষ্য দেয় ভ্রান্ত শিক্ষা-সংক্রান্ত ভঙ্গীর।

মানুষের সাধারণ বৃত্তির মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে ভাবে ক্রিয়া করে তাকে কাজে লাগাতে অপছন্দের ভাবটাই হল কোনো অভিজাত কৃষ্টির উদ্‌বর্তন। "প্রযুক্ত" জ্ঞানকে "বিশুদ্ধ" জ্ঞান থেকে হেয় মনে করা সেই সমাজের পক্ষেই স্বাভাবিক ছিল, যার মধ্যে সকল প্রয়োগশীল কাজকর্মই ক্রীতদাস বা দায়বদ্ধ কৃষকেরা করত, এবং যার মধ্যে শ্রমশিল্প বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত না হয়ে বরং রীতি-নির্দেশিত আদর্শ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতো। তখন বিজ্ঞান বা উচ্চতম জ্ঞানকে জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সব রকমের প্রয়োগ থেকে পৃথকভাবে, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক জল্পনার সাথে একাত্ম করা হয়েছিল। এবং ব্যবহারিক শিল্পকলায় নিযুক্ত শ্রেণীদের গায়ে যে কলঙ্ক মাখানো ছিল, শিল্প-কলাকেও তারই দুর্ভোগ পোহাতে হতো (নিম্নে দেখুন ১৯শ অধ্যায়)। বিজ্ঞানের যে ধারণা এই ভাবে জন্মেছিল, বিজ্ঞান শিল্পকলার কলকাঠিকে

অবলম্বন, এবং জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ-করার পরেও এবং গণতন্ত্রের উত্থান হওয়ার পরেও, সেই ধারণা বলবৎ ছিল। সে যাই হোক তত্ত্বকে কেবল তত্ত্ব হিসাবে ধরে নিলেও, যে তত্ত্ব কেবল ভৌত জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট, তার থেকে, যা-কিছু মানবজাতির সাথে সংশ্লিষ্ট, মানুষের কাছে তারই অধিকতর তাৎপর্য থাকে। জনসাধারণের ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে আলাদাভাবে সাহিত্যিক কৃষ্টি দ্বারা স্থাপিত জ্ঞানের মানদণ্ড অবলম্বন করে, বিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষাতাত্ত্বিক সমর্থকগণ নিজেদের একটা কৌশলগত অসুবিধায় ফেলেছেন। যে পর্যন্ত তাঁরা বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি, এবং একটা গণতান্ত্রিক ও শিল্পকেন্দ্রিক সমাজের আন্দোলনের সহিত সুসঙ্গত কোনো বিজ্ঞানের ধারণা অবলম্বন করেন, সে পর্যন্ত তাঁদের এটা দেখাতে কোনো বেগ পেতে হয় না যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কোনো আরোপিত মানবত্ব থেকে বেশী মানবতাবাদী। কারণ এই আরোপিত মানবত্বের শিক্ষা-প্রকল্প এক প্রচুর অবকাশপূর্ণ শ্রেণীর বিশিষ্ট প্রকারের স্বার্থের ওপরে স্থাপিত।

কারণ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, যখন মানবতাবাদী পাঠকে প্রকৃতি পাঠের বিরুদ্ধে স্থাপন করা হয়, তখন মানবতাবাদী পাঠ ব্যাহত হয়। তখন তা কেবল সাহিত্যিক ও ভাষাগত পাঠে পরিণত হয়ে উঠতে চায়। আবার এই পাঠ তখন "ক্লাসিক্‌স্" পাঠ, অর্থাৎ যে সব ভাষা এখন আর কথিত ভাষা নয়, তাতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। কারণ আধুনিক ভাষাগুলিকে স্পষ্টতঃই ব্যবহারে লাগানো চলে, কাজেই তা নিষেধের মধ্যে আসে। যে শিক্ষা ব্যবস্থা একমাত্র গ্রীক্ ও লেটিন পাঠকেই "হিউম্যানিটিজ" পাঠের সঙ্গে একাত্ম করেছে, ইতিহাসে তার থেকে অধিকতর পরিহাসজনক আর কিছু বের করা কঠিন। গ্রীক্ ও রোমান শিল্পকলা ও প্রতিষ্ঠান আমাদের সভ্যতার ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ অংশদান করেছে যে, তার সাথে পরিচয় ঘটানোর প্রচুরতম সুযোগ সকল সময়েই সম্ভবপর হয়। কিন্তু একেই "চরম উৎকর্ষ" বলে মেনে নিলে, শিক্ষায় যে সব বিষয়-বস্তু জনসাধারণের বোধগম্য, মানবতাবোধী পাঠের মধ্যে তার সম্ভাবনাদিকে ইচ্ছা করেই উপেক্ষা করা হয়; এবং সে পাঠ একটা সঙ্কীর্ণ ঠাট কর্ষণেই পর্যবসিত হয়। সেটি এমন কোনো সুপণ্ডিত শ্রেণীর ঠাট, যাঁর মার্কা হল, একচেটিয়া সুযোগের দৈবযোগ। অতীত কালের মানবিক সৃষ্টি "সম্বন্ধীয়" বলে, জ্ঞান মানবতাবোধে গুণান্বিত

হয় না; মানবিক বুদ্ধি ও মানবিক সমবেদিতাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে জ্ঞান যা "করে", তা দিয়েই জ্ঞান মানবতাবোধী হয়। যা কিছুই এই ফল দেয়, তাই মানবীয়; আর যা তা দেয় না, তা মানবীয় তো নয়ই, এমন কি শিক্ষা-সংক্রান্তও নয়।

সারাংশ

বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার জ্ঞানমূলক উপকরণের ফলপ্রসূতাকে উপস্থাপিত করে। ব্যক্তিগত, বা, চিরাচরিত অভিজ্ঞতার কাছে যা কিছু প্রশংসনীয় শুধু তার কথা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে, বিজ্ঞান এমন কোনো উক্তির প্রতি নজর রাখে, যা আমাদের বিশ্বাসের প্রভব, সঙ্গত কারণ ও পরিণামকে ব্যক্ত করতে পারে। এই লক্ষ্য সাধিত হলে, ঐ উক্তি যৌক্তিক গুণ পায়। শিক্ষার দিক দিয়ে এটা দেখতে হবে যে, যে বিষয়-বস্তু উচ্চমাত্রার বুদ্ধিগম্য বিশদতায় পৌঁছেচে, পদ্ধতির যৌক্তিক বৈশিষ্ট্য তারই অন্তর্গত। কাজেই তা শিক্ষার্থীর পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। শিক্ষার্থীর পদ্ধতি হল, তাঁর অভিজ্ঞতার গুণের কোনো স্থুলভাব থেকে অধিকতর পরিশোধিত বুদ্ধিগম্য গুণের মধ্যে সময়ানুক্রমিক অনুপ্রবেশ। যখন এই সত্য উপেক্ষা করা হয়, তখন বিজ্ঞানকে কেবল এক স্তূপীকৃত নগ্ন সংবাদরূপে ধরা হয়; এবং যেহেতু বিজ্ঞানকে এক ধরনের অস্বাভাবিক ও কারিগরি ভাষায় বর্ণনা করা হয়, সেইহেতু তা সাধারণ সংবাদের থেকে কম আকর্ষণীয় ও বেশী পরোক্ষ হয়। জাতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যা করেছে পাঠক্রমের মধ্যে বিজ্ঞানকে সেই কাজ করতে হবে; সে কাজ হল অভিজ্ঞতার ঘরোয়া ও অস্থায়ী প্রসঙ্গ থেকে মুক্তিলাভ করা; এবং ব্যক্তিগত অভ্যাস ও পূর্বানুরাগের দৈববশে কুয়াশাচ্ছন্ন না থেকে, বুদ্ধিগম্য বীথিকে উন্মুক্ত করা। বিমূর্তন, সামান্যীকরণ ও সূত্রায়ন প্রভৃতি যৌক্তিক প্রলক্ষণ, বিজ্ঞানের এই ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। যে বিশিষ্ট প্রসঙ্গে কোনো ধারণার উদ্ভব হয় তার থেকে মুক্ত করে এবং তাকে অধিকতর বিস্তৃত সম্পর্ক দান করে, যে কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ফলকে সকল লোকের সাধ্যের মধ্যে আনা যায়। কাজেই চূড়ান্তভাবে এবং দার্শনিকভাবে বলতে গেলে বিজ্ঞান হ'ল সার্বিক সমাজ প্রগতির যন্ত্র।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ

শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধের মধ্যে যে সকল বিচার-বিবেচনা রয়েছে লক্ষ্য ও স্বার্থবোধের আলোচনার মধ্যে তা পূর্বে বলা হয়েছে। সাধারণতঃ শিক্ষাতত্ত্বে যে সব বিশিষ্ট মূল্যবোধের কথা আলোচিত হয়, সেগুলি, যে সব লক্ষ্যের উপরে জোর দেওয়া হয়, তাদের সাথে মেলে। এগুলি হল উপযোগিতা, কৃষ্টি, সংবাদ, সামাজিক কর্মকুশলতার জন্য প্রস্তুতি, মানসিক শৃঙ্খলা বা ক্ষমতা। এবং এইরূপ আরও যে সব গুণ থাকার জন্য এই সব লক্ষ্য মূল্যবান, স্বার্থবোধের স্বরূপ বিবেচনা করার সময় তাও বলা হয়েছে। কলা সম্বন্ধে কোনো স্বার্থবোধ বা সংশ্লিষ্টতা থাকা, আর তাকেই মূল্যবোধ-রূপে বর্ণনা করা, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তবে পাঠক্রমের যে সব নির্দিষ্ট বিষয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যের প্রয়োজন মেটায়, সাধারণতঃ তাকে কেন্দ্র করেই মূল্যবোধের আলোচনা করা হয়েছে। এই সব পাঠ্য বিষয়ের পাঠ থেকে জীবনে যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ফল-লাভ হয়, তা দেখিয়ে দিয়েই ঐ সব পাঠ্য বিষয়ের ন্যায্যতা দেখাবার আংশিক চেষ্টা করা হয়েছে। কাজেই শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধের কোনো বিশদ আলোচনা, একদিকে পূর্বালোচিত লক্ষ্য ও স্বার্থবোধের আলোচনা এবং আর একদিকে পাঠক্রমের আলোচনার পুনরীক্ষণের সুযোগ দেয়।

১। সুস্পষ্ট উপলব্ধি বা মূল্যাবধারণের স্বরূপ

আমাদের অভিজ্ঞতার অনেক কিছুই পরোক্ষ। যে সব চিহ্ন জিনিসপত্র এবং আমাদের মাঝখানে এসে পড়ে, তা জিনিস-পত্রের স্থানে দাঁড়ায় বা তাকে উপস্থাপিত করে; অভিজ্ঞতা নির্ভর করে এই সমস্ত চিহ্নের উপরে। যুদ্ধে নিযুক্ত থাকা, যুদ্ধের বিপদ ও ক্লেশের অংশীদার হওয়া এক কথা, এবং সে বিষয়ে শোনা বা পড়া আর এক কথা। সকল ভাষা, সকল প্রতীকই পরোক্ষ

অভিজ্ঞতার সাধক। কারিগরি ভাষায়, চিহ্ন অবলম্বন করে যে অভিজ্ঞতা আসে, তা "মধ্যস্থতাজনিত।" এ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অব্যবহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার,—অর্থাৎ যার মধ্যে আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক মধ্যস্থতার পরিবর্তে নিজেরা সচেতন ভাবে এবং সরাসরি অংশ গ্রহণ করি তার,—একটা বৈষম্য থাকে। পূর্বে যেরূপ দেখেছি, ব্যক্তিগত, প্রাণবন্ত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ অতি সীমিত। অনুপস্থিত ও দূরপাল্লার বিষয়াদির প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন মাধ্যম না থাকলে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রায় জীব-জন্তুদের অভিজ্ঞতার স্তরেই থাকত। বর্বরতা থেকে সভ্যতার দিকে প্রতি পদক্ষেপই এমন সব মাধ্যম রচনার উপর নির্ভর করে যা অবিমিশ্র অব্যবহিত অভিজ্ঞতার পাল্লাকে বর্ধিত করে, এবং যা, যে সমস্ত জিনিস কেবল চিহ্নিত বা প্রতীকিকৃত করাই চলে তার সাথে সংযোগ স্থাপন করে তাকে গভীর ও বিস্তৃত অর্থ প্রদান করে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কার্যকর প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য অক্ষরগুলোর উপরে আমরা এতই নির্ভরশীল যে, এই সত্যটাই একজন নিরক্ষর লোককে কৃষ্টিহীন বলে মনে করতে একটা প্রবণতা যোগায়।

আবার এ কথাও ঠিক যে (যা আমাদের পুনঃ পুনঃ দেখাবার সুযোগ হয়েছে) প্রতীক-চিহ্নাদি যথার্থরূপে প্রতিনিধিমূলক না হবার বিপদ আছে। সে বিপদ এই যে, ভাষাগত উপস্থাপনার মাধ্যম, অনুপস্থিত ও দূরপাল্লার বিষয়গুলো যাতে কোনো বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, তাদিকে সেইভাবে উপস্থাপিত না করে ভাষাকেই ভাষার নিজ উদ্দেশ্য করে তুলতে পারে। বিশেষ করে, বিধিবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী এই প্রভাবের অধীনে আসতে পারে। ফলে, যখন আক্ষরিক জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, তখন অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে কেবল পুথিগত বিদ্যা, বা জনপ্রিয় ভাষায় যাকে পণ্ডিতি বলে, তাই চলে আসে। চলতি কথায় "কাণ্ডজ্ঞান" শব্দটি প্রতীকধর্মী অভিজ্ঞতার পরোক্ষ, নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ ও উদাসীন অবস্থার সাথে বৈষম্য রেখে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জরুরী, প্রাণবন্ত, ও ঘনিষ্ঠ অবস্থা জ্ঞাপন করে। "মানসিক উপলব্ধি" বা "মূল্যাবধারণ" (বা খাঁটি মূল্যাবধারণ) শব্দগুলো, কোনো জিনিস সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান থাকারই বিশদ নাম। "অন্তরে উপলব্ধি করা," "মর্মস্পর্শী হওয়া" এবং অনুরূপ প্রতিবাক্য ছাড়া উক্ত ধারণা বিশদ করা সম্ভব নয়।

কারণ কোনো কিছুর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার মানে কি, তার মূল্যাবধারণ করার একমাত্র উপায় হ'ল তার ভুক্তভোগী হওয়া। কোনো চিত্র সম্বন্ধে কোনো কারিগরি বর্ণনা পাঠ করা, আর তা চোখে দেখার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, এ পার্থক্যটা হল সেই রকম। কিম্বা তার উপরে শুধু চোখ বোলানো, আর তা দিয়ে অনুপ্রাণিত হওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তার মতো। জ্যোতি সম্বন্ধে কোনো গাণিতিক সমীকরণ শেখা, আর কোনো কুয়াশাচ্ছন্ন ভূ-দৃশ্যের এক অনন্যসাধারণ ও চমকপ্রদ দ্যুতির প্রভাবে ভাবাবিষ্ট হওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে এটা তারই মতো।

এই ভাবে আমরা প্রত্যক্ষ মূল্যাবধারণের এলাকাতে কৌশল ও অন্যান্য প্রতীকের অনুপ্রবেশের বিপদের সম্মুখীন হই। অন্য কথায়, আমাদের ধরে নেবার ঝোঁক হয় যে, বিধিবদ্ধ স্কুল পাঠ্যবিষয় দ্বারা প্রতীকমূলক অভিজ্ঞতার যে উপরতলা গড়ে উঠেছে, তার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্বন্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ভিত্তি থাকে। বিষয়টা কেবল সংখ্যা ও পরিমাণগত নয়; পর্যাপ্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আরও বেশী করে গুণগতও বটে। তার এমন গুণ থাকতে হবে যাতে শিক্ষার সাঙ্কেতিক বিষয়-বস্তু তার সাথে সহজে এবং ফলপ্রসূরূপে মিলে যায়। সঙ্কেতের মাধ্যমে ঘটনা ও ধারণাবলীকে জ্ঞাপন করার জন্য নির্বিবাদে শেখাতে আরম্ভ করার আগে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে এমন সব খাঁটি পরিস্থিতি যোগাতে হবে যে, তার মধ্যে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ, বিষয়-বস্তুর খাঁটি অর্থ এবং তা যে সব সমস্যা বহন করে তা যেন শিক্ষার্থীর কাছে সুস্পষ্ট হয়। এর ফলে যে অভিজ্ঞতা আসে শিক্ষার্থীর দিক থেকে সেটি তার নিজ অর্থেই মূল্যবান। শিক্ষকের দিক থেকে এই অভিজ্ঞতাই সঙ্কেত সম্বলিত পাঠ বোঝবার জন্য এবং প্রতীকের সাহায্যে যে বিষয়-বস্তু জ্ঞাপন করা হয় তার প্রতি বিমুক্তচিত্ততা ও সংশ্লিষ্টতার মনোভাবকে গড়ে তোলার জন্য, বিষয়-বস্তু যোগানোর উপায় স্বরূপ হয়ে ওঠে।

শিক্ষামূলক বিষয়-বস্তুর তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বহিঃরেখা বা খসড়া দেয়া হয়েছে তার মধ্যে খেলাধূলা ও কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজন-সম্বলিত উপযুক্ত পরিস্থিতির ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, বা মূল্যাবধারণের পশ্চাদভূমির এই দাবী মেটানো হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বেই যা বলা হয়েছে তার সাথে আর কিছু যোগ করার নেই; কেবল এটাই দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, যদিও এই আলোচনা

স্পষ্টতঃ প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে বলা হয়েছে তথাপি প্রতিটি বিষয়ের প্রাথমিক বা মৌলিক স্তরের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষায়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রাপ্তিযোগ্য পশ্চাদভূমির দাবি সর্বাধিক স্পষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে স্কুল বা কলেজের কোনো নতুন ক্ষেত্রে শ্রমশালার কাজের প্রথম ও মৌলিক কাজ হ'ল এক পাল্লার ঘটনা ও সমস্যাবলীর সঙ্গে বিদ্যার্থীকে সরাসরি পরিচয় করানো,—এই সম্বন্ধে তাকে কোনো একটা বিশেষ "অনুভূতি" দেওয়া। কলা-কৌশলের সাধারণ সূত্রে পৌছানোর এবং তার পরীক্ষা পদ্ধতির উপর দখল, প্রথমাবস্থায় মূল্যাবধারণের তুলনায় গৌণ কাজ। প্রাথমিক স্কুলের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ওখানে মুখ্য মতলব মনোরঞ্জন করা নয়, বা যতোদূর সম্ভব তাদের কম বিভক্ত করে সংবাদ জ্ঞাপন করাও নয়, আবার দক্ষতা অর্জন করাও নয়। যদিও উপফল হিসাবে এ সব গুণ আসতে পারে, তথাপি মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল অভিজ্ঞতার পাল্লাকে বর্ধিত ও সমৃদ্ধ করা, এবং বুদ্ধিগত প্রগতির আগ্রহকে জাগ্রত ও কার্যকর রাখা।

মূল্যাবধারণের রক্তিম শিরোনাম আরও তিনটি মূল নিয়ম বের করার যথাযথ শীর্ষ যোগায়: (১) কার্যকর বা বাস্তব (নাম মাত্র নয়) মূল্যায়নের মানের স্বরূপ; (২) মূল্যাবধারণকারী উপলব্ধির মধ্যে কল্পনাশক্তির স্থান; এবং (৩) পাঠক্রমের মধ্যে চারুকলার স্থান।

(১) মূল্যায়নের বিভিন্ন মানদণ্ডের স্বরূপ। প্রতিটি পরিণত বয়স্ক লোকই তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাধারার মাধ্যমে নানা ধরনের অভিজ্ঞতার মূল্য সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিমাপ আয়ত্ত করেছেন। তিনি সততা, অমায়িকতা, অধ্যবসায়, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অনুরূপ গুণাবলীকে নৈতিক কল্যাণরূপে দেখতে শিখেছেন। প্রাচীন যুগের আদর্শ সাহিত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতকে সৌন্দর্যবোধীয় মূল্যরূপে দেখতে শিখেছেন, এবং এইরূপ অন্যান্য মূল্যায়নও করেছেন। এ ছাড়া, তিনি এই সব মূল্যবোধের কিছু কিছু নিয়মও শিখেছেন—যেমন নীতির মান, আদর্শ আচরণ; সৌন্দর্যবোধীয় সামগ্রীর মান সমন্বয়, সুষমতা ইত্যাদির আনুপাতিক বণ্টন; বুদ্ধিগম্য কৃতির মান সংজ্ঞায়ন, প্রাঞ্জলতা ও সুসম্বদ্ধতা। নতুন অভিজ্ঞতার মূল্য বিচার করার মানদণ্ড হিসাবে এই মূল নিয়ম এত গুরুত্বপূর্ণ যে, পিতামাতা ও শিক্ষকেরা সর্বদাই ছোটোদের এগুলো

সরাসরি শেখাতে তৎপর থাকেন। তাঁরা এই আশঙ্কা উপেক্ষা করেন যে, মানদণ্ড এ ভাবে শেখালে "কেবল" প্রতীক হয়েই থাকবে; অর্থাৎ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেটি গতানুগতিক ও বাচনিক হয়েই থাকবে। আসল কথা এই যে, কোনো মূর্ত পরিস্থিতিতে গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে ব্যক্তি নিজেই যা কিছুকে সুনির্দিষ্টরূপে উপলব্ধি করেছেন তার উপরেই, কথার মানদণ্ড থেকে পৃথকভাবে, কাজের মানদণ্ড নির্ভর করে। ব্যক্তি শিখে থাকতে পারেন যে, চলিত প্রথা অনুযায়ী সঙ্গীতের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যকে উচ্চমূল্য দেওয়া হয়; তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুটা নির্ভুলভাবে আলাপ-আলোচনা করতেও সমর্থ হতে পারেন। এমন কি তিনি সততার সহিত বিশ্বাসও করতে পারেন যে, এই সব লক্ষণই তাঁর নিজের সঙ্গীত শিক্ষার মানদণ্ড। কিন্তু তাঁর নিজের অতীত অভিজ্ঞতায় তিনি যা কিছুতে সর্বাধিক অভ্যস্ত হয়েছেন, এবং যা কিছু সর্বাধিক উপভোগ করেছেন, তা যদি জংলী নৃত্য হয়, তা হলে তার সক্রিয় বা কার্যকর মূল্যমানও জংলী নৃত্যের স্তরে স্থাপিত হয়েছে। তাঁকে যা কিছু সঙ্গত বলে বলতে শেখানো হয়েছে, তার চেয়ে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির ডাক তাঁর মনোভাবকে অনেক বেশী গভীরভাবে স্থির-নিশ্চিত করবে। এইভাবে, যে অভ্যস্ত মানসতা স্থির-নিশ্চিত হয়েছে, তাই সঙ্গীত সংক্রান্ত পরবর্তী অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তার মূল্যায়নের "মানদণ্ড"কে গঠন করবে।

সম্ভবতঃ খুব কম লোকেই সঙ্গীতের রুচি সম্বন্ধে এই কথাটা অস্বীকার করবেন। কিন্তু নীতিগত ও বুদ্ধিগত মূল্য বিচারের ক্ষেত্রেও এই কথাই সমানভাবে খাটে। পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে যে যুবকের মানসিক প্রবণতার মধ্যে অপরের প্রতি দয়াশীলতার মূল্যবোধের পুরা তাৎপর্য গঠিত হয়েছে, তাঁর কাছে অন্যের প্রতি উদার আচরণের মূল্যের একটা মানদণ্ড থাকে। এই প্রাণবন্ত মূল্যাবধারণ ছাড়া নিঃস্বার্থপরতার মানদণ্ডরূপে অন্যে যে সব কর্তব্যবোধ ও সদাচারের কথা তার মাথার মধ্যে ঢোকায়, তা অবিমিশ্র প্রতীকরূপেই থাকে, এবং কেউ তাকে পর্যাপ্তরূপে বাস্তবতায় রূপান্তর করতে পারে না। তাঁর জ্ঞান নিম্নমানের; তা কেবল এই জ্ঞান যে, অন্য লোকে নিঃস্বার্থপরতাকে একটা সদ্‌গুণ ভেবে তার মূল্য দেয়, এবং যিনি এই গুণ প্রদর্শন করেন, পরিমাণ মতো তাঁর প্রশংসা করে।

এইভাবে ব্যক্তির বাস্তবিক ও বাচনিক মানদণ্ডের মধ্যে দ্বিধার জন্ম হয়। কোনো ব্যক্তি তার ঝোঁক ও তাত্ত্বিক মতের এই সংঘর্ষের "ফলাফলের" বিষয় অবগত থাকতে পারেন। তাঁর কাছে যা কিছু সত্য সত্যই প্রিয়, আর অন্যের সমর্থন পাবে বলে তিনি যা-কিছু শিখেছেন, এই দু'য়ের মধ্যের বিরোধ তাকে ব্যথিত করে। কিন্তু এই দ্বিধার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি অবগত নন; এর ফল দাঁড়ায়, এক ধরনের নির্জ্ঞাত কপটতা, একটা ঠুনকো ধাত। এইরূপেই, যে শিক্ষার্থী কোনো বুদ্ধিগম্য বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে কাজ করেছেন, এবং কোনো নির্দিষ্ট পরিণতির ক্ষেত্রে অবোধ্য বিষয়-গুলিকে পরিষ্কার করে নিতে সংগ্রাম করেছেন, তিনিই প্রাজ্ঞতা ও সংজ্ঞায়নের মূল্যের গুণাবধারণ করবেন। তার এমন একটা মানদণ্ড হয়েছে যার উপরে নির্ভর করা চলে। তাঁকে কোনো বিশ্লেষণের ভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর বিভাজন সম্বন্ধে বার থেকে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে, এবং তিনি "আদর্শ" যৌক্তিক ক্রিয়ারূপে এই কার্যপ্রণালীর মূল্য সম্বন্ধে সংবাদ আহরণ করতে পারেন, কিন্তু যদি এই সংবাদ কোনোক্রমে বা কোনো অংশে তাঁর নিজস্ব মূল্যাবধারণরূপে তার মর্মস্থলে না আসে, তা হলে তা হবে তথাকথিত যৌক্তিক রীতি, বা সেই ধরনের কোনো একটা বাহ্যিক টুকরো খবর হয়ে থাকবে,—যে ধরনে, ধরা যাক—চীন দেশের নদ-নদীর নাম মনে থাকে। তিনি ঐগুলো মুখস্থ বলতে পারবেন, কিন্তু সে আবৃত্তি হবে কোনো কলটেপা মহলার মতো।

কাজেই মূল্যাবধারণ যেন কেবল সাহিত্যে, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে ও অনুরূপ বিষয়েই সীমিত থাকে এরূপ ধরে নেওয়া গুরুতর ভুল। শিক্ষার কাজ যতো ব্যাপক, মূল্যাবধারণের পাল্লাও ততো ব্যাপক। যা অভ্যাস, তা যদি ব্যক্তির "রুচিও" না হয় অর্থাৎ পছন্দ এবং গুণাবধারণের অভ্যস্ত ধরন না হয়, তার কার্যকারী উৎকর্ষ বোধ না হয়—তা হলে তা কেবল অবিমিশ্র যান্ত্রিক জিনিস হয়। এ কথা জোর দিয়ে বলার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বাহ্যিক "শৃঙ্খলার" উপরে, নম্বর ও পুরস্কার বিতরণের উপরে, উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ও অনুত্তীর্ণ হওয়ার উপরে, বিদ্যালয়ে সচরাচর যে অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয়, তা জীবন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন ঘটনা, ধারণা, নিয়ম ও সমস্যাকে জীবন্তরূপে হৃদয়ঙ্গম করানোর প্রতি মনোযোগের অভাব থাকারই ও-পিঠ।

(২) মূল্যাবধারণমূলক প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে প্রতীক বা প্রতিভূ সূচিত অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক জ্ঞান করতে হবে। কিন্তু তাকে বুদ্ধি বা বোধশক্তির কাজ থেকে পৃথক জ্ঞান করা উচিত নয়। এমন কি, সত্য "ঘটনাদির" ক্ষেত্রেও কেবল কল্পনাযুক্ত ব্যক্তিগত সাড়াই বোধ হয় উপলব্ধি আনতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কল্পনাশক্তি হল মূল্যাবধারণের মাধ্যম। কল্পনাশক্তির নিয়োজনই একমাত্র সেই জিনিস যেটি কোনো ক্রিয়াশীলতাকে যান্ত্রিক পদ্ধতির উর্ধ্বে আনে। দুর্ভাগ্যবশতঃ "কল্পিতকে" কোনো পরিস্থিতির সম্পূর্ণ এলাকায় প্রাণবন্ত ও ঘনিষ্ঠ আধার করে না নিয়ে বরং একে "অলীকের" সমার্থক জ্ঞান করারই খুব চল রয়েছে। তার ফলে কল্পনাশক্তি ও মূল্যাবধারণশক্তির বিকাশের সঙ্ঘটকরূপে রূপকথা, অতিকথা, অলীক সঙ্কেত, পদ্য এবং "চারুকলা" মার্কা কোনো কিছু সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে ; এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতি কাল্পনিক দৃষ্টি উপেক্ষা করার ফলে, এমন সব পদ্ধতি আসে যে তাতে শিক্ষাদান বহুলাংশে কল্পনাহীন কারিগরি দক্ষতা লাভে, এবং সংবাদের বোঝা স্তূপীকৃত করার কাজে পরিণত হয়। তত্ত্ব এবং কিছুমাত্রায় বৃত্তিও ক্রীড়াশীলতাকে কোনো কল্পনামূলক উদ্যোগ বলে স্বীকৃতি দিতে অনেক দূর অগ্রসর রয়েছে। কিন্তু এই ক্রিয়াশীলতাকে এখনও শিশুর ক্রমবিকাশের কোনো এক বিশেষরূপে চিহ্নিত পর্যায় বলে মনে করার চল রয়েছে। এবং এটা উপেক্ষা করা হয় যে ক্রীড়াকৌতুক এবং যাকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োজন বলা হয়—এ দু'য়ের পার্থক্য কল্পনার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির পার্থক্য না হয়ে, বরং যে সব বিষয়বস্তু কল্পনা দখল করে থাকে, তাদেরই পার্থক্য হওয়া উচিত ; সে উপেক্ষার ফল দাঁড়ায়, একদিকে শিশু-সুলভ ক্রীড়াকৌতুকের উদ্ভট ও 'অবাস্তব' পর্যায়গুলোর কোনো অপুষ্টিকর অতিরঞ্জন ; অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োজনগুলোকে মারাত্মক ভাবে রুটিন-মাফিক কর্মকুশলতায় পরিণত করা। আবার এই কর্মকুশলতাকে মাত্র তার বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ফল পাওয়ার জন্য মূল্য দেওয়া হয়। কোনো সুপরিকল্পিত যন্ত্র মানুষের থেকে বেশী ভালো করে যা করতে পারে, সেই ধরনের কাজ করাকেই কৃতি বলে জ্ঞান করা হয় ; এবং যা কিছু শিক্ষার মুখ্য ফল—অর্থাৎ সমৃদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ জীবন গড়ে তোলা তা পথের পাশে পড়ে থাকে। ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্তচিত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খল অতিকল্পন এবং যে কাজটা সম্প্রতি করা হচ্ছে তার সাথে সংশ্লিষ্টতার একটা "দড়ি-

ছেঁড়া” অদম্য কল্পনাশক্তির অবাধ বিবরণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না।

যে সমস্ত জিনিস প্রত্যক্ষ দৈহিক সাড়ার এলাকার বাইরে, তার প্রতিটি জিনিসের উপলব্ধির মাধ্যমরূপে কল্পনা শক্তিকে খাটানোর পর্যাপ্ত স্বীকৃতিই যন্ত্রবৎ শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায়। সমসাময়িক শিক্ষাবিধির হেরফেরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি এ কথাটা স্বীকার করে নেয়া না হয় যে মানুষের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে পেশীয় আলোড়ন যতো দূর স্বাভাবিক ও অভিন্ন অংশ, কল্পনাও ততো দূর স্বাভাবিক ও অভিন্ন অংশ তাহ'লে এই গ্রন্থে কর্মতৎপরতার উপরে যে জোর দেওয়া হয়েছে তাতে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হবে। যে কাজটা চলছে তার তাৎপর্য বোধ করতে দৈহিক শ্রমের কাজ, লেবরেটরির অনুশীলন ও খেলাধূলার চর্চা যে পরিমাণে সহায়তা করে তার উপরেই এদের শিক্ষাগত মূল্য নির্ভর করে। নামে না হলেও কার্যতঃ এই সব ক্রিয়া-কলাপ নাটন। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ফল পাবার জন্যে দক্ষতালাভের অভ্যাস গঠনে এই সব ক্রিয়া-কলাপের উপযোগিতামূলক মূল্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যখন মূল্যাবধারণের দিক থেকে তাদের আলাদা করে রাখা হয়, তখন সে গুরুত্ব থাকে না। আনুষঙ্গিক কল্পনার খেলাটি যদি না থাকতো তাহ'লে প্রত্যক্ষ কর্মতৎপরতা থেকে প্রতীকমূলক জ্ঞানলাভের কোনো রাস্তাই থাকতো না। কারণ কল্পনা দ্বারাই প্রতীককে প্রত্যক্ষ অর্থে রূপায়িত করা হয়, এবং একে কোনো সঙ্কীর্ণতর কর্মতৎপরতার সঙ্গে যুক্ত করে বিস্তারিত ও সমৃদ্ধ করা হয়। যখন প্রতীকমূলক সৃজনশীল কল্পনাকে কেবল সাহিত্য ও পৌরাণিক কাহিনীর সম্বল করা হয়, তখন প্রতীক চিহ্নকে শুধু বাকৃযন্ত্রের ভৌত প্রতিক্রিয়াগুলির পরিচালন-মাধ্যম করা হয়।

(৩) পূর্ব বিবৃতিতে পাঠক্রমে সাহিত্য ও ললিতকলার স্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। সেখানে তা ইচ্ছা করেই বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথমাবস্থাতেই ব্যবহারিক বা শ্রমজাত শিল্প এবং চারুকলার মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সীমানা থাকে না। পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে সব ক্রিয়া-কলাপের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সব ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই এমন সব উপকরণ থাকে যা পরে ললিতকলা ও ব্যবহারিক শিল্পে পৃথকীকৃত হতে পারে। আবেগানুভূতি ও কল্পনার নিয়োজনরূপে এই সকল ক্রিয়া-কলাপের এমন সব গুণ থাকে, যা পরে

লাপিতকলা৫ে গুণান্বিত করে। পদ্ধতি বা দক্ষতার দাবিরূপে উত্তরোত্তর অধিকতর পূর্ণতার সহিত বস্তুর উপর যন্ত্রপাতির অভিযোজনরূপে এই সব ক্রিয়া-কলাপের এমন একটা কারিগরি উপাদান থাকে যা চারুশিল্পীয় উপাদানের জন্য অপরিহার্য। উৎপাদিত সামগ্রী বা কলা "সৃষ্টি"র দিক দিয়ে এই সব ক্রিয়া-কলাপ স্বভাবতঃই ত্রুটিপূর্ণ, যদিও এমন কি এ বিষয়েও যখন এ কাজের সঙ্গে যথার্থ মূল্যবোধ থাকে তখন তার মধ্যে একটা প্রাথমিক মাধুর্য থাকে। প্রাথমিকরূপে এ সব কাজের মধ্যে রুচিসম্পন্নতা এবং সৌন্দর্যবোধ উভয় গুণই থাকে। যখন এই সব প্রাথমিক কাজ এমন সব ক্রিয়াকৌশলে বিকাশলাভ করে যে সেটি তার উৎপাদিত সামগ্রীর মানে পরীক্ষিত হয় এবং এই সামগ্রীর সমাজসেবামূলক মূল্যের উপর জোর দেওয়া হয় তখন সেটি ব্যবহারিক বা শ্রমশিল্পীয় কলায় রূপ নেয়। যখন সে কাজটি রুচির আবেদন সম্বলিত অব্যবহিত গুণরাশির পরিবর্ধিত মূল্যবোধের দিকে বিকাশলাভ করে তখন সেটি চারুকলায় প্রস্ফুটিত হয়।

মূল্যবোধের একটি অর্থ অবচয়ের বিপরীত। এই অর্থটি কোনো পরিবর্ধিত ও প্রগাঢ় মূল্যাবধারণ ব্যক্ত করে—কেবল মূল্যায়নই নয়, আর অবচয়ের মতো কোনো নিম্নমানের ও হীনমূল্যের মূল্যনির্ধারণ তো নয়ই। গুণরাশির যে পরিবর্ধন কোনো সাধারণ অভিজ্ঞতাকে মর্মস্পর্শী, অধিগ্রহণযোগ্য—পূর্ণরূপে আত্তীকরণযোগ্য ও উপভোগ্য করে, সেটিই শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, রঞ্জনবিদ্যা ইত্যাদির মুখ্য ক্রিয়া। মূল্যবোধের ব্যাপকতম অর্থে কেবল এই সব বিষয়ই মূল্যাবধারণের অনন্য ঘটক নয়। কিন্তু এরাই কোনো প্রগাঢ় ও পরিবর্ধিত মূল্যাবধারণের মুখ্য সংঘটক। এইরূপে এরা কেবল মৌলিক ও প্রত্যক্ষভাবেই উপভোগ্য নয়, পরন্তু এরা এদের বহির্ভূত কোনো উদ্দেশ্যও সাধন করে। রুচি নির্ধারণ এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতার মানদণ্ড গঠনের ক্ষেত্রে সকল মূল্যাবধারণেরই যে ন্যস্ত কর্ম থাকে, বর্ধিত মাত্রায় এদের সেই কর্মভারই রয়েছে। যে সব অবস্থা এদের মানদণ্ডের নীচে পড়ে, তাদের প্রতি এরা অসন্তোষ জাগায়। এরা এদের স্তরের উপযুক্ত পরিবেষ্টনীর পক্ষে দাবি সৃষ্টি করে এবং অভিজ্ঞতার তাৎপর্যের এমন কোনো গভীরতা ও দূরপাল্লাকে ব্যক্ত করে যা অন্য অবস্থায় মাঝারি পদের বা নগণ্য ধরনের হতে পারতো। অর্থাৎ এরা দূরপ্রকল্পের সাধনী। অধিকন্তু পরিণত অবস্থায়

এরা, কল্যাণ সাধনের যে সব মৌলিক উপাদান অন্য অবস্থায় বিক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ থাকতো, তাকে কেন্দ্রীভূত ও পূর্ণাঙ্গ করে উপস্থাপিত করে। উপভোগ্য মূল্যের যে সকল উপাদান যে কোনো অভিজ্ঞতাকে সরাসরি উপভোগ্য করে, এরা সে গুলিকে বাছাই ও কেন্দ্রীভূত করে। এরা শিক্ষার বিলাস সামগ্রী নয়, পরন্তু যা কিছু শিক্ষাকে সার্থক করে এরাই তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ।

২। বিবিধ পাঠ্য বিষয়ের মূল্যায়ন

শিক্ষাগত মূল্যবোধ তত্ত্বের মধ্যে কেবল পরবর্তী বিভিন্ন মূল্যায়নের মানদণ্ড স্থির করার জন্যই মূল্যাবধারণের স্বরূপ বর্ণানা থাকে না, পরন্তু যে সকল সুনির্দিষ্ট দিকে এই সব মূল্যায়ন ঘটে তার বর্ণনাও থাকে। মূল্যবোধ করার মুখ্য অর্থ হল, অতি মূল্যবান বলে গণ্য করা, উচ্চ মূল্য আরোপ করা; কিন্তু এর গৌণ অর্থ হল, মূল্য নির্ধারণ করা, মূল্য বিচার করা। অর্থাৎ একদিকে এর অর্থ হল হৃদয়ে কোনো কিছুকে লালন করা ও কাম্য বলে গণ্য করা। অন্যদিকে এর অর্থ হল, অন্য কিছুর তুলনায় এর স্বরূপ, ও মূল্যের পরিমাণ সম্বন্ধে রায় দেওয়া। শেষোক্ত অর্থে মূল্যবোধ করা হল মূল্য নির্ধারণ করা, অথবা আপেক্ষিক মূল্য স্থির করা। মৌলিক ও যান্ত্রিক মূল্যের মধ্যে সময়ে সময়ে যে পার্থক্য করা হয়, উক্ত পার্থক্য তার সাথে খাটে। মৌলিক মূল্যবোধ বিচার সাপেক্ষ নয়। তা (মূলগত বলে) বেশী বা কম, ভালো বা মন্দ, এ ভাবে তুলনা বা মনে করা যায় না। এরা অমূল্য, এবং কোনো জিনিস যদি অমূল্যই হয়, তা হলে তা আর কোনো জিনিস থেকে বেশী বা কম অমূল্য হতে পারে না। কিন্তু এমন এমন সময় আসে যখন বাছাই করতেই হয়, যখন একটা জিনিস পাবার জন্য আর একটা জিনিস ছেড়ে দিতে হয়। এইভাবে বেশী ও কম, ভালো ও মন্দের পছন্দের ক্রম গড়ে ওঠে। যে সব জিনিস বিচার করা হয় বা ছেড়ে দেওয়া হয়, তাদের মূল্যানুমান করতে হয় কোনো তৃতীয় জিনিসের সম্পর্কে, বা আরও কোনো উদ্দেশ্য সম্পর্কে। এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে এরা হল কর্মসাধনের উপায় বা যান্ত্রিক মূল্যবিশিষ্ট।

আমরা কল্পনা করতে পারি যে একজন লোক এক সময়ে তাঁর বন্ধুদের

সঙ্গে আলাপ করছেন এবং আর এক সময়ে সঙ্গীত উপভোগ করছেন। আবার আর এক সময়ে খাবার খাওয়া, আর এক সময়ে বই পড়া, আর এক সময়ে টাকা রোজগার করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে উপভোগ করছেন। মূল্যাবধারণকারী উপলব্ধি হিসাবে এর প্রতিটি কাজকেই মৌলিক মূল্যবোধ বলে ধরা যায়। এগুলি জীবনে এক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে; এদের যে কোনোটিই তার নিজের উদ্দেশ্য সাধন করে, এবং কোনো প্রতিকল্প ব্যবস্থা দিয়ে তা করা যায় না। সুতরাং এখানে তুলনামূলক মূল্যের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই কোনো মূল্যায়নের প্রশ্নও আসে না। এর প্রতিটি কাজই তার নিজ ক্ষেত্রে কল্যাণকর এবং এই তার সব কথা। এর নিজের স্থানে কোনোটিই তার বাইরের কোনো কিছু করার উপায় নয়। কিন্তু এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যে, তার মধ্যে এরা প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে, এবং তখন একটা কাজকে বেছে নিতে হয়। এখানেই তুলনা আসে। যেহেতু কোনো কিছুকে বাছাই করতে হবে, সেই হেতু আমরা প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বীর যথাক্রমিক দাবি জানাতে চাই। বিষয়টির পক্ষে কি বলার আছে? আর কোনো সম্ভাবনার তুলনায় এবং তাকে ছাড়িয়ে বিষয়টি আমাদের কি দিতে পারে? এ সব প্রশ্ন তোলার অর্থ এই যে, কোনো বিশিষ্ট কল্যাণ তার নিজগুণেই তার উদ্দেশ্য হয় না বা মৌলিক কল্যাণের রূপ নেয় না। কারণ যদি তা হতো, তা হলে তার দাবি হতো অতুলনীয়, অবশ্য-করণীয়। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় "ঐ" পরিস্থিতিতে অন্য যা কিছু অমূল্য তা উপলব্ধি করার উপায়রূপে বিষয়টির পদাধিকার কি? কেউ যদি এইমাত্র আহার করে থাকেন, এবং তিনি যদি সাধারণতঃ ভালো খেতেই অভ্যস্ত থাকেন, এবং তাঁর পক্ষে সঙ্গীত শোনার সুযোগ খুবই কম হয়, তা হলে তিনি সম্ভবতঃ খাওয়া ছেড়ে সঙ্গীত পছন্দ করবেন। তিনি যদি অনাহারে থাকেন, এবং তাঁর সঙ্গীতের পিপাসা আপাততঃ নিবৃত্ত থাকে, তা হলে তিনি স্বভাবতঃই খাদ্যবস্তুকে বেশী মূল্যবান বলে ধার্য করবেন। বিমূর্ত বা বিমুক্ত অর্থে, যে বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে বাছাই করতে হবে তার প্রয়োজন থেকে আলাদাভাবে মূল্যবোধের কোনো মাত্রা বা ক্রম থাকে না।

এর থেকে, শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ সম্বন্ধে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত

আসে। বিভিন্ন পাঠ্যের মধ্যে আমরা মূল্যবোধের কোনো ক্রমোচ্চ পদাধিকার প্রবর্তন করতে পারি না। যার মূল্য সর্বনিম্ন, তা থেকে আরম্ভ করে যার মূল্য সর্বাধিক তার দিকে ক্রমে অগ্রসর হয়ে বিবিধ পাঠ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজাবার চেষ্টা অকেজো। যেহেতু অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে কোনো পাঠ্য বিষয়েই কোনো একটা অনন্যসাধারণ বা অন্যভাবে অপূরণীয় কৃত্য থাকে, যেহেতু তা জীবনের কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমৃদ্ধিকে চিহ্নিত করে, সেইহেতু তার মূল্যও মৌলিক বা অতুলনীয়। যেহেতু শিক্ষা জীবনযাত্রার কোনো উপায় নয়, পরন্তু এমন এক ধরনের জীবনযাত্রার কর্মপ্রণালীর সঙ্গে একাত্ম যা কার্যকর এবং মূলতঃ তাৎপর্যপূর্ণ, সেই হেতু যে চূড়ান্ত ও একমাত্র মূল্য দাঁড় করানো যায়, তা জীবনযাত্রার এই কর্মপ্রণালী ছাড়া আর কিছু নয়। এবং তা এমন কোনো উদ্দেশ্য নয় যে, বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় ও কাজকর্ম তার অধীনস্থ উপায় মাত্র হবে। বরং সেটি হল সেই গোটা বিষয়, এরা যার মিশ্র অংশ। এবং মূল্যাবধারণ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তার অর্থ এই যে, প্রতিটি পাঠ্যেরই তার এক পর্যায়ে, এই প্রকারের কোনো চূড়ান্ত তাৎপর্য থাকা উচিত। এ কথা গণিতের ক্ষেত্রে যতো সত্য পদ্যপাঠের ক্ষেত্রেও ততো সত্য যে, কোনো না কোনো স্থানে এবং কোনো না কোনো সময়ে তা নিজগুণেই কল্যাণকর বলে অবধারিত হওয়া উচিত,—অল্প কথায় কোনো উপভোগ্য অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত। তা যদি না হয়, তা হলে বিষয়টিকে যখন কোনো অবলম্বন বা সাধকরূপে প্রয়োগ করার স্থান ও সময় আসবে, তখন ঐ ত্রুটির মাত্রা অনুযায়ী অসুবিধা হবে। এর নিজ গুণেই উপলব্ধ বা গুণান্বিত না হওয়ার জন্য অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গতিরূপে তার শক্তিমত্তার কিছু অংশ নজরে পড়বে না।

সমান সমান ভাবে এ সিদ্ধান্তও আসে যে, যখন আমরা মূল্য হিসাবে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের তুলনা করি, অর্থাৎ তাদের বাইরের কোনো কিছুর উপায়রূপে তাদের পর্যালোচনা করি, তখন, যেটি তাদের যথাযথ মূল্যায়নকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেটি পাওয়া যায় সেই সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে যেখানে তাদের প্রয়োগ করা হবে। যে পথে কোনো শিক্ষার্থীকে পাটিগণিতের যান্ত্রিক মূল্য ধরানো যায়, তা হল কোন্ সুদূর ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতে বিষয়টি তাঁর উপকারে আসবে সে সম্বন্ধে তাঁকে বক্তৃতা দিয়ে নয়, পরন্তু তাঁকে

আবিষ্কার করতে দেওয়া যে, তাঁর যাতে স্বার্থ আছে এ রকম কিছুতে কৃত-কার্যতা লাভ করা নির্ভর করে সংখ্যা প্রয়োগ করতে পারার সক্ষমতার উপরে।

এ সিদ্ধান্তও আসে যে, বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে স্পষ্টাস্পষ্টি মূল্য বণ্টন করার চেষ্টা ভ্রান্ত পথে চালিত, যদিও এই কাজে সম্প্রতি বহু সময় খরচ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের "যে-কোনো" ধরনের মূল্যবোধ থাকতে পারে; এবং তা নির্ভর করে সেই পরিস্থিতির উপর যার মধ্যে কোনো উপায়রূপে বিজ্ঞান প্রবেশ করে। কতক লোকের কাছে এর মূল্য হতে পারে সামরিক, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার উপায় জোরদার করার যন্ত্র-স্বরূপ; আবার কতক লোকের কাছে তা কল-কৌশল সংক্রান্ত হতে পারে—যেমন ইন্‌জিনিয়ারিং-এর যন্ত্র হতে পারে। তা বাণিজ্যিকও হতে পারে, এবং সফলতার সহিত ব্যবসা চালানোর সহায়কও হতে পারে। অন্যান্য অবস্থাধীনে এর সার্থকতা থাকতে পারে লোক-হিতৈষণার কাজে,—মানুষের দুর্ভোগ দূরীকরণের সেবাদানে। আবার তা, পুরাপুরি, কোনো চলিত রীতিও হতে পারে,—একজন "শিক্ষিত" লোক হিসাবে কারও সামাজিক পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এর মূল্য থাকতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, বিজ্ঞান এর সব ক'টি উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রেই কাজ করে। এর মধ্যে কোনো একটিকে বিজ্ঞানের "প্রকৃত" উদ্দেশ্য বলে স্থির করতে চেষ্টা করা, খেয়াল-খুশীমত কাজ করারই সামিল হবে। আমরা কেবল এই সম্বন্ধেই নিশ্চিত হতে পারি যে, বিজ্ঞান এমনভাবে শেখানো উচিত যাতে শিক্ষার্থীদের জীবনে বিজ্ঞানই বিজ্ঞান শেখার উদ্দেশ্য হয়,—এমন কিছু হয় যা জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নিজস্ব অনন্যসাধারণ মৌলিক অংশ দান হিসাবেই সেটি সার্থক হয়ে ওঠে। মূলতঃ, এর "গুণাবধারণযোগ্য মূল্যবোধ" থাকতেই হবে। আমরা যদি পদ্য পাঠের মতো এমন কিছু নিই, যা বিজ্ঞানের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত বলে মনে হয়, সেখানেও এই এক ধরনের কথাই খাটে। হতে পারে যে বর্তমান কালে কবিতার মুখ্য মূল্য হ'ল অবসর বিনোদনে অংশদান করা। কিন্তু তা অপরিহার্য কোনো কিছু না হয়ে, বরং একটা অধঃপতিত অবস্থার প্রতীকও হতে পারে। পদ্য রচনা, ঐতিহাসিকরূপে, ধর্ম ও নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে; তা বস্তুর রহস্যময় গভীরে অনুপ্রবেশ করার উদ্দেশ্য সাধন করেছে। দেশ-প্রেমিকতার দিক থেকেও এর মূল্য বিপুল-ব্যাপ্ত। গ্রীকদের কাছে হোমারের

সৃষ্টি ছিল, বাইবেলের মতো,—ছিল নীতি, ইতিহাস ও জাতীয় প্রেরণার মূল পাঠ্য। সে যাই হোক, এ কথা বলা চলে যে, যে শিক্ষাব্যবস্থা কাব্যকে জীবনের কর্মব্যস্ততা এবং অবকাশ উভয়েরই সঙ্গতিরূপে গ্রহণ করতে অসমর্থ, তার কিছু গলদ আছে—নয়তো, সে কাব্যই পদ-মেলানো-কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রেষণা-দায়ক শক্তি হিসাবে কোনো পাঠের বা পাঠের প্রসঙ্গের মূল্য সম্বন্ধেও এই বিচার-বিবেচনাই খাটে। যাঁরা পাঠক্রম পরিকল্পনা করার বা শেখানোর জন্য দায়ী, তাঁদের পক্ষে চিন্তা করে দেখা যুক্তিযুক্ত যে, যে সমস্ত পাঠ ও প্রসঙ্গ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা যেন শিক্ষার্থীদের জীবনের সমৃদ্ধিকে সরাসরি বর্ধিত করে; এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, যে সমস্ত বিষয়-বস্তু কাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে তার পাল্লাকেও যেন বর্ধিত করে। যেহেতু পাঠক্রম নিয়তই নিছক উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত ঐতিহ্যিক বস্তু দিয়ে, এবং কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রিয় কোনো উদ্যমকে যাতে উপস্থিত করতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়-বস্তু দিয়ে নিয়তই বোঝাই হয়ে চলেছে, সেই হেতু পাঠক্রমের অবিরাম পরিদর্শন, সমালোচনা ও পুনরীক্ষণের প্রয়োজন। এই করেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, পাঠক্রম তার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে চলেছে কিনা। এ ছাড়া সব সময়েই একটা সম্ভাবনা থাকে যে, পাঠক্রম শিশু ও যুবগণের মূল্যবোধের পরিবর্তে, বরং পরিণত বয়স্কদের মূল্যবোধ উপস্থাপিত করবে, কিম্বা বর্তমান কালের শিক্ষার্থী-দের মূল্যবোধ উপস্থাপিত না করে, তাকে এক পুরুষ আগের শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে রাখবে। এ জন্য সমালোচনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও নিরীক্ষার আরও প্রয়োজন। কিন্তু সে আলোচনার অর্থ এ নয় যে, কোনো শিক্ষার্থীর কাছে কোনো পাঠ্যবিষয়ের প্রেষণাদায়ক মূল্য থাকা (মৌলিক বা যান্ত্রিক), এবং তার পক্ষে ঐ মূল্যটি জানা বা কি কারণে ঐ পাঠ্যটি ভালো তা বলতে পারা —এক কথা।

প্রথমতঃ, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রসঙ্গ তাৎক্ষণিক আগ্রহ জাগায় ততক্ষণ কি কারণে তা ভালো তা জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। কেবল যান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্বন্ধেই এ প্রশ্ন করা যেতে পারে। কোনো কোনো জিনিস শুধুই ভালো, কোনো কিছুর "জন্যে" যে ভালা, তা নয়। অন্য কোনো

ধারণা এখানে অবান্তর। কারণ আমরা কোনো যান্ত্রিক মূল্য সম্বন্ধে, —অর্থাৎ আর কিছুর "জন্যে" ভালো এই সত্যের উপরে নির্ভর করে সে সম্বন্ধে—"কেন ভালো" সে প্রশ্নটির শেষ করতে পারি না। সেটা কেবল তখনই পারি, যখন কোনো স্থানে এমন কিছু পাই যা মৌলিকরূপে ভালো অর্থাৎ নিজ অর্থেই ভালো। একটি ক্ষুধার্ত স্বাস্থ্যবান শিশুর কাছে, পরিস্থিতিটার ভালো হ'ল খাদ্য; খাওয়ার মতলব যোগানোর জন্য খাদ্য কি উদ্দেশ্যে কাজ করে সে বিষয়ে তাকে সচেতন করে দেওয়া আমাদের দরকার হয় না। তার ক্ষুধার সম্পর্কে খাদ্যটাই মতলব। বহু প্রসঙ্গ সম্পর্কে মানসিকরূপে আগ্রহশীল শিক্ষার্থীদের বেলায়ও এই কথাই খাটে। বিদ্যা-শিক্ষা, ভবিষ্যতে যে কি উদ্দেশ্য সম্পাদন করবে, শিক্ষার্থীরা বা শিক্ষক, কেউ তা একেবারে সঠিক করে বলতে পারেন না। আগ্রহ যতো দিন চলতে থাকে, ততো দিন ঐ বিদ্যা থেকে বিশেষ কি কল্যাণ আসবে, তা নির্দিষ্ট করে বলতে চেষ্টা করাও যুক্তিযুক্ত নয়। শিক্ষার্থী সাড়া দিচ্ছে, এই ঘটনার মধ্যেই কল্যাণের প্রমাণ দেখা যায়। বিষয়-বস্তুর প্রতি তাঁর সাড়াই দেখিয়ে দেয় যে তা তার জীবনে ক্রিয়া করছে। শুধু পাঠ হিসাবেই লেটিনের কোন আলাদা বিমূর্ত মূল্য আছে, এবং এটাই তা শেখাবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি,—এ রকম চাপ দেওয়া অবিজ্ঞতার কাজ। কিন্তু এ রকম বিতর্ক করাও অহেতুক যে, যদি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিষয়টার ভবিষ্যৎ সদ্ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের কিছু না দেখাতে পারেন তা হলে বিষয়টার সমর্থনযোগ্য মূল্যের অভাব থাকে। যখন শিক্ষার্থীদের লেটিন্ শেখার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ থাকে তখন সেই আগ্রহই প্রমাণ করে যে, বিষয়টার মূল্য আছে। এ রকম অবস্থায় কেবল এটাই জিজ্ঞাস্য যে, সময়ের সীমিতাবস্থা বিবেচনা করে মৌলিক গুণবিশিষ্ট অন্যান্য জিনিস আছে কিনা যার মধ্যে আবার বেশী করে যান্ত্রিক গুণও আছে।

এই আলোচনা থেকে আমরা যান্ত্রিক মূল্যবোধের বিষয়ে আসতে পারি, অর্থাৎ যে সব প্রসঙ্গ তার বাইরের কোনো উদ্দেশ্যের কারণে পাঠ করা হয় সে ক্ষেত্রেও আসতে পারি। একটি শিশু যদি অসুস্থ হয়, এবং তাকে খেতে দেওয়া হলে, তার ক্ষুধা তাকে খেতে প্ররোচিত না করে, অথবা, তার এমন দুষ্ট খিদে থাকে যে, সে মাংস বা সবজীর বদলে মিশ্রি খেতে চায়, তাহলে তার ফলাফলের সম্বন্ধে সচেতন অবতারণা করা আবশ্যক হয়। কোনো

কোনো পদার্থের সদর্থক বা নঞর্থক মূল্যের যুক্তিযুক্ততার পরিণাম সম্বন্ধে তাকে সচেতন করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিম্বা অবস্থার হাল যথেষ্ট স্বাভাবিক থাকতে পারে, এবং তবুও কোনো লোক কোনো বিষয়ে আলোড়িত না হতে পারেন। কারণ তিনি ধরতে পারেন না যে, কি করে উপস্থাপিত বিষয়ের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সংশ্লিষ্টতার উপরে কোনো মৌলিক কল্যাণ সাধন নির্ভর করছে। সহজেই বোঝা যায় যে, এ সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞতার কাজ হ'ল যোগসূত্রের চেতনা স্থাপন করা। সাধারণতঃ যা বাঞ্ছনীয় তা এই যে, কোনো প্রসঙ্গকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যে, হয় তার কোনো তাৎক্ষণিক মূল্যবোধ থাকবে এবং তাতে কোনো যুক্তির দরকার থাকবে না ; নয় তো, তাকে মৌলিক মূল্যের কোনো কিছু আয়ত্ত করার উপায়রূপে প্রসঙ্গটি উপলব্ধি করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে কোনো যান্ত্রিক মূল্যের মৌলিক মূল্যবোধও থাকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে বিভিন্ন পাঠ্যের মূল্যবোধের ব্যাপারে বর্তমান মাস্টারি সুলভ আগ্রহের কোনো কোনো অংশ অতিরঞ্জিত বা অতিসঙ্কীর্ণ কি না। কখনো কখনো মনে হয় যে, যে সমস্ত প্রসঙ্গ শিক্ষার্থীদের জীবনে এখন আর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো উদ্দেশ্যই সাধন করে না, তার সমর্থনে অজুহাত যোগাবার একটা কষ্টসাধ্য প্রয়াস থাকে। আবার কখনো কখনো অকেজো পরিত্যক্ত আবর্জনা স্তূপের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার মাত্রা চড়ে গেলে, মনে করা হয় যে, কোনো বিষয় বা প্রসঙ্গই শেখানো উচিত নয়, যদি না, যারা পাঠক্রম রচনা করেন, বা শিক্ষার্থীরা নিজেরা, এটা দেখিয়ে দিতে পারেন যে, পাঠ্যবিষয়ের কোনো একটা সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ উপযোগিতা আছে। এরা খেয়াল রাখেন না যে, জীবনই তার নিজের স্থিতির কৈফিয়ত ; এবং যে সমস্ত নির্দিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়ে দেওয়া যায়, তা কেবল এই কারণেই যুক্তি-যুক্ত হতে পারে যে, তা জীবনযাত্রারই অভিজ্ঞতাপূর্ণ আধেয় বৃদ্ধি করে।

৩। বিভিন্ন মূল্যবোধের পৃথকীকরণ ও সংগঠন

জীবনের নানাবিধ মূল্যবান পর্যায়কে সাধারণভাবে অবশ্য শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব। শিক্ষা অভিযানকে প্রসার ও নমনীয়তা প্রদানের ব্যাপারে যথেষ্ট

পরিমাণে বিস্তারিত লক্ষ্যগুলোর নিরীক্ষা করার জন্য এই ধরনের শ্রেণী বিভাগের কিছুটা সুবিধা আছে (পূর্বে দেখুন, ১৪৩ পৃঃ)। কিন্তু এমন মনে করা নিতান্তই ভুল যে, এই সব মূল্যই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এবং অভিজ্ঞতার মূর্ত পরিতুষ্টি এই সব উদ্দেশ্যের অধীন। ওগুলি মূর্ত কল্যাণের কম বেশী সামান্যীকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাস্থ্য, কর্ম-কুশলতা, সামাজিকতা, উপযোগিতা, কৃষ্টি, সুখ ইত্যাদি বিমূর্ত শব্দাবলী রাশি রাশি বৃত্তান্তের সার-সংক্ষেপ মাত্র। ঐ সব উদ্দেশ্যকে শিক্ষার নানাবিধ মূর্ত প্রসঙ্গ ও কর্ম-প্রণালীর মূল্যায়নের মানদণ্ড বলে গণ্য করার অর্থ দাঁড়ায় যে, যে সমস্ত মূর্ত ঘটনা থেকে সূত্র গড়ে তোলা হয়, ঘটনাবলীকে সেই বিমূর্তনের নিম্ন পদস্থ করা হচ্ছে। কিন্তু কোনো বাস্তব অর্থেই তারা মূল্যায়নের মানদণ্ড নয়। পূর্বে যেমন দেখেছি, এই মানদণ্ড পাওয়া যায় সেই সব "সুনির্দিষ্ট উপলব্ধির" মধ্যে, যা পছন্দের রুচি ও অভ্যাসকে গড়ে তোলে। তারা অবশ্য নানাবিধ দৃষ্টিকোণ হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ—যেমন যে সমস্ত দৃষ্টিকোণকে জীবনের বিস্তারিত খুঁটি-নাটির উর্ধ্বে তোলা হয়েছে, এবং যেখান থেকে পুরা ক্ষেত্রটি নিরীক্ষা করা যায়, এবং কি ভাবে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি বণ্টিত রয়েছে এবং তারা সুসঙ্গতি-পূর্ণ কিনা তা দেখা যায় ইত্যাদি।

• কোনো শ্রেণী বিভাগেরই সাময়িক সত্যতা ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। নিম্নোক্ত বিষয় সেটাকে বুঝতে কিছুটা সহায়তা করতে পারে। আমরা বলতে পারি যে, যে ধরনের অভিজ্ঞতা লাভে স্কুলের কাজের অংশদান করা উচিত, তা চিহ্নিত হয় যে সমস্ত সঙ্গতি ও বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তার সুবন্দোবস্ত করার কার্যনির্বাহী যোগ্যতা লাভ দ্বারা (কর্মকুশলতা), সামাজিকতা বা অন্যান্যের প্রত্যক্ষ সাহচর্যের আগ্রহ দ্বারা; সৌন্দর্যবোধীয় রুচি বা অত্যুচ্চমানের শিল্প সৃষ্টির মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি রুচিসম্পন্ন উৎকর্ষের মূল্যাবধারণের সামর্থ্য দ্বারা; সুশিক্ষিত মেধাবী পদ্ধতি বা কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃতি দ্বারা; এবং অন্যলোকের অধিকার বা দাবির প্রতি সুবেদিতা—[illegible]—দ্বারা। এবং যদিও এই সব গুরুত্ববোধ মূল্যবোধের মানদণ্ড নয়, তবুও এরা শিক্ষাদানের বর্তমান পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তুর নিরীক্ষা, সমালোচনা ও উত্তম সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড।

জীবনের নানাবিধ অনুধাবনের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা হেতু শিক্ষাসংক্রান্ত

মূল্যবোধকে আলাদা আলাদা করে দেখার যে ঝোঁক রয়েছে, সেই কারণে উক্ত সাধারণ দৃষ্টিকোণ থাকার আরও বেশী প্রয়োজন। এই ধারণা খুবই প্রচলিত যে, বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের প্রতীক। কাজেই যে পর্যন্ত পর্যাপ্ত বিচিত্র স্বতন্ত্র মূল্যবোধের ব্যবস্থা না হয় সে পর্যন্ত নানাবিধ পাঠ্যবিষয় একসঙ্গে জড়ো করে পাঠক্রম রচনা করা উচিত। নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশের মধ্যে মূল্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি বটে, কিন্তু এর মধ্যে পাঠক্রম রচনা করা সম্বন্ধে এই ধারণা আছে যে, কিছু সংখ্যক পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যে পৌছাতে হবে, এবং প্রতিটি পাঠ্যকে তার নিজ নিজ উদ্দেশ্যের সম্পর্কে বিচার করে নিয়ে, নানাবিধ পাঠ্যের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। "অধিকাংশ পাঠ্য বিষয় দ্বারাই স্মরণ-শক্তি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তা সব চাইতে বেশী হয় ভাষা ও ইতিহাস শিক্ষা দ্বারা। রুচি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় ভাষার উচ্চতর শিক্ষা দ্বারা, তা আরও ভালোভাবে হয় ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দ্বারা। কল্পনাশক্তি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় সকল উচ্চতর ভাষা শিক্ষা দ্বারা, কিন্তু মুখ্যতঃ গ্রীক ও লেটিন শিক্ষা দ্বারা। পর্যবেক্ষণ শক্তি আসে লেবরেটরিতে বিজ্ঞানের কাজ দ্বারা, যদিও প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রীক ও লেটিন্ শিক্ষা থেকে এর জন্যে আগেই কিছুটা শিক্ষা হয়ে যায়। প্রকাশ ক্ষমতার ক্ষেত্রে গ্রীক ও লেটিনের রচনার স্থান সর্ব প্রথম। এর পরে আসে ইংরেজী রচনা। যুক্তির ক্ষেত্রে গণিত প্রায় একাই দাঁড়িয়ে আছে। মূর্ত যুক্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আসে প্রথম, পরে আসে জ্যামিতি; সামাজিক যুক্তির ক্ষেত্রে গ্রীক ও রোমান ইতিহাস লেখক ও বক্তাগণ আসেন সর্বপ্রথম, পরে আসে সাধারণ ইতিহাস। কাজেই যাকে কোনো মতে পূর্ণাঙ্গ বলা যায়, সে রকমের সঙ্কীর্ণতম শিক্ষার মধ্যেও থাকতে হবে, লেটিন, একটি আধুনিক ভাষা, কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা ইংরেজী সাহিত্য এবং একটি বিজ্ঞান"।

আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে অবান্তর, এমন অনেক কিছুই উদ্ধৃত অংশের শব্দ বিন্যাসের মধ্যে আছে এবং একে স্পষ্ট করার জন্য কিছু বাটাও দিতে হবে। গ্রন্থকার যে বিশিষ্ট সঙ্কীর্ণ ঐতিহ্যের মধ্যে লিখছেন, তাঁর বাক্ প্রণালীই সে কথা বেফাঁস করে দেয়। "ধী-শক্তি"কে যে শিক্ষাপ্রাপ্ত করতে হবে তা বিনা প্রশ্নেই ধরে নেয়া হয়েছে, এবং প্রাচীন ভাষাগুলোর প্রতি একটা আত্যন্তিক উৎসাহ রয়েছে; আর যে জগতের মধ্যে মানুষকে বাস

করতে হচ্ছে, এবং যে দেহগুলোকে তাঁদের বহন করতে হচ্ছে, তার প্রতি অপেক্ষাকৃত একটা অবহেলা রয়েছে। কিন্তু এ সব বিষয়ে বাটা দিলেও (এমন কি তা পুরাপুরি ছেড়ে দিলেও) আমরা সমসাময়িক শিক্ষাদর্শনের মধ্যে এমন কিছু দেখি, যেটি পৃথক পৃথক পাঠ্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মূল্য বণ্টন করার মৌলিক ধারণারই অনুরূপ। এমন কি, যখন সামাজিক কৃতি বা কৃষ্টির মতো একটি মাত্র উদ্দেশ্যকেও মূল্যের মানদণ্ডরূপে দাঁড় করানো হয়, তখন তাকে অনেক সময়েই কেবল একটি মৌখিক শীর্ষরূপেই দেখা যাবে এবং এই শীর্ষের নীচে নানা প্রকারের ছাড়া ছাড়া উপকরণ জড়ো করা থাকে। এবং যদিও এক একটি পাঠ্য বিষয়ের উপর উদ্ধৃত অংশের থেকেও অধিকতর বিচিত্র প্রকারের মূল্য অর্পণ করার ঝোঁক দেখা যায়, তবুও প্রতিটি বিষয়ের পাঠের সঙ্গে অনেকগুলি মূল্য তালিকাভুক্ত করা, এবং সেটি কোন্ মূল্য কি পরিমাণে ধারণ করে তা বর্ণনা করা, পরোক্ষভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে খণ্ডিত চিন্তার উপরেই জোর দেয়।

আসলে, বিভিন্ন পাঠ্যের এ রকম মূল্যবোধ-প্রকল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা যে পাঠক্রমের সঙ্গে সুপরিচিত তারই নির্জ্ঞাত সমর্থন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপস্থিত পাঠক্রমের পাঠ্য বিষয় প্রথমেই মেনে নেওয়া হয়, এবং পরে তা পড়াবার পর্যাপ্ত কারণরূপে তার উপরে মূল্য অর্পণ করা হয়। যেমন বলা হয় যে, বর্ণনার বিশুদ্ধতা ও যুক্তির নৈকট্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত করানোর ক্ষেত্রে গণিতের শৃঙ্খলাকারী মূল্য আছে, ব্যবসায়ে ও শিল্পে যে গণনা কৌশল লাগে, তার উপরে দখল আনতে গণিতের উপযোগিতা-মূলক মূল্য রয়েছে; বিবিধ জিনিসের মধ্যে সর্বাধিক সাধারণ সম্পর্কগুলি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কল্পনাশক্তির বিস্তারে গণিতের কৃষ্টিমূলক মূল্যও থাকে। এমন কি, গাণিতিক ধারণার মধ্যে অসীম এবং সংশ্লিষ্ট ধারণাদি থাকার দরুণ বিষয়টির মধ্যে একটি ধর্মীয় মূল্যও থাকে। কিন্তু মূল্যবোধ নামধারী অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা একে ভূষিত করা হলেও, স্পষ্টই দেখা যায় যে, গণিত এ সব ফল সম্পাদন করে না। যদি গণিত এই সব ফল সম্পাদন করে, তবেই তার এ সব মূল্য থাকে, তা না হলে নয়। এই সব উক্তি, গাণিতিক বিষয়ে শিক্ষাদান দ্বারা যে সম্ভাব্য ফল সাধন করা যায়, সে সম্বন্ধে শিক্ষকের কল্পনা দৃষ্টি বাড়াবার সহায়ক হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই বর্ণনাকে এমন

ভাবে গ্রহণ করার ঝোঁক থাকে যে, যেন এ সব ক্ষমতা গণিতের মধ্যেই সহাবস্থান করে, তা তারা কাজ করুক আর নাই করুক, এবং এইভাবে তাদিকে অনমনীয় সমর্থন যোগায়। যদি তারা ক্রিয়া না করে তাহ'লে বিষয়টি যে ভাবে শেখানো হয় তার উপরে দোষ পড়ে না, দোষ পড়ে শিক্ষার্থীর উদাসীনতা ও অবাধ্যতার উপরে।

যে ধারণা অনুযায়ী অভিজ্ঞতা বা জীবন হ'ল কতকগুলি পাশাপাশি অবস্থিত এবং পারস্পরিকরূপে সীমিত স্বতন্ত্র স্বার্থের জোড়াতালি, বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের প্রতি এই মনোভাব সেই ধারণারই ওপিঠ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা সরকারী ক্ষমতাবলীর প্রতিরোধ-প্রতিমান তত্ত্বের সঙ্গে সুপরিচিত। ধরে নেয়া হয় যে, কতকগুলো আইন প্রণয়নকারী, কার্য নির্বাহকারী, বিচার-বিভাগীয় ও প্রশাসনিক, স্বতন্ত্র ও পৃথক পৃথক ক্ষমতা আছে, এবং যদি এর প্রতিটি ক্ষমতাই আর সব ক'টিকে রোধ করে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়, তাহলে সব কিছুই ভালোভাবে চলে। এক রকমের দর্শন আছে যাকে সহজেই অভিজ্ঞতার প্রতিরোধ-প্রতিমান তত্ত্ব বলা যায়। জীবন বিচিত্র স্বার্থ উপস্থাপিত করে। যদি তাদিকে নিজেদের উপরেই ফেলে রাখা হয়, তা হলে তারা পরস্পরের এলাকায় অনুপ্রবেশ করতে উদ্যত হয়। এর প্রতিটির জন্য এক একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রের এমন ব্যবস্থা যদি করা যায় যে, তাতে অভিজ্ঞতার গোটা জমিটা বিলি-বন্দোবস্ত হয়ে যায় এবং এর পরে এটা দেখা যে, যে যার নিজের সীমার মধ্যেই থাকে,—তা হলে সেটাই আদর্শ ব্যবস্থা হবে। রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসায়, চিত্ত-বিনোদন, কলা, বিজ্ঞান, পণ্ডিতী পেশা, ভদ্র মেলামেশা, অবকাশ ইত্যাদি এই সব স্বার্থকে উপস্থাপিত করে। এর প্রতিটি ব্যাপার আবার নানাবিধ শাখায় বিভক্ত। ব্যবসায় ছড়িয়ে পড়ে —হাতের কাজ, কর্মচারীর পদ, জমা-খরচ, রেল-রাস্তা, আর্থিক লেন-দেন (ব্যাঙ্কিং) কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মধ্যে। আর সব ক্ষেত্রেও এই-রূপ। এ অবস্থায়, কোনো আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই সব পৃথক পৃথক পায়রার খোপের মতন বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির উপায় যোগাতে হবে। এবং যখন আমরা বিদ্যালয়ের দিকে তাকাই তখন এই ধারণাতে আসাই সহজ যে, পরিণত জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে তারা এই মতটাই গ্রহণ করে, এবং তারই দাবী মেটাবার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। প্রতিটি স্বার্থই

এক ধরনের অনড় প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকৃতি পায়, এবং পাঠক্রমের কোনো না কোনো অংশকে তারই অনুরূপ হতে হয়। কাজেই পাঠক্রমের মধ্যে রাজনৈতিক ও দেশাত্মবোধক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কিছুটা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস থাকবে। কিছুটা প্রয়োগিক পাঠ থাকবে, কিছুটা বিজ্ঞান থাকবে; কিছুটা কলা থাকবে (অবশ্যই তা হবে প্রধানতঃ সাহিত্যিক); কিছুটা চিত্তবিনোদনকারী ব্যবস্থা থাকবে, কিছুটা নীতিপাঠ থাকবে। এইভাবে আর সব কিছুও থাকবে। এবং দেখা যাবে যে, স্কুলশিক্ষা সম্বন্ধে বর্তমান আন্দোলনের একটা বড়ো অংশ, এই সব স্বার্থের স্বীকৃতির যথোচিত পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কলরব ও বিতর্ক নিয়ে, এবং পাঠক্রমের মধ্যে এর প্রতিটির জন্য প্রাপ্য অংশ আদায় করার সঙ্ঘর্ষ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। কিম্বা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যদি এরূপ করা সম্ভব না হয় বলে মনে করা হয়, তাহ'লে প্রয়োজন মেটাবার জন্য কোনো নতুন ও পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার দাবিও ওঠে। শিক্ষাব্যবস্থার ভিড়ের মধ্যে শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া হয়।

এর সুস্পষ্ট ফল দাঁড়ায় পাঠ্য বিষয়ের গাদাগাদি, শিক্ষার্থীদের অত্যধিক খাটুনি ও বিভ্রান্তি, এবং শিক্ষার ধারণাটির পক্ষেই মারাত্মক,—এমন কোনো এক সঙ্কীর্ণ বিশেষজ্ঞতালাভ। কিন্তু এই সব কুফলের প্রতিকাররূপে, এই জাতীয় ব্যবস্থাই আরও বেশী করে চালু করা হয়। যখন প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ জীবন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন মিট্‌ছে না, তখন তার কারণ উপস্থিত বিষয়গুলির শেখানোর বিচ্ছিন্নতা ও সঙ্কীর্ণতার উপর রাখা হয় না, এবং তা স্বীকার করে নিয়ে তাকে বর্তমান ব্যবস্থার পুনর্গঠন করার ভিত্তিও করা হয় না। এমন কিছুর অভাব যে, আর একটা বিষয়ের পাঠ ঢুকিয়ে তা মেটাতে হবে, বা দরকার হলে আর এক রকমের বিদ্যালয় করে তা করতে হবে। যাঁরা এই গাদাগাদি ও তার থেকে আসা এই অগভীরতা ও চিত্ত-বিক্ষেপের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান, তারাও সচরাচর কেবল কোনো পরিমাণগত বিচারের মান অবলম্বন করেন। তাঁদের মত হ'ল পাঠ্য তালিকা থেকে খাস-পোশাকী, ঝাড়ঝালরবিশিষ্ট বিষয়গুলি কেটেছেটে ফেলা এবং প্রাথমিক শিক্ষাতে পুরাকালের পাঠক্রমের সনাতন বিষয় তিনটি, লেখা-পড়া আঁক কষার পুনঃ প্রচলন করা। এবং উচ্চশিক্ষাতে সমানভাবে উত্তম ও সমানভাবে পুরানো কায়দায় প্রাচীন ভাষা ও গণিত সম্বলিত পাঠক্রমের

প্রচলন করা।

এই পরিস্থিতির অবশ্য নিজস্ব ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে। অতীতের নানাবিধ যুগের নিজ নিজ চারিত্রিক সংগ্রাম ও স্বার্থ ছিল। ভূ-পৃষ্ঠের শিলা-স্তরের মতন, প্রতিটি প্রধান প্রধান যুগই সেটির পেছনে এক ধরনের সাংস্কৃতিক জমা রেখে গেছে। এই সব জমানো জিনিস, বিবিধ পাঠ, বিভিন্ন পাঠক্রম এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিদ্যাপীঠের আকারে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এসে পড়েছে। বিগত শতকে রাষ্ট্রগত, বিজ্ঞানগত এবং ধনগত স্বার্থের দ্রুত পরিবর্ত-নের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের মূল্যবোধের জন্ম ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যদিও পুরানো পাঠক্রম তার বিরোধিতা করেছে, তবুও অন্ততঃ এ-দেশে, পুরানোর সমর্থকেরা তাদের একাধিপত্যের দম্ভকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আধেয় ও লক্ষ্য হিসাবে তার পুনর্গঠন হয়নি; তা কেবল পরিমাণে কমানো হয়েছে। নূতন স্বার্থসম্বলিত নূতন পাঠ্যবিষয়কে সকল শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও লক্ষ্যে রূপান্তরিত করার জন্যে প্রয়োগ করা হয়নি। তাদিকে ঢোকানো হয়েছে এবং যোগ করা হয়েছে। এর ফলে পাওয়া গেছে একটা মিশ্র পিণ্ড। এর বাঁধন হ'ল স্কুলের কার্যক্রম বা সময়-সূচীর যন্ত্র কৌশল। তার থেকেই মূল্যায়নের ও মূল্যমানের প্রকল্প এসেছে, এবং সে কথাই আমরা বলেছি।

সমাজ জীবনে যে সমস্ত ভাগ-বিভাগ ও পার্থক্য রয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রের এই পরিস্থিতি তারই প্রতীক। বিভিন্ন স্বার্থের যে বিচিত্রতা, যে কোনো সমৃদ্ধ ও সুষম অভিজ্ঞতাকে সুচিহ্নিত করতে পারত, তা ছিন্নভিন্ন করে নিয়ে হরেক রকমের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্বলিত পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানে জমা করা হয়েছে। ব্যবসায় তো ব্যবসায়, বিজ্ঞান তো বিজ্ঞান, কলা তো কলা, রাষ্ট্রনীতি তো রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক আদান-প্রদান তো সামাজিক আদান-প্রদান, নীতিবোধ তো নীতিবোধ, অবকাশ-বিনোদন তো অবকাশ বিনোদন এবং এইভাবে আরো সব। প্রতিটি বিষয়েরই একটি করে পৃথক ও স্বতন্ত্র এলাকা আছে, এবং তার কোনো অনন্য লক্ষ্য ও কার্যক্রম আছে। প্রতিটি বিষয়ই অন্তদের কেবল বাহ্যিক ও আকস্মিকরূপে অংশদান করে। এরা পাশাপাশি থেকে এবং যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ জীবনটা গঠন করে। ব্যবসা থেকে একজনে এ ছাড়া আর কি আশা করে যে এতে টাকা আসা উচিত,

তা দিয়ে আরও টাকা আসা উচিত, এবং তা দিয়ে নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ করা, বই, ছবি ও সাংস্কৃতিক গান বাজনার টিকেট কেনা, ট্যাকস দেওয়া, দাতব্যের দান এবং অন্যান্য সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধক জিনিস কেনা, ইত্যাদিতে সদ্ব্যবহার করা হোক ? ব্যবসায়-বৃত্তি যে নিজে থেকেই কল্পনা-শক্তির বিস্তার ও শোধনমূলক কর্ষণ হওয়া উচিত, তা যে টাকা দিয়ে না হয়ে সরাসরিই সমাজসেবার সঞ্জীবনী রস হতে পারে, এবং সামাজিক সংগঠনের পক্ষে কোনো অভিযানরূপে পরিচালিত হতে পারে তা আশা করা কতোই না অযৌক্তিক। কলা, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি বা ধর্ম, এর সব কিছু অনু-ধাবনের ক্ষেত্রেই অবিকল এই কথাই খাটে। এর প্রতিটি ব্যাপারই কেবল তার প্রয়োগ কৌশলের ও সময়ের ওপরে দাবির ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞতা লাভ করেনি, পরন্তু তার লক্ষ্য ও সঞ্জীবনী আত্মার ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞতা লাভ করেছে। আমাদের পাঠক্রম ও পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্য সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব অজ্ঞাতসারেই এই বিভাজিত স্বার্থকে প্রতিফলিত করে।

অতএব, শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ তত্ত্বের বিচার্য বিষয় হল, অভিজ্ঞতার একত্ব বা অখণ্ডতা। আত্মার একত্ব না হারিয়ে অভিজ্ঞতা কি করে পরিপূর্ণ ও বিচিত্র হবে ? কি করে তা এক হবে, অথচ একত্বের ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ বা একঘেয়ে হবে না ? শেষপক্ষে, মূল্যবোধের এবং কোনো মূল্যমানের প্রশ্নটি হ'ল, জীবনের বিবিধ স্বার্থবোধের স্বাঙ্গীকরণের নৈতিক প্রশ্নটি। শিক্ষার দিক থেকে, স্কুল, বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতির যে ধরনের সংগঠন অভিজ্ঞতার প্রসার ও সমৃদ্ধি সাধন করে ক্রিয়া করবে প্রশ্নটি তার সঙ্গেই জড়িত। কি করে কার্যসাধনে কৃতিত্বকে বলিদান না করে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার লাভ করব ? বিচ্ছিন্নতার মূল্য না দিয়ে কি করে বিভিন্ন স্বার্থের বিচিত্রতা আয়ত্ত করব ? ব্যক্তি তাঁর বুদ্ধি না খুইয়ে কি করে তাঁর বুদ্ধির "মধ্যে" কর্মকুশলতা আনবে ? কি করে কলা, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি একটির মূল্য দিয়ে আর একটিকে অনুধাবন করার উদ্দেশ্য গঠন না করে, মনের কোনো সমৃদ্ধ ধাত দিয়ে পরস্পরকে [illegible] করবে ? কি করে জীবনের বিভিন্ন স্বার্থ এবং যে সব পাঠ্যবিষয় তা'দিকে বলবৎ করে, তা মানুষের মধ্যে ভেদ-বিভেদ না সৃষ্টি করে মানুষের সর্বজনীন অভিজ্ঞতা[illegible] সমৃদ্ধ করতে পারে ? প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের এই সব প্রশ্ন নিয়ে আমরা শেষের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করব।

সারাংশ

মূল্যবোধের আলোচনার মধ্যে যে সমস্ত আলোচনা থাকে, তা মূলতঃ লক্ষ্য ও স্বার্থবোধ সম্বন্ধীয় পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যে ধরা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ সাধারণতঃ পাঠক্রমের অন্তর্গত বিবিধ পাঠ্যের দাবি সম্পর্কে আলোচিত হয়, সেইহেতু এখানে লক্ষ্য ও স্বার্থবোধ সম্বন্ধীয় বিবেচনা, বিশিষ্ট পাঠ্যগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে আরম্ভ করা হচ্ছে। "মূল্যবোধ" শব্দটির দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ আছে। শব্দটি একদিকে কোনো বিষয়কে অতি মূল্যবান বলে গণ্য করার, এবং বিষয়টিকে তার নিজ কারণেই বা মৌলিক-ভাবে সার্থক বলে গণ্য করার দৃগভঙ্গী নির্দেশ করে। এটি হ'ল কোনো সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার নাম। এই অর্থে মূল্যবোধ করা মানে গুণগ্রহণ করা। কিন্তু মূল্যবোধ করা কোনো বিশিষ্ট বুদ্ধিগম্য ক্রিয়াও হতে পারে —যেমন তুলনা করা ও বিচার করার ক্রিয়া—মূল্যায়ন করা। যখন সরাসরি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতালাভের অভাব থাকে তখনই এমনটা ঘটে, এবং এখানে এই প্রশ্ন ওঠে যে, সম্পূর্ণ উপলব্ধি বা জীবন্ত অভিজ্ঞতায় পৌঁছাবার জন্য কোনো পরিস্থিতির নানাবিধ সম্ভাবনার মধ্যে কোন্‌টিকে পছন্দ করে নিতে হবে। •

কিন্তু আমরা অবশ্য পাঠক্রমের বিবিধ পাঠ্যবিষয়কে গুণাবধারণযোগ্য অর্থাৎ যা মৌলিক মূল্যবোধের সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং যান্ত্রিক, অর্থাৎ যা বিষয়টির বাইরের উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট—এ রকমের দুটো ভাগে বিভক্ত করব না। কোনো একটি বিষয়, অভিজ্ঞতার অব্যবহিত তাৎপর্যবোধের অর্থাৎ সরাসরি গুণাবধারণের ক্ষেত্রে যে অংশদান করে, তার উপলব্ধির উপরেই সেই বিষয়টির যথাযথ মানদণ্ড গঠন করা নির্ভর করে। সাহিত্য ও চারুকলার অনন্ত মূল্য-বোধ থাকে, কারণ তারা গুণাবধারণের সর্বোত্তম রূপ উপস্থাপিত করে— নির্বাচন ও প্রণিধানের মাধ্যমে তাৎপর্যের বর্ধিত উপলব্ধি আনে। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের বিকাশের কোনো না কোনো পর্যায়ে, সেটির এমন কিছু থাকতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে কোনো সৌন্দর্যবোধীয় গুণ।

পাঠ্য-বিষয়ের যান্ত্রিক বা আহৃত মূল্যের সার্থকতা নির্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড হ'ল, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সর্ব রকমের মৌলিক মূল্যবোধে তার অংশ-দান করা। প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ের উপর পৃথক পৃথক মূল্য অর্পণ করার ঝোঁক,

এবং সমগ্র পাঠক্রমকে কতকগুলো পৃথক পৃথক মূল্যের সমষ্টি করে এক রকমের একটা সংমিশ্রণ বলে গণ্য করা, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন থাকারই ফল। কাজেই কোনো গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার কর্তব্য হল এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, যাতে নানাবিধ স্বার্থ পরস্পরকে শক্তিশালী করতে পারে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া করতে পারে।

উনবিংশ অধ্যায়

শ্রম ও বিশ্রাম

১। বিরোধ-উৎস

বিভিন্ন লক্ষ্য ও মূল্যবোধের বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে আমরা যা বলছিলাম, এখন দেখছি তাদের মধ্যেই বিরোধিতা আভাসিত হচ্ছে। সম্ভবতঃ শিক্ষার ইতিহাসে গভীরতম বিরোধাভাসের প্রকাশ পেয়েছে ব্যবহারিক শ্রমের জন্য প্রস্তুতির শিক্ষা এবং শ্রম-বিবিক্ত জীবনের জন্য শিক্ষার বিরোধের মধ্যে। শুধু ব্যবহারিক শ্রম "এবং" বিশ্রাম শব্দ দুটিই পূর্বকথিত এই উক্তিকে সমর্থন করে যে, এদের মূল্যবোধের পৃথক অবস্থিতি এবং পরস্পর-বিরোধিতা নিজ নিজ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নয়, পরন্তু তা সমাজ জীবনের বিভেদকেও প্রতিফলিত করে। যদি খেটে জীবিকা অর্জন করার, আর কৃষ্টি-কর্ষিত পথে বিশ্রামের সুযোগ উপভোগ করার বৃত্তি দু'টি সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বণ্টিত থাকত, তাহলে এ কথা কারও মনে আসত না যে, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো বিরোধিতা আছে। তখন এ কথা স্বতঃপ্রমাণিত হতো যে, আসল প্রশ্ন হল কি করে শিক্ষাব্যবস্থা এর দুটো দিকেই কার্যকরী অংশ দিতে পারে; এবং যদিও বা দেখা যেত যে, কোনো কোনো বিষয়বস্তু প্রধানতঃ একই রকমের ফল দেয়, আর অন্যান্য বিষয়-বস্তু অন্য এক রকমের ফল দেয়, তা হলেও এটা স্পষ্ট হতো যে, অবস্থা অনুযায়ী এদের যতোদূর সম্ভব মিলিয়ে মিশিয়ে নেওয়ার জন্য অবশ্যই যত্ন নিতে হবে; অর্থাৎ, যে শিক্ষার অধিকতর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বিশ্রাম, তা পরোক্ষভাবে শ্রমশীল কাজের কর্মকুশলতা ও আনন্দকেও যতোদূর সম্ভব পোক্ত করবে; আর, যে শিক্ষার উদ্দেশ্য শ্রমশীল কাজ, তা প্রক্ষোভ ও বুদ্ধির এমন অভ্যাস সৃষ্টি করবে যে, তাতে বিশ্রামেরও সার্থক কর্ষণ ঘটাবে।

শিক্ষা-দর্শনের ঐতিহাসিক বিকাশে এই সাধারণ বিচার বিবেচনার প্রচুর সমর্থন রয়েছে। পেশাদারী এবং শ্রমশিল্পীয় শিক্ষা থেকে উদারনৈতিক শিক্ষার

পৃথকীকরণ আরম্ভ হয়েছে প্রাচীন গ্রীক্‌যুগ থেকে; এবং সেটি, জীবিকার জন্য যাদের পরিশ্রম করতে হতো এবং সেই আবশ্যকতা থেকে যারা মুক্ত থাকত তাদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তিতেই প্রবর্তিত হয়েছিল। শেষোক্ত শ্রেণীর উপযোগী উদারনীতিক শিক্ষা, পূর্বোক্ত শ্রেণীর দাস-সুলভ বৃত্তিধারী শিক্ষা থেকে মৌলিকরূপে শ্রেয়,—এই ধারণাটি, সামাজিক পদমর্যাদা হিসাবে এক শ্রেণী যে মুক্ত, আর, আর এক শ্রেণী যে দাস-সুলভ এই কথাটিই প্রতি-ফলিত করেছিল। শেষোক্ত শ্রেণী কেবল নিজেদের জীবিকার জন্যই পরিশ্রম করত না, পরন্তু সেই সব উপায়ের জন্যও পরিশ্রম করত, যাতে করে উচ্চতর শ্রেণী কোনো বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত না থেকেও জীবন-যাপন করতে পারে। এই কাজে তাঁদের প্রায় পুরা সময়টাই লেগে যেত, এবং তা আবার এমন ধরনের কাজ ছিল, যাতে তাঁদের বুদ্ধি নিয়োজিত বা পুরস্কৃত হতো না।

কিছু পরিমাণ পরিশ্রম যে অবশ্যই নিয়োজিত করতে হবে, তা অবশ্য না বললেও চলে। মানুষকে বাঁচতে হবে, এবং বাঁচবার সঙ্গতি যোগাড়ের জন্য কাজও করতে হবে। যদি বা আমরা এ কথার উপরে জোর দিই যে, জীবিকা আহরণের সঙ্গে যে সব স্বার্থ জড়িত থাকে তা বৈষয়িক,—কাজেই তা শ্রমমুক্ত সময়ের উপভোগ থেকে মূলতঃ নিকৃষ্ট; এবং যদি এ কথাও স্বীকার করে নেওয়া হয় যে বৈষয়িক স্বার্থের মধ্যে এমন সব আসক্তি ও অবাধ্যতা থাকে, যা সেই স্বার্থকে উচ্চতর এবং আদর্শ স্বার্থের অধিকৃত স্থান জবর দখল করার চেষ্টায় পরিচালিত করে, তবুও তা,—সমাজগতভাবে বিভক্ত শ্রেণীদের অবর্তমানে যে জাতীয় শিক্ষা মানুষকে ব্যবহারিক অনুধাবনে প্রশি-ক্ষিত করে—সে শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে পরিচালিত করত না। বরং তা ঐ শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে যত্ন নিতেই পরিচালিত করত, যাতে করে ঐ সব কাজে পারদর্শী হবার জন্য লোকে শিক্ষাও পেতে পারে, আবার, ঐ সব কাজকে তাদের যথাস্থানেও রাখতে পারে। সে ক্ষেত্রে বৈষয়িক স্বার্থাদিকে উপেক্ষার অন্ধকারময় অরণ্যে সমৃদ্ধি লাভ করতে দেওয়ার ফলে যে সব কুফল আসে, তা যাতে বর্জন করা যায় শিক্ষাব্যবস্থা সেটাকে দেখত। এই স্বার্থ-বিভাগ যখন কেবল কোনো অধম বা উত্তম সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের খাপে পড়ে, তখনই ব্যবহারিক কাজকে অযোগ্য কাজ বলে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। এবং তা-ই লোককে এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত করে যে, কাজ করার সঙ্গে

বৈষয়িক স্বার্থের একত্ব, এবং বিশ্রামের সঙ্গে আদর্শ স্বার্থের একত্ব যেন কোনো সমাজ প্রক্রিয়ারই ফল।

দু'হাজার বছর আগেকার সামাজিক পরিস্থিতির শিক্ষাতাত্ত্বিক সূত্রায়ণ এত প্রভাবশালী ছিল, এবং তা শ্রম ও বিশ্রাম সমন্বিত শ্রেণী বিভাগের জটকে এত স্পষ্ট ও যুক্তিসিদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ জীবন প্রকল্পের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। আংশিক ভাবে সে উদ্‌ভিদ্‌ ও প্রাণীর গঠন ও ক্রিয়া-প্রণালীর অংশীদার, যেমন, পুষ্টি, প্রজনন, গতিশক্তি, বা প্রয়োগ সম্বলিত ক্রিয়া ইত্যাদি। বৈশিষ্ট্যসূচক মানবোচিত ধর্ম হল যুক্তি, যা বিশ্ব মহিমা দর্শনের জন্য বর্তমান। কাজেই যথার্থ মানবোচিত উদ্দেশ্য হ'ল এই বৈশিষ্ট্যমূলক বিশেষাধিকারের যথাসম্ভব পূর্ণতম বিকাশ সাধন। দর্শন, ধ্যান, জ্ঞান ও জল্পনার জীবনকে তার নিজ উদ্দেশ্যরূপে অনুধাবন করাই হল মানুষের সঙ্গত জীবন। অধিকন্তু, যুক্তি থেকেই মানব প্রকৃতির নীচতর উপাদানগুলির,—যেমন নানাবিধ ক্ষুধা ও সক্রিয় গতিদায়ক আবেগানুভূতির,—সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আসে। এরা নিজ গুণেই গৃধ্নু, অবাধ্য, অত্যাসক্ত,—এরা কেবল নিজ নিজ সন্তৃপ্তিই চায়। যখন এদিকে যুক্তির শাসনে আনা হয় তখনই এরা সংযত থাকে,—মিতাচারিতা পালন করে এবং মধ্য পন্থা আশ্রয় করে বাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে।

তত্ত্বীয় মনোবিদ্যার বিষয়রূপে, এবং অ্যারিস্টোটেল যে বর্ণনা দিয়েছেন সেই অনুসারে পরিস্থিতি ঐ ধরনেরই বটে। কিন্তু এই অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের শ্রেণী-বিভাগ গঠনে, এবং তার ভিতর দিয়ে সমাজ সংগঠনে। কেবল অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই যুক্তির ধর্ম জীবনের বিধানরূপে ক্রিয়া করতে সমর্থ। জনসাধারণের মধ্যে উদ্ভিজ ও জান্তব ধর্মই প্রবল। তাদের বুদ্ধির দীপ্তি এত দুর্বল ও অস্থির যে, তা অনবরতই দৈহিক ক্ষুধা ও অতিরাগের বশীভূত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এ সব লোকের নিজেদের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, কারণ কেবল যুক্তিই কোনো একটা চূড়ান্ত উদ্দেশ্য গঠন করে। উদ্ভিদ্‌, প্রাণী ও ভৌত সাধকের মতো এরা হল এদের নিজেদের বাইরের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ও প্রয়োগ-যন্ত্র,—যদিও ঐ সব সাধক থেকে ভিন্নরূপে, এ সব লোকের উপর যদি কোনো কাজের ভার দেওয়া হয়, সেটি করে দেওয়ার জন্য কিছুটা বিচার খাটানোর মত পর্যাপ্ত বুদ্ধি এরা রাখে। এইভাবে কেবল

সামাজিক রীতি অনুযায়ীই নয়, প্রকৃতি অনুযায়ীই, কতক লোক দাসসুলভ, অর্থাৎ, অন্যের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ।[১] একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে, বিরাট শিল্পকার শ্রেণী, এমন কি, দাসদের থেকেও অধম। দাসদের মতো শিল্পকারেরাও তাঁদের নিজেদের বাইরের উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত। কিন্তু যেহেতু তারা গৃহ-ভৃত্যদের মতো মুক্ত উচ্চবর্ণ শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ভোগ করে না, সেই হেতু তারা উৎকর্ষের একটা নিম্নস্তরে থেকে যায়। অধিকন্তু স্বাধীন ও যুক্তিপূর্ণ জীবনের স্বার্থে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের উপকরণরূপে স্ত্রীলোকেরাও দাস ও শিল্পকারদের সঙ্গে জীবন্ত সাধিকত্বের শ্রেণীভুক্ত।

ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে, শুধু জীবন ধারণ, এবং সার্থকভাবে জীবন ধারণ,—এ দুয়ের মধ্যে একটা ফাঁক থাকে। যাতে সার্থকভাবে জীবন ধারণ করা যায় সেজন্যে ব্যক্তিকে প্রথমে বাঁচতে হবে। সমষ্টিবদ্ধ সমাজের পক্ষেও এ কথাই খাটে। শুধু জীবনের উপরে, জীবিকা সংগ্রহের উপরে, যে সময় ও শক্তিটা খরচ হয় তা যে সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে স্বভাবতঃই যুক্তিপূর্ণ অর্থ থাকে তা থেকে মন সরিয়ে নেয়; আবার, তার অনুপযুক্তও করে। উপায়গুলি যন্ত্রবৎ, কার্যোপযোগী বিষয় দাসসুলভ। দৈহিক প্রয়োজনগুলি যে পরিমাণে বিনা চেষ্টায় ও বিনা মনোযোগে পাওয়া যায়, সত্যিকার জীবন কেবল সেই পরিমাণেই সম্ভব হয়। কাজেই দাসেরা, শিল্পকারেরা ও স্ত্রীলোকেরা জীবিকার উপায় যোগাতে নিযুক্ত থাকবে, যাতে করে অন্যেরা,—অর্থাৎ যারা উপযুক্ত পরিমাণে বুদ্ধি-সমৃদ্ধ তাঁরা, যা মূল্যবান তার সাথে বিশ্রামসুলভ সংশ্লিষ্টতা নিয়ে জীবন যাপন করতে পারে।

দাসসুলভ ও স্বাধীন ক্রিয়া-কলাপের (বা কলার) পার্থক্য সম্বলিত এই দুই ধরনের নিয়োজন দুই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিরূপ: একটি নিকৃষ্ট বা কারিগরি, অন্যটি উদারনীতিক বা বুদ্ধিগম্য। কতক লোককে উপযুক্ত ব্যবহারিক অনুশীলন দ্বারা কাজ "করতে" সমর্থ করার জন্য, অর্থাৎ, যে সকল ভৌত সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কারিগরি হাতিয়ার লাগে তা ব্যবহার করার যোগ্যতা লাভের জন্য, এবং ব্যক্তিগত সেবাদানের জন্য শিক্ষিত করা হয়। এই প্রশিক্ষণ শুধুই কোনো অভ্যাস্তি বা কারিগরি কৌশল;

১। এ্যারিস্টোটল মনে করেন না যে, আসল দাসশ্রেণী আর স্বভাবসুলভ দাসশ্রেণীকে একই রকম হতে হবে।

এটি শুধু পুনরাবৃত্তি ও প্রয়োগমূলক অধ্যবসায়ের মধ্যে দিয়ে কাজ করে, চিন্তাশক্তির উদ্রেক বা লালনের মধ্যে দিয়ে নয়। উদারনীতিক শিক্ষা হল বুদ্ধির যথাযথ কর্তব্যের জন্য বুদ্ধিকে প্রশিক্ষিত করা; তা হল অবগতির জন্য। এই জ্ঞান ব্যবহারিক বিষয়ের সঙ্গে, নির্মাণ ও উৎপাদনের সঙ্গে যতো কম জড়িত হয়, বুদ্ধির নিয়োজনও ততো বেশী পরিমাণে হয়। এ্যারিস্টোটেল, নিকৃষ্ট ও উদার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এত সামঞ্জস্যপূর্ণ পার্থক্য করেছিলেন যে, এখন যাকে "চারু" কলা, সঙ্গীত, রঞ্জন, ভাস্কর্য ইত্যাদি বলা হয়, তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগকেও নিকৃষ্ট শিল্পকার্যের শ্রেণীতে রেখে ছিলেন। এ সবের মধ্যে ভৌতিক সংঘটক, ব্যবহারিক অধ্যবসায় এবং বাহ্যিক ফলাফল থাকে। যেমন, সঙ্গীতে শিক্ষাদানের আলোচনাকালে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে বাদ্যবাদনে তরুণদের কতোদূর পর্যন্ত অভ্যস্ত করানো হবে। তাঁর নিজের উত্তর এই যে, এ ধরনের অনুশীলন ও যোগ্যতা ততোটাই সহ্য হতে পারে, মূল্যাবধারণের জন্য তা যতোটা সাহায্য করে, অর্থাৎ যখন দাসেরা বা পেশাদারেরা বাদ্যবাদন করে, তার সঙ্গীতস্বর বুঝতে ও উপভোগ করতে ঐ শিক্ষা যতোটা সাহায্য করে। যখন পেশাদারী ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য যায়, তখন তা উদার স্তর থেকে পেশার স্তরে নেমে যায়। এ্যারিস্টোটেল বলেন যে তা হলে তো রান্না করতে শেখালেও চলে। এমন কি, চারুকলার সৃষ্ট-বস্তুর সঙ্গে উদার সংশ্লিষ্টতাও নির্ভর করে এমন কোনো ব্যবহারজীবী ভাড়াটে শ্রেণীর বর্তমানতার উপরে, যাঁরা যান্ত্রিক সম্পাদনায় ক্রিয়াকৌশল লাভের জন্য নিজেদের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে নিম্নস্তরে রেখেছেন। ক্রিয়াশীলতা যতোই উচ্চস্তরের, তা ততোই বিশুদ্ধরূপে মানসিক, এবং ভৌত পদার্থ ও দেহের সঙ্গে তার যোগও ততোই কম। আবার, তা যতো বেশী বিশুদ্ধ-রূপে মানসিক, ততোই বেশী স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এই শেষোক্ত শব্দাবলী আমাদিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যুক্তি বা বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেও এ্যারিস্টোটেল উত্তম ও অধমের পার্থক্য রেখেছেন। কারণ একজনের জীবনে কেবল বুদ্ধির "সাহচর্য" থাকে, না সে বুদ্ধিকেই তার নিজের "মাধ্যম" করে নেয়, সেই অনুযায়ী উদ্দেশ্য এবং স্বাধীন কাজের ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়। যেমন, যে স্বাধীন নাগরিক তাঁর সম্প্রদায়ের জন-জীবনের সেবায় নিজেকে ব্রতী করেন, সেই জীবনের বিধি-ব্যবস্থাদিতে

যিনি অংশগ্রহণ করেন, এবং ব্যক্তিগত সম্মান এবং কৃতিত্ব অর্জন করেন, তিনি বুদ্ধির "সাহচর্যে" জীবন যাপন করেন। কিন্তু যে গবেষণাকারী, যে লোকটি, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও দার্শনিক জল্পনার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন, তিনি, বলতে গেলে, বুদ্ধির "মধ্যেই" কাজ করেন, বুদ্ধির "দ্বারা" কাজ করেন না। অন্য কথায়, এমন কি কোনো নাগরিকের পৌর জীবন সংশ্লিষ্ট কর্মতৎপরতাতেও কিছু পরিমাণে পেশাদারীর বাহ্যিক বা যান্ত্রিক ছোঁয়াচ থাকে। নাগরিক কর্মতৎপরতা এবং নাগরিক উৎকর্ষের জন্য অপরের যে সাহায্যটি দরকার হয়, সেটিই এই সংক্রমণ ব্যক্ত করে; কেবল নিজে নিজেই কেউ জন-জীবনে নিযুক্ত থাকতে পারে না। এ্যারিস্টোটেলের দর্শনে সকল প্রযোজন, সকল বাসনাই কোনো না কোনো বৈষয়িক উপাদানের ইঙ্গিত দেয়; তার মধ্যে অভাব অনটন থাকে; সম্পূর্ণতার জন্য তারা তাদের বাইরের কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে। কোনো বিশুদ্ধ বুদ্ধি-গম্য জীবন নিজের দ্বারাই, নিজের মধ্যেই চলতে থাকে; অন্যান্যের কাছ থেকে যা-কিছু সহায়তা আসতে পারে, তা আসে আকস্মিক ভাবে, মৌলিক ভাবে নয়। "অবগতির" ক্ষেত্রে, তত্ত্বের জীবনে, বুদ্ধি তার নিজের পূর্ণাঙ্গ বহিঃপ্রকাশ লাভ করে; কোনো প্রয়োগের ধার না ধরে, অবগতির স্বার্থেই যে অবগতি আসে, কেবল সেটিই স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং যে শিক্ষা, এমন কি নাগরিক কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গেও সম্পর্ক না রেখে, কেবল অবগত হওয়াকেই নিজ উদ্দেশ্য করে নিয়ে জানবার ক্ষমতা লাভের জন্য তৈরী করে, সেই শিক্ষাই যথার্থ উদারনীতিক বা সংস্কার-বিমুক্ত।

২। বর্তমান পরিস্থিতি

যদি এ্যারিস্টোটেলের ধারণা কেবল তাঁরই ব্যক্তিগত অভিমতকে উপস্থাপিত করত, তা হলে তা অল্পবিস্তর উৎসাহব্যঞ্জক কোনো একটা ঐতিহাসিক কৌতূহল হয়েই থাকত; সে অবস্থায় তাকে সমবেদীতার অভাব বলে, অথবা, অসাধারণ মনীষার সঙ্গে যে কি পরিমাণ পণ্ডিতিপনা থাকতে পারে, তারই দৃষ্টান্তরূপে বিদায় করা যেত। কিন্তু বিভ্রান্তি ছাড়াই এবং মানসিক বিভ্রান্তির সঙ্গে সর্বদাই যে কপটতা জড়িত থাকে তা বাদেই, এ্যারিস্টোটেল

তাঁর চোখের সামনে যে জীবনধারা বিদ্যমান ছিল, সেটিরই বর্ণনা করেছেন। আসল সামাজিক পরিস্থিতি যে তাঁর কাল থেকে অনেক বদলে গেছে, সে কথা বলার আর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সব পরিবর্তন সত্ত্বেও, আইনসম্মত দাসত্বপ্রথা রহিত হওয়া সত্ত্বেও, বিজ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষার সম্প্রসারণের সহিত গণতন্ত্রের বিস্তৃতিলাভ (পুস্তক, সংবাদপত্র, পর্যটন, সাধারণ যোগাযোগ ও বিদ্যালয়ের মেলামেশার মাধ্যমে) করলেও বিজ্ঞ ও অজ্ঞ শ্রেণীর, বিশ্রাম ও শ্রমসমন্বিত শ্রেণীর মধ্যে সমাজের ভাঙন এখনো এত পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান রয়েছে যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কৃষ্টি ও উপযোগিতার বিভেদ সমালোচনা করার ক্ষেত্রে, এ্যারিস্টোটেলের দৃগ্‌ভঙ্গী এখনো প্রচুর আলোকপাত করতে পারে। শিক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে বুদ্ধিগম্য ও বিমূর্ত প্রভেদ যে আকারে জেগে ওঠে, তার পিছনে,—যাঁদের অনুধাবনগুলির মধ্যে ন্যূনতম আত্ম-নিয়ন্ত্রিত চিন্তন ও সৌন্দর্যবোধীয় মূল্যাবধারণ থাকে, এবং যাঁরা অধিকতর বুদ্ধির কাজের এবং অন্যান্যের ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত,—এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ অস্পষ্টভাবে আনাগোনা করে। ১

এ্যারিস্টোটেলের এ কথা নিশ্চিতরূপেই চিরসত্য যে, "যে কোনো নিয়োজন, বা কলা বা পাঠকেই যান্ত্রিক বলা যায়, যদি তা মুক্ত লোকদের দেহ বা আত্মা বা বুদ্ধিকে পরমোৎকর্ষের অনুশীলন ও অভ্যাসের অনুপযুক্ত করে।" এই উক্তির জোর অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, যদি, আমরা যাকে এখন নামে-মাত্র স্বীকার করি তাকে যথার্থই মেনে নেই যে, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের পরিবর্তে, সকল মানুষই মুক্ত। কারণ যে কালে অধিকাংশ পুরুষ এবং সকল স্ত্রীলোককে তাঁদের দেহ-মনের প্রকৃতি অনুযায়ীই অমুক্ত বলে ধরা হতো, সেকালে সার্থকভাবে জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করার যোগ্যতার উপরে শেষপক্ষে কি ফল দাঁড়াতে পারে, তা বিবেচনা না করেই তাদিকে কেবল কারিগরি ক্রিয়া-কৌশলে উপযুক্ত করার জন্য শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে কোনো বুদ্ধিগত বিভ্রান্তি বা নীতিগত কপটতা থাকতো না। তাঁর এই উক্তিটিও চিরসত্য যে "সর্ব প্রকার ভাড়া-করা পদ, এবং যে সব পদ শরীরের অধঃপতন ঘটায় সেগুলি যান্ত্রিক, কারণ তা বুদ্ধিকে বিশ্রাম ও

মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে,—চিরসত্য, অর্থাৎ "যদি" উপার্জনকারী অনুধাবন প্রকৃতপক্ষেই বুদ্ধিকে তার অনুশীলনের, এবং কাজেই তার মর্যাদার শর্তাবলী থেকে বঞ্চিত করে। যদি তাঁর উক্তি মিথ্যা হয় তা হলে তা এই কারণে যে, সেটি সামাজিক রীতিনীতির এক পর্যায়কে কোনো জাগতিক অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গে একাত্ম করেছে। কিন্তু মন ও পদার্থ, মন ও শরীর, বুদ্ধি ও সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো ভিন্ন মত, এ্যারিস্টোটেলের ধারণা থেকে তখনই উত্তম, যখন তা জীবন ও শিক্ষার আসল পরিচালনের ক্ষেত্রে পুরানো ধারণাটিকে কার্যতঃ অকেজো করে দেয়।

বোধশক্তি, গুণগ্রহণের ক্ষেত্রে সমবেদিতা, এবং ধারণাবলীর অবাধ চর্চার তুলনায়, কেবল কর্ম-সম্পাদনে দক্ষতা ও স্তূপীকৃত বাহ্যিক উৎপাদনের নিকৃষ্টতা ও নিম্নপদাধিকার অনুমান করার বিষয়েও এ্যারিস্টোটেল চিরসত্য। যদি এতে ভুল থেকে থাকে, সে ভুলটি রয়েছে এই দুটো দিকের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ ধরে নেওয়ার মধ্যে ; এ কথা ধরে নেওয়ার মধ্যে যে, শিল্পোৎপাদনে কর্ম-কুশলতা ও সেবাদান এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রিত চিন্তন,—ব্যবহারিক কৃতি এবং তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞান—এ দুটো দিকের মধ্যে কোনো একটা স্বাভাবিক বিচ্ছেদ থাকে। আমরা যদি কেবল তাঁর তত্ত্বীয় ভুলভ্রান্তিকে শুদ্ধ করে নিই, এবং যে সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা তাঁর ধারণার জন্ম দিয়েছে এবং অনুমোদন করেছে, তাকে সহ্য করি, তাহলে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হবে না। যদি উৎপাদনের মনুষ্যাকৃতি যন্ত্রগুলির কর্ম-কুশলতা বৃদ্ধি করাই পরিবর্তনের সর্বাধিক পুরস্কার হয়, তাহলে আমাদের লাভ না হয়ে বরং লোকসানই ঘটবে। এই ভাবেই, আমরা যদি এই ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি যে, যাঁরা প্রকৃতিকে প্রয়োগশীল করার কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত, তাঁদের মধ্যে একটা বুদ্ধিহীন মুক্তিহীন অবস্থা বিরাজ করে, এবং যে বুদ্ধি তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তা শিল্প থেকে দূরে অবস্থিত বিজ্ঞানী ও শিল্পপতি-দের একচেটিয়া দখলেই থাকুক, তাহলে আমরা বুদ্ধিকে কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের একটা যন্ত্র হিসাবে ধরে নিই, এবং তাতেও আমাদের লাভ না হয়ে বরং লোকসানই হয়। যে শিক্ষানুষ্ঠান অধিক লোককে কেবল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রিয়া-কৌশল লাভের অনুধাবনে শিক্ষিত করে, এবং অল্প লোককে এমন জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষিত করে যা কেবল কোনো অলঙ্কার বা কৃষ্টিমূলক সজ্জাভরণ হয়ে থাকবে, তা হলে তাকে চিরস্থায়ী রাখার দায়িত্ব

থেকে আমরা যে পরিমাণে মুক্ত থাকি কেবল সেই পরিমাণেই, বিভিন্ন কর্তব্য কর্মের মধ্যে জীবনের, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমাজের বিভাজন ব্যবস্থাকে সততার সহিত সমালোচনা করতে পারি। অল্প কথায়, শুধু মুক্ত, যুক্তিপূর্ণ ও সাধক-অর্থ-আশ্রিত প্রতীকগুলিকে এধার-ওধার করে গ্রীকদের জীবন ও শিক্ষাদর্শন ছাড়িয়ে ওপরে ওঠবার যোগ্যতা লাভ করা যায় না। শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে এবং কোনো নিঃসঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে সেবাব্রতী জীবনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে ভাবরস পরিবর্তন করেও সে যোগ্যতা অর্জন করা অসম্ভব। যদিও এই সমস্ত তত্ত্বীয় ও প্রক্ষোভগত পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ, এদের আসল গুরুত্ব রয়েছে একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে এগুলোকে কার্যোপযোগী করার মধ্যে,—এমন কোনো সমাজ গঠন করার মধ্যে যেখানে সকলেই প্রয়োগশীল কাজে অংশ নেবে, এবং সকলেই সার্থক বিশ্রাম উপভোগ করবে। কেবল কৃষ্টি বা উদারনীতিক মন, এবং সমাজ সেবার ধারণাকে পরিবর্তন করার জন্যই শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের দরকার নয়, পরন্তু সমাজ-জীবনের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তাকে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্যও শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর সাধনের দরকার। "জনসাধারণের" বর্ধিত রাজ-নীতিক ও অর্থনীতিক স্বাধীনতা শিক্ষাব্যবস্থাতে প্রকাশ পেয়েছে। এর ফলে, শিক্ষার সর্বজনীন স্কুল ব্যবস্থা বিকাশলাভ করেছে, এ ব্যবস্থা সরকারী ও অবৈতনিক। যে অল্পসংখ্যক লোক সমাজ শাসনের জন্য প্রকৃতি দ্বারা পূর্বাদিষ্ট, বিদ্যালাভে কেবল তাদেরই একচেটিয়া অধিকার আছে,—সে ধারণাটি বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু বিপ্লব এখনো অসম্পূর্ণ। এই ধারণাটি এখনো প্রচলিত যে, কোনো যথার্থরূপে কৃষ্টিমূলক বা উদারনীতিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে, অন্ততঃ সরাসরি-ভাবে, শ্রমশিল্পের বিষয়ীভূত কোনো জিনিস থাকবে না; এবং যে শিল্প জন-সাধারণের উপযুক্ত, সেটিকে প্রয়োগমূলক ও ব্যবহারিক হতেই হবে; এবং তা এমন এক অর্থে, যা মূল্যবধারণ ও চিন্তন-বিমুক্তি লালনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারিক স্বার্থের বিরোধিতা করে।

এর পরিণামরূপে আমাদের আসল ব্যবস্থাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি অসঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণ। কোনো কোনো বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতি এই মনে করে রেখে দেওয়া হয় যে, তার কোনো অসাধারণ উদারনৈতিক অনুমোদন আছে, উদার কথাটার প্রধান আধেয় হল ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে তার অকার্যকারিতা

যাকে উচ্চশিক্ষা বলা হয়,—যেমন কলেজ ও কলেজের জন্য প্রস্তুতির শিক্ষা,—তার ক্ষেত্রেই এই ধারণাটি বেশী দেখা যায়। কিন্তু তা প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেও চুয়ে এসেছে, এবং তা এই শিক্ষার কর্মপ্রণালী এবং উদ্দেশ্যরও বেশীর ভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে। অপরপক্ষে, জনসাধারণের যে বৃহৎ অংশকে জীবিকা অর্জনের কাজে নিযুক্ত হতে হবে, এবং আধুনিক জীবনের অর্থনীতিক ক্রিয়া-কলাপে বর্ধিত ভূমিকা নিতে হবে, তাদিকেও কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই সব সুযোগ-সুবিধা দেখা যায় বিশেষ প্রকারের পেশা-দারী স্কুল ও পাঠক্রমের মধ্যে, যেমন, ইনজিনিয়ারিং, হস্তশিল্প ও বাণিজ্য, এবং বৃত্তিধারী ও প্রাক্-বৃত্তিধারী পাঠক্রমের মধ্যে ; এবং যে মনোভাব নিয়ে কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় শেখানো হয়,—যেমন, লেখা-পড়া-আঁককষা—ইত্যাদির মধ্যে। এর ফলে, এমন একটি পাঠ্য ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছে যার মধ্যে "কৃষ্টিমূলক" ও "উপযোগিতামূলক", দুটো দিকই কোনো অজৈব মিশ্রণরূপে বর্তমান থাকে। এই ব্যবস্থার প্রথমোক্ত বিষয়টির প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ সেবামূলক নয়, আর শেষোক্ত বিষয়টির প্রধান উদ্দেশ্য কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিমুক্তিমূলক নয়।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই পরিস্থিতিতে, এমন কি একটি পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেই একদিকে কার্যকারিতার সুযোগ-সুবিধা, অন্যদিকে এক কালে যে সব উপলক্ষণকে অনন্যরূপে বিশ্রামের প্রস্তুতিমূলক বলে ধরা হতো, তার সুযোগ-সুবিধার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ থাকে। "উপযোগিতার" উপাদানটি দেখা যায়, পাঠ্য-বিষয়ের প্রতি যে উদ্দেশ্য অর্পণ করা হয় তার মধ্যে, আর "উদার" উপা-দানটি দেখা যায় শেখানোর পদ্ধতির মধ্যে। যদি দু'টি নীতির প্রতিটিকে তার বিশুদ্ধ অবস্থাতে রাখা হতো, তা হলে যে পরিণতি হতো, এই সংমিশ্রণের পরিণতি সম্ভবতঃ তার থেকে কম সন্তোষজনক। প্রথম চার-পাঁচ বছরের পাঠকে প্রায় পুরাপুরি, পড়তে পারা, বানান, হাতের লেখা ও পাটিগণিতে নিবদ্ধ রাখার জন্য যে জনপ্রিয় উদ্দেশ্য দেখানো হয়, তা এই যে, নির্ভুলভাবে পড়তে পারা, লিখতে পারা ও অঙ্ক করা, এগিয়ে যাবার জন্য অপরিহার্য। এই সব পাঠ্যকে শিক্ষার্থীরা স্কুল ছাড়বে, কি স্কুলে থাকবে, সেই অনুযায়ী আয় করার কাজ বা বিদ্যালাভে অগ্রসর হওয়ার যন্ত্ররূপে গণ্য করা হয়। স্বয়ংচল দক্ষতা লাভ করার জন্য অনুশীলন ও অভ্যাসের উপর যে জোর দেওয়া হয়, তার

মধ্যেই এই মনোভাব প্রতিফলিত রয়েছে। আমরা যদি গ্রীকদের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই যে, প্রথম শৈশব থেকেই তাঁরা সৌন্দর্যবোধীয় ও নৈতিক তাৎপর্যবিশিষ্ট সাহিত্যিক আধেয় আয়ত্ত করার কাছে দক্ষতা আয়ত্ত করাকে যতোদূর সম্ভব নিম্নস্তরে রাখতেন। জোর পড়ত বর্তমান বিষয়-বস্তুর উপর, পরবর্তী ব্যবহারের জন্য যন্ত্র পাবার উপরে নয়, —কোনো সাধক আহরণের উপরে নয়। তা সত্ত্বেও, ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে এই সব পাঠ্যের বিচ্ছিন্নতা, ও তাদের অবিমিশ্র সাঙ্কেতিক কৌশলে পরিণতি, উপযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো উদারনীতিক শিক্ষা ধারণার উজ্জীবনেরই প্রতীক। উপযোগিতার ধারণা পুরামাত্রায় গ্রহণ করলে সেটি এমন শিক্ষাদানে পরিচালিত হতো, যা পাঠ্য বিষয়কে সেই সব পরিস্থিতির সাথে বাঁধা রাখত, যেখানে পাঠ্য বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে দরকার হতো, এবং যেখানে তা দূরবর্তী ব্যবধানের পরিবর্তে অব্যবহিতরূপে সহায়ক হতো। পাঠক্রমের মধ্যে এ রকমের কোনো বিষয় পাওয়া দুষ্কর যার মধ্যে এই পরস্পর-বিরোধী আপস মীমাংসার কুফল দেখা না যায়। প্রকৃতি-বিজ্ঞান অনুমোদিত হয় তার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কারণে, কিন্তু শেখানো হয় প্রয়োগবর্জিত কোনো বিশিষ্ট পারগতার কারণে। পক্ষান্তরে, সঙ্গীত ও সাহিত্য সমর্থিত হয় তাদের কৃষ্টিমূলক মূল্যবোধের কারণে, কিন্তু শেখানো হয় কৌশলী দক্ষতার ধরন গঠনের উপর মুখ্য জোর দিয়ে।

আমাদের যদি নিষ্পত্তি ও তৎপ্রসূত বিভ্রান্তি কম থাকত, আমরা যদি কৃষ্টি ও উপযোগিতার যথাক্রম অর্থ অধিকতর যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করতাম, তাহলে হয়ত এমন কোনো পাঠক্রম গঠন করা সহজ হতো, যা একই সঙ্গে ব্যবহারিক ও উদারনীতিক হতো। কেবল কুসংস্কার থেকেই আমাদের এ বিশ্বাস এসেছে যে, এই দুটো দিক পরস্পর-বিরোধী,—একটি বিষয় অনুদার কারণ তা প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারযোগ্য, আর একটি বিষয় কৃষ্টিমূলক কারণ তা অপ্রয়োজনীয় বা প্রয়োগহীন। সাধারণতঃ দেখা যাবে যে, যে শিক্ষা উপযোগিতামূলক ফল পাবার উদ্দেশ্যে কল্পনা-শক্তির বিকাশ, রুচির পরিশোধন ও বুদ্ধিগত সূক্ষ্মদৃষ্টির গভীরতাকে, অর্থাৎ, যে সব গুণ নিশ্চিতরূপেই কৃষ্টি-মূলক,—তাদের বলি দেয়, সে শিক্ষা, যা-কিছু শিক্ষা করা হয় তার প্রয়োগকেও সেই মাত্রায় সীমিত করে। একে পুরাপুরি অপ্রাপ্য করে না, কিন্তু এর

প্রয়োগ-সম্ভাবনাকে অন্যান্যের অধীনে পরিচালিত রুটিনমাফিক কাজের মধ্যে সীমিত করে। দক্ষতার কোনো সঙ্কীর্ণ ধরনকে তার সীমার বাইরে খাটানো যায় না। কিন্তু জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে এবং বিচার-বুদ্ধির পূর্ণতার সঙ্গে যে দক্ষতা আয়ত্তে আসে, তাকে সহজেই নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায়, এবং তা ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে। শুধু সামাজিক ও বৈষয়িক হিসাবে উপযোগী বলেই যে গ্রীকদের কাছে কোনো কোনো ক্রিয়া-কলাপ দাসসুলভ বলে মনে হতো, তা নয়; পরন্তু সেকালে যে সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ প্রত্যক্ষভাবে জীবিকা আহরণের সাথে যুক্ত ছিল, তার মধ্যে কোনো সুশিক্ষিত বুদ্ধির প্রকাশ থাকতো না, বা, সে সব কাজের তাৎপর্যের কোনো ব্যক্তিগত মূল্যাবধারণের কারণেও তা করা হতো না। যে মাত্রায় কৃষিকার্য ও নানাবিধ পেশা হাতুড়ে বৃত্তি ছিল, এবং যে মাত্রায় কৃষি-শ্রমিক ও কারিগরদের মনের বাইরে অবস্থিত ফলের জন্য ঐ সব কাজ করা হতো, সেই মাত্রাতেই ওসব কাজকে অনুদার প্রকৃতির বলা হতো,—কিন্তু কেবল সেই মাত্রাতেই। বুদ্ধিগত ও সমাজগত প্রসঙ্গ এখন বদলে গেছে। শ্রম-শিল্পের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান কেবল রীতি ও রুটিনের বশবর্তী ছিল, অধিকাংশ অর্থকরী পেশার মধ্যেই এখন তা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা থেকে পাওয়া উপাদানের বশবর্তী হয়েছে। এখনকার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ফলিত গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নকে উপস্থাপিত করে, এবং এদের উপরে, নির্ভর করে। মানব জগতের যে ক্ষেত্রটি অর্থকরী উৎপাদনে প্রভাবিত হয়, তা এত অপরিমেয়রূপে বিস্তৃত হয়েছে যে, এর মধ্যে অতি দূর পাল্লার ভৌগোলিক ও রাজনীতিক প্রশ্নও প্রবেশ করেছে। প্লেটোর পক্ষে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে, জ্যামিতি ও পাটিগণিত শিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানোই স্বাভাবিক ছিল। কারণ কার্যতঃ, যে সমস্ত ব্যবহারিক প্রয়োগে ওগুলো খাটানো হতো তার সংখ্যা খুব কমই ছিল, এবং তার প্রায় সবটাই ছিল ভাড়া খাটানোর মতো। কিন্তু যেহেতু এ সবের সামাজিক প্রয়োগ বেড়ে গেছে, এবং বিস্তার লাভ করেছে, সেই হেতু এগুলির উদারনীতিক বা "বুদ্ধিগম্য" মূল্য এবং ব্যবহারিক মূল্য একই সীমার নিকটবর্তী হয়েছে।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে কারণটি এই একাত্মীকরণের পূর্ণ স্বীকৃতি ও প্রয়োগকে ব্যাহত করে, তা হল সেই সকল অবস্থা-ব্যবস্থা যার অধীনে

এত কাজ এখনও পরিচালিত হয়। কলের উদ্ভাবন বিশ্রামের মাত্রা বাড়িয়েছে; এখন কাজে নিযুক্ত থেকেও বিশ্রাম করা সম্ভব। এ তো একটি সাধারণ কথা যে, সুপ্রতিষ্ঠিত অভ্যাসরূপে যে দক্ষতা দখলে আসে, তা মনকে উচ্চতর পর্যায়ের চিন্তার জন্য মুক্ত করে। শ্রম-শিল্পে যন্ত্রচালিত স্বয়ংচল ক্রিয়া-প্রণালীর প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও এই ধরনের কথা খাটে। এ অবস্থা, অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করার জন্য মনকে মুক্ত রাখতে পারে। কিন্তু যারা হাতের কাজ করে, তাদের শিক্ষাকে আমরা যখন অল্প কয়েকটি বছরের স্কুল শিক্ষাতে সীমিত করে রাখি, এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস না শিখিয়ে এই সময়টার অধিকাংশই প্রতীক-চিহ্নাদি শেখাতে অতিবাহিত করি, তখন আমরা উক্ত বিশ্রামের সুযোগটির সুবিধা নেওয়ার জন্য শ্রমিকদের মন প্রস্তুত করতে পারি না। আরও একটি বেশী মৌলিক কথা এই যে, খুব বেশীর ভাগ শ্রমিকেরই তাঁদের অনুধাবনগুলির সামাজিক উদ্দেশ্যের প্রতি কোনো সূক্ষ্ম-দৃষ্টি থাকে না, এবং তাতে তাঁদের কোনো সরাসরি ব্যক্তিগত আগ্রহও থাকে না। যে সব ফলাফল প্রকৃতই সাধিত হয়, সেগুলি "তাঁদের" কাজের পরিণতি নয়, তা হল তাঁদের নিয়োগকারীদের কাজের পরিণতি। তাঁরা যে সব কাজ করে তা স্বচ্ছন্দভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে করে না,—করে মজুরি পাবার জন্য। এই সত্যটিই কাজকে অনুদার ভাবাপন্ন করে, এবং যে শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল এরূপ কাজেই ক্রিয়া-কৌশল আনবার জন্য পরিকল্পিত হয়, তা অনুদার ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়ে। এখানে ক্রিয়াশীলতা স্বচ্ছন্দ নয়, কারণ তাতে স্বচ্ছন্দগতিতে অংশ নেওয়া হয় না।

এ সব সত্ত্বেও, এ রকম শিক্ষার সুযোগ এখনই এসেছে, যেটি, কাজের রূপরেখাকে মনে রেখে, উদার লালনের সঙ্গে সামাজিক কার্যোপযোগিতাতে শিক্ষিত করবার,—উৎপাদনশীল নিয়োজনের মধ্যে সুদক্ষ ও সানন্দ অংশ নিতে যোগ্যতা আনবার,—সমন্বয় ঘটাবে। এবং এ রকমের কোনো শিক্ষা-ব্যবস্থা নিজ থেকেই উপস্থিত অর্থনীতিক পরিস্থিতির কুফলগুলি দূর করতে সহায়ক হবে। যে সব উদ্দেশ্য মানুষের কর্মতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত করে তার সাথে তাঁদের যে মাত্রায় সংশ্লিষ্টতা থাকে কর্মতৎপরতাও সেই মাত্রায় স্বচ্ছন্দ বা ইচ্ছামূলক হয়। এবং যদিও আচরণের ভৌতিক ধরন একই থাকে, তথাপি সে কাজ বার থেকে চাপানো দাসসুলভতা থেকে মুক্তি পায়।

রাষ্ট্রনীতিতে, গণতান্ত্রিক সামাজিক সংগঠন তার নিয়ন্ত্রণে এই সরাসরি অংশ নেওয়ার ব্যবস্থাই রাখে। অন্যদিকে, অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ থাকে বার থেকে, এবং তা একতন্ত্রী। এর ফলেই, ভিতরকার মানসিক ক্রিয়া এবং বাইরের দৈহিক কাজের মধ্যে ভাঙন ধরে, এবং এরই প্রতিফলন ঘটে উদার ও উপযোগী বিষয়ের ঐতিহ্যিক পার্থক্যের মধ্যে। যে শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ-সমষ্টির মানস-প্রবণতাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, সে ব্যবস্থা সমাজকেই ঐক্যবদ্ধ করার সহায়ক হবে।

সারাংশ

পূর্ব অধ্যায়ে শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধের নানাবিধ পৃথকীকরণের বিষয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে কৃষ্টি ও উপযোগিতার মধ্যে পৃথকীকরণই সর্বাধিক সারগর্ভ বিষয়। যদিও একে সচরাচর একটা মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় পার্থক্য বলে মনে করা হয়, তথাপি আসলে এটা একটা ঐতিহাসিক ও সামাজিক পার্থক্য। এটির সচেতন সূত্রায়নের পত্তন হয়েছে গ্রীসে, এবং তা এই সত্যের উপর স্থাপিত হয়েছিল যে, সে দেশে প্রকৃত মনুষ্যত্বপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন খুব কম সংখ্যক লোক, এবং তাঁরা অন্য সকলের পরিশ্রমের ফলের উপর বেঁচে থাকতেন। এই পরিস্থিতি, বুদ্ধি ও বাসনার, এবং তত্ত্ব ও বৃত্তির সম্পর্ক সম্বলিত মনস্তাত্ত্বিক মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল। এই মতবাদকে মানবজাতির চিরস্থায়ী বিভেদ-সম্বলিত এক রাষ্ট্রতত্ত্বের মধ্যে মূর্ত করা হয়েছিল। কতক লোক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবন যাপনে সমর্থ, কাজেই তাঁদের উদ্দেশ্য থাকবে তাঁদের নিজেদের মধ্যে; আর বাকী লোকেরা কেবল বাসনার ও শ্রমেরই উপযুক্ত,—তাদের উদ্দেশ্য যোগাবে অন্যান্য লোকেরা। এই দু'টি পার্থক্য,—একটি মনস্তাত্ত্বিক, অন্যটি রাজনীতিক,—শিক্ষাক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে উদারনৈতিক শিক্ষা ও প্রয়োগমূলক ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছিল। উদারনৈতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট থাকবে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ অবকাশ-সমন্বিত জীবনের সঙ্গে। তার অধিকারীরা কেবল জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞানাহরণে ব্রতী থাকবেন। ব্যবহারিক শিক্ষা থাকবে কারিগরি পেশার জন্য। এর মধ্যে বুদ্ধিগত বা সৌন্দর্যবোধী

আধেয় থাকবে না। যদিও বর্তমান পরিস্থিতি, নীতিতত্ত্বের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং কার্যতঃও অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, তবুও প্রাচীন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপকরণ এখনও এত পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান রয়েছে যে, তাতে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রভেদটি বজায় রয়েছে। এবং তার সঙ্গে রয়েছে সেই সমস্ত আপস-নিষ্পত্তি, যা সচরাচর শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতাকে হ্রাস করে। গণতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষা সমস্যা হল এই দ্বৈতবাদের বিলোপ সাধন করা, এবং এমন কোনো পাঠক্রম গঠন করা, যাতে চিন্তন সকল মানুষের ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ বৃত্তির পথ-প্রদর্শক হয়ে উঠবে, এবং যাতে বিশ্রাম, সেবার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি না নিয়ে, বরং সেবার দায়িত্বের পুরস্কারেই পরিণত হতে চাইবে।

বিংশ অধ্যায়

বুদ্ধিগম্য ও ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয়

১। অভিজ্ঞতা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিরোধ

জীবিকা ও বিশ্রাম যেরূপ বিরোধী, তত্ত্ব ও বৃত্তি, মেধা ও কৃতি, জ্ঞান ও কর্মতৎপরতা সে রকমই বিরোধী। শেষোক্ত বিরোধগুলি যে সমাজ ব্যবস্থা থেকে উদ্‌ভূত, প্রথমোক্ত বিরোধগুলির সৃষ্টিও সেখান থেকে। কিন্তু এদের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি শিক্ষা-সমস্যা, জানা ও করার মধ্যের সম্পর্ক ও আরোপিত বিচ্ছেদের বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আনে।

জ্ঞান যে ব্যবহারিক কর্মতৎপরতা থেকে কোনো উর্ধ্বতর উৎস থেকে উদ্ভূত এবং তার যে কোনো একটা উর্ধ্বতর ও অধিকতর আধ্যাত্মিক মূল্য থাকে, এই ধারণার এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্লেটো ও এ্যারিস্টোটেল, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির ধারণার যে সূত্রায়ন করেছিলেন তার সংজ্ঞাত উক্তির ইতিহাস আমাদের দৃষ্টিকে সেদিকে নিয়ে যায়। যদিও এই সন্ধানীরা বহুবিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন, তবুও তাঁরা অভিজ্ঞতাকে বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন। তার ফলে, অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্যকে একাত্ম করেছিলেন বৈষয়িক স্বার্থের সঙ্গে, এবং অভিজ্ঞতার যন্ত্রকে একাত্ম করেছিলেন দেহের সঙ্গে। পক্ষান্তরে, জ্ঞান তার নিজ কারণ বশতঃই ব্যবহারিক সম্পর্ক থেকে বিমুক্ত থেকে যায়; এবং তার উৎস ও যন্ত্র দেখতে পায় কোনো বিশুদ্ধ অভৌতিক মনের মধ্যে; জ্ঞানের কারবার চলে আধ্যাত্মিক ও আদর্শ স্বার্থের সঙ্গে। আবার, অভিজ্ঞতার মধ্যে সর্বদাই অভাব, প্রয়োজন ও বাসনা থাকে,—তা কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকে না। অপর পক্ষে, যুক্তিপূর্ণ অবগতি নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ ও ব্যাপ্ত থাকে। কাজেই ব্যবহারিক জীবন প্রতি নিয়তই পরিবর্তমান, পরন্তু বুদ্ধিগম্য জ্ঞান সংশ্লিষ্ট থাকে শাশ্বত সত্যের সঙ্গে।

এই তীক্ষ্ণ বিরোধটি এথেন্সের দর্শনের সঙ্গে জড়িত। এথেন্সের দর্শন

আরম্ভ হয়েছিল, জ্ঞান ও আচরণের মানদণ্ডরূপে রীতিনীতি ও সংস্কারের সমালোচনা নিয়ে। এই রীতিনীতি ও সংস্কারকে অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার অনুসন্ধান-সূত্রে তাঁরা যুক্তিকেই, বিশ্বাস ও কর্মতৎপরতার একমাত্র পর্যাপ্ত পথপ্রদর্শক বলে গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু রীতি ও সংস্কারকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছিল, সেইহেতু অবিলম্বে এই সিদ্ধান্তও এসেছিল যে, যুক্তি অভিজ্ঞতা থেকে শ্রেয়। অধিকন্তু, অভিজ্ঞতা তার প্রাপ্য অধম স্থান নিয়ে তুষ্ট না থাকার দরুণ, সে যুক্তির কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দেবার পরম শত্রু। যেহেতু রীতি ও সংস্কারের বিশ্বাসগুলি মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে, সেই হেতু কেবল অভিজ্ঞতার মৌলিক ক্ষণ-ভঙ্গুর ও অপ্রতুল স্বরূপ প্রমাণ করেই যুক্তি তার বৈধ প্রাধান্যের সংগ্রামে বিজয়ী হতে পারে।

দার্শনিকদেরই রাজা হওয়া উচিত,—প্লেটোর এই উক্তিটি এই অর্থেই সবচেয়ে বেশী বোধগম্য হয় যে, অভ্যাস, ক্ষুধা, প্রবণতা ও প্রক্ষোভ ইত্যাদির বদলে যুক্তিসঙ্গত বোধশক্তিরই মানবীয় বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। যুক্তিসঙ্গত বোধশক্তি একত্ব, শৃঙ্খলা ও নীতির বিধান আনে; প্রথমোক্ত প্রবণতাগুলি বহুত্ব ও অনৈক্যকে চিহ্নিত করে,—নির্দেশ দেয় এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থাতে যুক্তিহীন উত্থান-পতনের।

বিষয়াদির অসন্তোষজনক অবস্থার সঙ্গে,—যে সব ব্যবস্থা কেবল রীতির নিয়মে উপস্থাপিত হয় তার সঙ্গে,—অভিজ্ঞতার একাত্মীকরণের কারণ বের করা কঠিন নয়। পরিবর্ধিত বাণিজ্য, পর্যটন, উপনিবেশ স্থাপন, প্রবাস ও যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষের বুদ্ধিগত দিগন্তকে প্রসারিত করেছিল। দেখা গিয়েছিল যে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস তীব্রভাবে পারস্পরিকতা-বিচ্ছিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত। এথেন্‌সে নাগরিক বিক্ষোভ একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল; নগরের সুখ-বিভব যেন দলগত শত্রুতার হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল। অধিকতর অবকাশের সঙ্গে দিগন্তের বিস্তার একত্র হয়ে, বিশ্ব-প্রকৃতির বহু নতুন ঘটনা গোচরে এসেছিল, এবং সেটা কৌতূহল ও জল্পনাকে উদ্দীপিত করেছিল। এই পরিস্থিতি, বিশ্বপ্রকৃতি ও সমাজ রাজ্যে কোনো কিছু স্থিতিশীল ও সর্বধর্মী আছে কি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার একটা ঝোঁক জাগিয়েছিল। যুক্তিই হল সেই ধী-শক্তি যা

দিয়ে এই সর্বধর্মী মূল নিয়ম ও নিষ্কর্ষ উপলব্ধ হয়। ইন্দ্রিয়াদি পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করার অঙ্গ,—যা চিরস্থায়ী ও একরূপ, তার পরিবর্তে, যা ক্ষণস্থায়ী ও ভিন্নরূপ তাকে প্রত্যক্ষ করার অঙ্গ। ইন্দ্রিয়ের কাজের ফল স্মৃতিপটে ও কল্পনাতে রক্ষিত হয়ে, অভ্যাস দ্বারা ক্রিয়া-কৌশলে নিয়োজিত হয়ে, অভিজ্ঞতাকে গঠিত করে।

কাজেই, অভিজ্ঞতা তার সর্বোত্তম রূপে, নানাবিধ হাতের কাজে—যুদ্ধবিগ্রহ ও শান্তির সময়ের শিল্পকলায়,—উপস্থাপিত হয়। চর্মকার, সানাই-দার, সিপাহী, তাঁদের দক্ষতা অর্জনের জন্য অভিজ্ঞতার শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এর অর্থ এই যে, দৈহিক যন্ত্রাদি, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াদি, পুনঃ পুনঃ বস্তুর সংযোগে এসেছে, এবং যে পর্যন্ত দূরদর্শীতা ও পেশার যোগ্যতা আয়ত্ত না করেছে, সে পর্যন্ত ঐ সকল সংযোগের ফলাফল রক্ষিত ও একীভূত করেছে। এই হল "অভিজ্ঞতা লব্ধ" শব্দটির সার অর্থ। শব্দটি সেই রকমের কোনো জ্ঞান ও যোগ্যতার আভাস দেয়, যেটি, মূল নিয়মের সূক্ষ্ম-দৃষ্টির উপর স্থাপিত নয়, পরন্তু সেটি বহুসংখ্যক পৃথক পৃথক চেষ্টার ফলকেই প্রকাশ করে। বর্তমান সময়ে "চেষ্টা ও ক্রটি" পদ্ধতি কথাটি পুনঃ পুনঃ চেষ্টার আকস্মিকতার উপর জোর দিয়ে যে ধারণাটি দেয়, অভিজ্ঞতালব্ধ কথাটি সেটিই প্রকাশ করে। নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থা করার যোগ্যতা হিসাবে এ পদ্ধতি হাতুড়ে বা ছকে-বাঁধা কার্যক্রমের সমান। যদি নতুন অবস্থা অতীত অবস্থার মতো হয়, তা হলে এ নিয়ম যথেষ্ট কার্যোপযোগী হতে পারে; অবস্থার যে মাত্রায় নড়ন-চড়ন ঘটে, সেই মাত্রাতেই তার ব্যর্থতা আসা সম্ভব। বর্তমানেও কোনো চিকিৎসককে যখন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলা হয়, তখন এই ইঙ্গিতই থাকে যে, তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব, এবং কেবল অতীত পেশাদারী কাজের আকস্মিক বিশৃঙ্খলা থেকে তাঁর যা-কিছু আয়ত্তে এসেছে তিনি শুধু তার ভিত্তিতেই চলছেন। "অভিজ্ঞতার" মধ্যে বিজ্ঞান বা যুক্তির অভাব হেতু একে তার স্বাভাবিক নিম্নমানের উচ্চতম স্তরে রাখা দুষ্কর। অভিজ্ঞতার ব্যক্তি সহজেই হাতুড়ে ব্যক্তিতে অধঃপতিত হন। তিনি জানেন না যে, তাঁর জ্ঞানের আরম্ভ বা শেষ কোথায়। কাজেই তিনি যখন রুটিন মাফিক কাজের বাইরে যান, তখন তিনি ভান করতে আরম্ভ করেন,—এমন সব দাবী করেন যার কোনো সমর্থন নেই, এবং দৈবের উপরে বা

অন্যের উপরে চেপে বসবার যোগ্যতার ওপরে—এক কথায় "ধাপ্পার" ওপরে—নির্ভর করেন। অধিকন্তু, তিনি মনে করেন যে, যেহেতু তিনি একটা বিষয় শিখেছেন, তাই তিনি আর সব বিষয়ও জানেন ; এথেন্সের ইতিহাস যেমন দেখিয়ে দেয় যে, সাধারণ শিল্পকারেরা মনে করতেন যে, তারা গৃহস্থালী, শিক্ষা, রাজনীতি—সব কিছুই চালাতে পারেন, কারণ তাঁরা তাদের পেশার সুনির্দিষ্ট জিনিসগুলো শিখেছেন। অতএব অভিজ্ঞতা সব সময়েই ভান, নকল, চাতুরি ও লোক দেখানো ভাবের কিনারায় কিনারায় ঘোরে ফেরে। অন্যদিকে যুক্তি বাস্তবতার ওপর দখল দেয়, এবং সেটি অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন।

এই অবস্থা থেকে দার্শনিকেরা অনতিবিলম্বে কোনো কোনো সাধারণ সূত্রে উপনীত হলেন। ইন্দ্রিয় নানাবিধ ক্ষুধা, অভাব ও বাসনার সঙ্গে যুক্ত। তারা জীবনের বাস্তবতার উপর দখল আনে না, দখল আনে জিনিসের সঙ্গে আমাদের সুখ-দুঃখের সম্পর্কের উপরে, অভাব পূরণের ও দৈহিক কল্যাণের ওপরে। তারা কেবল দৈহিক জীবনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দৈহিক জীবন কোনো উর্ধ্বতন জীবনের দৃঢ় নিম্নস্তর মাত্র। কাজেই অভিজ্ঞতার একটা সুনিশ্চিত বৈষয়িক চরিত্র আছে। সেটি শরীরের সম্পর্কে ভৌতবস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিপরীত পক্ষে, যুক্তি বা বিজ্ঞান, যা অভৌতিক, যা আদর্শ, যা আধ্যাত্মিক—তার উপরেই দখল আনে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন কিছু থাকে যা নৈতিকরূপে বিপজ্জনক। ইন্দ্রিয়পরবশ, ভোগবিলাসী, বৈষয়িক, সাংসারিক ও স্বার্থ শব্দগুলি এই বিপদেরই আভাস দেয়। পক্ষান্তরে, বিশুদ্ধ যুক্তি এবং আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকরূপে প্রশংসা-যোগ্য কোনো কিছুর ইঙ্গিত করে। অধিকন্তু, যা-কিছুই পরিবর্তনশীল সত্তার সঙ্গে অনপনীয়রূপে যুক্ত, যা-কিছু অবোধ্যরূপে বিক্ষেপকারী এবং যা কিছুই বহুবিধ ও ভিন্নরূপ, তাই অভিজ্ঞতাকে জড়িয়ে থাকে। অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তু স্বভাবতঃই অস্থির ও অবিশ্বাসযোগ্য। তা নৈরাজ্যিক, কারণ তা অস্থায়ী। যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় আস্থা রাখেন, তিনি জানেন না যে তিনি কিসের উপর ভরসা করছেন। কারণ অভিজ্ঞতা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, দিনের পর দিন, বদলাতে থাকে। আর দেশে দেশে যে সেটা বদলায় তা না বললেও চলে। নানাবিধ খুঁটিনাটি সহ "বহুর" সঙ্গে এর যোগ-

সূত্রেরও একই ফল দাঁড়ায় এবং তার সঙ্গেও বিবাদ থাকে।

যা এক, যা একরূপ কেবল তা-ই সংহতি ও সমন্বয়কে নিশ্চিত করে। অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তির অন্তরে এবং ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে সংগ্রাম, এবং মত ও কর্মের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বাসের কোনো মানদণ্ড আসতে পারে না, কারণ অভিজ্ঞতার রীতিই হল সব রকমের বিপরীত বিশ্বাসে মানুষকে প্ররোচিত করা। স্থানীয় রীতিনীতির ভিন্নরূপতা তা-ই প্রমাণ করে। এর যুক্তিপূর্ণ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, নির্দিষ্ট স্থান ও কাল অনুসারে কারও অভিজ্ঞতা তাকে যা কিছুই সত্য ও উত্তম বলে বিশ্বাস করতে পরিচালিত করে, তাই তার কাছে সত্য ও উত্তম বলে ধার্য হয়।

শেষ কথা এই যে, বৃত্তি অবশ্যম্ভাবীরূপেই অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে। প্রয়োজন থেকে কাজ করা আসে, এবং তার লক্ষ্য থাকে পরিবর্তন করা। সৃষ্টি বা তৈরী করা হল কোনো কিছুকে পরিবর্তিত করা। ভোগ করাও তাই। এই ভাবে, কাজ করার সাথে পরিবর্তন ও বিচিত্রতার একটা বিরক্তিকর চরিত্র জড়িত থাকে। কিন্তু জ্ঞান তার নিজের বিষয়-বস্তুর মতোই চিরস্থায়ী। জানা, অর্থাৎ কোনো জিনিসকে বুদ্ধিগম্য রূপে বা তত্ত্বীয় রূপে দখল করা মানে উত্থান পতন, দৈব ও বিচিত্রতার রাজ্য থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। সত্যের কোনো অভাব থাকে না। ইন্দ্রিয় জগতের বিভ্রান্তি তাকে স্পর্শ করে না। যা শাশ্বত, যা সর্বগত, সত্য তাই নিয়ে কাজ করে। এবং কেবল সত্যের যুক্তি-বিধানের বশবর্তী হয়েই অভিজ্ঞতার জগৎকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা যায়, এবং তাকে অটল ও সুশৃঙ্খল করা যায়।

এ কথা অবশ্য বলা সাজে না যে, এর সবগুলো পার্থক্যই—পুরোপুরি তাদের খুঁটিনাটি নিয়ে নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এর সবগুলোই, মানুষের পরবর্তী চিন্তাধারা ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণাবলীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের তুলনায় ভৌত বিজ্ঞানের প্রতি, এবং ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় পর্যবেক্ষণের প্রতি অবজ্ঞা; যে মাত্রায় জ্ঞান মূর্ত বিষয়ের পরিবর্তে আদর্শ প্রতীক চিহ্নাদি নিয়ে কাজ করে, সেই মাত্রাতেই তা উচ্চতর ও মাহাত্ম্যপূর্ণ,—এই ধারণা; যে সমস্ত খুঁটিনাটি অবরোহী প্রথা দ্বারা কোনো সার্বিক তত্ত্বের অধীনে আনা যায়, তা ছাড়া আর সব খুঁটিনাটির প্রতি অবহেলা; শরীরের প্রতি অশ্রদ্ধা; বুদ্ধিগত সাধকস্বরূপে শিল্প ও কারিগরি

বিজ্ঞানের অবমূল্যায়ন প্রভৃতি সব কিছুই, অভিজ্ঞতা ও যুক্তি, অর্থাৎ ব্যবহারিক ও বৌদ্ধিক বিষয়ের যথাক্রম মূল্য সম্বন্ধে এই প্রকার অনুমানের আশ্রয় চাইল এবং অনুমোদনও পেল। মধ্যযুগীয় দর্শন এই ঐতিহ্যকে চালু রেখেছে এবং একে শক্তিশালী করেছে। বাস্তবতাকে জানা অর্থ পরম বাস্তবতার,—পরমেশ্বরের, সম্পর্কে থাকা, এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে শাশ্বত, পরম আনন্দকে উপভোগ করা। পরমার্থিকের ধ্যান করাই মানুষের চরম উদ্দেশ্য,—কর্ম এই উদ্দেশ্যের নিম্নপদভুক্ত। অভিজ্ঞতাকে, পার্থিব, অপবিত্র এবং ধর্মাতীত বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট থাকতে হয়। তা ব্যবহারিকরূপে অবশ্যই অপরিহার্য। কিন্তু তা অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের জ্ঞানের তুলনায় অর্থহীন। আমরা যখন এইরূপ মনোভাবের সহিত রোমক শিক্ষার সাহিত্যিক চরিত্র এবং গ্রীকদের ঐতিহ্যিক শক্তিকে যুক্ত করি, এবং তার সাথে আবার, যে সব পাঠ্যবিষয় স্পষ্টভাবেই নিম্নশ্রেণীদের থেকে অভিজাত শ্রেণীর সীমা চিহ্নিত করত, তার প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা হিসাব করি, তখন আমরা শুধু শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, উচ্চতর বিদ্যায়তনগুলির ক্ষেত্রেও "ব্যবহারিক" বিষয়ের বিপক্ষে বৌদ্ধিক বিষয়ের অব্যাহত অগ্রাধিকারে যে প্রচণ্ড ক্ষমতার ব্যবহার করা হয়েছে, তার কথা সহজেই বুঝতে পারি।

২। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আধুনিক তত্ত্ব

আমরা পরে দেখব যে, জ্ঞানের পদ্ধতিরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিকাশ উক্ত মতবাদের আমূল রূপান্তরকে সম্ভব এবং অবশ্যম্ভাবী করে। কিন্তু তার আগে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের যে তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছিল, তা দেখতে হবে। সাধারণ ভাবে, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির সম্পর্ক সম্বলিত প্রাচীন মতবাদকে এই তত্ত্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিপরীতভাবে উপস্থাপিত করেছিল। প্লেটোর মতে অভিজ্ঞতার অর্থ ছিল অভ্যস্ত হওয়া, বা, বহু পরিমাণ অতীত আকস্মিক চেষ্টার মোট ফলাফলকে সংরক্ষিত করা। যুক্তির অর্থ ছিল সংস্কৃতি, অগ্রগতি ও অধিকতর নিয়ন্ত্রণের মূল নিয়ম। যুক্তির স্বার্থে ব্রতী হওয়ার অর্থ ছিল রীতির সীমা লঙ্ঘন করা, এবং জিনিস প্রকৃতপক্ষে যা, তার সন্ধান পাওয়া। আধুনিক সংস্কারকদের কাছে পরিস্থিতি থাকে উলটো দিকে।

যুক্তি, সার্বিক মূল নিয়ম, নির্বিচার ধারণা, ইত্যাদির অর্থ দাঁড়ায়, হয়, কতকগুলো সাদা ছক্, যার সার্থকতা ও বৈধতা প্রমাণ করার জন্য তাদিকে অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ দ্বারা পূরণ করতে হবে, নয় তো, ওগুলো কেবল জমাট বাধা কুসংস্কার, কর্তৃত্বভরে চাপানো মতবাদ। এটা একটা মাহাত্ম্যসূচক নামের মুখোশ পরে চলে, এবং তা দিয়েই রক্ষিত হয়। যা অতীব প্রয়োজন, তা হল, সেই সব ধারণার কারাগার ভেঙে বেড়িয়ে পড়া। বেকনের কথায় এটি হল বিশ্বপ্রকৃতির পূর্বানুমান, এবং মাত্র তারই উপরে মানুষের মতামত চাপিয়ে দেওয়া। প্রকৃতির স্বরূপ কি, তা বের করার জন্য অভিজ্ঞতার আশ্রয় নিতে হবে। অভিজ্ঞতার প্রতি আবেদনই কর্তৃত্বের সঙ্গে বিরোধের সূচনা করল। এর অর্থ দাঁড়াল, নতুন ধারণাদির প্রতি মন খোলা রাখা; প্রাপ্ত ধারণাদিকে ছক কেটে সুসম্বদ্ধ করার কাজে, এবং সেগুলি যে সব পারস্পরিক সম্বন্ধ দিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে, তা দিয়ে তাদের প্রমাণ করার পরিবর্তে, আবিষ্কার ও উদ্‌ভাবনের প্রতি আগ্রহশীল হওয়া। পূর্বকল্পিত ধারণাবলী পদার্থের উপর যে আবরণ দিয়ে রেখেছে, তার থেকে তাকে মুক্ত করে পদার্থ যথার্থরূপে যা, মনের মধ্যে তাই ঢোকান।

এইভাবে দ্বিবিধ পরিবর্তন এল। প্লেটোর কাল থেকে অভিজ্ঞতা শব্দটি যে অর্থ বহন করে আসছিল, তা লোপ পেল। অভিজ্ঞতা অর্থে আর ব্যবহার করা বা ব্যবহৃত হওয়ার উপায় বোঝাতো না, তা হয়ে দাঁড়াল বুদ্ধি ও জ্ঞানধর্মী কোনো কিছুর নাম। এর অর্থ দাঁড়াল বিষয়-বস্তুর অবধারণ। এতে যুক্তির অনুশীলন অটল ও সংযত থাকবে। আধুনিক দর্শনধর্মী অভিজ্ঞতাবাদী এবং তার বিরুদ্ধপক্ষ, উভয়েই অভিজ্ঞতাকে কেবল জ্ঞানলাভের একটি উপায় হিসাবে দেখে আসছেন। একমাত্র প্রশ্ন ছিল, এই উপায়টা কতোদূর সার্থক। এর ফলে প্রাচীন দর্শন থেকেও একটি বড়ো "বুদ্ধিবাদ" গড়ে উঠল,—যদিও এই শব্দটি সম্পর্ক-বিচ্যুত জ্ঞানের প্রতি জোরালো এবং একাগ্র আগ্রহ জ্ঞাপন করে। বৃত্তিকে জ্ঞানের ততো বশবর্তী না করে বরং জ্ঞানের এক ধরনের লেজুড় বা রেশ বলে গণ্য করা হতো। শিক্ষাক্ষেত্রে এর ফল দাঁড়াল স্কুল থেকে ক্রিয়াশীল অনুধাবনকে বাদ দেওয়ার সমর্থন করা। কেবল বিশুদ্ধ প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্যে,—অর্থাৎ কোনো কোনো অভ্যাসের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা তাকে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যেই, সেটা রাখা যায়। দ্বিতীয়তঃ,

বস্তুর উপরে সত্যের ভিত্তি স্থাপনার উপায়রূপে অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহ, মনকে শুধুই গ্রহীতা বলে মনে করাতে লাগল। মন যতো বেশী নিষ্ক্রিয় থাকবে, বিভিন্ন বস্তু ততো ঠিক ঠিক করে তার উপরে তাদের ছাপ রাখবে। কারণ মন যদি এর মধ্যে মাথা খেলায়, তা হলে জানবার ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যেই তা বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দূষিত করবে—তার নিজের উদ্দেশ্যকেই সে নিজে ব্যাহত করবে।

যেহেতু বিভিন্ন বস্তু মনের উপরে যে ছাপ রাখে তাকে সাধারণতঃ সংবেদন বলে, সেইহেতু অভিজ্ঞতাবাদ কোনো এক সংবেদনবাদ তন্ত্রে পরিণত হল, অর্থাৎ এমন কোনো তন্ত্রে পরিণত হল যা জ্ঞানকে সংবেদজ ছাপগুলির গ্রহণ ও মিলনের সঙ্গে একাত্ম করে তুলল। অভিজ্ঞাবাদীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী ছিলেন জন্ লক্। অর্থ-ভেদ বা পার্থক্য-বোধ, তুলনা, বিমূর্তন, সামান্যীকরণ প্রভৃতি যে সকল মানসিক শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুকে নির্দিষ্ট ও সুগঠিত রূপ দেয়, এবং যারা নিজ নিজ গুণেই, এমন কি নতুন ধারণাবলীর, যেমন, নীতি ও গণিত সম্বলিত নতুন ধারণাবলীরও উদ্ভব করে, তিনি সেই সব মানসিক শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে এই সংবেদনবাদকে সংযত রেখেছিলেন (পূর্বে দেখুন, পৃঃ ৭৯)। কিন্তু তাঁর কয়েকজন উত্তরাধিকারী, বিশেষ করে ফরাসী দেশে, অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে তাঁর তন্ত্রকে শেষ সামায় নিয়ে গিয়েছিলেন; তাঁরা অর্থ-ভেদ ও বিচারশক্তিকেও একটা অসাধারণ সংবেদন বলে মনে করতেন, এবং মনে করতেন যে আমাদের মধ্যে এই ধরনের সংবেদন ঘটে অন্যান্য সংবেদনের সমবেত উপস্থিতি দ্বারা। লকের মতে, মন একখণ্ড সাদা কাগজ বা মোমের ফলক, যার উপরে ধারণার আধেয়রূপে জন্মকালে কোনো আঁচড়ই থাকে না। কিন্তু তিনি তাকে গৃহীত বিষয়বস্তুর উপরে ক্রিয়া-কলাপ চালানোর ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ফরাসী উত্তরাধিকারীরা এই ক্ষমতাকেও বিলোপ করে দিলেন, এবং তাকেও গৃহীত ছাপ থেকে উদ্ভূত করে নিলেন।

আমরা পূর্বে যেমন বলেছি, সমাজ সংস্কারের পদ্ধতিরূপে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি নতুন আগ্রহই এই ধারণাটিকে লালন করেছিল (পূর্বে দেখুন, ১২০ পৃঃ) শুরুতে মন যতো বেশী শূন্য থাকে, তার উপরে যথার্থ প্রভাব খাটিয়ে, তাকে

ততোই আমাদের ইচ্ছানুযায়ী যা কিছু করতে পারি। যেমন, হেলভিটিয়াস্, —যিনি সম্ভবতঃ সর্বাধিক চরমপন্থী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সংবেদনবাদী ছিলেন,—ঘোষণা করলেন যে, শিক্ষা সব কিছুই করতে পারে,—শিক্ষা সর্বশক্তিমান। স্কুল শিক্ষার এলাকাতে, অভিজ্ঞতাবাদ তার প্রত্যক্ষ গৌরব পেল শুধু পুঁথিগত বিদ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে। যদি প্রাকৃতিক বস্তুর দেওয়া ছাপ থেকেই জ্ঞান আসে, তা হ'লে যে বস্তু মনের ওপরে ছাপ দেয় তার ব্যবহার ছাড়া জ্ঞান আহরণ করা অসম্ভব। যে সব বস্তুর সঙ্গে শব্দ বা অন্য ভাষাগত প্রতীক সংযুক্ত হয়েছে তার অভাবে, শব্দ ও প্রতীক নিজেদের আকৃতি ও রং-এর সংবেদন ছাড়া আর কিছু জ্ঞাপন করে না—এবং তা নিশ্চয়ই জ্ঞানের খুব একটা শিক্ষামূলক ধরন নয়। ঐতিহ্য ও কর্তৃত্বের উপরে পূর্ণরূপে নির্ভরশীল নানা তন্ত্র ও মতের বিরুদ্ধে লড়াই করার পক্ষে সংবেদনবাদ একটি পরম সুবিধার অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকল মতামতের ক্ষেত্রেই সংবেদনবাদ মাত্র একটি মানদণ্ড খাড়া করল। যে সকল বাস্তব পদার্থ থেকে এই সব ধারণা ও বিশ্বাস এসেছে তারা কোথায়? যদি ঐ সকল পদার্থ উপস্থিত করানো না যেত, তা হলে ঐ সব ধারণাকে মিথ্যা অনুসঙ্গ ও মিশ্রণের ফলরূপে ব্যাখ্যা করা হতো। অভিজ্ঞতাবাদ একটি প্রত্যক্ষ উপাদানের জন্যও দাবি করল। ছাপ দিতে হবে "আমার" মনের উপরে। এই প্রত্যক্ষ সরাসরি জ্ঞানের উৎস থেকে আমরা যতো সরে যাই, ভুলের উৎস ততোই বেশী হয়, এবং তৎপ্রসূত ধারণাও ততোই অস্পষ্ট হয়।

যেমন আশা করা যায়, সদর্থক দিক থেকে বিচার করলে এ দর্শন দুর্বল। প্রাকৃতিক বস্তু ও প্রত্যক্ষ পরিচিতির মূল্য অবশ্য এই তত্ত্বের সত্যতার উপর নির্ভর করে না। স্কুলের বিষয়ভুক্ত করলে তারা তাদের কাজ করবে; যে পথে তারা তা করবে, সে সম্বন্ধে সংবেদনবাদী তত্ত্বটি আগাগোড়া ভুল হলেও তারা তা করবে। এ পর্যন্ত অভিযোগ করার কিছুই নেই। কিন্তু সংবেদনবাদের উপরে এই জোর, যে "পন্থায়" প্রাকৃতিক বস্তুকে কাজে লাগানো হতো তাকেও প্রভাবিত করতে লাগল এবং তা থেকে পুরো সুফল পাওয়ার পথও রোধ করল। "বস্তুপাঠ", শুধু ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াকে আলাদা করে রাখতে চায়, এবং এই ক্রিয়াকেই এর উদ্দেশ্য করে নেয়। বস্তু যতো

বেশী অসংশ্লিষ্ট হয়, তার সংজ্ঞবহ গুণ ততো বেশী অসংশ্লিষ্ট থাকে, এবং জ্ঞানের একক হিসাবে তার ইন্দ্রিয়-বেদন ততো বেশী স্পষ্ট হয়। তত্ত্বটি কেবল এই যান্ত্রিক পৃথককরণের দিকে কাজ করে শিক্ষাদানকে ইন্দ্রিয়াদির এক ধরনের ভৌত ব্যায়ামেই পরিণত করতে চেষ্টা করে নি, (যে ব্যায়াম শরীরের যে কোনো অঙ্গের পক্ষেই ভালো, কিন্তু তার বেশী ভালো নয়), পরন্তু সেটি চিন্তাশক্তিকে উপেক্ষা করার পক্ষেও কাজ করেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ইন্দ্রিয়-পর্যবেক্ষণের সম্পর্কে চিন্তনের কোনো দরকার হয় না। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বটির যথাযথ অর্থে, শেষ ভাগে ছাড়া, চিন্তন অসম্ভবই হবে। কারণ বিচার-বুদ্ধির অংশগ্রহণকে বাদ দিয়ে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ একক গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের একত্র ও পৃথক করা নিয়েই চিন্তন গঠিত।

এই জন্য কার্যতঃ, অবিমিশ্র ইন্দ্রিয়ধর্মী ভিত্তিতে প্রায় কোনো শিক্ষা প্রকল্পকেই কোনো দিন সুসংবদ্ধভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয় নি, অন্তত: প্রথম শৈশবের ক' বছর পরে তো বটেই। এর সুস্পষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি একে শুধু "যুক্তিসিদ্ধ" জ্ঞানকে (অর্থাৎ প্রতীক-চিহ্নাদির মাধ্যমে সংজ্ঞার্থ, নিয়ম, শ্রেণীবদ্ধতা ও প্রয়োগের ধরণ ইত্যাদির জ্ঞানকে) পুরণ করার জন্য, এবং অনুর্বর প্রতীক চিহ্নাদির প্রতি অধিকতর "উৎসাহ" দানের উপায়-স্বরূপে কাজে লাগানো হয়েছে। জ্ঞানের শিক্ষাসংক্রান্ত দর্শনরূপে, সংবেদন-বাদী অভিজ্ঞতাবাদের অন্ততঃ তিনটি গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। (ক) তত্ত্বটির ঐতিহাসিক মূল্য ছিল সমালোচনামূলক। এটি সংসার ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান-গুলি সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার দ্রাবক ছিল। এটি বাঁধা-ধরা মতবাদ-গুলোর ধ্বংসাত্মক সমালোচনার একটি যন্ত্র ছিল। কিন্তু শিক্ষার কাজ হল গঠনমূলক, সমালোচনামূলক নয়। শিক্ষা ধরে নেয় না যে, প্রাচীন বিশ্বাস-গুলি দূর ও পুনরীক্ষা করতে হবে, পরন্তু তা প্রথম থেকেই, যতোদুর সম্ভব নির্ভুলভাবে বুদ্ধিগম্য অভ্যাসগুলির মধ্যে নতুন অভিজ্ঞতা গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে ধরে নেয়। এই গঠনমূলক কর্তব্যের জন্য সংবেদনবাদ অতিশয় অনুপযুক্ত। মন ও বোধশক্তি বিভিন্ন অর্থের প্রতি প্রতিবেদনশীলতা নির্দেশ করে (পূর্বে দেখুন পৃঃ ৩৮), প্রত্যক্ষ দৈহিক উদ্দীপকের প্রতি সাড়া নির্দেশ করে না এবং অর্থোপলব্ধি হয় কেবল প্রসঙ্গক্রমে। যে প্রকল্প জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়বেদনগুলির যোগফলের সঙ্গে একাত্ম করে, তার থেকে প্রসঙ্গ বাদ

পড়ে। শিক্ষাগত প্রয়োগ হিসাবে এই তত্ত্বটি হয় দৈহিক উত্তেজনাগুলিকে বিবর্ধিত করতে, নয়তো কতকগুলি অসংলগ্ন পদার্থ ও গুণকে স্তূপীকৃত করতে পরিচালিত করেছিল।

(খ) সরাসরি সংবেদনের যেমন প্রত্যক্ষ হওয়ার সুবিধা থাকে, তেমন তার পাল্লা সীমিত থাকার অসুবিধাও থাকে। ইন্দ্রিয়ের নাগালের বহির্ভূত জগতের কোনো কোনো অংশের ধারণাকে বাস্তবতা দেওয়ার জন্য এবং বুদ্ধিগত কৌতূহল জাগানোর উপায়রূপে, গৃহ পরিবেশের স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ এক কথা। কিন্তু ভৌগোলিক জ্ঞানের সব কিছু এবং সর্বময় উদ্দেশ্য হিসাবে সে পরিচিতি মারাত্মকরূপে সীমাবদ্ধ। ঠিক এই ভাবেই শিম, জুতোর কাঁটা ও গণনার জিনিস, সংখ্যাগত সম্পর্কাদির বোধগম্য হওয়ার সহায়ক অবলম্বন হতে পারে। কিন্তু চিন্তার অবলম্বনরূপে, তাৎপর্যের অবধারণরূপে, ব্যবহৃত না হলে, ওগুলো পাটিগণিতের বোধশক্তি বাড়ানোর প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। ওগুলো কোনো একটা নিম্নস্তরেই উন্নতিকে রোধ করে দেয়; সে স্তরটি হল ভৌত প্রতীকের স্তর। সংখ্যার প্রতীকরূপে আঙুলের সদ্ব্যবহার পথের মধ্যে এসে পড়েছিল বলেই, জাতি যে ভাবে হিসাব ও গাণিতিক যুক্তির সাধকরূপে বিশেষ প্রতীক-চিহ্নাদির বিকাশ করেছিল, সেই ভাবেই ব্যক্তিকে মূর্ত থেকে বিমূর্ত প্রতীক চিহ্নগুলির দিকে, অর্থাৎ যে প্রতীক চিহ্নগুলির অর্থ কেবল ধারণামূলক চিন্তনের মাধ্যমেই উপলব্ধ হয় তার দিকে, —অগ্রসর হতে হবে। এবং শুরুতেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌত পদার্থের মধ্যে এই অসঙ্গত নিমজ্জন সে ক্রমোন্নতিকে ব্যাহত করে।

(গ) সংবেদনবাদী অভিজ্ঞতাবাদের গোড়ায়, মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে একটি পুরোপুরি মিথ্যা মনস্তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে, অভিজ্ঞতা হল বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে, সহজ-প্রবৃত্তি ও আবেগমূলক "ক্রিয়া-কলাপের" বিষয়। এমন কি, একটি ক্ষুদ্র শিশুও যে "অভিজ্ঞতা লাভ করে," তা কোনো বস্তু দিয়ে ছাপ দেওয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে প্রাপ্ত গুণ নয়, পরন্তু সেটা হল, হাতড়ানো, ছুঁড়ে-মারা, ভাঙাচোরা ও ছেড়া-ফাড়ার কাজ বস্তুর উপরে যে ফল ঘটায়, এবং তার পরিণামে কাজের ধারার উপরে বস্তু যে ফল ঘটায় তাই। (পূর্বে দেখুন পৃঃ ১৮৩)। সংবেদনের মাধ্যমে জানা— এই যে ধারণা, তার চেয়ে ব্যবহারিক বিষয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভের

যে প্রাচীন ধারণা, সেটিই মূলতঃ প্রকৃত অবস্থার অধিকতর নিকটবর্তী। অভিজ্ঞতার গভীরে অবস্থিত সক্রিয় ও গতিদায়ক উপকরণগুলোকে উপেক্ষা করা, ঐতিহ্যিক অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের একটা মারাত্মক দোষ। যে বস্তুপাঠ প্রকল্প, বস্তু দিয়ে কোনো কিছু করতে চেষ্টা করার ভিতর দিয়ে এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখে, তার গুণাবলী শিক্ষা করার স্বাভাবিক ঝোঁককে উপেক্ষা করে, এবং যতোদূর পারে বাদ দেয়, তা থেকে নীরস ও যান্ত্রিক পদ্ধতি আর কিছুই হতে পারে না।

কাজেই, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদ অভিজ্ঞতার যে দর্শনটি উপস্থাপিত করে, তা যদি এখন যতোটা পেয়েছে, তার থেকে বেশী সর্ববাদী তাত্ত্বিক সমর্থনও পেত, তা হলেও তা শিক্ষালাভ করার ক্রিয়া-প্রণালী সম্বন্ধে কোনো সন্তোষজনক দর্শন আমাদের দিতে পারত না। এর শিক্ষাসংক্রান্ত প্রভাব পুরানো পাঠক্রমের মধ্যে একটা নতুন উপকরণের অনুপ্রবেশ ঘটানোর এবং সেই পাঠ্য ও পদ্ধতির মধ্যে তার আনুষঙ্গিক পরিবর্তন আনার মধ্যেই সীমিত। এই দর্শন প্রত্যক্ষভাবে বা চিত্র ও রেখা-চিত্রিত বিবৃতির মাধ্যমে বিষয় পর্যবেক্ষণ করার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছে এবং বাচনিক প্রতীকের গুরুত্বকে খাটো করেছে। কিন্তু এর নিজের দৌড় এতো সীমাবদ্ধ ছিল যে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়বেদনের বহির্ভূত বিষয়ের সংবাদ দ্বারা,, এবং যে সমস্ত বিষয় বেশী সরাসরিভাবে চিন্তাকে নাড়া দেয় তা দিয়ে তাকে অনুপূরণ করার দরকার হতো। ফলে, সংবাদ-জ্ঞাপন সম্বলিত ও বিমূর্ত, বা, "যুক্তিবাদী" পাঠই অক্ষুণ্ণ রইল।

৩। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভিজ্ঞতা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সংবেদনধর্মী অভিজ্ঞতাবাদ, আধুনিক মনো-বিজ্ঞান সমর্থিত অভিজ্ঞতার ধারণাকেও উপস্থাপিত করে না, বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম-অনুমিত জ্ঞানের ধারণাকেও উপস্থাপিত করে না। মনো-বিজ্ঞানের সম্পর্কে, যে সক্রিয় সাড়া জিনিস-পত্রকে ব্যবহারে লাগায়, এবং এই প্রয়োগের ফলে যে পরিণাম ঘটে তার আবিষ্কৃতির মাধ্যমে জিনিস-পত্র সম্বন্ধে যে শিক্ষা অর্জিত হয়, এই দর্শন সেই সাড়ার সক্রিয় মুখ্য ভূমিকাটিকে বাদ

দেয়। মনে হয় যেন, একটি ক্ষুদ্র শিশু যে পন্থায় জ্ঞানলাভ করে, নিরপেক্ষ-ভাবে তা পাঁচ মিনিট দেখলেও এই ধারণাকে নির্মূল করার পক্ষে যথেষ্ট হবে যে, শিশুটি শব্দ, বর্ণ, কাঠিন্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পূর্বপ্রস্তুত গুণের ছাপ গ্রহণে নিষ্ক্রিয়ভাবে নিযুক্ত রয়েছে। কারণ তখন দেখা যাবে যে, হাতড়ানো, নাগালে পাওয়ার চেষ্টা ইত্যাদি ক্রিয়া-কলাপে শিশুটি উদ্দীপকের প্রতি প্রতি-ক্রিয়া করে দেখতে চায় যে, সংজ্ঞাবহ বেদনের প্রতি ক্রিয়াবাহী প্রতিবেদনের কি ফল দাঁড়ায়। দেখা যাবে যে, সে যা শেখে তা পৃথক পৃথক গুণ নয়, পরন্তু তা হল জিনিসের কাছ থেকে যে আচরণ আশা করা যায় তাই; এবং কোনো ক্রিয়া জিনিস ও মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে—তাই। অন্য কথায় সে যা শেখে তা হ'ল নানা প্রকারের যোগসূত্র। এমন কি লাল রং, তারস্বরের শব্দ প্রভৃতি গুণকেও এগুলি যে সব ক্রিয়া-কলাপ জাগায় এবং এই ক্রিয়া-কলাপের ফলে যে পরিণাম ঘটে তার ভিত্তিতে প্রভেদ ও সনাক্ত করতে হয়। কোন্ কোন্ জিনিস যথাক্রমে কি কি করবে আর তাদের দিয়ে আমরা কি কি করতে পারি বা না পারি সক্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা তা দেখে নিয়েই আমরা তাদের কোন্‌টা শক্ত আর কোন্‌টা নরম তা শিখে থাকি। এই ভাবেই কোন্ কোন্ লোক কি কি ধরনের প্রতিবেদনশীল ক্রিয়া-কলাপ আদায় করে এবং শিশুদের ক্রিয়া-কলাপের উত্তরে তাঁরা কি কি করেন তাই বের করে নিয়েই শিশুরা লোকজন সম্বন্ধে শেখে। এবং আমাদের কাজকর্মের রূপান্তর করতে, কতক কাজকে এগিয়ে দিতে আর কতক কাজকে বাধা দিতে বা রোধ করতে জিনিস-পত্র আমাদের প্রতি যা "করে" (নিষ্ক্রিয় মনের উপর গুণের ছাপ মেরে নয়) এবং নতুন পরিবর্তন আনার জন্য আমরা "জিনিস-পত্রের" প্রতি যা করতে পারি, এই দু'য়ের যোগেই অভিজ্ঞতা গঠিত হয়।

সপ্তদশ শতক থেকে আরম্ভ করে, বিজ্ঞানের যে সব পদ্ধতি পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে, তাও এই শিক্ষাই দেয়। কারণ এই সব পদ্ধতি সুবিবেচিত নিয়ন্ত্রণের শর্তাধীনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো বৈ আর কিছু নয়। গ্রীকদের কাছে এটা একেবারেই নিরর্থক কথা মনে হতো যে, এক ধরনের কর্মতৎপরতা, যেমন চর্মকারের পক্ষে চামড়ার মধ্যে ছিদ্র করা, বা মোম, ছুঁচ ও সুতো ব্যবহার করা, পৃথিবী সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান

দিতে পারে। এ কথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলেই মনে হতো যে, প্রকৃত জ্ঞানের জন্য আমাদিকে অবশ্যই অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোনো যুক্তি-সিদ্ধ ধারণাবলীর আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রবর্তন যথাযথরূপে সূচিত করেছিল যে, ঐ ধরনের ক্রিয়া যখন নিয়ন্ত্রণের শর্তাধীনে রেখে সম্পাদন করা হয়, তখন তাই ঠিক সেই পন্থা হয়ে দাঁড়ায় যা দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ফলপ্রসূ ধারণা পাওয়া যায়, এবং তা পরীক্ষিত হয়। অন্য কথায়, কেবল এটাই প্রয়োজন যে, ধাতুর উপরে এসিড্ ঢেলে দেখবার মতো একটা ক্রিয়া, কোনো পেশার খাতিরে পরিচালিত না হয়ে পরিচালিত হবে জ্ঞান লাভ করার স্বার্থে। এখন থেকে এর উপরেই প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান নির্ভর করবে এবং সেটাকে আয়ত্ত করাই হবে কাজের মতো কাজ। ইন্দ্রিয়-লব্ধ উপলব্ধি অবশ্যই অপরিহার্য। কিন্তু এই উপলব্ধির স্বাভাবিক ও রীতিগত ধরনের উপর পূর্বতন বিজ্ঞান যতোটা নির্ভরশীল ছিল, আধুনিক বিজ্ঞান তার থেকে কম নির্ভরশীল। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-লব্ধ উপলব্ধি যে নিজেদের মধ্যেই ইন্দ্রিয়ের মুখোশ পরা কোনো সার্বিক "আকৃতি" বা জাতিরূপ লুকিয়ে রাখে, এবং যুক্তিমূলক চিন্তা দিয়ে যে তার মুখোশ খুলে ফেলতে হবে, সে ধারণা আর রইল না। বিপরীত পক্ষে, প্রথম কাজ হ'ল ইন্দ্রিয়-লব্ধ উপলব্ধির তথ্যাদিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করা : দূরবীন ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কাচের সাহায্যে, এবং নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কৌশল এঁটে, ইন্দ্রিয়বেদন সাপেক্ষ "হাতের" জিনিসগুলোর উপরে খাটানো। তা এমনভাবে সম্পাদন করা যাতে প্রয়োজনীয় নতুন ধারণা, অনুমান বা তত্ত্ব গড়ে উঠতে পারে। এমন কি প্রাচীন বিজ্ঞানের দখলে যা ছিল তার থেকেও বেশী সর্বময় ধারণা (গাণিতিক ধারণাদির মতো) গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এখন আর এটা ধরে নেওয়া হয় না যে এই সার্বিক ধারণাবলী নিজ থেকেই জ্ঞান দেবে। এরা হল সাধক বিশেষ—পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নানা রকমের জিজ্ঞাসা উপস্থিত করা, পরিচালনা করা, ব্যাখ্যা করা এবং এ সব কাজের ফলাফলকে সূত্রবদ্ধ করার সাধক।

এর যৌক্তিক পরিণতি দাঁড়ায় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের কোনো নতুন দর্শন। সে দর্শন অভিজ্ঞতাকে যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান ও তার ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড় করায় না। অতীতে কম বেশী দৈবক্রমে যে সব কাজ করা হয়েছে অভিজ্ঞতা

আর কেবল তার সারসংক্ষেপ নয়। অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা সুবিবেচিত নিয়ন্ত্রণ : আমাদের উপরে যা কিছু ঘটে এবং আমরা জিনিসের উপরে যা কিছু ঘটাই তার সম্পর্কে অভিভাবনের ক্ষেত্রকে (অভিভাবিত অর্থাবলীকে) যতোদূর সম্ভব উর্বর করার জন্য এবং এই সব অভিভাবনের বৈধতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য যা কিছু করা হয়, অভিজ্ঞতা তারই সুবিবেচিত নিয়ন্ত্রণ। যখন এই চেষ্টা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবেগ বা রীতি দিয়ে মোহ-গ্রস্ত না হয়, যখন তা কোনো লক্ষ্য দ্বারা নির্দেশিত এবং পরিমাপন ও পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখনই তা হয় সুসঙ্গত—যুক্তিপুর্ণ। যখন বিষয় থেকে আমাদের যে ভোগ আসে, তার হাতে আমাদের যা কিছু ঘটে, তা আর দৈব পরিস্থিতি থাকে না, যখন তা আমাদের পূর্বতন উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টার পরিণামে রূপান্তরিত হয়, তখনই তা যুক্তিসঙ্গতরূপে তাৎপর্যপূর্ণ হয় —হয় মোহমুক্তকারী ও শিক্ষাপ্রদ। এককালে যে মানবিক পরিস্থিতি অভি-জ্ঞতাবাদ ও যুক্তিবাদের মধ্যে বিরোধাভাসকে অর্থ ও আপেক্ষিক ন্যায্যতা দান করেছিল সে বিরোধাভাস তার সমর্থন হারিয়ে বসে।

বিশুদ্ধ ব্যবহারিক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্য পাঠ্যের বিরোধিতার উপর এই পরিবর্তনের ফল স্বতঃপ্রমাণিত। এই পার্থক্য মৌলিক নয়, পরন্তু তা শর্তাধীন এবং এমন শর্তাধীন যাকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। ব্যবহারিক কাজকর্ম বুদ্ধিগম্যরূপে সঙ্কীর্ণ ও নগণ্য "হতে পারে"; যতোদূর পর্যন্ত এগুলো রুটিন মাফিক ও কর্তৃত্বের হুকুমে পরিচালিত হয়, এবং মাত্র কোনো বাহ্যিক ফলই এদের লক্ষ্য থাকে, ততোদূর পর্যন্ত এরা সঙ্কীর্ণ "হবে"। কিন্তু শৈশব ও যৌবন, স্কুল শিক্ষার কালটা, হল ঠিক সেই সময়, যখন কোনো ভিন্ন রকমের মনোভাব নিয়ে এ সব কাজ করা সম্ভব হয়। চিন্তন সম্বন্ধে, এবং শিশুদের কাজ ও খেলাধুলা সম্বলিত শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু থেকে যুক্তিসঙ্গত ও সুসম্বদ্ধ বিষয়বস্তু গড়ে ওঠা সম্বন্ধে পূর্বের অধ্যায়গুলোতে যে সব আলোচনা করা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি করা অসুবিধাজনক। এই অধ্যায়ের এবং এর আগের অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ঐ সব আলোচনার ফলাফলকে আরও কিছু অর্থ দিতে পারে।

(১) একজন মানুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেষ্টনীর সঙ্গে তাঁর যে সব "সক্রিয়" সম্বন্ধ থাকে, অভিজ্ঞতা মুখ্যতঃ তা নিয়েই গঠিত। কোনো

কোনো ক্ষেত্রে কর্মোদ্যোগ থাকে পরিবেশের পক্ষে। কোনো একজন মানুষের প্রচেষ্টা কিছু পরিমাণ বাধা বা বিক্ষেপ, ভোগ বা দুর্ভোগ আনে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক জিনিস-পত্র এবং মানুষের আচরণ, ব্যক্তির সক্রিয় প্রবণতাকে সফলতা দান করে। এতে ব্যক্তি শেষ পক্ষে সেই সব পরিণামই ভোগ করে, যা ঘটাতে সে নিজেই চেষ্টা করছিল। যে পরিমাণে একজনের যা ঘটে, এবং সে ফিরে যা ঘটায়; এবং সে পরিবেশের উপরে যা করে, এবং পরিবেশ ফিরে তাঁর উপরে যা করে, সেই পরিমাণেই তাঁর কাজ এবং তাঁর পরিবেশের জিনিস অর্থলাভ করে। সে নিজেকে এবং মানুষ-জিনিস সম্বলিত জগৎটাকে বুঝতে শেখে। উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা বা বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার এমন একটি পরিবেশ উপস্থাপিত করা উচিত যাতে এই সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সেই সব অতি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যকে আয়ত্ত করাবে, যা আবার তার দিক দিয়ে আরও জ্ঞানার্জনের যন্ত্রে পরিণত হবে (পূর্বে দেখুন, ১১শ অধ্যায়)। বার বার যেমন দেখানো হয়েছে, স্কুলের বাইরের কর্মতৎপরতা এমন সব শর্তাধীনে চলতে থাকে, যা বোধশক্তির কৃত্য-কর্তব্য লালন করার, এবং কার্যকরী বুদ্ধিগম্য ধাত গঠন করার জন্য সুবিবেচিতরূপে উপযোগী করে নেওয়া হয় নি। স্কুলের বাইরের ক্রিয়া-কর্ম থেকে যে ফলাফল আসে, তার দৌড়ের পাল্লায় সেটা প্রাণবন্ত ও খাঁটি কিন্তু তা নানা প্রকারের অবস্থাধীনে সীমিত থাকে। কতক কতক ক্ষমতা একেবারেই অবিকশিত ও অনির্দেশিত অবস্থায় থাকে; আর কতকগুলো কেবল সাময়িক ও খামখেয়ালী উদ্দীপনা পায়। আর কতকগুলো, লক্ষ্য এবং সঙ্গতিপূর্ণ উদ্যোগ ও উদ্‌ভাবন শক্তির খরচে রুটিন মাফিক ক্রিয়া-কৌশলের অভ্যাসে পরিণত হয়। তরুণদের কোনো কর্মব্যস্ত পরিবেশের মধ্যে থেকে অন্য লোকদের বিদ্যার নথি-পত্রের শ্বাসরোধকারী অধ্যয়নে চালান দেওয়া স্কুল শিক্ষার কর্মভার নয়। স্কুল শিক্ষার কর্মভার হল তাদিকে অপেক্ষাকৃত দৈব ক্রিয়াকলাপের (সূক্ষ্মদৃষ্টি ও চিন্তনের সম্পর্কে যা আকস্মিক) পরিবেশ থেকে, শিক্ষালাভ-নির্দেশক, নির্বাচিত ক্রিয়াকলাপের পরিবেশে নিয়ে আসা। যে সব উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি এর মধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে ফলপ্রসূ বলে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা সাধারণভাবে পরিদর্শন করলেও দেখা যাবে যে, তারা কম বেশী জ্ঞাতসারেই একথা মেনে নিয়েছে যে, "বুদ্ধিগম্য" পাঠ্যবিষয়

কর্মতৎপর অনুধাবনগুলির বিরোধী হওয়ার পরিবর্তে ব্যবহারিক অনুধাবন-গুলিকে বুদ্ধিধর্মী করার প্রতীক হয়ে ওঠে। এই মূল নিয়মটিকে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

(২) সমাজ জীবনের আধেয়র মধ্যে যে সব পরিবর্তন চলেছে, তা যে ধরনের ক্রিয়া-কলাপ স্কুলের খেলাধূলা ও কাজকর্মকে বুদ্ধিধর্মী করে, তার নির্বাচনকে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছে। যখন কেউ গ্রীকদের ও মধ্যযুগের লোকদের সেই সামাজিক পরিবেশের কথা মনে করে যে, সেখানে যে সমস্ত ব্যবহারিক ক্রিয়া-কলাপ কৃতকার্যতার সঙ্গে করা হতো, তার অধিকাংশই রুটিন মাফিক, বাহ্যিক, এমন কি দাসসুলভ ছিল, তখন সে এটা দেখে মোটেই বিস্মিত হয় না যে, শিক্ষাবিদেরা ঐ সব কাজকে বোধশক্তি কর্ষণের পক্ষে অনুপযোগী বলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু একালে যখন, এমন কি ঘরকন্না, কৃষি, পণ্যোৎপাদন, এবং পরিবহন ও বার্তাবহনকারী পেশাও প্রযুক্তি বিজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে, তখন অবস্থা অন্য রকম দাঁড়িয়েছে। এ কথা সত্য যে, যাঁরা ঐ সব কাজে নিযুক্ত তাঁদের অনেকেই তাঁদের ব্যক্তিগত কাজটা যে বুদ্ধিগত আধেয়টির উপরে নির্ভর করছে সেটি সম্বন্ধে অবহিত নন। কিন্তু এই অবস্থা, স্কুলে কেন যে এই সব অনুধাবনের সদ্ব্যবহার করা হবে তার আরও একটি কারণ দেখিয়ে দেয়। সেটি এই যে, স্কুলে তা করা হলে এখন যে সব বোধবুদ্ধির খুবই অভাব রয়েছে, আগামী কালের বংশ-ধরেরা সেটা আয়ত্ত করতে সমর্থ হবে, এবং লোকে অন্ধভাবে না করে, বুদ্ধিমত্তার সহিত তাঁদের নিযুক্তির কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

(৩) জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে গতানুগতিক পার্থক্য এবং বিশুদ্ধ "বুদ্ধি-গম্য" পাঠ্যের তথাকথিত মর্যাদার উপরে সর্বাধিক সরাসরি আঘাত পড়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে। যদি এই অগ্রগতি স্পষ্ট করে কিছু প্রদর্শন করে থাকে, তাহলে সেটি এই যে, "করার" ক্রিয়াফলরূপে ছাড়া খাঁটি জ্ঞান এবং ফলপ্রসূ বোধগম্যতা বলে কিছু নেই। জ্ঞানের ক্রমোন্নতি, ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, আর সঠিক শ্রেণীবদ্ধতার জন্য তথ্যাদির যেরূপ বিশ্লেষণ ও পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য, বিশুদ্ধ মানসিক সূত্রে,—ঠিক মগজের মধ্যে,—তার সন্ধান মেলে না। মানুষ যখন কিছু বের করতে ইচ্ছা করে তখন তাকে জিনিসের উপরে কোনো কিছু করতেই হবে,—করতে হবে শর্তাবলীর

পরিবর্তন। এটাই হল শ্রমশালার পদ্ধতির শিক্ষা, এবং সব শিক্ষাকেই এ পাঠ শিখতে হবে। শ্রমশালা হল সেই সমস্ত শর্তাদির আবিষ্কার যার অধীনে "শ্রম" শুধু বাহ্যিকরূপে উৎপাদনশীল না থেকে বুদ্ধিগম্যরূপে ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। যদি বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমশালা আরও বেশী রকমের কারিগরি দক্ষতা লাভ করার স্থান হয়ে থাকে, তার কারণ এই যে, এখনো তা খুব বেশীর ভাগেই কেবল কোনো বিচ্ছিন্ন সঙ্গতি হয়ে রয়েছে, এবং অপেক্ষাকৃত বেশী বয়স হয়ে যাওয়ার জন্য, শিক্ষার্থীরা তার পুরোপুরি সুযোগ নিতে অসমর্থ হচ্ছে; এবং এমন কি, সে অবস্থাতেও তারা এমন সব অন্যান্য পাঠ দিয়ে ঘেরাও রয়েছে যেখানে তথাকথিত ঐতিহ্যিক পদ্ধতি-গুলো বুদ্ধিকে কর্মতৎপরতা থেকে আলাদা করে রাখে।

সারাংশ

তথাকথিত ঐতিহ্যিক রীতিনীতি ও বিশ্বাস দ্বারা জীবন-যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করতে ব্যর্থ হয়ে, গ্রীকেরা দার্শনিক জল্পনাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাই তারা রীতিনীতির প্রতিকূল সমালোচনাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এবং জীবন ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অন্য কোনো কর্তৃত্বের উৎস খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন। যেহেতু তাঁরা জীবন ও বিশ্বাসের জন্য কোনো যুক্তিযুক্ত মানদণ্ড পেতে চেয়েছিলেন, এবং যে সমস্ত রীতি-নীতি অসন্তোষজনক অবলম্বন বলে প্রমাণিত হয়েছিল তাদিকে অভিজ্ঞতার সহিত একাত্ম করেছিলেন, সেইহেতু তাঁরা যুক্তি (বা বুদ্ধি), এবং অভিজ্ঞতার খোলাখুলি বিরোধ মেনে নিয়ে-ছিলেন। যুক্তিকে যতো বেশী মহিমান্বিত করা হতে লাগল, অভিজ্ঞতার ততোই অবমূল্যায়ন হতে লাগল। যেহেতু জীবনের বিশেষ বিশেষ ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে মানুষে যা কিছু করে, এবং যা কিছু ভোগ করে, তার সাথে অভিজ্ঞতাকে একাত্ম করা হয়েছিল, সেই হেতু কাজ-কর্ম করাও দর্শনধর্মী অবমূল্যায়নের একটা অংশ হয়ে দাঁড়াল। এই প্রভাব আরও অনেক প্রভাবের সঙ্গে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, যে সমস্ত পদ্ধতি ও আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতম ইন্দ্রিয়-পর্যবেক্ষণ ও দৈহিক কর্ম-তৎপরতা থাকে, সেগুলোকে অতিরঞ্জিত করল। এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করে, অভিজ্ঞতার প্রতি আবেদন করে, এবং তথাকথিত বিশুদ্ধ বিচারসম্পন্ন প্রত্যয়ের উপর আক্রমণ শুরু করেই, আধুনিক যুগের আরম্ভ। বলা হল যে, হয় ঐ সব প্রত্যয়কে মূর্ত অভিজ্ঞতার ফলাফল দিয়ে ওজনে ভারী করতে হবে, আর তা না হলে ওগুলো তো কেবল কুসংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণী-স্বার্থেরই অভিব্যক্তি, এবং তাকে রক্ষা করার জন্যই ওগুলোকে যুক্তিযুক্ত আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু নানাবিধ অবস্থা বশতঃ অভিজ্ঞতা বিবেচিত হল বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপে, এবং অভিজ্ঞতা থেকে তার মূলগত, ক্রিয়াগত ও প্রক্ষোভগত পর্যায়গুলো বাদ পড়ে গেল। তাকে একাত্ম করা হল ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলো "সংবেদনের" নিষ্ক্রিয় সংগ্রহণের সঙ্গে। কাজেই এই নতুন তত্ত্ব যে শিক্ষাসংস্কার আনল, তা প্রধানতঃ পূর্বতন পদ্ধতির পুঁথিগত বিদ্যাভ্যাসের কিছু অংশ বাদ দেওয়ার মধ্যেই সীমিত হল, এবং সেটি কোনো সুসঙ্গত পুনর্গঠন সাধন করল না।

ইতিমধ্যে, মনোবিদ্যা, শিল্পোৎপাদন প্রণালী এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক পদ্ধতির অগ্রগতি, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আর একটি ধারণাকে সুস্পষ্টরূপে বাঞ্ছনীয় ও সম্ভাবনীয় করে তোলে। যে ধারণা অনুযায়ী অভিজ্ঞতা হল প্রধানতঃ ব্যবহারিক,—জ্ঞানধর্মী নয়,—কাজকর্ম করার ও কাজকর্মের পরিণাম ভোগ করার কোনো ব্যাপার, এই তত্ত্ব প্রাচীন কালের সেই ধারণাকে পুনরুপস্থাপিত করে। কিন্তু যখন এই উপলব্ধি আসে যে "করাকে" এমন ভাবে পরিচালিত করা চলে, যাতে চিন্তন যা কিছু অভিভাবন করে, তাও "করার" আধেয়র মধ্যে গৃহীত হয়, এবং তার ফলে দৃঢ়রূপে পরীক্ষিত জ্ঞানলাভ হয়, তখনই ঐ প্রাচীন তত্ত্ব রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে, "অভিজ্ঞতা" হাতুড়ে রূপ ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার রূপ ধারণ করে। যুক্তি কোনো বহুদূরবর্তী ও আদর্শান্বিত ধী-গুণের রূপ ত্যাগ করে, এবং যে সমস্ত সঙ্গতি দিয়ে কর্মতৎপরতা সার্থকরূপে ফলবতী হয়, তাকেই সূচিত করে। শিক্ষার দিক থেকে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষা পদ্ধতির যে বিকাশ দেখানো হয়েছে, এই পরিবর্তন তারই কোনো পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে।

একবিংশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পাঠ্যবিষয় ঃ প্রকৃতিবাদ ও মানবতাবাদ

পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য সাহিত্যিক পাঠ্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিরোধিতার পরোক্ষ উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত যে মীমাংসায় পৌছানো গেছে তা হ'ল কোনো রকমের একটা যান্ত্রিক মিটমাট। এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রটিকে প্রকৃতি-বিষয়ক এবং মনুষ্য-বিষয়ক পাঠ্যের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতি আমাদের কাছে শিক্ষাগত মূল্যবোধের আর একটি বাহ্যিক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে, এবং মানবিক বিষয়ের সঙ্গে ভৌত প্রকৃতির সম্বন্ধ সম্বলিত দর্শনের প্রতি আমাদের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, এই শিক্ষাগত বিচ্ছেদ দ্বৈতবাদী দর্শনগুলিতেও প্রতিফলিত। এতে মন ও জগৎকে স্থিতির দু'টি স্বতন্ত্র রাজ্য বলে মনে করা হয় এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনো স্থানে একটা পারস্পরিক সংযোগ রাখা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই স্বাভাবিক দাঁড়ায় যে, স্থিতির প্রতিটি এলাকারই তার সংলগ্ন একটা নিজস্ব পাঠ্যাবলী থাকা উচিত; এমন কি, এটাও স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় যে বৈজ্ঞানিক পাঠ্যাবলীর ক্রমবৃদ্ধিকে, আধ্যাত্মিক রাজ্যের মধ্যে জড়বাদী দর্শনের অনধিকার প্রবেশের উপক্রম, বলে সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। যে কোনো শিক্ষাতত্ত্বই এখনকার থেকে কোনো একটা অধিকতর ঐক্যবদ্ধ শিক্ষাপ্রকল্পের সঙ্কল্প করে, তাকেই ভৌত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রশ্নটির মোকাবিলা করতে বাধ্য থাকতে হয়।

১। মানবতাবাদী পাঠ্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

এটা লক্ষণযোগ্য যে, প্রাচীন গ্রীকদর্শনে এই সমস্যাটি কোনো আধুনিক রূপায়ণে উপস্থাপিত হয় নি। সক্রেটিস্ হয়তো সত্য সত্যই ভাবতেন যে, ভৌত-প্রকৃতির বি-জ্ঞান প্রাপ্তব্য নয়, বা তা খুব গুরুত্বপূর্ণও নয়। অবগতির মুখ্য

বিষয় হ'ল, মানুষের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য। যা কিছু গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ —অর্থাৎ সকল নৈতিক ও সামাজিক কৃতি,—তা এই জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে। প্লেটোর মতে অবশ্য মানুষ ও সমাজের প্রকৃত জ্ঞান ভৌত প্রকৃতির মুখ্য কাঠামোর উপরেই নির্ভরশীল। "রিপাব্লিক" নামক তাঁর সর্বপ্রধান গ্রন্থখানি, একই সঙ্গে নীতি, সমাজ সংগঠন, এবং অধিবিদ্যা ও ভৌতবিজ্ঞানের গ্রন্থনা। যেহেতু তিনি সক্রেটিসের এই সূত্রটি স্বীকার করেছিলেন যে, যথার্থ নৈতিক ও সামাজিক কৃতি যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে, সেই-হেতু তিনি জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করতে বাধ্য হলেন। যেহেতু তিনি এই ধারণাটি গ্রহণ করেছিলেন যে, জ্ঞানের চরম লক্ষ্যবস্তু হ'ল মানুষের মঙ্গল বা উদ্দেশ্যের আবিষ্কার করা, এবং সক্রেটিসের এই প্রত্যয়কে খুশী মনে গ্রহণ করতে অসম্মত ছিলেন যে, আমরা যা কিছু জানি তা হল আমাদের অজ্ঞতা, সেইহেতু তিনি মানবিক মঙ্গলের আলোচনাকে প্রকৃতির নিজেরই মঙ্গল বা উদ্দেশ্যের বিবেচনার সঙ্গে যোগ করেছিলেন। যে সর্বময় উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে বিধান ও একত্ব দান করে, তার জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্রভাবে মানুষের উদ্দেশ্য নিরূপণ করা অসম্ভব। কাজেই তিনি যে গণিত ও পদার্থবিদ্যা, এবং ন্যায়-শাস্ত্র ও অধিবিদ্যার কাছে সাহিত্যিক পাঠকে নিম্নস্থান দিয়েছিলেন, তা তাঁর দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সুসঙ্গত। পক্ষান্তরে, ভৌতপ্রকৃতির জ্ঞান তার নিজস্ব অর্থেই কোনো উদ্দেশ্য নয়। সমবেত ও ব্যক্তিগত কর্মধারার নির্দিষ্ট বিধান-রূপে, মনকে স্থিতির পরম উদ্দেশ্য উপলব্ধি করানোর জন্যে ভৌতপ্রকৃতির জ্ঞান হল একটি আবশ্যিক স্তর। আধুনিক বাক্-বিন্যাস্ অনুযায়ী প্রকৃতি-বাদী পাঠ্য অপরিহার্য, কিন্তু সেটা মানবতাবাদী ও আদর্শ উদ্দেশ্যের স্বার্থেই ঘটে থাকে।

প্রকৃতিবাদী পাঠ্যের দিকে এ্যারিস্টোটেল্ বোধকরি আরও বেশী এগিয়ে-ছিলেন। তিনি নাগরিক সম্পর্ককেও বিশুদ্ধ জ্ঞানধর্মী জীবনের নিম্নস্থানে রেখেছিলেন (পূর্বে, পৃঃ ৩৩২)। মানুষের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য মানবীয় নয়, পরন্তু তা দিব্য,—যে বিশুদ্ধ জ্ঞান দিব্য জীবন গঠন করে তাতে অংশ নেওয়া। এরূপ জ্ঞান, যা কিছু বিশ্বজনীন ও আবশ্যিক, তা নিয়েই কাজ করে। কাজেই প্রকৃতিতে যা-কিছু সর্বোত্তম তার মধ্যেই মানুষের অনিত্য বিষয় থেকে অধিকতর পর্যাপ্ত বিষয়বস্তুর সন্ধান মেলে। দার্শনিকেরা যা বলেছেন, তার

বিস্তৃত বিবরণ না দেখে তাঁরা গ্রীক জীবনে যা-কিছুর প্রতীক ছিলেন আমরা যদি তা দেখি, তা হলে সংক্ষেপে বলতে পারি যে, গ্রীকেরা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে অবাধ অনুসন্ধান, এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধীয় উপভোগের প্রতি আত্যন্তিকভাবে আগ্রহী ছিলেন। এবং সমাজ যে পরিমাণে প্রকৃতির মধ্যে দৃঢ়মূলবদ্ধ এবং তার বিধানের অধীন, সে সম্বন্ধে তাঁরা এত গভীরভাবে সচেতন ছিলেন যে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধের কথা তাঁদের চিন্তাতেও আসেনি। প্রাচীন জীবনধারার শেষ ভাগে অবশ্য দুটি কারণ এক হয়ে, সাহিত্যিক ও মানবতাবাদী পাঠ্যকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিল। একটি কারণ হল, কৃষ্টির ক্রমবর্ধনশীল অনুস্মৃতি ও অনুকৃতিধর্মী প্রকৃতি ; অন্যটি হ'ল, রোমক জীবনে রাষ্ট্রনৈতিক ও বাক্‌বিন্যাসী আলংকারিক প্রবণতা।

সভ্যতার ক্ষেত্রে গ্রীকদের কৃতি দেশজ। আলেকজেন্দ্রিয়া ও রোমের সভ্যতা বিদেশী উৎস থেকে উত্তরাধিকারলব্ধ। কাজেই সেটি বিষয়বস্তু ও প্রেরণার জন্য ভৌত প্রকৃতি ও সমাজের দিকে নজর দেওয়ার পরিবর্তে নজর ফিরিয়েছিল সেই সব লিপির মধ্যে যার থেকে তা আহরণ করা হয়েছিল। শিক্ষা-তত্ত্ব ও শিক্ষাবৃত্তির উপরে তার পরিণাম দেখানোর জন্য আমরা হ্যাট্‌চ-এর কথার উদ্ধৃতিকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে পারি। "একদিকে গ্রীস্ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারান ; অন্যদিকে তার সমৃদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে ছিল, কোনো অনপসরণীয় উত্তরা-ধিকার......। ফলে এটাই স্বাভাবিক যে, সে সেই পাণ্ডিত্যের প্রতি মন নিবিষ্ট করবে। আবার এটাও স্বাভাবিক যে, সেই পাণ্ডিত্য তাদের বক্তৃতাতেও প্রকাশ পাবে......। গ্রীকজগতের জন সাধারণ অতীত বংশাবলীর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতির উপর এবং কৃষ্টিসম্পন্ন বাচনভঙ্গীর অভ্যাসের উপর যে গুরুত্ব দিতে তৎপর হয়েছিলেন, সাধারণ কথায়, তাই সেকাল থেকে শিক্ষা নামে অভিহিত হয়ে এসেছে।......আমাদের নিজেদের শিক্ষা তার থেকেই সরাসরি ঐতিহ্য হয়ে এসেছে। এই শিক্ষা এমন একটি চলিত ভঙ্গী স্থাপন করেছে যে, সেটি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সমগ্র সভ্য জগতের উপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। আমরা প্রকৃতি পাঠ না করে বরং সাহিত্য পাঠ করি, কারণ গ্রীকেরা তা করত ; আরও এই কারণে যে, যখন রোমকগণ এবং তাদের প্রাদেশিক নাগরিকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন, তাঁরাও গ্রীক শিক্ষক নিযুক্ত করলেন এবং

গ্রীকদের পথই গ্রহণ করলেন[১]।

রোমকদের তথাকথিত ব্যবহারিক ঝোঁক একই দিকে কাজ করেছিল। গ্রীকদের লিখিত ধারণাবলী অবলম্বন করে তাঁরা কেবল কৃষ্টি বিকাশের একটা সহজ পথই গ্রহণ করলেন না, পরন্তু তাঁরা ঠিক সেই সব বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিও যোগাড় করলেন, যা তাদের প্রশাসনিক মেধার সাথে খাপ খেয়েছিল। কারণ তাদের ব্যবহারিক প্রতিভা, ভৌত প্রকৃতির বিজয় ও নিয়ন্ত্রণের দিকে পরিচালিত না হয়ে পরিচালিত হয়েছিল মানুষের বিজয় ও নিয়ন্ত্রণের দিকে।

উদ্ধৃত অংশে মিঃ হ্যাট্‌চ যখন বলেন যে, আমরা প্রকৃতি অধ্যয়ন না করে বরং সাহিত্য অধ্যয়ন করি এই কারণে যে, গ্রীকেরা ও গ্রীক-শিক্ষিত রোমকেরাও তাই করতেন, তখন তিনি অনেকখানি ইতিহাসকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। মধ্যবর্তী শতকগুলি কি সূত্রে গ্রথিত হয়েছে? এই প্রশ্ন থেকে যে ইঙ্গিত আসে তা এই যে, বর্বর ইউরোপ রোমক অবস্থাকেই অধিকতর পরিমাণে এবং অধিকতর প্রগাঢ়তায় পুনরাবৃত্তি করেছে। তাঁকে গ্রীক-রোমক সভ্যতার স্কুলে যেতে হ'তো, ফলে সেও তাঁর কৃষ্টিকে অভিব্যক্ত না করে, বরং তাকে ধার করেছিল। কেবল তাঁর সাধারণ ধারণা এবং তাঁর শিল্পীসুলভ উপস্থাপনের জন্যই নয়, পরন্তু আইন-কানুনের আদর্শ রূপ স্থাপনের জন্যেও তাঁকে বিদেশী লোকদের নথিপত্রের কাছে যেতে হয়েছে। এবং সেকালের প্রভাবশালী ধর্মীয় স্বার্থ দ্বারাও ঐতিহ্যের উপরে এই নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, যাজক সম্প্রদায় যে সব অনুশাসনের দোহাই দিতেন সেগুলি ছিল বিদেশী ভাষায় রচিত সাহিত্য। সব কিছুই ভাষা শিক্ষার সহিত বিদ্যার্জনকে একাত্ম করতে, এবং মাতৃভাষার পরিবর্তে পণ্ডিতী ভাষাকে সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত করার দিকে বাঁক নিয়েছিল।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি না করি যে, এই বিষয়বস্তুই কোনো "আলোচনাধর্মী" পদ্ধতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সত্যের পুরো ক্ষেত্রটি আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। বিদ্যার পুনরুজ্জীবনের সময় (রানেশাঁর) থেকেই "পণ্ডিতীপনা" সচরাচর [illegible] অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু তার যা কিছু অর্থ, তা হ'ল আশ্রমিক শিক্ষায়তনের বা শাস্ত্রজ্ঞদের পদ্ধতি। তার সার কথা এই যে, যে সব বিদ্যাদান ও বিদ্যালাভ পদ্ধতি

১। "খ্রীষ্টধর্মের উপর গ্রীকদের ধারণা ও রীতিনীতির প্রভাব" পৃঃ [illegible]

কোনো আনুশাসনিক সত্যাবলীর বৃত্তান্তকে হস্তান্তরিত করার পক্ষে খাটে, এটি তারই একটি অতীব ফলদায়ক সুসম্বদ্ধতা মাত্র। যেখানে ভৌত প্রকৃতি ও সমাজের পরিবর্তে শব্দশাস্ত্রই শিক্ষার আধেয় যোগায়, সেখানে পদ্ধতিগুলোকে অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও উদ্‌ভাবনের উপযোগী করার পরিবর্তে বরং প্রাপ্ত বিষয়ের সংজ্ঞাদান, ব্যাখ্যাদান ও তাৎপর্য-দানেরই উপযোগী করতে হয়। এবং মূলতঃ যাকে পাণ্ডিত্য বা পণ্ডিতীপনা বলা হয় তা হ'ল সেই সব পদ্ধতির একটা আন্তরিক ও সঙ্গত রূপায়ণ এবং তাদের প্রয়োগ। সেগুলি তখনই শেখানোর উপযোগী হয় যখন শিক্ষার্থীরা যাতে নিজে নিজেই পদ্ধতি বের করতে পারে, পাঠ্যের বিষয়বস্তু সে রকমের কিছু না হয়ে, পূর্বপ্রস্তুত আকারে গ্রহণ করা হয়। যে মাত্রায় বিদ্যালয়ে এখনো পাঠ্যপুস্তক থেকে শেখানো হয়, এবং আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের উপর নির্ভর না করে, অনুশাসন ও আয়ত্ত করার মূল নিয়মের উপর নির্ভর করা হয়, শিক্ষাপদ্ধতিও সেই মাত্রাতেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়ে থাকে,—কেবল সর্বোত্তম পাণ্ডিত্যের মধ্যে যে ন্যায়ানুগ বিশুদ্ধতা ও সুসম্বদ্ধতা থাকে, এখনকার পণ্ডিতিতে তা থাকে না। পদ্ধতি ও প্রস্তাবনার এই শিথিলতা ছাড়া, একমাত্র পার্থক্য এই যে, বর্তমানে ভূগোল, ইতিহাস, উদ্‌ভিদ্ বিদ্যা এবং জ্যোতিঃ বিদ্যাও কর্তৃত্বব্যঞ্জক বা আনুশাসনিক সাহিত্যের অংশ হয়েছে এবং এগুলিকেও সে ভাবেই আয়ত্ত করতে হবে।

এর ফলে, যে গ্রীক ঐতিহ্যের মধ্যে মানবতাবাদী স্বার্থকে ভৌত-প্রকৃতির উপর আগ্রহের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা হতো, এবং যে ভৌত প্রকৃতির জ্ঞানকে মানুষের সুবিশিষ্ট মানবসুলভ লক্ষ্য সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করা হতো, সে ঐতিহ্য লোপ পেল। জীবন তার অবলম্বন পেল অনুশাসনের মধ্যে, বহিঃ প্রকৃতির মধ্যে নয়। অধিকন্তু, বহিঃ প্রকৃতিকে বেশ কিছু সন্দেহের চোখে দেখা হতে লাগল। প্রকৃতির অনুধ্যান হয়ে উঠল বিপজ্জনক। কারণ যে সমস্ত প্রমাণ-পত্রের মধ্যে জীবন-যাপনের নিয়মাবলী আগে থেকেই দেওয়া রয়েছে, প্রকৃতির অনুধাবন মানুষকে তার উপরে আস্থা রাখতে দেয় না,—তাকে দূরে টানতে চায়। তা ছাড়া কেবল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই বহিঃ প্রকৃতিকে জানা সম্ভব। ভৌত প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রতি আবেদন করে; ইন্দ্রিয়গুলি শুধুই বস্তুধর্মী, বিশুদ্ধ অভৌতিক মনের বিরোধী। অধিকন্তু

প্রকৃতির জ্ঞানের উপযোগিতা অবিমিশ্র ভৌতিক ও সাংসারিক; সেটি মানুষকে দৈহিক ও বৈষয়িক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে; পরন্তু সাহিত্যিক ঐতিহ্য মানুষের আধ্যাত্মিক ও শাশ্বত মঙ্গলের সহিত সংশ্লিষ্ট

২। ভৌত প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আগ্রহ

পঞ্চদশ শতকের যে আন্দোলনকে নানাভাবে শিক্ষার পুনরুজ্জীবন এবং নবজন্ম,—রেনাশাঁ, বলা হয়, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের উপস্থিত জীবনের প্রতি নতুন স্বার্থবোধ, এবং সেই দিক থেকে ভৌত প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রতি এক নতুন আগ্রহ। সেটি এই অর্থে প্রকৃতিবাদী ছিল যে, সেটি তখনকার প্রভাবশালী অতিপ্রাকৃতবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবতঃ এই পরিবর্তিত মনোভাব ঘটানোর সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম-নীতিহীন সাহিত্যে ফিরে আসার প্রভাবটাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে, পরিবর্তনটি ছিল প্রধানতঃ সমসাময়িক অবস্থাদির ক্রিয়াফল। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার পরে, শিক্ষিত লোকেরা তার সমুপযোগী পোষণ ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য সাগ্রহে গ্রীক সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। এবং বেশ কিছু পরিমাণে, গ্রীক চিন্তনের প্রতি এই যে আগ্রহ সেটা সাহিত্যের খাতিরে সাহিত্য পাঠে সীমাবদ্ধ না হয়ে তার প্রকাশমান ভাব-প্রাণতায় ধরা পড়েছিল। যে মানসিক স্বাধীনতা, প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যবোধ গ্রীক বিকাশকে অনু-প্রাণিত করেছিল, তাই মানুষকে অদম্যভাবে সদৃশ চিন্তনে ও পর্যবেক্ষণে উদ্বুদ্ধ করল। ষোড়শ শতকের বিজ্ঞানের ইতিহাস বলে যে, ভৌত প্রকৃতির বিকাশোন্মুখ বিজ্ঞানগুলি গ্রীক্ সাহিত্যের প্রতি এই নতুন আগ্রহের কাছে তাদের যাত্রার উদ্যোগে বহুলাংশে-ঋণী। উইন্ডেলব্যাণ্ড যেমন বলেছেন, ভৌত প্রকৃতির এই নতুন বিজ্ঞান মানবতাবাদেরই মানস-কন্যা। সে কালের জনপ্রিয় ধারণা ছিল যে, বিশাল সত্তারূপে বিশ্ব যা, ক্ষুদ্র সত্তারূপে মানুষও তাই।

এই বিষয়টি নতুন করে আবার এই প্রশ্ন তোলে যে, পরে প্রকৃতি ও মানুষ আবার কি করে পৃথকীকৃত হ'ল এবং ভাষা ও সাহিত্য, এবং ভৌত

বিজ্ঞানকেই বা কি করে আত্যন্তিকভাবে ভাগ করা হল। এখানে তার চারটি কারণ দেওয়া যেতে পারে। (ক) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্য দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রীয় বিধান, কূটনীতি অবশ্যম্ভাবী-রূপে অনুশাসনিক সাহিত্যের শাখা-প্রশাখা ছিল। কারণ পদার্থবিদ্যা ও রাসায়নিক বিজ্ঞানের,—জীববিদ্যার তো বটেই,—পদ্ধতিগুলি আরো অগ্রগতি লাভ না করা পর্যন্ত সমাজ বিজ্ঞান বিকাশলাভ করেনি। ইতিহাসের বেলাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই কথা খাটে। অধিকন্তু, ভাষার ফলপ্রদ শিক্ষাদানের জন্য যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো, সেগুলি উত্তমরূপে বিকাশলাভ করেছিল এবং কেতাবী রীতির জাড্যও তাদের পক্ষে ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ গ্রীক্ সাহিত্যের প্রতি নতুন আগ্রহকে যেরূপ প্রথমে পণ্ডিতি-ব্যবস্থায়-সংগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বাসা বাঁধতে দেওয়া হয়নি, সেইভাবেই যখন এই ঔৎসুক্য তাদের মধ্যে স্থান পেল, তখন সেটিও পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রভাবকে খাটো করার জন্য প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে হাত মেলাল। যাঁরা পড়াতেন, তারা কদাচিৎ বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন; যাঁদের বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা ছিল তাঁরা বেসরকারী শ্রমশালায়, এবং যে সমস্ত বিদ্যায়তন গবেষণার পৃষ্ঠপোষক ছিল অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে সংগঠিত হয়নি, তাদের মাধ্যমেই কাজ করতেন। সর্বশেষে, যে অভিজাত ঐতিহ্য বৈষয়িক বিষয়ের এবং ইন্দ্রিয়াদি ও হাতের কাজকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো তা তখনো শক্তিশালী ছিল।

(খ) প্রোটেস্টেন্ট বিদ্রোহ তার সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্বালোচনা ও বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রবল উৎসাহ আনল। দু'পক্ষ থেকেই সাহিত্যিক দলিলপত্রের প্রতি আবেদন এল। যে সমস্ত প্রাচীন লিপির উপর ভরসা করতে হতো, তা পাঠ করার ও তাকে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা লাভের জন্য দু'পক্ষকেই লোকজনকে শিখিয়ে নিতে হতো। যাঁরা মনোনীত ধর্ম বিশ্বাসকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে সমর্থন করতে পারেন ও প্রচার করতে পারেন, এবং অন্যপক্ষের হস্তক্ষেপ ব্যাহত করতে পারেন, এরূপ লোককে শিখিয়ে নেওয়ার চাহিদা এমন অবস্থায় এল যে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভাষামূলক শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত ধর্মবিদ্যার স্বার্থদ্বারা অধিকৃত হয়েছিল, এবং তা ধর্মীয় শিক্ষা ও

যাজকীয় বিতর্কের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। কাজেই এখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যে সব ভাষা দেখা যাচ্ছে তাদের উদ্ভব শিক্ষার পুনরুজ্জীবন থেকে সরাসরি ঘটেনি,—ঘটেছে ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনে তার অভিযোজন থেকে।

(গ) প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলিকেই এমন ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা মানুষ ও প্রকৃতির বিরোধিতাকে প্রবল করে তুলেছিল। ফ্রান্সিস্ বেকন প্রকৃতিবাদী ও মানবতাবাদী স্বার্থের মিলনের একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করে বিজ্ঞানকে প্রকৃতির "পূর্বানুমান"—প্রকৃতির উপরে পূর্বকল্পিত ধারণাদি চাপানোর—প্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করতে হবে, এবং তাকে হতে হবে প্রকৃতির নিরহঙ্কার ব্যাখ্যাতা। বুদ্ধিগম্যরূপে প্রকৃতির আদেশ পালন করেই মানুষ ব্যবহারিকরূপে তাকে আদেশ করতে শিখবে। "জ্ঞানই ক্ষমতা।" এই স্মরণীয় উক্তিটির অর্থ এই যে, বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করবে, এবং তার নিজ উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করার জন্য প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জকে নিয়োজিত করবে। বেকন প্রাচীন পণ্ডিতি ও যুক্তিবিদ্যাকে এই বলে আক্রমণ করেছিলেন যে, তা বিশুদ্ধ বিতর্কমূলক, অর্থাৎ তার কাজ শুধু তর্কে জয়লাভ করা, অজানা বিষয়কে আবিষ্কার করা নয়। তাঁর নতুন যুক্তিবিদ্যাতে তিনি চিন্তনের যে নতুন পদ্ধতিটি প্রস্তাব করলেন তা হল এই যে, তার ভিতর দিয়ে একটি সম্প্রসারণশীল যুগ প্রতিভাত হবে, এবং সে যুগের আবিষ্কার মানবকুলের সেবার জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবিত রচনাতে ফলপ্রসূ হবে। মানবগোষ্ঠীকে তাঁদের পরস্পরকে দাবিয়ে রাখার নিরর্থক ও চির-অসমাপ্ত প্রয়াস বর্জন করতে হবে, এবং মানবজাতির স্বার্থে ভৌত প্রকৃতির উপরে আধিপত্য বিস্তারের সহযোগী কর্মে নিয়োজিত হতে হবে।

মোটামুটিভাবে, বেকন পরবর্তী প্রগতির ধারা সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। কিন্তু তিনি অগ্রগতিকে "পূর্বানুমান" করেছিলেন। তিনি দেখতে পান নি যে, এই নতুন বিজ্ঞান দীর্ঘকাল যাবৎ মানব শোষণের প্রাচীন উদ্দেশ্যের স্বার্থে খাটানো হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে, নতুন বিজ্ঞান মানুষকে অবিলম্বে নতুন উদ্দেশ্য দেবে। কিন্তু তার পরিবর্তে তা এক শ্রেণীর হাতে আর এক শ্রেণীকে বলি দিয়ে তার বিষয়-তৃষ্ণা মেটানোর পুরাতন উদ্দেশ্য

সাধনের উপায় যোগাল। তিনি যেরূপ অনুমান করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পরেই শ্রমশিল্পে বিপ্লব এল। কিন্তু একটি নতুন ধরনের মন সৃষ্টি করতে এই বিপ্লবের বহু শতাব্দী লেগে যাচ্ছে। নতুন বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে সামন্ততন্ত্র দণ্ডিত হয়েছে, কারণ এই সকল প্রয়োগ, ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা স্থানান্তরিত করেছে পণ্যোৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের স্থান নিয়েছে পুঁজিবাদ, কোনো রকমের সামাজিক মানবতাবাদ নয়। উৎপাদন ও ব্যবসায় এমন ভাবে চলেছে, যেন নতুন বিজ্ঞানের কাছে কোনরূপ নৈতিক শিক্ষা নেই, আছে কেবল কৌশলী শিক্ষা,—উৎপাদনে ব্যয়-সঙ্কোচ, আর আত্ম-স্বার্থে সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার। স্বভাবতঃই, জড়-বিজ্ঞানের এই প্রয়োগ (যা অসাধারণরূপে লক্ষণযোগ্য), স্বীকৃত মানবতাবাদীদের এই দাবিকে শক্তিশালী করল যে, বিজ্ঞানের প্রবণতা জড়বাদের দিকে অর্থাৎ বৈষয়িক দিকে। এই অবস্থা, ধনোৎপাদন, ধনসঞ্চয় ও অর্থব্যয়ের বাইরে মানুষের সুচিহ্নিত মানবিক স্বার্থের স্থানকে শূন্য রাখল; এবং ভাষা ও সাহিত্য মানবজাতির নীতিগত ও আদর্শগত স্বার্থের একমাত্র প্রতীক হওয়ার দাবিকে উপস্থাপিত করল।

(ঘ) অধিকন্তু, যে দর্শন নিজেকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক বলে ঘোষণা করেছিল, যা নিজেকে বিজ্ঞানের মোট তাৎপর্যের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিভূ বলে আত্ম-প্রকাশ করেছিল, তা, হয় প্রকৃতির গঠনে মন (মানুষের বৈশিষ্ট্য) ও বস্তুর মধ্যে তীক্ষ্ণ বিভেদ-চিহ্নিত দ্বৈতবাদী চরিত্র বিশেষ হল, নয়তো তা প্রকাশ্য-ভাবেই যান্ত্রিক হয়ে মানবজীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণরাশিকে অলীক প্রতিপন্ন করল। প্রথম ক্ষেত্রে, এই দর্শনটি মানসিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে কোনো কোনো পাঠ্যের বিশেষ অধিকারের দাবি মেনে নিয়েছে, এবং প্রকারান্তরে তাদের শ্রেষ্ঠতার দাবিই মেনে নিয়েছে, কারণ মানুষের, অন্ততঃপক্ষে তার নিজের কাছে, মানবিক বিষয়গুলোর মুখ্য গুরুত্ব মেনে নেওয়ারই ঝোঁক থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, এই দর্শনটি এমন একটি প্রতিক্রিয়া এনেছে, যা ভৌত বিজ্ঞানের মূল্যের উপর দ্বিধা ও সন্দেহ জাগিয়েছে, এবং বিজ্ঞানকে মানুষের উচ্চতর স্বার্থের শত্রু বলে গণ্য করার অবকাশ দিয়েছে।

গ্রীক ও মধ্যযুগীয় জ্ঞান, জগৎকে তার গুণগত বৈচিত্র্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল, এবং প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রণালীকে উদ্দেশ্যমূলক, বা কারিগরি ভাষায়,

পরমকারণমূলক বলে মনে করেছিল। নতুন বিজ্ঞানকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হল যে, তাতে বাস্তব বা বিষয়গত অস্তিত্বের সকল গুণের বাস্তবতাকেই অস্বীকার করা হ'ল। শব্দ, বর্ণ, উদ্দেশ্য এবং ভালোমন্দকেও বিশুদ্ধ আধ্যাত্ম-বাদীয়, অর্থাৎ শুধু মনের ধারণা বলে গণ্য করা হল। এ অবস্থায়, বিষয়মুখী অস্তিত্বকে গণ্য করা হল কেবল তার পরিমাণগত ধরন নিয়ে,—একটা বিরাট গতিশীল ভাররূপে। তার একমাত্র বিভিন্নতা এই যে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পুঞ্জীভূত ভার বেশী থাকে, আর কোনো কোনো জায়গায় অন্য জায়গার থেকে বেশী গতিবেগ থাকে। গুণগত পার্থক্যের অভাবে প্রকৃতির সার্থক বিচিত্রতা রইল না। জোর দেওয়া হতো একরূপতার উপরে, ভিন্নরূপতার উপরে নয়। মনে করা হতো যে, আদর্শ হল একটি মাত্র গাণিতিক সূত্র বের করা, যা নাকি একই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রয়োগ করা যাবে, এবং যার থেকে প্রতীত ব্যাপারের সকল প্রতীয়মান বৈচিত্র্যই উদ্ভূত হবে। এই হল যন্ত্রবাদী দর্শনের অর্থ।

এ রকমের কোনো দর্শন বিজ্ঞানের খাঁটি অর্থকে উপস্থাপিত করে না। এ দর্শন আসল জিনিসটির স্থানে তার কৌশলটি গ্রহণ করে; যন্ত্রপাতি ও পরিভাষাকে ধরে বাস্তবতা, আর তার পদ্ধতিকে গ্রহণ করে বিষয়বস্তুরূপে। বিজ্ঞান অবশ্যই সেই সব শর্তাবলীর মধ্যে তার বর্ণনাকে সীমিত রাখে, যা ঘটনাবলীর গুণকে উপেক্ষা করে ঘটনাবলীর সঙ্ঘটন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে ও তাদিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। এর থেকেই তার যান্ত্রিক ও পরিমাণগত গুণ আসে। কিন্তু ঘটনাবলীর গুণকে হিসাবের বাইরে রাখে বলে, বিজ্ঞান বাস্তবতা থেকে তা বাদ দেয় না, বা বিশুদ্ধ মনোরাজ্যেও তাকে নির্বাসিত করে না; উদ্দেশ্যের পক্ষে যা ব্যবহারযোগ্য বিজ্ঞান তারই উপায় যোগায়। প্রকৃতপক্ষে, যখন বিজ্ঞানের প্রগতি প্রকৃতির উপরে মানুষের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে যাচ্ছে, এবং এইভাবে তাঁর অভিপ্রেত উদ্দেশ্যকে পূর্বের যে কোনো কাল থেকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করতে, এবং তাঁর ক্রিয়া-কলাপকে প্রায় ইচ্ছামতোই বিচিত্র করতে সমর্থ হচ্ছে, তখন যে দর্শনটি বিজ্ঞানের প্রকৃতিকে সূত্রবদ্ধ করার অঙ্গীকার করেছিল, সেটি পৃথিবীকে স্থান-স্থানান্তরে পদার্থের সৃজন-শক্তিহীন ও একঘেয়ে পুনর্বণ্টনে পরিণত করল। এইভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের অব্যবহিত ফল দাঁড়াল, পদার্থ ও মনের

বিষয়কে জোরদার করা, এবং সেই অনুসারে জড়বাদী ও মানবতাবাদী পাঠ্যকে দুটো অসংলগ্ন শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করা। যেহেতু উত্তম ও অধমের পার্থক্য অভিজ্ঞতার "গুণাবলীর" সঙ্গে জড়িত, সেইহেতু বিজ্ঞানের যে কোনো দর্শন এই "গুণাবলীকে" বাস্তবতার খাঁটি আধেয় থেকে বাদ দেয়, সেই দর্শনই মানব জাতির কাছে যা কিছু সর্বাধিক আগ্রহদ্যোতক ও গুরুত্বপূর্ণ, তাকেও বাদ দেয়।

৩। বর্তমান শিক্ষাসমস্যা

প্রকৃতপক্ষে, অভিজ্ঞতা মানবিক বিষয় এবং বিশুদ্ধ যন্ত্রবৎ জড়জগতের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ জানে না। মানুষের বাসস্থান হল বহিঃ প্রকৃতি। তার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কার্য-কারিতা নির্ভর করে প্রাকৃতিক অবস্থা-নিচয়ের উপরে। এই অবস্থানিচয় থেকে তাকে পৃথক করলে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শূন্যগর্ভ স্বপ্ন ও স্থূল কল্পনার অলস প্রশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। মানব অভিজ্ঞতার দিক থেকে, অতএব শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার দিক থেকে, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে সঙ্গত পার্থক্য করা যেতে পারে, তা হ'ল আমাদের ব্যবহারিক লক্ষ্যগুলির গঠন ও তাদের কার্যকরী করতে যে শর্তাবলী গণ্য করতে হবে, তার সাথে এই লক্ষ্যগুলোর স্বরূপের পার্থক্য। জীবন-বিকাশ তত্ত্ব এই দর্শনেরই সাক্ষ্য দেয়,—দেখিয়ে দেয় যে, মানুষ বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গেই নিরবচ্ছিন্নরূপে চলমান, সে বার থেকে প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে ঢুকে পড়েনি। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি দেখিয়ে দেয় যে, সামাজিক প্রয়োগের স্বার্থে বস্তু নিয়ে কাজ করার ফলে যে সব ধারণা আসে, সেই সব ধারণা অনুযায়ী ভৌত শক্তিপুঞ্জকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা থেকেই জ্ঞান আসে। বিজ্ঞানের এই পদ্ধতিও উক্ত দর্শনকে বলবৎ করে। সমাজ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপ—ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বলিত বিদ্যা,—দেখিয়ে দেয় যে, সামাজিক প্রশ্নগুলোর সঙ্গে বুদ্ধিমানের মতো সেই [illegible] বোঝা যায় যে মাত্রায় আমরা তথ্য সংগ্রহ, অনুমান গঠন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের পন্থা অনুযায়ী, ঐ অনুমানকে কার্যতঃ পরীক্ষা করি, এবং যে মাত্রায় আমরা পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের

কারিগরি জ্ঞানকে সমাজ কল্যাণের উন্নতি বিধানকল্পে কাজে লাগাই। উন্মাদনা, অমিতাচার, দারিদ্র, জনস্বাস্থ্য, নগর পরিকল্পন, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ খর্ব না করে জন-কল্যাণমূলক সরকারী সংস্থাগুলোর গঠনমূলক সদ্ব্যবহার ইত্যাদি জটিল সমস্যাগুলির প্রতিবিধানের সকল উন্নততর পদ্ধতিগুলিই, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নানাবিধ পদ্ধতি ও ফলাফলের উপরে আমাদের সর্বপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংশ্লিষ্টতার সরাসরি নির্ভরশীলতার দৃষ্টান্ত দেয়।

মানবতাবাদী এবং প্রকৃতিবাদী উভয়বিধ পাঠ্য সম্বন্ধেই শিক্ষাব্যবস্থার উচিত কাজ হল, এই নিবিড় আন্তঃনির্ভরশীলতা থেকে শুরু করা। বিজ্ঞানকে [illegible]রূপে এবং সাহিত্যকে মানবিক স্বার্থবোধের লিপিরূপে পৃথক না রেখে, শিক্ষাব্যবস্থার উচিত কাজ হ'ল, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এবং ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্বলিত বিভিন্ন মানবিক বিষয়কে আড়া-আড়ি রেখে উভয়বিধ পাঠকেই সমৃদ্ধ করা। শিক্ষকতার দিক দিয়ে একদিকে কেবল কারিগরি বিজ্ঞপ্তি ও হাতের কাজের বিভিন্ন কারিগরি ধরন শিক্ষা দেওয়া, এবং অন্যদিকে কেবল মানবতাবাদী বিষয়গুলোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শিক্ষা দেওয়া থেকে, উক্ত সংযুক্ত পদ্ধতি শিক্ষণ-সমস্যাকে সহজ করে। কারণ ভাগাভাগি পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার মধ্যে কৃত্রিম ছেদ পত্তন করে। বিদ্যালয়ের বাইরে, শিক্ষার্থীরা মানুষের নানা ধরনের কাজকর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন ঘটনা ও নিয়মের সংশ্রবে আসে (পূর্বে দেখুন ৩য় অধ্যায়)। তারা যে সব সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে অংশ নিয়েছে, তাদিকে সে সব কাজের বিষয়-বস্তু ও ক্রিয়া-প্রণালী বুঝে নিতে হয়েছে। বিদ্যালয়ের পাঠ আরম্ভ করার সময়, এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ যদি ছিন্ন হয়, তা হলে মানসিক বিকাশের নিরবচ্ছিন্নতাও ছিন্ন হয়; এবং এই অবস্থাটি বিদ্যার্থীকে তাঁর পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে একটা বর্ণনাতীত অবাস্তবতা অনুভব করার এবং তাঁকে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্বাভাবিক প্রেরণা থেকে বঞ্চিত করে।

অবশ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এমন হওয়া উচিত, যাতে, যাদের বিজ্ঞানে সুবিশিষ্ট যোগ্যতালাভে অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা আছে, এবং সেই অনুযায়ী যারা জীবনের বিশিষ্ট বৃত্তিরূপে বিজ্ঞানের অনুশীলনে ব্রতী হবেন, তাঁদের সকলেই যেন তার জন্য সুযোগ-সুবিধা পায়।

কিন্তু বর্তমানে খুব বেশীর ভাগেই শিক্ষার্থীকে কেবল এই দুটোর মধ্যেই বেছে নিতে হয় যে,—হয় তাকে আগেকার বৈশিষ্ট্যসূচক কাজের ফলাফলের পাঠ নিয়ে শুরু করতে হবে, যার মধ্যে পাঠ্য বিষয়-বস্তু শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে,—নয়তো তাকে আরম্ভ করতে হবে পাঁচ-মিশেলী প্রকৃতি পাঠ নিয়ে, যার বিষয়-বস্তু এমন আকস্মিকভাবে উপস্থাপিত করা হয় যে, তা বিশেষ কোনো দিকেই পরিচালিত করে না। যে লোকটি কোনো বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছা রাখেন তার উপযোগী বিষয়-বস্তুকে পরস্পর যোগশূন্য বৈজ্ঞানিক বিষয়-বস্তু করে কলেজের শিক্ষার্থীদের শেখানোর রীতি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যের মধ্যে টেনে আনা হয়। সেখানে শিক্ষার্থীরা এই বিষয়-বস্তুরই প্রাথমিক শিক্ষা পায় এবং তার মধ্যের কঠিন অংশ পালিশ করে নিয়ে আলোচ্য বিষয়কে তাঁদের আনুমানিক যোগ্যতার স্তরে পরিণত করা হয়। কোনো দ্বৈতবাদী দর্শনের প্রতি সংজ্ঞাস্ত আনুগত্যের কারণে এমনটা করা হয় না; সেটা করা হয় ঐতিহ্যের অনুকরণ করে। কিন্তু তার ফল একই হয়; যেন তার উদ্দেশ্য থাকে এই ধারণাটি করানো যে, বিজ্ঞান, যা প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে তার সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। কারিগরিরূপে সংগঠিত বিষয়-বস্তু নিয়ে আরম্ভ করলে যে যোগশূন্যতা অনিবার্য হয় যারা কখনো বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ হবেন না, তাদিকে বিজ্ঞান শেখানোর অপেক্ষাকৃত নিষ্ফলতার একটা বড়ো অংশ তারই ফল। এমন কি, যদি সকল বিদ্যার্থীই উদীয়মান বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ হতেন, তা হলেও এই পদ্ধতিটি সর্বাধিক ফলপ্রসূ হতো কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। যদি বিবেচনা করে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ বিদ্যার্থীই বিজ্ঞান পাঠ্যের মাধ্যমে তাঁদের মানসিক অভ্যাসের উপর যে ফল দাঁড়ায় তার সাথে সংশ্লিষ্ট,—যেমন, তাদিকে বেশী সতর্ক করার, সংস্কার-মুক্ত করার, সাময়িক-ভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত করার, বিশদভাবে বর্ণিত বা প্রস্তাবিত ধারণা-গুলোকে পরীক্ষা করে দেখার, এবং তাদের নিত্যকার পরিবেশকে ভালো করে বোঝবার ইত্যাদি,—তা হ'লে ঐ পদ্ধতিটি নিশ্চিতরূপেই অযৌক্তিকর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থী একটা ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিয়ে বেরিয়ে আসে এবং সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক হিসাবে অত্যন্ত অগভীর এবং দৈনন্দিন প্রয়োগে অত্যধিক সূক্ষ্ম।

বৈজ্ঞানিক বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতিকে সুপরিচিত মানবিক স্বার্থের যোগসূত্রে রেখে এই বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতির অগ্রগতি সাধনের জন্য সাধারণ অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করা পূর্বের যে কোনো কালের থেকে আজকের দিনে সহজতর। সভ্য সমাজের সকল লোকের সাধারণ অভিজ্ঞতাই আজকাল শ্রমশিল্পের ক্রিয়া-প্রণালী ও ফলাফলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এগুলি আবার ফলিত বিজ্ঞানেরও বিভিন্ন ক্ষেত্র। গতিহীন ও গতিশীল বাষ্পচালিত ইন্‌জিন্, গ্যাসোলিন চালিত ইঞ্জিন, মোটরগাড়ী, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ইলেকট্রিক মোটর ইত্যাদি জিনিস অধিকাংশ লোকের জীবনধারার মধ্যেই সরাসরি প্রবেশ করেছে। শিক্ষার্থীরা অল্প বয়সেই এগুলোর সাথে ব্যবহারিক পরিচিতি লাভ করে। কেবল তাঁদের পিতামাতার পেশাদারী বৃত্তিই বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের উপর নির্ভর করে না; পরন্তু গৃহস্থালীর কাজ, জনস্বাস্থ্যের কাজ, রাস্তার নানাবিধ দৃশ্যও বিজ্ঞানের কৃতিকে মূর্ত করে, এবং সংলগ্ন বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রতি আগ্রহকে উদ্দীপিত করে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষকতার যাত্রা শুরু করার সহজ স্থান, বিজ্ঞান লেবেলধারী বৈজ্ঞানিক বিষয় শেখানো নয়, পরন্তু তা হ'ল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকে নির্দেশিত করার জন্য সুপরিচিত বৃত্তি ও প্রয়োগ কৌশলগুলির ততোদিন পর্যন্ত সদ্ব্যবহার করা যতোদিন না শিক্ষার্থীরা সুপরিচিত ব্যবহারিক প্রয়োগের সূত্রে কতক কতক মূল নিয়ম বুঝে নিয়ে এই সব নিয়মের কিছু কিছু জ্ঞান আয়ত্ত করে।

সময় সময় এই অভিমতও দেওয়া হয় যে, বিজ্ঞানের বিমূর্ত তত্ত্বের পরিবর্তে, সক্রিয় মূর্তিতে বিজ্ঞান পাঠ করলে বিজ্ঞানের "বিশুদ্ধতার" অবমূল্যায়ন করা হয়। এ অভিমত একটা ভ্রান্ত ধারণার উপর স্থাপিত। প্রকৃত অবস্থা এই যে, যে কোনো পাঠ্য বিষয়ই সেই পরিমাণে কৃষ্টিসম্পন্ন, যে পরিমাণে বিষয়টিকে তার ব্যাপকতম তাৎপর্য দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অর্থবোধের উপলব্ধি নির্ভর করে, বিভিন্ন যোগসূত্র ও প্রসঙ্গের উপলব্ধির উপরে। বৈজ্ঞানিক তথ্য তার মানবিক এবং ভৌত ও কারিগরি প্রসঙ্গে দেখার অর্থ দাঁড়ায় তার তাৎপর্য বৃদ্ধি এবং তাকে বর্ধিত কৃষ্টিশীল মূল্য দেওয়া। তার অর্থনৈতিক প্রয়োগ—যদি অর্থনৈতিক শব্দটিকে টাকার অঙ্কে যার মূল্য আছে তাই বলা হয়—আনুষঙ্গিক ও পরোক্ষ; কিন্তু তাও তার আসল

যোগসূত্রাদির অংশ। গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই যে, বিষয়টিকে তার সামাজিক যোগসূত্রগুলির সম্পর্কে—জীবনের ক্ষেত্রে তার করণীয় কর্মের সম্পর্কে—বুঝতে হবে।

পক্ষান্তরে, "মানবতাবাদের" গোড়ার অর্থ হ'ল, মানবিক স্বার্থবোধের বুদ্ধিগম্য চেতনাদ্বারা অনুরঞ্জিত হওয়া। সামাজিক স্বার্থবোধ, যা তার গভীরতম অর্থে নৈতিক স্বার্থবোধের সঙ্গে একাত্ম, তা অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের সর্বাধিনায়ক। মানুষের "সম্বন্ধে" জ্ঞান,—তাঁর অতীতের সংবাদ, তাঁর লিপিবদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে ঘন পরিচিতি,—ভৌতিক বিবরণ সঞ্চয়ের মতোই কোনো কারিগরি পুঁজি হতে পারে। মানুষ নানা রকমের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে, যেমন, অর্থোৎপাদন, শ্রমশালায় দক্ষতা অর্জন, ভাষাবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যের ভাণ্ডারকে স্তূপাকার করা, বা সাহিত্যিক উৎ-পাদনের কালক্রম নিরূপণ। কিন্তু এই ধরনের কাজ যদি কল্পনামূলক জীবন-দর্শনকে পরিবর্ধিত করার স্বার্থে কাজ না করে, তা হলে তা শিশুদের কর্মব্যস্ততার স্তরেই থেকে যায়। এ রকম কাজের বর্ণ আছে, প্রাণ নেই। এ কাজ সহজেই কৃপণের পুঁজির মতো মর্যাদা হারায় এবং ব্যক্তি তাঁর যা আছে তা নিয়েই গর্ববোধ করে, জীবনের হেরফেরের মধ্যে যে তাৎপর্য দেখে তাতে গর্ববোধ করে না। যে কোনো শিক্ষাই যদি এমনভাবে অনুধাবন করা হয়, যাতে তা জীবনের মূল্যবোধের সহিত সংশ্লিষ্টতাকে বৃদ্ধি করে, সমাজ-কল্যাণের প্রতি অধিকতর সুবেদিতা সৃষ্টি করে, এবং সেই কল্যাণের উন্নতিবিধান করার ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতা আনে, তাহলে তাই হবে মানবিক পাঠ।

গ্রীকদের মানবতাবাদী ভাবধারা ছিল দেশজ এবং ঐকান্তিক, কিন্তু তার বিস্তার ছিল সংকীর্ণ। গ্রীক পরিধির বাইরে সকলেই ছিল বর্বর, এবং সম্ভাব্য শত্রু হিসাবে ছাড়া উপেক্ষনীয়। গ্রীক মনীষীদের সামাজিক পর্যবেক্ষণ ও জল্পনার ধারা তীক্ষ্ণ থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের লেখার মধ্যে এমন কোনো শব্দ নেই যাতে বোঝা যায় যে, গ্রীক্ সভ্যতা আত্ম-অবরুদ্ধ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। তাঁদের সভ্যতা যে তাঁদের ঘৃণিত বিদেশীর দয়ার অধীন, তাদের মনে সে রকমের কোনো সন্দেহ ছিল বলে মনে হয় না। গ্রীক সম্প্র-দায়ের ঐকান্তিক সামাজিক ভাবধারা, এই ধারণা দিয়ে সীমিত ছিল যে

উচ্চতর কৃষ্টি কোনো দাসত্ব ও অর্থনৈতিক বেগার শ্রেণী-সম্বলিত অধস্তন স্তরের উপর স্থাপিত ; এই সব শ্রেণী রাষ্ট্রের স্থিতির জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু তবুও. এ্যারিস্টোটেল যেমন বলেছেন. তাঁরা রাষ্ট্রের কোনো আসল অংশ নয়। বিজ্ঞানের প্রসার শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন বিপ্লব এনেছে এবং তার ফলে বিভিন্ন জনসমাজ, উপনিবেশ ও বাণিজ্যের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে এত নিবিড় সংযোগে এসেছে যে, কোনো কোনো জাতি এখনও অন্যান্য জাতিকে যতো অবজ্ঞার চোখেই দেখুন না কেন, কোনো দেশই এখন আর এমন অলীক ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, তাঁদের জীবনধারা পুরোপুরি তাদের মধ্যেই ধার্য হয়। এই বিপ্লবই চাষী-বেগার প্রথা লোপ করেছে; এবং একটি কম-বেশী সংগঠিত কারখানা-মজদুর শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। এদের রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে, এবং এরা উৎপাদনশিল্পে কোনো দায়িত্ব-শীল অংশ নেওয়ারও দাবি রাখে ; এই দাবি বহু ধনী লোকদের সমবেদিতাপূর্ণ মনোযোগও আকর্ষণ করেছে। কারণ শ্রেণীগত প্রতিবন্ধক লোপ পাওয়ার ফলে তাঁরা কম-ভাগ্যবান শ্রেণীদের নিকটতর সংযোগে এসেছে।

এই অবস্থাকে এই বলে সূত্রবদ্ধ করা যায় যে, প্রাচীন মানবতাবাদ তার এলাকা থেকে অর্থনীতিক ও শিল্পভিত্তিক শর্তগুলিকে বাদ দিয়েছিল। কাজেই তা একচোখো ছিল। এই অবস্থায়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যে শ্রেণীর খাস দখলে ছিল, কৃষ্টি অবশ্যম্ভাবীরূপে তাঁদেরই বুদ্ধিগত ও নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গীকে উপস্থাপিত করত। কৃষ্টির এ রকমের ঐতিহ্য আভিজাত্যপূর্ণ (পূর্বে দেখুন, ৩৪০ পৃঃ); এ জাতীয় কৃষ্টি মৌলিক যৌথ স্বার্থবোধের উপর জোর না দিয়ে জোর দেয় তার উপরে, যা এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীকে ভিন্নরূপে চিহ্নিত করে। এই কৃষ্টির মানদণ্ড রয়েছে অতীত কালে ; কারণ তার উদ্দেশ্য হল, যা লাভ করা হয়েছে তাকে সংরক্ষিত করা, কৃষ্টির পাল্লাকে বিস্তারিতরূপে সম্প্রসারণ করা নয়।

শ্রমশিল্প এবং জীবিকার সঙ্গে যা কিছু যুক্ত, তা বেশী করে হিসাবে ধরার ফলে যে সব পরিবর্তনের উদ্ভব হয়, তাকে সচরাচর অতীত কাল থেকে পাওয়া কৃষ্টির উপরে আক্রমণ বলে নিন্দা করা হয়। কিন্তু শিক্ষার কোনো প্রশস্ততর দৃষ্টিভঙ্গী শ্রমশিল্পভিত্তিক ক্রিয়া-কলাপকে ধারণা করে নেবে বুদ্ধিগম্য সম্পত্তি-গুলোকে জনসাধারণের কাছে সহজগম্য করার সম্বটকরূপে, এবং যাঁদের

উত্তম সঙ্গতি আছে তাঁদের কৃষ্টিকে অধিকতর দৃঢ় করার জন্যে। সংক্ষেপে, যখন আমরা একদিকে বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পের বিকাশের মধ্যে, এবং অন্যদিকে সাহিত্যিক ও সৌন্দর্যবোধীয় কর্ষণ ও অভিজাত সামাজিক সংগঠনের মধ্যে, নিকট সম্বন্ধ বিবেচনা করি, তখন আমরা কারিগরি বৈজ্ঞানিক পাঠ্য এবং পরিমার্জনামূলক সাহিত্যিক পাঠ্যের মধ্যে বিরোধিতা বুঝতে পারি। যদি সমাজকে সত্য সত্যই গণতান্ত্রিক হতে হয়, তা হলে আমাদের সম্মুখে শিক্ষার এই ছেদ-ভেদ নিরসন করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

সারাংশ

মানুষ ও ভৌত প্রকৃতির মধ্যে যে দার্শনিক দ্বৈতবাদ গড়ে উঠেছে তা প্রকৃতিবাদী ও মানবতাবাদী পাঠ্যের মধ্যে বিচ্ছেদে প্রতিফলিত হয়ে থাকে এবং তার সঙ্গে শেষোক্ত পাঠ্যকে অতীত কালের সাহিত্যিক লিপির পাঠে পরিণত করার প্রবণতা থাকে। এই দ্বৈতবাদ (অন্য যেগুলো দেখানো হয়েছে তার মতো) গ্রীক চিন্তনের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়। তা আংশিক ভাবে এই কারণে উদ্ভূত হয়েছিল যে, রোমক ও বর্বর ইউরোপের সভ্যতা তাদের দেশজ সৃষ্টি ছিল না; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তা ছিল গ্রীস থেকে ধার করা। অন্য আংশিক কারণ এই যে, অতীতের যে জ্ঞান সাহিত্যিক লিপির মধ্যে প্রবেশ করেছিল, রাষ্ট্রীয় ও যাজকীয় ব্যবস্থা সেই জ্ঞানের অনুশাসনের উপর নির্ভরতার প্রতি জোর দিত।

আধুনিক জ্ঞানের উদ্ভব তার শুরুতেই ভৌত প্রকৃতি ও মানুষের ঘনিষ্ঠ সংযোগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পূর্বাভাষ দিয়েছিল। কারণ তা ভৌতপ্রকৃতির জ্ঞানকে মানবকুলের প্রগতি ও কল্যাণসাধনের উপায়রূপে অনুমান করেছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের অব্যবহিত প্রয়োগ জনস্বার্থে নিয়োজিত না হয়ে বরং কোনো এক বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে নিয়োজিত হয়েছিল; এবং বৈজ্ঞানিক সূত্রায়ণ-লব্ধ দার্শনিক সূত্রগুলি বিজ্ঞানকে, হয় আধ্যাত্মিক ও অভৌতিক সত্তারূপী মনুষ্য থেকে পৃথক কোনো জড়বাদী বিষয়রূপে চিহ্নিত করেছিল, নয়তো মনকে একটি আধ্যাত্ম্য মায়ায় রূপান্তরিত করেছিল। এই ভাবে শিক্ষায় বিজ্ঞান-গুলিকে জড়জগৎ সম্বন্ধীয় কারিগরি সংবাদ সম্বলিত একটি পৃথক পাঠক্রম-

রূপে গণ্য করার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। আর পুরাতন সাহিত্যিক পাঠ্যকে সংরক্ষিত করা হয়েছিল কোনো বিশিষ্ট মানবতাবাদী পাঠ্যরূপে। ইতিপূর্বে আমরা জ্ঞানের অভিব্যক্তি এবং তৎভিত্তিক পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে যে শিক্ষা-প্রকল্পের বর্ণনা দিয়েছি, তা, এই বিচ্ছেদ রোধ করার জন্য এবং মানুষের ব্যাপারে প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলি যে স্থান অধিকার করে তার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত হয়েছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ব্যক্তি ও জগৎ

১। মনের অবিমিশ্র ব্যক্তিগত রূপ

যে সমস্ত প্রভাব, জ্ঞান ও কর্ম, শ্রম ও বিশ্রাম, মানুষ ও ভৌত প্রকৃতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, আমরা এতক্ষণ তা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলাম। এদের প্রভাবে, শিক্ষার বিষয়-বস্তু ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যে বিভক্ত হয়েছে। এগুলি নানাবিধ দর্শনেও সূত্রবদ্ধ হয়েছে, এবং তারা শরীর ও মন, তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক বৃত্তি, ভৌত যন্ত্রকৌশল ও আদর্শ উদ্দেশ্যের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা এনেছে। দার্শনিক দিক থেকে, এই সব নানাবিধ দ্বৈতবাদ, প্রথমে পৃথিবী থেকে ব্যক্তিগত মনকে, এবং পরে একটি মনকে আর একটি মন থেকে একটা তীক্ষ্ণ সীমারেখায় চিহ্নিত করেছে। যদিও পূর্বের তিনটি অধ্যায়ে যে সব কথা বিবেচনা করা হয়েছে তার সাথে শিক্ষার কার্যক্রমের সম্পর্ক যতোটা সুস্পষ্ট, এই দার্শনিক অবস্থার সাথে তা ততোটা সুস্পষ্ট নয়, তবুও কয়েকটি শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবেচনা এই দার্শনিক অবস্থার অনুরূপ। যেমন বিষয়-বস্তু (জগতের প্রতিরূপ) এবং পদ্ধতির (মনের প্রতিরূপ) মধ্যে যে বিরোধাভাস আছে বলে ধরে নেয়া হয় সেটি, এবং পাঠ্য বিষয়-বস্তুর সঙ্গে যৌগিক সংযোগ বাদ দিয়ে, স্বার্থবোধকে অবিমিশ্র ব্যক্তিগত কোনো কিছু বলে মনে করার ঝোঁক ইত্যাদি। আনুষঙ্গিক শিক্ষাসংশ্লিষ্টতা ছাড়াও, এই অধ্যায়ে দেখানো হবে যে, মন ও জগৎ সম্বলিত দ্বৈতবাদী দর্শন, একদিকে জ্ঞান ও সামাজিক স্বার্থবোধের মধ্যে, এবং অন্যদিকে ব্যক্তিতা বা স্বাধীনতা, এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসনের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার সংশ্লেষ এনেছে।

মনকে প্রাতিস্বিক আত্মন্'এর সঙ্গে একাত্ম করা এবং আত্মন্‌কে কোনো মনোচেতনার সঙ্গে একাত্ম করা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। গ্রীকদের এবং মধ্যযুগের বিধান ছিল, ব্যক্তিকে এমন কোনো একটি খাত বলে মনে করা

যার মধ্যে দিয়ে এক সর্বাত্মক ও ঐশী শক্তি প্রবহমান রয়েছে। কোনো প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তি জ্ঞাতা ছিলেন না; জ্ঞাতা ছিলেন "বুদ্ধি" বা হেতু বা যুক্তি, এবং তিনি ব্যক্তির মাধ্যমে কাজ করতেন। ব্যক্তির পক্ষে মনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা মানেই হল তার নিজেরই বিপদ ডেকে আনা,—কেবল সত্যেরই হানি করা। যে মাত্রায় বুদ্ধির (যুক্তির, হেতুর) পরিবর্তে ব্যক্তি নিজে 'জ্ঞাত হতেন' সেই মাত্রাতেই প্রকৃত জ্ঞানের স্থানে, অস্মিতা, ভ্রম ও অভিমত প্রতিস্থাপিত হতো। গ্রীক জীবনে পর্যবেক্ষণ ছিল সূক্ষ্ম ও সাবধানী এবং চিন্তন এত বন্ধনমুক্ত ছিল যে, তা প্রায় দায়িত্বহীন জল্পনা-কল্পনায় পৌঁছতো। কাজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতির অভাবে যেরূপ ঘটে থাকে, তাদের তত্ত্বের পরিণতিও সেই রকম হতো। কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি ছাড়া লোকে অবগতির কাজে নিযুক্ত হতে, এবং অন্যান্যের জিজ্ঞাসার ফলাফল দ্বারা পরীক্ষিত হতে পারে না। অন্যান্যের হাতে পরীক্ষিত হওয়ার দায় ছাড়া মানুষের মন বুদ্ধিগম্যরূপে দায়িত্বশীল হতে পারে না; সে ক্ষেত্রে ফলাফল গ্রাহ্য হয়, সৌন্দর্যবোধীয় সামঞ্জস্য, পছন্দসই গুণ, বা তার কর্তাদের পদমর্যাদার কারণে। বর্বর যুগে সত্যের প্রতি মানুষের আরও বেশী বিনম্র মনোভাব ছিল। ধরে নেয়া হতো যে, গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান দৈবসূত্রে ব্যক্ত হয়, এবং কর্তৃত্বসূত্রে তা পাওয়ার পরে সেই অনুসারে কাজ করা ছাড়া, মনের দিক দিয়ে মানুষের আর কিছুই করার থাকে না। এই সমস্ত আন্দোলনের অধিকতর সচেতন দার্শনিক গুণ বাদ দিলে দেখা যায় যে, যেখানেই রীতির মাধ্যমে বিশ্বাস হস্তান্তরিত হয়, সেখানেই মন ও প্রাতিস্বিক আত্মনকে চেনবার কথা কখনো কারও মনেও আসে না।

মধ্যযুগে একটি ধর্মান্বিত ব্যক্তিত্ববাদ ছিল। প্রাতিস্বিক আত্মার উদ্ধারই ছিল জীবনের গভীরতম উদ্বেগ। মধ্যযুগের শেষভাগে, এই প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিতা-বাদ সংজ্ঞাবাদীয় দর্শনগুলির মধ্যে একটা সংজ্ঞাত সূত্রায়ণ পেল। এই দর্শনগুলি জ্ঞানের গড়নকে এমন কিছু বলে মনে করত, যা ব্যক্তির নিজের ক্রিয়াকর্ম ও মানসিক অবস্থাদির দ্বারা নিজের মধ্যেই গড়ে ওঠে। ষোড়শ শতকের পরে, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যক্তিতাবাদ দেখা দেওয়ায়, এবং প্রতিবাদী ধর্মবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির পক্ষে নিজে নিজেই জ্ঞানান্বেষণের দাবি ও দায়িত্বের উপর জোর দেওয়ার কাল পূর্ণ হল। তার

থেকে এই মতের উদ্ভব হল যে, জ্ঞান ব্যক্তিগত ও প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সম্পূর্ণরূপে আসে। তারই পরিণতিরূপে মন,—জ্ঞানের উৎস ও আধেয়,—পুরোপুরি প্রাতিস্বিক বলে বিবেচিত হল। এইভাবে শিক্ষার দিক থেকে দেখা গেল যে, মন্টেগনে, বেকন, লক্ প্রমুখ শিক্ষা সংস্কারকগণ জনশ্রুতিলব্ধ সকল জ্ঞানকে প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করছেন, এবং জোরের সহিত বলছেন যে, যদিও বা বিভিন্ন বিশ্বাস সত্য হয়, তা হলেও, ওগুলি যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে না জন্ম নেয় এবং তা দিয়ে পরীক্ষিত না হয়, তা হলে তারা জ্ঞান গঠন করে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, এবং বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও, কর্মে ও জিজ্ঞাসায় স্বাধীনতার জন্য তীব্র সংগ্রাম, ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও ধারণাদির উপর এত বেশী জোর আনল যে, মনকেই পৃথক করা হল, এবং যে জগৎটাকে জানতে হবে তার থেকে তাকে আলাদা রাখা হ'ল।

দর্শনের যে শাখা জ্ঞানতত্ত্ব,—অর্থাৎ জ্ঞানের তাত্ত্বিক রূপ—তার মহান বিকাশের মধ্যে, মনের এই পৃথকীকরণ প্রতিফলিত হয়। আত্মন-এর সঙ্গে মনের এই একীকরণ, এবং আত্মন্‌কে একটা কিছু স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে তুলে ধরা, জ্ঞাতা মন, এবং জগতের মধ্যে এমন একটি ব্যবধান সৃষ্টি করল যে, কি করে যে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হতে পারে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠল। যদি আত্মন্—জ্ঞাতা,—এবং বিষয়—জ্ঞাতব্য বস্তু,—এদের পারস্পরিকভাবে সম্পূর্ণ পৃথক বলে ধরা হয়, তা হলে এমন একটি তত্ত্ব গঠন করা আবশ্যিক হয়ে ওঠে যা, তা দিয়ে, কি করে জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়, এবং বৈধ জ্ঞান আসে সেটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। এই সমস্যাটি এবং মনের উপরে জগতের ও জগতের উপরে মনের সম্ভাব্য ক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্যাটি দার্শনিক চিন্তার প্রায় সর্বগ্রাসী জল্পনা হয়ে দাঁড়াল। জগৎটা আসলে যে কি, আমরা তা জানতে পারি না, মাত্র মনের উপরে তার যে ছাপ পড়ে, সেটাই জানতে পারি। কিম্বা, প্রাতিস্বিক মনের বাইরে কোনো জগৎ নেই; কিম্বা জ্ঞান কেবল মনের নিজ অবস্থান্তরেরই এক প্রকারের অনুষঙ্গ ইত্যাদি তত্ত্বগুলি এই জল্পনারই ফল। আমরা এদের সত্যতার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নই। কিন্তু এই সমস্ত বেপরোয়া মীমাংসা যেরূপ ব্যাপক-ভাবে গৃহীত হয়েছিল, তা মনকে যে কি পরিমাণে বাস্তব জগতের উপর

চালানো হয়েছিল, তারই সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন সংজ্ঞাত অবস্থা ও ক্রিয়া-প্রণালী সম্বলিত, এবং প্রকৃতি ও সমাজ থেকে স্বতন্ত্র, এমন একটি অন্তর্জগৎ আছে যা অন্য সব কিছু থেকে অধিকতর বাস্তব ও অব্যবহিতরূপে জ্ঞাত,—এরূপ ধারণা করার ফলে মনের প্রতিশব্দরূপে "চেতনা" শব্দটির ক্রমবর্ধনশীল প্রয়োগ ঐ এক কথারই সাক্ষ্য দেয়। অল্প কথায়, ব্যবহারিক ব্যক্তিবাদকে, যা কর্মক্ষেত্রে চিন্তনের অধিকতর স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামকে, দার্শনিক আধ্যাত্মবাদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

২। পুনর্গঠনের সংঘটকরূপে প্রাতিস্বিক মন

স্পষ্টই দেখা যাবে যে, এই দার্শনিক আন্দোলন, ব্যবহারিক আন্দোলনের তাৎপর্যকে ভুল বুঝেছিল। এটি তার প্রতিকৃতি হওয়ার পরিবর্তে হল তার বিকৃতি বিশেষ। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ ভৌত-প্রকৃতির সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ থেকে মুক্তি লাভের যুক্তিহীন চেষ্টায় নিযুক্ত হয়নি। তারা প্রকৃতি ও সমাজের "মধ্যে" অধিকতর স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করছিল। তারা বস্তু ও মানব সম্বলিত জগতের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করার জন্য অধিকতর ক্ষমতা চেয়েছিল; চেয়েছিল গতিবিধির বৃহত্তর পরিধি। এবং কাজেই এই গতিবিধি যে সব পর্যবেক্ষণ ও ধারণাদিকে সূচিত করে তাতে অধিকতর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। তারা জগৎ থেকে পৃথক হতে চায়নি, চেয়েছিল তার সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগ। তারা ঐতিহ্যের মাধ্যমের পরিবর্তে নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে তাদের বিশ্বাস গঠন করতে চেয়েছিল। তারা তাদের সহযাত্রীদের সঙ্গে নিকটতর মিলন চেয়েছিল, যাতে তারা পরস্পরকে অধিকতর সফলতা সহকারে প্রভাবান্বিত করতে পারে, এবং পারস্পরিক উদ্দেশ্যের স্বার্থে তাদের নিজ নিজ কর্মধারাকে একত্রিত করতে পারে।

বিভিন্ন বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের মনে হয়েছিল যে, জ্ঞানের নামে যা চলছে, তা বহুল পরিমাণে কেবল অতীতের পুঞ্জীভূত অভিমত। এর অনেকগুলিই যুক্তিহীন, আর যে সব অংশ শুদ্ধ, তাও অনুশাসনের চাপে গৃহীত হয় বলে বোধগম্য হয় না। মানুষদের নিজেদেরই পর্যবেক্ষণ করতে হবে; নিজেদেরই

তত্ত্ব গঠন করতে হবে, এবং ব্যক্তিগতভাবে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই পদ্ধতিই হল, ধর্মবাদকে সত্য বলে চাপানোর একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা। সত্যের নামে চাপানোর ব্যবস্থা মনকে সত্যের প্রতি যৌন সম্মতির বিধিবদ্ধ ক্রিয়াতে সীমিত করে। যাকে সময় সময় অবগতির অবরোহী পদ্ধতির স্থানে আরোহী পদ্ধতির প্রবর্তন বলা হয়, এটাই হল তার অর্থ। এক অর্থে, মানুষ তার অব্যবহিত ব্যবহারিক দায়দায়িত্ব নিয়ে কাজ কারবারের ক্ষেত্রে সব সময়েই কোনো না কোনো আরোহী প্রথা প্রয়োগ করে আসছে। স্থাপত্যবিদ্যা, কৃষি, শ্রমশিল্পীয় উৎপাদন ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক বস্তুর ক্রিয়া-বিক্রিয়ার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই রাখতে হতো, এবং সংশ্লিষ্ট ধারণাদিকে ফলাফল দিয়েই কিছু পরিমাণে পরীক্ষা করে দেখতে হতো। কিন্তু এমন কি, এ সব ক্ষেত্রেও শুধু রীতির উপরেই অসঙ্গত রকম আস্থা রাখা হতো; এবং বুঝেসুঝে কাজ না করে বরং একটা অন্ধ রীতির অনুসৃতিই চলতো। এই পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ পদ্ধতিকে কেবল "ব্যবহারিক" বিষয়ের মধ্যেই সীমিত রেখে, ব্যবহারিক বৃত্তি এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান বা সত্যের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ প্রভেদ রাখা হতো (বিংশ অধ্যায় দেখুন)। স্বতন্ত্র নগরগুলির উদ্ভব, পর্যটনের বিকাশ, উদ্‌ঘাটন, ব্যাপক পণ্য-বিনিময়, পণ্যোৎপাদনের ও ব্যবসায়ের নতুন পদ্ধতির উদ্ভব মানুষকে নিশ্চিতরূপেই তাঁদের নিজেদের সঙ্গতির উপরই দাঁড় করাল। গ্যালিলিও, ডিকার্টে প্রমুখ বৈজ্ঞানিক সংস্কারকগণ এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীরা ভৌত প্রকৃতির তথ্যাবলীকে বোঝাবার জন্য সদৃশ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। ফলে, আবিষ্কারের আগ্রহ, পাওয়া বিশ্বাসগুলিকে সূত্রবদ্ধ ও "প্রমাণিত" করার আগ্রহের স্থানটিকে দখল করল।

এই সব আন্দোলনের কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যা, প্রকৃতপক্ষেই জ্ঞানলাভ করা এবং বিশ্বাসগুলিকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে দেখার দাবি ও দায়িত্বের উপর গুরুত্ব দিত,—তা যে কোনো অনুশাসকমণ্ডলীই তার প্রমাণ যুগিয়ে থাকুন না কেন। কিন্তু তাতে তা ব্যক্তিকে জগৎ থেকে, এবং কাজেই তাত্ত্বিকরূপে, এক ব্যক্তিকে আর এক ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করত না। তাতে এই উপলব্ধি আসত যে, এরূপ ছিন্নসূত্র, নিরবচ্ছিন্নতার ভাঙন, আগে থেকেই তাদের প্রচেষ্টার সফলতার সম্ভাবনাকে অস্বীকার্য করেছে। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি লোকই কোনো না কোনো সামাজিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছে এবং

চিরকালই তা হতেই হবে। কেবল এই সহজ কারণ বশতঃই তাঁর বিভিন্ন সাড়া বোধবুদ্ধিসম্পন্ন হতে থাকে, বা এমন একটা অর্থলাভ করতে থাকে যে, তাতে সে একটি স্বীকৃত অর্থবোধ ও মূল্যবোধের বাতাবরণে বাস করে, এবং কাজ করে। (পূর্বে দেখুন, ৩য় অধ্যায়)। সামাজিক আদান-প্রদানে, এবং নানারূপ বিশ্বাস সম্বলিত ক্রিয়া-কলাপে অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে সে ক্রমে ক্রমে একটি নিজস্ব মনকে আয়ত্ত করে। মনকে আত্মন-এর কোনো বিশুদ্ধ বিচ্ছিন্ন সম্পত্তি বলে গণ্য করার ধারণাটি সত্যের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। যে মাত্রায় তাঁর চারপাশের জীবন-ধারার মধ্যে বস্তু ও বিষয়ের জ্ঞান মূর্ত, আত্মন সেই মাত্রাতেই মন "অর্জন" করে।[৫] নিজে নিজেই নতুন করে জ্ঞান নির্মাণ করতে থাকে,—আত্মন এ রকমের কোনো একটা পৃথক মন নয়।

তথাপি, যে জ্ঞান বিষয়মুখী ও নৈর্ব্যক্তিক, এবং যে চিন্তন অন্তর্মুখী ও ব্যক্তিগত তার মধ্যে বৈধ পার্থক্য থাকে। এক অর্থে জ্ঞান হ'ল তাই, যা আমরা বিনা বিচারে মেনে নেই। যা স্থিরীকৃত, মীমাংসিত, প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছে, তাই হ'ল জ্ঞান। আমরা যা কিছু সম্পূর্ণরূপে জানি, তার সম্বন্ধে চিন্তা করার দরকার হয় না। চলিত কথায় তা নিশ্চিত, সন্দেহাতীত। এর অর্থ কেবল নিশ্চয়তাবোধ নয়। তা কোনো ভাবরস সূচিত করে না, —সূচিত করে ব্যবহারিক ভঙ্গী, সঙ্কোচ বা ওজর ছাড়া কাজে রাজী হওয়া। অবশ্য আমাদের ভুল হতে পারে। এক সময়ে যাকে জ্ঞান বলে,—তথ্য ও সত্য বলে,—ধরা হয় সেটি তা নাও হতে পারে। কিন্তু যা কিছুই বিনা প্রশ্নে ধরে নেওয়া হয়, পরস্পরের সঙ্গে ও প্রকৃতির সঙ্গে আদান-প্রদানের মধ্যে স্বীকার করে নেওয়া হয়, সেই সময়টিতে তাকেই জ্ঞান "বলা হয়"। বিপরীত পক্ষে, আমরা দেখেছি যে, চিন্তন শুরু হয় সংশয় ও অনিশ্চয়তা থেকে। তা কোনো মালিকানা ও সম্পত্তি হওয়ার পরিবর্তে, জিজ্ঞাসা, সন্ধান ও অনুসন্ধানের মনোভাবকে চিহ্নিত করে। তার সমালোচনাপূর্ণ ক্রিয়া-প্রণালীর ভিতর দিয়ে প্রকৃত জ্ঞানকে পুনরীক্ষন ও সম্প্রসারণ করা হয়; এবং বিষয়াদির অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় পুনর্গঠিত হয়।

স্পষ্টতঃই; বিগত কয়েক শতক আমাদের বিভিন্ন বিশ্বাসের পুনরীক্ষণ ও পুনর্গঠনের আদর্শ কাল ছিল। প্রকৃতপক্ষে, লোকে স্থিতির বাস্তবতা সংশ্লিষ্ট পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাসগুলির সব কিছুকে ছুড়ে ফেলে দেয়নি, তাঁদের

প্রাতিজনিক একতরফা সংবেদন ও ধারণাদি নিয়ে নতুন করে কাজ আরম্ভ করেনি। ইচ্ছা থাকলেও তারা তা করতে পারত না; এবং তা যদি সম্ভব হতো তা হলে তার একমাত্র পরিণাম দাঁড়াত একটা সর্বময় জড়বুদ্ধিতা। জ্ঞান বলে যা-কিছু চলে আসছিল, লোকেরা তাই নিয়েই শুরু করেছিল, এবং যে সব ভূমিকার উপরে তা স্থাপিত ছিল সেগুলিকে বাদ-বিচার সহকারে তদন্ত করেছিল। তারা ব্যতিক্রমগুলিকে লক্ষ্য করল এবং যা-কিছুতে বিশ্বাস করা হতো তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন তথ্যগুলিকে নজরে আনার জন্য তারা নতুন যন্ত্রকৌশলের ব্যবহার করল। পূর্বপুরুষেরা যে জগতের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন তাঁরা তার থেকে একটি' ভিন্ন জগতের ধারণা করে নিতে তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রয়োগ করল। কাজটা ছিল টুকরো টুকরো খুচরা ধরনের কাজ। এক এক বারে এক একটি সমস্যা·হাতে নেয়া হতো। এই সব পুনরীক্ষণের মোট ফলাফল জগৎ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী ধারণাদির বিপ্লব ঘটাল। যা ঘটল, তা হল, পূর্ববর্তী বুদ্ধিগম্য অভ্যাসগুলির পুনঃসংগঠন; এবং পূর্ববর্তী সকল সংযোগ থেকে কাটা ছাড়া হলে যা হতো তার থেকে তা অশেষ প্রকারে বেশী কার্যকারী হ'ল।

এই অবস্থা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বা আত্মসত্তার (আত্মনের) ভূমিকা সম্বন্ধে একটি সংজ্ঞার্থের অবতারণা করে, সেটি হল,—গৃহীত বিশ্বাসগুলির পুনর্নির্দেশ বা পুনঃসংগঠন। প্রতিটি নতুন ধারণার,—প্রচলিত বিশ্বাস দ্বারা অনুমোদিত বিশ্বাস থেকে পৃথক প্রতিটি ধারণারই,—উৎপত্তিস্থল থাকবে ব্যক্তির মধ্যে। নতুন ধারণাবলী সর্বক্ষণই অঙ্কুরিত হচ্ছে। কিন্তু রীতি-শাসিত সমাজ তাদের বিকাশে উৎসাহ দেয় না। বিপরীতপক্ষে, তা তাদিকে চেপে দিতে চায়। এর একমাত্র কারণ হ'ল যে, সেটি প্রচলিত ধারণা থেকে ভিন্নপথাবলম্বী। এ রকমের একটি সমাজের মধ্যে, যে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী আর সকলের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভিন্নরূপ হয়, সে ব্যক্তির চরিত্র সন্দেহভাজন হয়, তাতে লেগে থাকা তার পক্ষে সাধারণতঃ মারাত্মক হয়। যেখানে বিশ্বাসের সামাজিক প্রহরা ততোটা কড়া নয়, এমন কি সেখানেও, নতুন ধারণা যাতে যথোপযুক্তরূপে বিস্তারিত করা যায়, সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা তার জন্যে যন্ত্রপাতি যোগাতে ব্যর্থ হতে পারে; কিম্বা, যাঁরা এই সব ধারণা পোষণ করেন, তাদের পক্ষেও কোনো বৈষয়িক সমর্থন ও পুরস্কার যোগাড়েও ব্যর্থ

হতে পারে। কাজেই সেগুলি কেবল অসার কল্পনা, আকাশ-কুসুম বা লক্ষ্য-হীন দূরকল্পন হয়েই পড়ে থকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিপ্লবে পর্যবেক্ষণ ও কল্পনার স্বাধীনতা সহজে পাওয়া যায় নি ; তার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে ; বুদ্ধিগম্য স্বাধীনতার জন্য অনেককে দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। কিন্তু মোটের উপর, আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ, অন্ততঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে, রীতির ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে প্রথমে অনুমতি দিয়েছে এবং পরে সুবিবেচনার সঙ্গে উৎসাহও দিয়েছে। আবিষ্কার, গবেষণা, নতুন নতুন দিকে জিজ্ঞাসা, উদ্ভাবনশীল রচনা প্রভৃতি, শেষপক্ষে, হয় সামাজিক দস্তুর, নয় কিছু মাত্রায় সহনীয় হয়ে দাঁড়াল।

সে যাই হোক, আমরা এর আগেই যেমন দেখেছি, জ্ঞানের বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব ব্যক্তির মনকে এমন কোনো একটা স্থির দণ্ড বলে মনে করে তুষ্ট থাকেনি যে, তার উপরেই বিশ্বাসগুলির পুনর্গঠন পাক খাচ্ছে, এবং এইভাবে ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতি ও জনমানব সম্বলিত জগতের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকছে। তারা ব্যক্তি-মানসকে একটি পৃথক সত্তারূপে মনে করেছে, যা প্রতিটি লোকের মধ্যেই সম্পূর্ণ, এবং যা ভৌত প্রকৃতি থেকে, কাজেই আর সকল মন থেকে বিচ্ছিন্ন। এই ভাবে একটি বৈধ বুদ্ধিগম্য ব্যক্তিতা-বাদকে—প্রগতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য পূর্বতন বিশ্বাসগুলির সমালোচনাপূর্ণ পুনরীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গীকে,—একটি নৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিতাবাদে সুস্পষ্ট-রূপে সূত্রবদ্ধ করা হ'ল। যখন মনের ক্রিয়া রীতিগত বিশ্বাসগুলি নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং সেগুলির এমন রূপান্তর ঘটাতে চেষ্টা করে যে তারাও আবার সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করতে পারে, তখন ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিষয়ের মধ্যে কোনো বিরোধিতা থাকে না। অভ্যাসের সমরূপতা যেমন সমাজ সংরক্ষণের ঘটক, ঠিক সেইভাবেই পর্যবেক্ষণ, কল্পনা, বিচারবুদ্ধি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধিগম্য ভিন্নরূপতা সমাজ-প্রগতির ঘটক। কিন্তু যখন ধরে নেওয়া হয় যে, কোনো এক ব্যক্তির মধ্যেই জ্ঞান জন্ম নেয় ও বিকাশলাভ করে, তখন যে সকল গ্রন্থি এক ব্যক্তির মনকে তার সহযাত্রীদের মনের সঙ্গে গ্রথিত করে, সেগুলোকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করা হয়।

যখন ব্যক্তিধর্মী মানসিক ক্রিয়াগুলির সামাজিক গুণ উপেক্ষা করা হয়, তখন যা ব্যক্তিকে তার সহযাত্রীদের সাথে সুসম্বদ্ধ করবে, তার যোগসূত্র

দেখতে পাওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে জীবন প্রবাহের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে জ্ঞাতসারে পৃথক পৃথক করে নৈতিক ব্যক্তিতাবাদকে স্থাপন করা হয়। এই ধারণার মূলে এই রয়েছে যে, প্রতিটি লোকের চেতনা সম্পূর্ণরূপেই প্রাতিজনিক, একটি আত্ম-অবরুদ্ধ মহাদেশ; এ নাকি অন্য প্রত্যেকের ধারণা, বাসনা ও অভিপ্রায় থেকে মৌলিকরূপে স্বতন্ত্র। কিন্তু মানুষে যখন কাজ করে, তখন তারা তা করে একটি যৌথ জন-জগতের মধ্যে। পৃথকীকৃত এবং স্বতন্ত্র সংজ্ঞাত মন-সম্বলিত তত্ত্বটি এই সমস্যা জাগায় যে, যদি বিভিন্ন অনুভূতি, বিভিন্ন ধারণা ও বিভিন্ন বাসনার, একের সঙ্গে অপরের কিছুই করার না থাকে, তা হলে এদের থেকে যে সব কাজকর্ম চালু হয়, সামাজিক বা জন-স্বার্থে কি করে তাদের নিয়ন্ত্রিত করা যায়? যদি অহংবাদী চেতনা থাকে তা হলে সে কাজ কি করে ঘটে যা অন্যান্যের কাজেরও খেয়াল রাখে।

যে সমস্ত নীতিবাদী দর্শনে এ রকম প্রস্তাব নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে, সেখানে প্রশ্নটি বিবেচনা করা হয়েছে চারটি বিশিষ্ট পন্থায়।

(১) একটি পদ্ধতি ঘটনাবলীর অগ্রগতি যা নিতান্ত অনিবার্য করেছে তার সাথে আপস মীমাংসা করে নিয়ে প্রাচীন অনুশাসনিক অবস্থার উজ্জীবনকে উপস্থাপিত করে। এর মধ্যেও কোনো ব্যক্তির চারিত্রিক ব্যতিক্রম ও অতিক্রমকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হয়; বাহ্যিক অনুশাসনিক নির্দেশ ছাড়া যা কিছু ঘটে, মূলতঃ সেগুলি ব্যক্তির সেই সব অন্তর্নিহিত আলোড়ন, বিদ্রোহ ও বিকৃতিরই প্রমাণ। মূল নিয়ম থেকে পৃথকভাবে, কার্যতঃ কোনো কোনো কারিগরি এলাকাতে, যেমন গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং এদের থেকে যে সব কারিগরি উদ্ভাবন-কৌশল সৃষ্টি হয় সেগুলির ক্ষেত্রে,—বুদ্ধিগম্য ব্যক্তিতাবাদকে বরদাস্ত করা হয়। কিন্তু নৈতিক, সামাজিক, আইনগত ও রাজনীতিক বিষয়ে অনুরূপ পদ্ধতির প্রয়োগে অসম্মতি থাকে। এ সব ক্ষেত্রে বিধানই থাকবে সর্বপ্রধান; যে সকল শাশ্বত সত্যের আত্ম-প্রকাশ ও সহজ-প্রকাশ ঘটেছে, বা যা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রজ্ঞালব্ধ, সেগুলি ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটা অনতিক্রম্য সীমারেখা চিহ্নিত করেছে। বিপথগামী লোকদের পক্ষে এই সব সীমা লঙ্ঘন করার চেষ্টাকেই সমাজের

দুর্গতির কারণ বলে ধরা হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞানের মাঝখানে পড়ে জীবন-বিজ্ঞান; কেবল সংসাধিত তথ্যাবলীর চাপে পড়েই, এখানে অবজ্ঞাভরে জিজ্ঞাসার স্বাধীনতাকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। যদিও অতীত ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে, জিজ্ঞাসার ক্রিয়া-প্রণালীর ভিতরেই যে দায়িত্ব গড়ে ওঠে, তার উপর ভরসা রেখেই মানব কল্যাণের সম্ভাব্যতাগুলিকে প্রসারিত এবং অধিকতর স্থায়ী করা হয়, "অনুশাসনিক" তত্ত্বটি সত্যের এমন একটি পবিত্র রাজ্যকে আলাদা করে রাখে যে, সেটিকে বিশ্বাসের ব্যতিক্রমের অনুপ্রবেশ থেকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে শাশ্বত সত্যের উপর জোর নাও পড়তে পারে, কিন্তু সে জোরটি পড়ে পুস্তক ও শিক্ষকের অনুশাসনের উপর; ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমকে উৎসাহ দেওয়া হয় না।

(২) আর একটি পদ্ধতিকে কখনো কখনো যুক্তিবাদ বা বিমূর্ত বুদ্ধিবাদ বলা হয়। এক্ষেত্রে ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং সকল মূর্ত বিষয়-বস্তু থেকে পৃথক করে একটি বিধিবদ্ধ যৌক্তিক ধী-শক্তি দাঁড় করানো হয়। যুক্তির এই শক্তিকে, আচরণকে সরাসরি প্রভাবিত করার ক্ষমতা দিয়ে ভূষিত করা হয়। যেহেতু এই শক্তি পুরোপুরিভাবে সাধারণ ও নৈর্ব্যক্তিক আকৃতিতে কাজ করে, সেই হেতু যখন বিভিন্ন লোকে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে, তখন তাদের ক্রিয়া-কলাপ বাহ্যতঃ সুসঙ্গত থাকে। এই দর্শনটি যে অনেক উপকারে লেগেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে সমস্ত মতবাদের পেছনে ঐতিহ্য ও শ্রেণীগত স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নেই, সেগুলির নঞর্থক ও দ্রাবক সমালোচনার ক্ষেত্রে এটি একটি শক্তিশালী উপকরণ ছিল। এটি আলোচনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আনতে এবং বিভিন্ন বিশ্বাসকে যে সব যুক্তির মানদণ্ডে ফেলতে হবে, তার ধারণা আনতে অভ্যস্ত করেছিল। এটি মানুষকে বিতর্ক, আলোচনা ও সম্মতির উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত করে নিয়ে, পক্ষপাতিত্ব, কুসংস্কার ও পাশবিক বলের ক্ষমতার মূল্যকে হ্রাস করেছিল, এনেছিল অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রাঞ্জলতা ও শৃঙ্খলা। কিন্তু মানুষের মধ্যে নবতর বন্ধন ও মিলন ঘটানোর বদলে, প্রাচীন মিথ্যা ধারণা-গুলির বিনষ্টি সাধনেই এর প্রভাব বেশী ছিল। যুক্তিকে বিষয়-বস্তু থেকে পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো কিছু বলে ধারণা করার জন্যে এই দর্শনের আকার-গত ও শূন্যগর্ভ স্বরূপ, ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এর বৈরী মনোভাব

এবং জীবনের ক্রিয়াশীলতার উপকরণরূপে অভ্যাস, সহজ প্রবৃত্তি ও প্রবণতার প্রভাবকে অমান্য করা ইত্যাদি কারণে, কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পদ্ধতির যুক্তি দিতে সেটি অক্ষম হয়েছিল। নগ্ন যুক্তিবিদ্যা, উপস্থিত বিষয়-বস্তুর বিন্যাস ও সমালোচনা করতে যতোই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তা তার নিজের মধ্যে থেকে নতুন বিষয়-বস্তু গড়ে তুলতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে এর অনুবন্ধী বিষয় হল, শিক্ষার্থীর ধারণাগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক মিল আছে কিনা তার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই, মিল ঘটানোর জন্য পূর্বপ্রস্তুত সাধারণ নিয়ম ও নীতির উপর আস্থা স্থাপন করা।

(৩) যখন ফরাসীদেশে এই যুক্তিবাদী দর্শন বিকাশলাভ করছিল, তখন চেতনার ভিন্ন ভিন্ন ধারা থেকে যে সব কর্ম প্রসূত হয় সেগুলির বাহ্যিক একত্ব সাধনকল্পে ইংরেজী ভাবধারা মানুষের বোধগম্য আত্ম-স্বার্থের প্রতি আবেদন করেছিল। আইন ব্যবস্থা, বিশেষতঃ দণ্ডমূলক প্রশাসন, এবং সরকারী কানুনকে এমনতর করতে হবে যাতে তা একজনের নিজের ব্যক্তিগত সংবেদনগুলি থেকে যে সব ক্রিয়া চালু হয়, সেগুলিকে অন্যান্যের আবেগানুভূতির প্রতি হস্তক্ষেপ করতে বিরত করে। শিক্ষা ব্যবস্থার কাজ হবে লোকদের মধ্যে সেই চেতনা জাগানো যাতে একজন তার ব্যক্তিগত সুখের অনুধাবনকে স্থায়ী করার জন্যে, অন্যান্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে, এবং তাঁদের কল্যাণের জন্য কিছু মাত্রায় সদর্থক খেয়ালও অতি অবশ্যই রাখে। একজনের আচরণের সঙ্গে অন্যান্যের আচরণের সামঞ্জস্য সাধনের উপায়রূপে প্রধান জোর দেওয়া হয়েছিল অবশ্য ব্যবসায়ের উপরে। বাণিজ্যে প্রত্যেকেই তার নিজের অভাবপূরণের দিকে লক্ষ্য রাখে; কিন্তু কেবল অপরকে কোনো সামগ্রী বা সেবাদান করেই সে তার মুনাফা লাভ করতে পারে। এইভাবে লোকে তার নিজের চেতনার প্রাতিজনিক সুখকর অবস্থার বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে, অন্যান্যের চেতনাকে অংশদান করে। এখানেও, কোনো সন্দেহ নেই যে, এই অভিমত, চেতনাময় জীবনের মূল্যবোধের একটি উচ্চপর্যায়ের উপলব্ধির প্রকাশ ও উন্নত বিধান। এবং এতে স্বীকৃত হয়েছিল যে, শেষ পক্ষে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলিকে সংজ্ঞাত অভিজ্ঞতার পাল্লা জোরদার করতে ও বাড়াতে তারা যে অংশদান করে, তাই দিয়েই বিচার করতে হবে। একটি বিশ্রামিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের উপর প্রতিষ্ঠিত

সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কাজ, শিল্প ও যন্ত্রকৌশলকে যে রকম হীন চক্ষে দেখা হতো এই দর্শন তা থেকেও এগুলিকে উদ্ধার করার পক্ষে অনেক কিছু করেছিল। উভয় দিক থেকেই সে দর্শন একটি প্রশস্ততর এবং অধিকতর গণতান্ত্রিক সামাজিক সংশ্লিষ্টতার পৃষ্ঠপোষক হয়েছিল। কিন্তু তার গোড়ার মুখবন্ধের সঙ্কীর্ণতাই তাকে কলঙ্কিত করেছে। সে মতবাদ এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই কেবল তার নিজের সুখ-দুঃখ বিবেচনা করে কাজ করে, এবং তথাকথিত উদার ও সমবেদী কাজগুলো কেবল তার নিজের আরামকে সুনিশ্চিত করারই পরোক্ষ উপায়। অন্য কথায় যে কোনো মতবাদ সর্বজনীয় সংশ্লিষ্টতাগুলিকে পুনর্নির্দেশ, ও পুনরুপযোগী করার প্রয়াসের পরিবর্তে, মানসিক জীবনকে একটি আত্ম-অবরুদ্ধ সত্তায় পরিণত করে, এ দর্শন তার অন্তর্নিহিত পরিণামগুলিই ব্যক্ত করেছে। এটি মানুষের মিলনকে একটি বাহ্যিক গণাগাথার ব্যাপার করে তুলেছিল। কারলাইল অবজ্ঞাভরে ঘোষণা করেছিলেন যে, এটি হল একটি নৈরাজ্যের সহিত কনেস্টবল সম্বলিত তন্ত্র এবং এটি মানুষের মধ্যে কেবল কোনো "তহবিল সংক্রান্ত সম্পর্ককেই" স্বীকৃতি দেয়; শিক্ষাক্ষেত্রে আনন্দবোধক পুরস্কার ও বেদনাদায়ক ব্যবস্থার মধ্যেও এই দর্শনটির প্রতিরূপ অতিশয় স্পষ্ট।

(৪) বিশিষ্ট এক জার্মান দর্শন আর এক পথের অনুসরণ করেছিল। প্রধানতঃ যেটি ডিকার্টে এবং তার ফরাসী উত্তরাধিকারীদের যুক্তিবাদী দর্শন ছিল, এই দর্শন তার থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু যেখানে ফরাসী চিন্তন মানুষের মধ্যে একটি দিব্য মন বিরাজ করে,—এই রকমের মোটামুটি কোনো ধর্মীয় ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তির ধারণাটির বিকাশ করেছিল, সেখানে জার্মান চিন্তন (যেমন হেগেলের মত) এই দুটি মতের মধ্যে এক রকমের সমন্বয় করেছিলেন। যুক্তি স্বয়ম্ভু। প্রকৃতি হল, মূর্ত যুক্তি। ইতিহাস হল, মানুষের মধ্যে যুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ। ভৌত প্রকৃতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে যুক্তিবাদিতা রয়েছে, একজন লোক যে পরিমাণে তার আধেয়কে আত্মীভূত করতে পারে, এই পরিমাণেই সে বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন হতে পারে। কারণ স্বয়ম্ভু যুক্তি যুক্তিবাদের যুক্তির মতো অবিমিশ্র বিধিবদ্ধ ও শূন্যগর্ভ নয়; স্বয়ম্ভুরূপে তার নিজের মধ্যে সকল আধেয়ই থাকবে। কাজেই আসল সমস্যাটি হল ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে কিছুটা

সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমন্বয় বিধান করা নয়; পরন্তু সেটি হল, রাষ্ট্রকে বিষয়মুখী "যুক্তি"রূপে সংগঠন করার মধ্যে যে বিশ্বজনীন নিয়ম দেখা যায়, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ব্যক্তিগত প্রত্যয়গুলির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অর্জন করা। যদিও এই দর্শনকে সাধারণতঃ স্বয়ম্ভু বা বিষয়মুখী আদর্শবাদ বলা হয় তথাপি অন্ততঃ শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে একে প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শবাদ বললে ভালো হয় (পূর্বে দেখুন ৭৬ পৃঃ)। এই দর্শন ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনো এক অন্তর্নিহিত স্বয়ম্ভূ মনের বিভিন্ন মূর্ত আবির্ভাবরূপে আদর্শান্বিত করেছিল। এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, উনিশ শতকের প্রারম্ভে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যে দর্শন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে পরিণত হয়েছিল, তাকে তার থেকে উদ্ধার করতে এই দর্শন একটি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি অধিকতর গঠনমূলকতার দিকে আগ্রহশীল করার সহায়ক হয়েছিল। এটি দৈব, প্রাতিস্বিক যুক্তিগত প্রত্যয়, এবং প্রাতিজনিক আত্ম-স্বার্থ সম্বলিত ক্রিয়াকর্মের উপরে কম নির্ভর করাতো। এটি বিষয় পরিচালনের ক্ষেত্রে বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটিয়ে সমবায়ী রাষ্ট্রের স্বার্থে জাতীয়ভাবে সংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল; এবং প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রতীত ব্যাপারের সকল কারিগরি বিবরণের মধ্যে জিজ্ঞাসার স্বাধীনতাকে অনুমোদন করেছিল— হয়েছিল তার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু সকল চূড়ান্ত নৈতিক বিষয়ের মধ্যেই, এটি অনুশাসনের মূল নীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়েছিল। সংগঠনে কর্মকুশলতা আনার জন্য পূর্বোক্ত যে কোনো বিশিষ্ট একটা দর্শন অপেক্ষা এই দর্শন অধিকতর সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু এতে এই সংগঠনের স্বচ্ছন্দ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বলিত রূপান্তর ঘটানোর কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। রাষ্ট্রনীতিক গণতন্ত্রবাদ এই বিশ্বাস রাখে যে, এমন কি সমাজের মৌলিক গঠনকে পুনরুপযোগী করতেও, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের ন্যায্য অধিকার আছে। কিন্তু এ কথা এ দর্শনের কাছে পরদেশী।

৩। শিক্ষাগত প্রতিরূপ

এই সমস্ত নানা জাতীয় দর্শনের মধ্যে যে সব ত্রুটি দেখা যায়, তাদের

শিক্ষাগত প্রতিরূপ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক নয়। এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, বিদ্যালয় হ'ল ঠিক সেই প্রতিষ্ঠান, যা, একদিকে অবিমিশ্র ব্যক্তিবাদী শিক্ষাপদ্ধতি ও সামাজিক কাজকর্ম এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটা ধারণাগত বিরোধাভাসকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে আসছে। এই বিরোধাভাস, শিক্ষার জন্য কোনো সামাজিক বাতাবরণ ও প্রেষণার অভাবের ক্ষেত্রে, এবং তার ফলে বিদ্যালয় পরিচালনের ক্ষেত্রে, শিক্ষণ-প্রণালী ও শাসন-প্রণালীর বিচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তিগত প্রকারভেদকে যে নগণ্য সুযোগ দেওয়া হয়, তাতেও তা প্রতিফলিত হয়। সক্রিয় কর্ম সম্পাদনের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিনিময় হতে থাকে, শিক্ষালাভ করা যদি তারই কোনো পর্যায় হয়, তাহলে বিদ্যালাভের ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনুপ্রবেশ ঘটে। যখন এই সামাজিক কারণটি অনুপস্থিত থাকে, তখন বিদ্যালাভ হয়ে দাঁড়ায় কোনো উপস্থাপিত বিষয়বস্তুকে অবিমিশ্র ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যে পরিবাহিত করা, এবং সেক্ষেত্রে এমন কোনো অন্তর্নিহিত হেতু নেই, যে কারণে তা মানসিক ও প্রক্ষোভগত প্রবণতাকে একটা অধিকতর সমাজধর্মী নির্দেশ দেবে।

৫ বিদ্যালয়ে স্বাধীনতার সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলের মধ্যেই, স্বাধীনতাকে সামাজিক নির্দেশের অভাবের সঙ্গে, বা কখনো কখনো শুধু অবাধ দৈহিক গতিবিধির সঙ্গে একার্থক করার ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু স্বাধীনতার দাবির সার হ'ল সেই সমস্ত শর্তাবলীর প্রয়োজনীয়তা, যেগুলি একজনকে কোনো সমষ্টির স্বার্থে তাঁর নিজের বিশেষ অবদান যোগাতে সমর্থ করে, এবং এই সমষ্টির ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে তাঁকে এমন ভাবে অংশ নিতে সমর্থ করে, যাতে সামাজিক নির্দেশ তাঁর কাজের উপর কর্তৃত্বশীল হুকুম না হয়ে, তাঁর নিজেরই মানসিক ভঙ্গীর একটি উপাদান হতে পারে। যেহেতু যাকে শৃঙ্খলা ও "শাসন" বলা হয়, তা আচরণের একমাত্র বাইরের দিকটা নিয়েই থাকে, সেই হেতু স্বাধীনতার সঙ্গেও অনুরূপ অর্থ যোগ হয়। কিন্তু যখন এটা দেখা যায় যে, প্রতিটি ধারণাই, মনের যে গুণটি কর্মে প্রকাশ পায়, তাকেই সূচিত করে, তখন এই ধারণাগত বিরোধটি লোপ পায়। চিন্তন ব্যক্তিগত; বিদ্যালাভে চিন্তন যে ভূমিকাটি গ্রহণ করে, স্বাধীনতার

অর্থ মূলতঃ তাই :—সেটির অর্থ হল, বুদ্ধিগম্য উদ্যোগ, পর্যবেক্ষণে স্বাধীনতা, বিচক্ষণ উদ্ভাবন, পরিণামের অগ্রদর্শন, এবং সেই লক্ষ্যসাধনে অভিযোজনের উপস্থিতবুদ্ধি।

কিন্তু এ সব বিষয় আচরণের মানসিক পর্যায়ভুক্ত বলে, ব্যক্তিতার প্রয়োজনীয় ভূমিকা,—বা স্বাধীনতাকে—দৈহিক গতিবিধির মুক্ত সুযোগ থেকে আলাদা করা যায় না। বাধ্যতামূলক দৈহিক চুপচাপ থাকা কোনো সমস্যাকে উপলব্ধি করার, সমস্যাকে স্পষ্ট করার জন্য পর্যবেক্ষণের আশ্রয় নেওয়ার, এবং আনুমানিক ধারণাবলীকে পরখ করে দেখার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে প্রতিকূল হতে পারে। শিক্ষায় আত্ম-সক্রিয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু এই ধারণটিকে অনেক সময়েই আভ্যন্তরীণ এমন কোনো কিছুর মধ্যে সীমিত রাখা হয়,—সংজ্ঞাবহ ও ক্রিয়াবাহী অঙ্গগুলির সচ্ছন্দ ব্যবহার যার বহির্ভূত। যাঁরা প্রতীক চিহ্নাদি থেকে শিক্ষালাভ করার কোঠায় থাকেন, কিম্বা যাঁরা কোনো সযত্ন ও সুবিবেচিত কর্মব্যস্ততার প্রস্তুতিরূপে, কোনো সমস্যা বা ধারণার সংশ্লেষগুলি বিস্তার করার কাজে নিযুক্ত থাকেন, তাঁদের পক্ষে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর সক্রিয়তার প্রয়োজন না হতে পারে। কিন্তু আত্ম-সক্রিয়তার পূর্ণ চক্রটি—অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ, পদার্থের উপর ধারণাগুলিকে খাটিয়ে দেখাবার, জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি দিয়ে কি রকমে কি করা যায় তা আবিষ্কার করার—সুযোগ দাবি করে। এবং সঙ্কীর্ণরূপে সীমিত দৈহিক কর্মতৎপরতার সাথে এ সব বিষয় খাপ খায় না।

সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত কর্মতৎপরতার অর্থ ধরা হয়েছে—শিক্ষার্থীকে কেবল নিজে নিজেই বা একা একা কাজ করতে দেওয়া। ধীর-স্থির ও নিবিষ্টচিত্ত হওয়ার জন্য, অন্য একজনে কি করছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন থেকে অব্যাহতি পাওয়া বাস্তবিকই প্রয়োজন। বড়োদের মতো ছোটোদেরও পরিমিত মাত্রায় একা থাকতে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ পৃথক কাজের স্থান, সময় ও পরিমাণের বিষয়টা সূক্ষ্ম আলোচনার বিষয়,—কোনো নীতিগত বিষয় নয়। অন্যান্যের সঙ্গে কাজ করা, এবং ব্যক্তিগতরূপে কাজ করার মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত বিরোধিতা নেই। বিপরীতপক্ষে, ব্যক্তির কোনো কোনো সামর্থ্য অন্যান্যের সঙ্গে মেলা-মেশাজনিত উদ্দীপক ছাড়া

প্রকাশিতই হয় না। শিশুকে নিজে নিজেই কাজ করতে হবে এবং তার ব্যক্তিতা বিকাশের জন্য সে স্বাধীন অবস্থায় থাকবে, সে যৌথ কাজে নিযুক্ত হবে না,—এ রকমের ধারণা ব্যক্তিতাকে স্থান-ব্যবধানের দূরত্ব দিয়ে পরিমাপ করে, এবং তাকে একটি দৈহিক ব্যাপার করে তোলে।

শিক্ষার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হয়,—এ রকমের কোনো উপকরণরূপে, ব্যক্তিতার দু'টি অর্থ হয়। প্রথমতঃ, যতোদূর পর্যন্ত একজনের নিজেরই কোনো উদ্দেশ্য ও সমস্যা থাকে, এবং সে নিজেই নিজের চিন্তা করে, ততোদূর পর্যন্ত সে মানসিকরূপে একজন ব্যক্তি। "নিজেই নিজের চিন্তা করে" বাক্যাংশটির মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দ রয়েছে। একজনে যদি নিজেই তা না করে, তা হলে তা চিন্তনই নয়। কেবল শিক্ষার্থীর নিজের পর্যবেক্ষণ, অনুচিন্তন, গঠন, এবং অনুমানের পরীক্ষণ দ্বারাই সে পূর্বে যা জেনেছে তার পরিবর্ধন ও পরিশোধন করতে পারে। খাদ্য হজম করা যতোটা ব্যক্তিগত বিষয়, চিন্তনও ততোটাই ব্যক্তিগত বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে,—দৃষ্টিকোণ, বিষয়ের আকর্ষণ ও তার মধ্যে অনুপ্রবেশের ধরন নিয়ে,—প্রকারভেদও থাকে। যখন একরূপতার আরোপিত স্বার্থে, এই সকল প্রকারভেদকে দাবিয়ে রাখা হয়, এবং পাঠ ও আবৃত্তি পদ্ধতির কেবল একটি ছাঁচ রাখা হয়, তখন তার ফলে অনিবার্য বিভ্রান্তি ও কৃত্রিমতা ঘটে। ব্যক্তির মৌলিকতা ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হয়, নিজের মানসিক ক্রিয়ার শক্তির উপরে বিশ্বাস খর্ব হয়, এবং অন্যান্যের অভিমতের প্রতি বিনম্র বশ্যতার শিক্ষা আসে; নয়তো, ধারণাগুলো উচ্ছৃঙ্খল হয়। যেকালে সম্পূর্ণ সমাজটাই রীতিগত বিশ্বাস দিয়ে অনুশাসিত হতো, সেকাল থেকে একালে অনিষ্টের পরিমাণ বাড়ছে। কারণ বিদ্যালয়ের ভিতরে শিক্ষালাভ করার পদ্ধতি, এবং বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষালাভ করার বিশ্বস্ত পদ্ধতির মধ্যে, একালে বেশী পার্থক্য থাকে। এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, মানুষকে বিষয়বস্তুর প্রতি তার নিজ নিজ সাড়ার ধরন প্রয়োগ করতে প্রথমে অনুমতি ও পরে উৎসাহ দেওয়া যখন থেকে আরম্ভ হয়েছে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিয়মিত অগ্রগতিও তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। যদি আপত্তি তোলা হয় যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এরূপ কোনো মৌলিকতা দেখাতে সমর্থ নয়, কাজেই যারা বেশী শিক্ষিত তাদের কাছে আগে থেকে

যা জানা থাকে, তাদিকে তাই আত্মসাৎ ও পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য করা হবে, তাহলে সে কথার উত্তর দু'টি। (১) আমাদের দায়,—ভঙ্গীর মৌলিকতা; সেটি হ'ল কারও নিজের ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়ার প্রতিরূপ; এখানে আমরা মৌলিকতাকে ফল দিয়ে মাপজোপ করি না। প্রকৃতি ও মানব সম্বলিত বিজ্ঞানের মধ্যে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব মূর্ত হয়েছে, তরুণেরা তার মৌলিক আবিষ্কার করবে তা কেউ আশা করে না। কিন্তু এটা আশা করা অযৌক্তিক নয় যে, শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে যা খাঁটি আবিষ্কার হয়ে দাঁড়াবে তেমন অবস্থার অন্তরালে শিক্ষালাভ ঘটতে পারে। যদিও এতে অধিকতর অগ্রসর শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিতে অপরিণত শিক্ষার্থীরা কোনো আবিষ্কার করে না, তবুও যেখানেই খাঁটি শিক্ষালাভ থাকে, সেখানেই তাদের নিজেদের দৃষ্টিতে তারা আবিষ্কার করে থাকে। (২) অন্যের জানা বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতি লাভের স্বাভাবিক ক্রিয়াপ্রণালীর সূত্রে, এমন কি খুব ছোটো শিক্ষার্থীরাও, অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিক্রিয়া করে। যে সব পন্থা অবলম্বন করে তারা আলোচ্য বিষয়টির প্রতি ধাবমান হয়, যে বিশিষ্ট পন্থায় বিষয়বস্তু তাদের মাথায় খেলে, তার মধ্যে জীবন্ত এমন কিছু থাকে যে, সর্বাধিক অভিজ্ঞ শিক্ষকও এর পূর্বানুমান করতে সমর্থ ন'ন। অধিকাংশ সময়েই এ সমস্ত কথা অবান্তর বলে ঝেড়ে ফেলা হয়; বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যে আকারে বিষয়বস্তুটিকে ধারণা করেন, ইচ্ছা করেই শিক্ষার্থীদিকে ঠিক সেই আকারে তার মহলা দিতে লাগানো হয়। তার ফল এই হয় যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে যা সহজাতরূপে মৌলিক, যা-কিছু এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি থেকে ভিন্নরূপে চিহ্নিত করে, তা অব্যবহৃত ও অনির্দেশিত থেকে যায়। শিক্ষকের কাছেও শিক্ষকতার কাজটি তখন আর শিক্ষামূলক ক্রিয়া থাকে না। ভালোর থেকে ভালো হলেও, তিনি কেবল তাঁর বর্তমান কৌশলের উন্নতি করতেই শেখেন: তিনি নতুন দৃষ্টিকোণ লাভ করেন না; তিনি বুদ্ধিগত সাহচর্য লাভের অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হ'ন। এর ফলে, শিক্ষণ ও শিক্ষা গতানুগতিক ও যান্ত্রিক হয়ে পড়তে চায়, আর তার সাথে থাকে তৎপ্রসূত স্নায়বিক পরিশ্রান্তি—এবং সেটা উভয় পক্ষেরই।

পরিপক্কতা যতো বাড়তে থাকে, এবং যা-কিছুর উপর একটি নতুন আলোচ্য বিষয় অভিক্ষেপিত হয় সেটির সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠতার একটা বৃহত্তর

পটভূমিকা আসে, কমবেশী এলোপাতাড়ি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ততোই কমতে থাকে। কর্মতৎপরতা সুনির্ধারিত হয় বা কোনো কোনো ধারায় বিশিষ্টতা লাভ করে। অন্যান্যের চক্ষে শিক্ষার্থী তখন সম্পূর্ণ দৈহিক ধীর-স্থিরভাব ধারণ করতে পারে, কারণ তাঁর শক্তি তখন নার্ভপ্রণালীর এবং তৎসংলগ্ন চক্ষু ও কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতির মধ্যে সীমিত থাকে। কিন্তু যেহেতু এই ভঙ্গী শিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রগাঢ় মনোনিবেশের সাক্ষ্য দেয়, সেইহেতু এ কথা আসে না যে, যে সব শিক্ষার্থীকে এখনো তাঁদের বুদ্ধিগম্য পথ খুঁজে বের করতে হবে, তাদের ক্ষেত্রেও এই ভঙ্গীকে আদর্শরূপে দাঁড় করাতে হবে। এবং এমন কি, প্রাপ্তবয়স্কদের বেলাও, এই ভঙ্গী মানসিক শক্তির সম্পূর্ণ পরিক্রমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটি একটি মধ্যবর্তী কাল চিহ্নিত করে; বিষয়ের অধিকার দখলের সঙ্গে এই কালটিকে বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই ভঙ্গীটি থাকে দুটি কালের মধ্যে; তার একটি হল অধিকতর সাধারণ ও লক্ষণযোগ্য অঙ্গাঙ্গিক ক্রিয়ার প্রাথমিক কাল; আর একটি হল, যা জানা হয়েছে তাকে কাজে লাগানোর একটি পরবর্তী কাল।

যখন শিক্ষা, জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে মন ও শরীরের একত্বকে স্বীকৃতি দেয়, তখন আমরা প্রতীয়মান, বা বাহ্যিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে বাধ্য থাকি না। সে ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও শিক্ষা করার মধ্যে যে স্বাধীনতা থাকে তাকে একজনে পূর্বেই যা জেনেছে ও বিশ্বাস করেছে তা বিবর্ধিত ও পরিশোধিত করার চিন্তনের সঙ্গে একীভূত করাই যথেষ্ট। ফলপ্রসূ চিন্তার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক পরিস্থিতি আনার জন্য যে সব শর্ত মেটাতে হবে, সেগুলির প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হলে, স্বাধীনতা নিজেই নিজের রক্ষক হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তির এমন কোনো প্রশ্ন থাকে, যেটি তার কাছে একটি রীতিমত প্রশ্ন হয়ে তাকে কৌতূহলে প্ররোচিত করবে, এবং যে সব সংবাদ প্রশ্নটির সাথে যোঝবার জন্য তাকে সাহায্য করবে সেগুলির জন্য তার উৎকণ্ঠার খোরাক্ যোগাবে,—এবং সেই লোকটির দখলে যদি এমন সরঞ্জামও থাকে যা এই সব স্বার্থকে ফলপ্রসূ করবে,—তা হলেই সে বুদ্ধিগম্যরূপে স্বাধীন। তার নিজের উদ্দেশ্যগুলিই তার ক্রিয়া-কর্মকে নির্দে-শিত করবে। অন্যথায় তার মনোযোগের ভান, তার বিনম্রতা, তার মুখস্থবিদ্যা ও পুনরুদ্গিরণশক্তি (!) বুদ্ধিগম্য দাসত্বে অংশ নেবে। বুদ্ধিগম্য বশ্যতার

এরূপ অবস্থা জনসাধারণকে এমন কোনো সমাজের উপযুক্ত করার প্রয়োজনে লাগে যেখানে অধিকাংশ লোকের কাছ থেকেই তাদের কোনো নিজস্ব উদ্দেশ্য বা ধারণা থাকবে বলে আশা করা যায় না,—আশা করা যায় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত অল্প কয়েকজনের কাছ থেকে হুকুম নেওয়ার। যে সমাজ গণ-তান্ত্রিক হতে মনস্থ করেছে এহেন অবস্থা তার উপযোগী নয়।

সারাংশ

আসল ব্যক্তিতাবাদ হ'ল, বিশ্বাসের মানদণ্ডরূপে রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের অনুশাসনের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হওয়ার ক্রিয়াফল। গ্রীক্ চিন্তনের শীর্ষপর্যায়ের, এবং অনুরূপ ক্ষেত্রের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রকাশ। অবশ্য ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য সর্বকালেই ছিল। কিন্তু রক্ষণশীল আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা অনুশাসিত সমাজ বিচিত্রতার পথ রোধ করে দাঁড়ায়, বা, অন্ততঃ তার সদ্ব্যবহার ও পৃষ্ঠপোষণ করে না। নানাবিধ কারণ বশতঃ, দার্শনিক দিক্ থেকে এই নতুন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে পূর্বগৃহীত বিশ্বাসগুলির পুনরীক্ষণ ও রূপান্তরের জন্য সঙ্ঘটক সৃষ্টি করার তাৎপর্যরূপে ব্যাখ্যা করা হয়নি,—ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ঘোষণা দিয়ে যে, প্রতিটি লোকের মনই অন্যান্য সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। দর্শনের তাত্ত্বিক পর্যায়ে, এতে জ্ঞানতত্ত্বের সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছিল: জগতের সঙ্গে ব্যক্তির কোনো জ্ঞানধর্মী সম্পর্কের সম্ভাব্যতার প্রশ্নটি তুলেছিল। এর ব্যবহারিক পর্যায়ে এটি সার্বিক বা সামাজিক স্বার্থে ক্রিয়া করে—এ রকমের একটা অবিমিশ্র ব্যক্তিগত চেতনার সম্ভাবনা উদ্ভব করেছিল,—তুলে ছিল সামাজিক নির্দেশের সমস্যাটি। যদিও এই প্রশ্নাবলীর বিচারার্থে যে সকল দর্শনের বিবর্ধন ঘটেছে, তারা সরাসরিভাবে শিক্ষাতত্ত্বকে প্রভাবিত করেনি, তথাপি এদের ভিত্তিগত অঙ্গীকারগুলি শিক্ষণ ও শাসনের এবং ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা ও অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সচরাচর যে বিচ্ছেদ রাখা হয়, তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতা শব্দে মনে রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এই যে, শব্দটি গতিবিধির বাহ্যিক বিধিনিষেধকে নির্দেশ না করে বরং একটি মানসিক ভঙ্গীকে নির্দেশ করে। কিন্তু উদ্‌ঘাটন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রয়োগ ইত্যাদি

আলোড়নের মধ্যে একটি সুষ্ঠু পথ খুলে না দিয়ে মনের এই ভঙ্গীটি বিকাশ লাভ করতে পারে না। একটি রীতি-ভিত্তিক সমাজ কেবল চলিত প্রথার সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণ সীমা পর্যন্তই ব্যক্তিগত প্রকারভেদের সদ্ব্যবহার করবে। এর মুখ্য আদর্শ হল প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে একরূপতা আনা। প্রগতিশীল সমাজ ব্যক্তিগত বিচিত্রতাকে অতি মূল্যবান মনে করে। কারণ সে সমাজ এই বিচিত্রতার মধ্যেই তার নিজের ক্রমবিকাশ দেখতে পায়। কাজেই একটি গণতান্ত্রিক সমাজকে, তার আদর্শের সঙ্গে সংগতি রেখে, তার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অবশ্যই বুদ্ধিগত স্বাধীনতার, এবং বিচিত্র মেধা ও স্বার্থের মুক্তির অবকাশ রাখতে হবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শিক্ষার বৃত্তিগত রূপ

১। বৃত্তির অর্থ

বর্তমান কালে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের দ্বন্দ্ব, শিক্ষায় বিভিন্ন বৃত্তিমূলক উপকরণের স্থান ও কর্তব্য সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত। যদি খোলাখুলি বলা হয় যে, মৌলিক দার্শনিক ধারণাবলীর তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যগুলি এই প্রসঙ্গটির মধ্যেই তাদের প্রধান তর্কের বিষয় দেখতে পায়, তাহলে কথাটা অবিশ্বাস্য: মনে হতে পারে যে, যে সমস্ত পরোক্ষ ও সাধারণ বাক্য দ্বারা দার্শনিক ধারণাবলী সূত্রবদ্ধ, তার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবহারিক ও মূর্ত বিস্তারিত বর্ণনার অতি দূর ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মধ্যে, শ্রম ও বিশ্রাম, তত্ত্ব ও বৃত্তি, দেহ ও মন, মানসিক ভাব ও পৃথিবী ইত্যাদির মধ্যে যে সব বিরোধিতা রয়েছে, তার গোড়ার বুদ্ধিগম্য অনুমানগুলির মানসিক সমীক্ষা দেখিয়ে দেবে যে, এই সব বিরোধিতাই বৃত্তিমূলক ও কৃষ্টিমূলক শিক্ষার মধ্যের বিরোধাভাসে পর্যবসিত। ঐতিহ্যিক প্রথানুযায়ী, উদার সংস্কৃতিকে বিশ্রাম, বিশুদ্ধ ধ্যানশীল জ্ঞান, এবং দৈহিক অঙ্গ-অবয়বের প্রয়োগ-বর্জিত আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জড়ানো হয়েছে। কালক্রমে, সংস্কৃতিকে একটি বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত পরিমার্জনার, এবং চেতনার এমন এক ধরনের ভাব ও ভঙ্গীর কর্ষণের সঙ্গে একত্র করা হয়েছে, যা সামাজিক নির্দেশ থেকেও আলাদা, আর, সমাজ-সেবা থেকেও আলাদা। এর ধরন হল, প্রথমটি থেকে পলায়ন, আর শেষেরটির অত্যাবশ্যকতার স্থানে একটা সান্ত্বনা বিশেষ।

এই দার্শনিক দ্বৈতবাদগুলি বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিষয়টির সঙ্গে এত গভীর ভাবে জড়িত যে, কিছুটা পূর্ণরূপে বৃত্তির সংজ্ঞায়ন করা অত্যাবশ্যক; তাতে আমরা এই ধারণাটি থেকে মুক্তি পাব যে, বৃত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা যদি শুধু অর্থকরী নাও হয়, তবুও সঙ্কীর্ণরূপে ব্যবহারিক। বৃত্তির একমাত্র

অর্থ হল, জীবনের ক্রিয়াকলাপ এমনভাবে পরিচালিত করা, যাতে ক্রিয়া-কলাপের সম্পাদিত পরিণাম ফল ব্যক্তির কাছে ওই ক্রিয়া-কলাপকে প্রত্যক্ষ-রূপে সার্থক করে, এবং সেটি তার সহযাত্রীদের কাজেও লাগে। কর্ম-জীবনের বিপরীত জিনিস বিশ্রামও নয় কৃষ্টিও নয় পরন্তু তা ব্যক্তির দিক দিয়ে লক্ষ্যহীনতা ও খামখেয়াল,—অভিজ্ঞতায় ক্রমপুঞ্জিত কৃতির অভাব, আর সমাজের দিক দিয়ে তা অলস আড়ম্বর,—অন্যের উপর পরজীবিমূলক নির্ভরতা। নিয়োজন, নিরবচ্ছিন্নতার মূর্ত নামান্তর। তার মধ্যে থাকে, যে কোনো ধরনের শিল্পীসুলভ সামর্থ্য, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা ও সার্থক নাগরিকতার বিকাশ; থাকে পেশাদারী ও ব্যবসাদারী নিয়োজনও। আর যন্ত্রকৌশলী শ্রম ও লাভজনক বিভিন্ন অনুধাবনে নিযুক্ত থাকার তো কথাই নেই।

যেখানে অব্যবহিতরূপে প্রত্যক্ষ পণ্য উৎপাদন হয়, বৃত্তির ধারণাকে আমরা কেবল সেখানকার নিয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব না, আবার এ ধারণাও করব না যে, বিভিন্ন বৃত্তি কোনো অনন্য প্রকারে বণ্টিত থাকে,—অর্থাৎ একজন লোকের কেবল একটি মাত্র বৃত্তিই থাকে। এরূপ সীমিত বিশেষজ্ঞতা অসম্ভব। কেবল এক একটি দিকে কাজ করার দিকে নজর রেখে মানুষকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করা থেকে বেশী অযৌক্তিক আর কিছু নেই। প্রথমতঃ, প্রতিটি লোকেরই অপরিহার্যরূপে নানা রকমের কাজের ডাক থাকে; এবং তার প্রত্যেকটিতেই তাকে বুদ্ধিমত্তার সহিত কৃত-কর্মা হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে কোনো নিয়োজনের ক্ষেত্রেই, যে মাত্রায় তা অন্যান্য স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, সেই মাত্রাতেই তা তার তাৎপর্য হারায়। ফলে সেটি একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার মতো একটা নিত্য-কর্ম পদ্ধতিতে পরিণত হয়। (১) কেউ শুধুই কলাকার, আর কিছু নয়,—এমনটি হয় না; এবং সে এই অবস্থার যতো কাছে আসে, ততোই সে একটি স্বল্প-বিকাশপ্রাপ্ত মানব সত্তায় পরিণত হয়। সে হয়ে দাঁড়ায় এক ধরনের একটি বিকৃত মূর্তি। জীবনের কোনো এক সময়ে, তাকে একটি পরিবারের লোক হতে হবে; তার বন্ধু-বান্ধব থাকতে হবে; হয় সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করবে, নয় সে অন্যের দ্বারা রক্ষিত হবে, এবং এইভাবে তার একটি ব্যস্ত জীবনযাত্রা থাকবে। সে কোনো না কোনো সংগঠিত রাষ্ট্রীয় এককের

সভ্য এবং এই ভাবেই আরও অনেক কিছু। তার যে সব কর্তব্য অন্যান্তের মতো, সেগুলির কোনোটিকে তার বৃত্তি না বলে, আমরা স্বভাবতঃই তার সেই কর্তব্যটিকেই বরং বৃত্তি বলি, যেটিতে তার বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য ফুটে ওঠে। কিন্তু শিক্ষার বৃত্তিমূলক পর্যায়গুলো বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা যেন শব্দাবলীর এতোটা অধীন হয়ে না পড়ি, যাতে একজন লোকের অন্যান্য কর্তব্যগুলিকে উপেক্ষা, এবং কার্যতঃ অস্বীকার করতে হয়। (২) যেহেতু কলাকার হিসাবে একজনের বৃত্তি তার বিভিন্ন ও বিচিত্র বৃত্তিমূলক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই একটি অতি বিশিষ্ট পর্যায়, সেইহেতু এতে তার কর্ম-কুশলতা, মানবিক অর্থে কর্মকুশলতা,—তার অন্যান্য কর্তব্যের সঙ্গে সংযোগ-সূত্রে নির্ধারিত হয়। একজনের কারুকার্যতাকে যদি শুধুই কারিগরি কৃতি থেকে বেশী কিছু হতে হয়, তা হলে অবশ্যই তার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, অবশ্যই তাকে জীবন্ত হয়ে বাঁচতে হবে। সে তার কলার মধ্যেই তার শিল্পীসুলভ কর্মতৎপরতার বিষয়-বস্তু পেতে পারে না। তার অন্যান্য সম্পর্কাদির মধ্যে সে যে আনন্দ ও বেদনা পায়, যা আবার তার বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি সতর্কতা ও সমবেদনার ওপর নির্ভর করে,—তার বিষয়-বস্তুকে তারই কোনো প্রকাশ হতে হবে। একজন কলাকারের ক্ষেত্রে যা সত্য, অন্য যে কোনো বিশিষ্ট কর্তব্যের ক্ষেত্রেও তা সত্য। নিঃসন্দেহে, অভ্যাসের মূল নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি সুচিহ্নিত বৃত্তিই সুবিশিষ্টরূপে অত্যধিক প্রভাবশালী, একমুখী ও সর্বগ্রাসী হয়ে পড়তে চায়। এর অর্থ দাঁড়ায় তাৎপর্য-বোধের বদলে ক্রিয়া-কৌশলের বা কারিগরি পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া। এই প্রবণতার পোষণ করা শিক্ষার ন্যস্ত কর্ম নয়, বরং শিক্ষার কাজ হল তার বিরুদ্ধে পাহারা দেওয়া যাতে বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসী শুধু বৈজ্ঞানিকই হবেন না, শিক্ষক শুধু পণ্ডিতই হবেন না, এবং শুধু অঙ্গবস্ত্র ধারণ করেই কেউ ধর্মযাজক হবেন না।

২। শিক্ষায় বৃত্তিমূলক লক্ষ্যাদির স্থান

কোনো বৃত্তির বিভিন্ন ও আনুষঙ্গিক আধেয়কে মনে রেখে, এবং যে প্রশস্ত পটভূমির উপর কোনো বিশিষ্ট কর্তব্য অভিক্ষেপণ করা হয়, তা মনে

রেখে আমরা এখন কোনো একটি লোকের অধিকতর বৈশিষ্ট্যসূচক কর্ম-শীলতা সংক্রান্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা বিবেচনা করব। (১) নিয়োজনই হল একমাত্র জিনিস যা কোনো লোকের বৈশিষ্ট্যসূচক সামর্থ্যকে তার সমাজ সেবার সঙ্গে প্রতিমান করে। একটি লোক যে কাজের উপযুক্ত, তা বার করা, এবং সেই কাজ করার সুযোগ আদায় করাই হ'ল সুখ-স্বাচ্ছন্দের চাবিকাঠি। কারও জীবনে তার প্রকৃত কর্তব্য আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হওয়া, বা জীবনের পাকে পড়ে, বা অবস্থার চাপে পড়ে কোনো রুচিহীন কর্তব্যে বাধ্য হয়েছে,—এটা দেখতে পাওয়ার থেকে বেশী দুঃখদায়ক আর কিছু নেই। কোনো উপযুক্ত নিয়োজনের সহজ অর্থ হ'ল কারও মানসিক বৃত্তির পর্যাপ্ত সুযোগ করে নেওয়া এবং ন্যূনতম সংঘর্ষ ও সর্বোত্তম পরিতুষ্টি নিয়ে কাজ করা। সমষ্টির অন্যান্য লোকের প্রসঙ্গে এই পর্যাপ্ততার অর্থ অবশ্য এই দাঁড়ায় যে, তারাও ঐ লোকটির কাছ থেকে তাঁর সাধ্যমত,—সর্বোত্তম সেবা পাচ্ছে। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, এমন কি, অর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ক্রীতদাসদের শ্রম শেষপক্ষে অপচয়মূলক ছিল কারণ তাদের তেজোরাশি নির্দেশিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপক ছিল না, এবং কাজেই তার অপচয় ঘটত। অধিকন্তু, যেহেতু দাসেরা কতকগুলি ব্যবস্থিত কর্তব্যে বাঁধা থাকত এবং তাদের অনেকটা মেধাই সমাজের কাছে অপ্রাপ্তব্য ছিল, সেই হেতু তা ছিল ডাহা লোকসান মাত্র। যেখানেই ব্যক্তি তার কাজের মধ্যে নিজেকে দেখতে পায় না সেখানেই কিছু মাত্রায় অপচয় ঘটে এবং এরই স্পষ্ট ও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হল দাস প্রথা। এবং যেখানেই বৃত্তিগুলিকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়, এবং কোনো একটি কৃষ্টির গতানুগতিক আদর্শকে বজায় রাখা হয়, সেখানেই ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে পায় না। মূলতঃ কৃষ্টি সকলের পক্ষেই এক। প্লেটো (পূর্বে দেখুন, ১১৪ পৃঃ) যখন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রতিটি লোকের মধ্যে যা কিছু উত্তম, তা আবিষ্কার করা, এবং তাকে তাতেই চরমোৎকর্ষ লাভের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হল শিক্ষার ন্যস্ত কর্ম, তখন তিনি শিক্ষাদর্শনের মূল নীতিকেই সূত্রস্থ করে-ছিলেন। কারণ এরূপ শিক্ষাই সবচেয়ে সুসামঞ্জস্যের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনও মেটায়। তাঁর এই নীতিসূত্রে কোনো গুণগত ভুল ছিল না,—ভুল ছিল সামাজিকরূপে প্রয়োজনীয় বৃত্তিগুলির ক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁর সীমিত

ধারণার মধ্যে,—দৃষ্টির এমন একটি প্রতিবন্ধের মধ্যে, যা, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে অসংখ্য প্রকারের সামর্থ্য থাকতে পারে, সে কথাটিকে অস্পষ্ট করার পক্ষে প্রতিক্রিয়া করেছিল।

(২) নিয়োজন হ'ল উদ্দেশ্য সম্বলিত কোনো নিরবচ্ছিন্ন কর্মশীলতা। কাজেই নিয়োজনের "ভিতর দিয়ে" শিক্ষা-পদ্ধতি তার নিজের মধ্যেই, অন্য যে কোনো পদ্ধতি অপেক্ষা শিক্ষালাভের সহায়ক অধিকতর উপকরণ সংগ্রহ করে। এটি বিভিন্ন সহজ-প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের স্বচ্ছন্দ পরিচালনকে উৎসাহিত করে; এটি নিষ্ক্রিয় গ্রহণশীলতার শত্রু। এর কোনো একটা-উদ্দেশ্য সামনে থাকে, এবং সেটি হল ফল সম্পাদন করা। কাজেই এটি চিন্তনের প্রতি আবেদন জানায়। এটি দাবি করে যে, কোনো উদ্দেশ্যের ধারণাটিকে অটল-ভাবে বজায় রাখতে হবে, যাতে কর্মশীলতা রুটিন মাফিক বা খামখেয়ালী না হতে পারে। যেহেতু কর্মশীলতার গতি অবশ্যই প্রগতিশীল,—এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে পরিচালিত,—সেইহেতু প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করা, এবং কার্যসাধনের উপায়গুলিকে আবিষ্কার ও পুনরুপ-যোগী করার জন্য প্রতিটি ধাপেই পর্যবেক্ষণ এবং সহজাত বুদ্ধিমত্তার উদ্ভাবনী শক্তির দরকার হয়। সংক্ষেপে, যখন কোনো নিয়োজন এমন সব অবস্থাধীনে অনুধাবন করা হয়, যেখানে শুধু বাহ্যিক ফলটির উপর লক্ষ্য না থেকে লক্ষ্যটি বরং থাকে কর্মশীলতার উপলব্ধির উপরে, তখনই উদ্দেশ্য, স্বার্থবোধ ও চিন্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে যে সব কথা বলা হয়েছে সেই সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হয়। (৮ম, ১০ম ও ১২শ অধ্যায় দেখুন)।

অধিকন্তু, কোনো বৃত্তি অবশ্যম্ভাবীরূপে সংবাদ ও ধারণাবলী এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিগত ক্রমোন্নতির সংগঠনকারী উৎস। বৃত্তি এমন একটি অক্ষ যোগায়, যা বিস্তারিত বিবরণের অপরিমিত বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে ধাবিত। এটি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, তথ্য, ও টুকরো টুকরো খবরকে পরস্পরের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। আইনজীবী, চিকিৎসক, রসায়নের কোনো শাখায় শ্রম-শালার অনুসন্ধানী, পিতামাতা, এবং যে নাগরিক তার নিজের পাড়ায় উৎসাহী,—এদের প্রত্যেকেরই তার বৃত্তির সঙ্গে যা কিছুর সংশ্রব থাকে তাকেই লক্ষ্য করার ও বর্ণনা করার একটা স্থির, ক্রিয়াশীল উদ্দীপক থাকে। তার নিয়োজনের প্রেষণা থেকে সে তার অজ্ঞাতসারেই সকল প্রসঙ্গোচিত

খবরাখবর আহরণ করে, এবং তা মনে রাখে। তার বৃত্তিটি আকর্ষণের চুম্বক ও বেঁধে রাখার আঠা হিসাবে দু-'ভাবেই কাজ করে। জ্ঞানের এরূপ সংগঠন প্রাণবন্ত। কারণ তার সাথে প্রয়োজনের সম্পর্ক থাকে। এটি কর্মক্ষেত্রে এমনভাবে প্রকাশিত ও পুনর্বিন্যস্ত হয় যে, তা কখনো অচল হয়ে পড়ে না। বিশুদ্ধ বিমূর্ত উদ্দেশ্য নিয়ে জ্ঞাতসারে-কৃত তথ্যাবলীর শ্রেণী-বদ্ধতা, নির্বাচন ও বিন্যাস কোনো কালেও সংহতি ও ফলপ্রসূতা হিসাবে কর্মে নিয়োজনের-চাপে-পড়ে-গ্রথিত সংহতি ও ফলপ্রসূতার তুলনায় দাঁড়াতে পারেনা। তুলনাতে প্রথমোক্ত ধরনটি দাঁড়ায় বিধিবৎ, অগভীর ও নিষ্প্রাণ।

(৩) নিয়োজনের "মাধ্যমে" শিক্ষণই, নিয়োজনের "জন্য" শিক্ষার একমাত্র পর্যাপ্ত শিক্ষণ। এই গ্রন্থের প্রথমাংশে (ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন) যে মূল নীতিটি বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই যে, শিক্ষণশীল ক্রিয়া-প্রণালীটিই তার নিজের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য এই যে, অব্যবহিত বর্তমান জীবনের সর্বাধিক সদ্ব্যবহার থেকেই পরবর্তী দায়িত্বের জন্য একমাত্র পর্যাপ্ত প্রস্তুতি আসে। শিক্ষার বৃত্তিমূলক পর্যায়গুলিতে এই নীতিটি পুরোপুরি জোরের সহিত খাটে। সকল মানুষের সর্বকালীন সর্বপ্রধান বৃত্তি হল "জীবন যাত্রা,"—বুদ্ধিগত ও নীতিগত ক্রমবৃদ্ধি। শৈশবে ও কৈশোরে, আর্থিক চাপ থেকে আপেক্ষিক স্বাধীনতা থাকা হেতু, এই সত্যটি নিরাভরণ ও নির্মুক্ত থাকে। ভবিষ্যতের জন্য কোনো নিয়োজন পূর্ব-নির্ধারণ করা, এবং তারই যথার্থ প্রস্তুতির জন্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা করার অর্থ দাঁড়ায়, বর্তমান বিকাশের সম্ভাবনাদির ক্ষতি সাধন, এবং তার ফলে, ভবিষ্যতে কোনো উপযুক্ত পদের জন্য প্রস্তুতির পূর্ণতাকে খর্ব করা। যে মূল নীতিটি বহু কথিত, তারই পুনরাবৃত্তি করে বলা যেতে পারে যে, এরূপ শিক্ষা কোনো রুটিন মাফিক লাইনে যন্ত্রবৎ ক্রিয়া-কৌশলের বিকাশ "করতে পারে" (যদিও তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই, কারণ তাতে অরুচি, বিরক্তি ও বেপরোয়া ভাবের সৃষ্টি হতে পারে), কিন্তু তা সাধিত হবে সেই সমস্ত সতর্ক পর্যবেক্ষণ, এবং সুসম্বদ্ধ ও উদ্ভাবনশীল পরিকল্পনের গুণাবলীর বলিদান করে, যে গুণাবলী কোনো নিয়োজনকে বুদ্ধি-গম্যরূপে পুরস্কৃত করে। কোনো স্বৈরতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজে স্বাধীনতা ও দায়িত্বের বিকাশ রোধ করাই অনেক সময় সচেতন উদ্দেশ্য থাকে। এখানে অল্পলোকে পরিকল্পনা ও হুকুম করে, বাকী লোকেরা নির্দেশ পালন করে

এবং তাদিকে ইচ্ছা করেই চেষ্টার সঙ্কীর্ণ ও ব্যবস্থিত ধারাগুলির মধ্যে কয়েদ রাখা হয়। এ রকমের কোনো প্রকল্প, একটি বিশেষ শ্রেনীর মর্যাদা ও মুনাফা যতোই কায়েম রাখুক না কেন, এ কথা সুস্পষ্ট যে, এই ব্যবস্থা অধীন শ্রেনীদের বিকাশকে সীমিত করে, এবং মালিক শ্রেণীদের পক্ষে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগকে অনমনীয় ও সীমাবদ্ধ করে,— এবং দু'দিক দিয়েই সম্পূর্ণ সমাজ জীবনটিকে ব্যাহত করে। (পূর্বে দেখুন ৩৩৯ পৃঃ)

এর একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা এই যে, বিভিন্ন বৃত্তির জন্য সকল প্রাথমিক প্রস্তুতিকেই প্রত্যক্ষ না হয়ে, পরোক্ষ হতে হবে ; অর্থাৎ ঐ সময়টিতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও আগ্রহ দ্বারা যে নিয়োজন সুচিত হয় বৃত্তিগুলিকে কেবল সেই সব কর্মশীল নিয়োজনের মধ্যেই নিযুক্ত রাখতে হবে। কেবল এই ভাবেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্যক্তিগত উপযোগিতার যথার্থ আবিষ্কৃতি সম্ভব হয়। তাতে করে, জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুধাবনের যথাযথ নির্বাচন সুচিত হতে পারে। অধিকন্তু যতোদিন পর্যন্ত ক্রমোন্নতি চলতে থাকে, ততোদিনই সামর্থ্য ও উপযোগিতার আবিষ্কার করা একটি "অব্যাহত" ক্রিয়াপ্রণালী হয়ে থাকবে। যে মত অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয় যে, পরিণত বয়সের জন্য যে কাজ মনোনীত করতে হবে তা কোনো একটা নির্দিষ্ট তারিখে একচোটেই আবিষ্কৃত হয়ে যায়, সে মতটি গতানুগতিক এবং খামখেয়ালী। ধরা যাক যে, একজনে যেন নিজের মধ্যে আবিষ্কার করল যে, ইন্‌জিনিয়ারিং এর কাজে যে সব জিনিস লাগে, সেগুলিতে তার বুদ্ধিগত ও সমাজগত উৎসাহ আছে, এবং সে ঐ কাজকেই তার পেশা করবে ঠিক করল। খুব বেশী হলে এতে কেবল সেই ক্ষেত্রটির পরিসীমাই কাটা হবে যার মধ্যে পরবর্তী উন্নতি পরিচালিত করা হবে। এটি পরবর্তী ক্রিয়া-কলাপের পরিচালনে ব্যবহার করার জন্য এক রকমের একটি খসড়া রেখাচিত্র। কলম্বাস্ আমেরিকার উপকূল স্পর্শ করে যে অর্থে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন, এটিও সেই অর্থে একটি পেশার আবিষ্কার। কিন্তু অপরিমিতরূপে অধিকতর বিস্তারিত ও ব্যাপক ধরনের ভবিষ্যৎ উদ্‌ঘাটন তখনও করতে হবে। যখন শিক্ষাবিদেরা বৃত্তিমূলক উপদেশকে এমন কিছু বলে ধারণা করেন যে, সেটি কোনো অবধারিত, প্রতিকারহীন ও সম্পূর্ণ

মনোনয়নে পরিচালিত করে, তখন শিক্ষা ও মনোনীত বৃত্তি উভয়েরই অনমনীয় হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাতে পরবর্তী উন্নতিও ব্যাহত হয়। এবং এই ধারণা অনুযায়ীই, নির্বাচিত পেশাও এমন হবে, যা সংশ্লিষ্ট লোকটিকে স্থায়ীরূপে কোনো নিম্নপদভুক্ত রাখবে, এবং সে এমন সব লোকের বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করবে যাদের কাজ অধিকতর নমনীয় পরিচালন ও পুনর্বিন্যাসের উপযুক্ত। এবং যদিও ভাষার চলিত প্রয়োগ পুনর্বিন্যাসের নমনীয় ভঙ্গীকে কোনো নতুন ও বর্ধিত কাজ বলা সমর্থন করে না, তথাপি আসলে তা তাই। যদি পূর্ণবয়স্ক লোকদিকেও এটা দেখতে তৎপর থাকতে হয় যে তাদের কাজ যেন তাদিকে অবরুদ্ধ ও অশ্মীভূত করে না ফেলে, তাহলে শিক্ষককে নিশ্চিতই সতর্ক থাকতে হবে যে, কিশোরদের বৃত্তিমূলক প্রস্তুতি যেন এমন হয় যে, সেটি তাদিকে উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির নিরবচ্ছিন্ন পুনর্গঠনে নিযুক্ত রাখতে পারে।

৩। বর্তমান কালের সম্পদ ও বিপদ

অতীত কালে, শিক্ষাব্যবস্থা, নামের থেকে কাজে, খুব বেশী মাত্রায় বৃত্তিমূলক ছিল। (১) জনসাধারণের শিক্ষা স্পষ্টতঃই প্রয়োগশীল ছিল। তাকে শিক্ষা না বলে শিক্ষা-নবিশি বলা হতো, বা, বলা হতো, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা। যে মাত্রায় পড়তে পারা, লিখতে পারা ও গণনা করতে পারার যোগ্যতা সব রকম শ্রমশীল কাজের মধ্যেই সাধারণ উপাদানরূপে থাকতো, স্কুলগুলি সেই মাত্রাতেই স্বাক্ষরতার প্রতি মনোযোগ দিত। এই শিক্ষার স্কুল-বহির্ভূত পর্যায়টি ছিল, অন্যান্যের পরিচালনার অধীনে কোনো বিশিষ্ট কর্ম-সংস্থায় অংশ গ্রহণ করা। দুটি দিক পরস্পরের পরিপূরণ করত। এক্ষেত্রে স্কুলের কাজটির সঙ্কীর্ণ ও নিয়মিত ধরন, স্পষ্ট ভাষায় যাকে শিক্ষা-নবিশি বলা হয়, তারই মতো কোনো কাজ শেখার একটা অংশ ছিল।

(২) বেশ কিছু মাত্রায়, ক্ষমতাসীন শ্রেণীদের শিক্ষা মূলতঃ বৃত্তিধারী ছিল। কেবল তাঁদের রাজত্ব ও আমোদ-প্রমোদ ঘটিত অনুধাবনগুলিকে পেশা বলা হতো না, এই যা। কারণ কেবল সেই সব জিনিসকেই বৃত্তি বা কর্ম-সংস্থান বলা হতো যার মধ্যে দৈহিক পরিশ্রম থাকতো, থাকতো

পারিতোষিক হিসাবে খাদ্য বা তার বদলে অর্থের, বা, সুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিকে ব্যক্তিগত সেবাদানের জন্য পরিশ্রম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, দীর্ঘকাল যাবৎ অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসকের পেশা, প্রায় ভৃত্য বা ক্ষৌরকারের কাজের সমপর্যায়ভুক্ত ছিল ;—তা আংশিকভাবে এই কারণে যে, ঐ কাজের সাথে শরীরের সংশ্রব বেশী থাকতো, আর আংশিকভাবে এই কারণে যে, এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ সেবাদান করা হতো। কিন্তু যদি শব্দকে নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে তার অন্তর্নিহিত অর্থকে ধরি তা হলে দেখা যাবে যে, সমাজ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিচালন, তা সে রাজনীতিক বা অর্থনীতিক হোক, যুদ্ধেই হোক আর শান্তিতেই হোক, আর সব কিছুর মতোই একটা পেশা। এবং যেখানে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহ্যাশ্রয়ী ছিল না, সেখানে অতীতকালে উচ্চতর বিদ্যালয়গুলি মোটামুটিভাবে এই কাজের জন্য প্রস্তুতি দেওয়া হিসাবেই গণ্য হতো। অধিকন্তু আড়ম্বর, অঙ্গসজ্জা, মর্যাদাসূচক সাহচর্য এবং আমোদ-প্রমোদ ও অর্থব্যয়কে নির্দিষ্ট পেশাই করা হয়েছিল। তাদের অজ্ঞাতসারেই উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিকে ঐ সমস্ত পদের জন্য প্রস্তুতিতে অংশ দেওয়ানো হতো। এমন কি, এখনও যাকে উচ্চশিক্ষা বলা হয়, তা প্রধানতঃ একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য (আগে যেমন ছিল বরং তার থেকে অনেক ছোটো), ঐ সমস্ত অনুধাবনে কার্যকরীরূপে নিযুক্ত হওয়ার প্রস্তুতি।

অন্যান্য বিষয়ে, এই শিক্ষাটির বেশীর ভাগই ছিল, বিশেষতঃ এর উচ্চতম পর্যায়ে, শিক্ষকতা এবং বিশিষ্ট গবেষণার পেশার জন্য শিক্ষণ। যে শিক্ষা অসাধারণ নিষ্কর্মা অনুধাবনের জন্য প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িত, যেমন শিক্ষকতা ও সাহিত্যিক পেশা এবং নেতৃত্ব, এক অদ্ভুত কুসংস্কার বশতঃ, তাকেই অপেশাদারী, এমন কি, অদ্ভুতভাবে কৃষ্টিমূলক বলে মনে করা হয়েছে। যে সাহিত্যিক শিক্ষণ পরোক্ষভাবে লেখক হওয়ার উপযুক্ত করে, তা পুস্তক, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য বা সাময়িক কাগজের প্রবন্ধ লেখকই হোক, সেই শিক্ষাটি বিশেষ করে এই কুসংস্কারের অধীন। তাই বহু শিক্ষক ও লেখক সাংস্কৃতিক ও মানবিক শিক্ষার পক্ষ নিয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যবহারিক শিক্ষণের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লেখেন ও যুক্তি দেখান। তাঁরা দেখতে পান না যে তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষাকে যে উদারপন্থী বলা হয়, তা প্রধানতঃ তাঁদের নিজেদের বিশিষ্ট পেশার জন্যই শিক্ষণ। তারা শুধু তাঁদের নিজ নিজ

কাজকে মূলতঃ সাংস্কৃতিক মনে করার, এবং অন্যান্য নিয়োগের সাংস্কৃতিক সম্ভাবনাগুলিকে উপেক্ষা করার অভ্যাসের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন। যে ঐতিহ্য কেবল সেই সব অনুধাবনকেই নিয়োগরূপে দেখে, যেখানে কেউ তাঁর কাজের জন্য একজন সুনির্দিষ্ট নিয়োগকর্তার কাছেই দায়ী থাকে, কিন্তু চূড়ান্ত নিয়োজক, সমাজের কাছে দায়ী থাকে না, নিঃসন্দেহে সেই ঐতিহ্যই এই প্রভেদীকরণের মূলে বর্তমান রয়েছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরে বর্তমানে জ্ঞানতঃ যে জোর দেওয়া হয়, অর্থাৎ পূর্বে যে সব বৃত্তিমূলক সংশ্লেষ অব্যক্ত ছিল তাকে প্রকট ও যুক্তিপূর্ণ করার দিকে যে ঝোঁক এসেছে, তার কতগুলি স্পষ্ট কারণ রয়েছে। (১) প্রথমতঃ, যা কিছুই দৈহিক শ্রম, বাণিজ্য সংক্রান্ত নিয়োজন, এবং সমাজকে চাক্ষুষ সেবাদানের সঙ্গে জড়িত, তার প্রতিই গণতান্ত্রিক সমাজগুলিতে শ্রদ্ধা এসেছে। তত্ত্বের দিক দিয়ে, স্ত্রী-পুরুষেরা সমাজের কাছ থেকে যে বুদ্ধিগত ও অর্থগত সমর্থন পায়, তার প্রতিদানে, তাঁদের পক্ষ থেকেও কিছু করার প্রত্যাশা করা যায়। শ্রম প্রশংসিত; সেবা বহু-প্রশংসিত নৈতিক আদর্শ। যাঁরা নিরর্থক অসাধারণ জাঁকজমকের জীবনচর্যা করতে পারেন তাঁদের প্রতি এখনও অনেক বাহবা ও ঈর্ষা থাকলেও, উত্তম নৈতিক আদর্শে ওরূপ জীবন নিন্দিত। সময় ও ব্যক্তিগত সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারের জন্য সামাজিক দায়িত্ব আগের থেকে এখন বেশী করে সাধারণ স্বীকৃতি পায়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত বৃত্তি সুনির্দিষ্টরূপে শ্রমশিল্পীয়, বিগত দেড় শতকে সেগুলি প্রচণ্ড গুরুত্বলাভ করেছে। বৃহৎমানে উৎপাদন ও পণ্য-বিনিময় এখন আর কুটির ও অঞ্চলগত নয়, কাজেই কম-বেশী আনুষঙ্গিক ব্যাপারও নয়; পরন্তু তা পৃথিবী-প্রসারী। এগুলি ক্রমাগতই অধিকতর সংখ্যক লোকের সর্বোত্তম কর্মশক্তিকে নিযুক্ত করছে। বৃহৎ উৎপাদক, লেনদেন-কারী ও শিল্পের নায়কেরা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরিচালক হিসাবে বংশগত ভূম্যধিকারীদের স্থান অধিকার করেছে। সামাজিক পুনর্বিন্যাসের সমস্যাটি খোলাখুলি শ্রমশিল্প ভিত্তিক, এবং তা মূলধন ও শ্রমের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। অসামান্য শ্রমশিল্প সংক্রান্ত ক্রিয়া-প্রণালী, সামাজিক গুরুত্বের আত্যন্তিক বৃদ্ধি, স্কুলশিক্ষার সঙ্গে শ্রমশিল্পীয় জীবনের সম্পর্কের প্রশ্নগুলিকে অনিবার্যরূপে অগ্রগণ্য করেছে। বিভিন্ন সামাজিক অবস্থাদি থেকে উত্তরাধিকার

সূত্রে পাওয়া শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে, এবং শিক্ষার সম্মুখে নতুন সমস্যাগুলিকে উপস্থাপিত না করে, এই বিশাল সামাজিক পুনর্বিন্যাস ঘটতে পারে না।

(৩) তৃতীয়তঃ, যে বিষয়টি পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে তা এই যে, রীতির মাধ্যমে যা হস্তান্তরিত হয়, শ্রমশিল্প এখন আর মূলতঃ সে রকম কোনো অভিজ্ঞতালব্ধ হাতুড়ে পদ্ধতি নয়। এর কৌশল এখন প্রযুক্তি বিদ্যা সম্বলিত, অর্থাৎ গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবাণুবিদ্যা ইত্যাদির আবিষ্কার-প্রসূত কল-কৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতিক বিপ্লব, মীমাংসার জন্য বিভিন্ন সমস্যাকে তুলে ধরে যান্ত্রিক সাধকগুলির প্রতি অধিকতর বুদ্ধিগত শ্রদ্ধা জন্মিয়ে, বিজ্ঞান চর্চাকে উদ্দীপিত করেছে। এবং শ্রমশিল্পও বিজ্ঞানের কাজ থেকে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সহ তার পাওনা ফিরে পেয়েছে। তার ফলে, বিভিন্ন শ্রমশিল্পীয় নিয়োজনের মধ্যে পূর্বে যা ছিল, এখন তার থেকে অপরিমেয়রূপে অধিকতর বুদ্ধিগত আধেয় এবং কৃষ্টিগত সম্ভাব্যতা থাকে। এ অবস্থায় যেরূপ শিক্ষা শিল্পকর্মিগণকে তাদের পেশার বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ভিত্তি ও সম্বন্ধগুলির সঙ্গে পরিচয় করাবে, সেরূপ শিক্ষার দাবি অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। কারণ যাদের এরূপ শিক্ষা থাকবে না, তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে, তাদেরই হাত দিয়ে চালানো মেসিনগুলির উপাঙ্গবৎ ভূমিকায় ডুবে থাকবে। পুরানো আমলে কোনো শিল্পে নিযুক্ত সকল কর্মীই তাদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে প্রায় সমান সমান ছিল। অন্ততঃ কোনো একটি সঙ্কীর্ণ পাল্লার মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও উদ্‌ভাবন বিকাশলাভ করত। কারণ কর্মকারটির সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে হাতিয়ার খাটিয়েই কাজটি করা হতো। বর্তমানে হাতিয়ারকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি যোজনা করার পরিবর্তে, মেসিন-চালককেই মেসিনের প্রতি নিজেকে যোজনা করতে হয়। যদিও শ্রমশিল্পের বুদ্ধিধর্মী "সম্ভাব্যতা" অনেকগুণ বেড়েছে, তথাপি তার ব্যবস্থা এমন হয়েছে যে, যেকালে স্থানীয় বাজারের জন্য হাতের জিনিস তৈরী হতো সে কালের থেকে বর্তমানে শিল্পের শিক্ষামূলক সঙ্গতিটি বৃহৎ জনসমষ্টির কাছে কমে গেছে। কাজের মধ্যে যে বুদ্ধিধর্মী সম্ভাব্যতাগুলি বাস করে তাকে রূপ দেওয়ার ভার, ফিরে আবার স্কুলের ঘাড়েই পড়ছে।

(৪) চতুর্থতঃ, জ্ঞানানুধাবন করা, বিজ্ঞানের জন্য অধিকতর পরীক্ষা-

নিরীক্ষামূলক হয়েছে ; এটি কেতাবী ঐতিহ্যের উপর কম নির্ভরশীল, এবং যুক্তি-তর্কের আলোচনাধর্মী পদ্ধতি ও প্রতীকের সঙ্গেও কম সংশ্লিষ্ট। তার ফলে, শিল্পবৃত্তির বিষয়-বস্তু কেবল পূর্বাপেক্ষা বেশী বৈজ্ঞানিক আধেয়কেই উপস্থাপিত করে না, পরন্তু যে পদ্ধতিতে জ্ঞান গড়ে ওঠে, তার সাথেও নিবিড়তর পরিচিতির অধিকতর সুযোগ যোগায়। অবশ্য, কারখানার সাধারণ কর্মীর উপরে অব্যবহিত আর্থিক চাপ এত বেশী থাকে যে, শ্রমশালার কর্মীর মতো জ্ঞান গঠন করার সুযোগ সে পায় না। কিন্তু বিদ্যালয়ে কল-কৌশল ও শিল্প-পদ্ধতির সঙ্গে এমন অবস্থাধীনে পরিচিতি ঘটানো যেতে পারে যাতে শিক্ষার্থীদের মুখ্য সংজ্ঞাত সংশ্লিষ্টতা থাকে সূক্ষ্মদৃষ্টির মধ্যে। যেখানে এই অবস্থাটি বর্তমান, সেখানে পাঠশালা ও শ্রমশালার ভিন্নতা অধিকাংশই রীতিগত ; একটা সমস্যা যদি কোনো বুদ্ধিগম্য স্বার্থের ইঙ্গিত বহন করে, শ্রমশালায় তার অনুধাবনের সুযোগ থাকে ; পাঠশালাতে, একটি বৈজ্ঞানিক মূল নিয়মের সামাজিক সংশ্লিষ্টতার প্রতি জোর দেওয়ার সুবিধা থাকে,—আর সুবিধা থাকে, অনেক বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে, আরও একটু প্রাণবন্ত উৎসাহ যোগানোর।

(৫) শেষ কথা এই যে, শিক্ষালাভ ক্রিয়ার সাধারণ ক্ষেত্রে এবং শিশুকালের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান যে অগ্রগতি লাভ করেছে, তা জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে শ্রমশিল্পের বর্ধিত গুরুত্বের সঙ্গে এক সারিতে পড়ে। কারণ আধুনিক মনোবিজ্ঞান, বহিরানুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও "করে দেখা" সম্বলিত আদিম প্রাক্-শিক্ষালব্ধ সহজ-প্রবৃত্তির মৌলিক গুরুত্বের উপর জোর দেয়। মনোবিজ্ঞান ব্যক্ত করে যে, জ্ঞানলাভ-ক্রিয়াটি "মন"-নামক কোনো আদিভূত জিনিসের ক্রিয়া নয়, পরন্তু মনটি নিজেই তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে আদিম সামর্থ্যগুলির একটি সংগঠন। পূর্বেই যেরূপ দেখেছি, (পূর্বে, ২২৫ পৃঃ) স্থূল আদিম ক্রিয়া-কলাপের শিক্ষামূলক বিকাশের ক্ষেত্রে ছোটো শিক্ষার্থীদের কাছে খেলাধুলা যে স্থান অধিকার করে, বড়ো শিক্ষার্থীদের কাছে শ্রমশীল কাজও সেই স্থান অধিকার করে। অধিকন্তু, খেলা থেকে কাজের মধ্যে চলার গতি ক্রমানুবর্তী হওয়া উচিত। তার মধ্যে মনোভাবের কোনো আমূল পরিবর্তন থাকবে না ; থাকবে, খেলার উপাদানগুলিকে শ্রমশীল কাজের মধ্যে বহন করা ; আর থাকবে, অধিকতর নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন পুনর্গঠনের কাজ।

পাঠক এই মন্তব্য করবেন যে, এই পাঁচটি বিষয় কার্যতঃ এই গ্রন্থের পূর্বতন অংশের মুখ্য বিতর্কের বিষয়গুলির পুনরুল্লেখ মাত্র। ব্যবহারিক ও দার্শনিক উভয়রূপেই, বর্তমান শিক্ষা-পরিস্থিতির চাবিকাঠি রয়েছে বিদ্যালয়ের জিনিস-পত্র ও পদ্ধতিগুলির ক্রমিক পুনর্গঠনের মধ্যে, যাতে করে সামাজিক পেশাগুলির অনুরূপ নানাবিধ নিয়োজনের সদ্ব্যবহার করা যায়; এবং সেগুলির বুদ্ধিগত ও নীতিগত আধেয়কে ব্যক্ত করা যায়। এই পুনর্গঠন, পাঠ্যপুস্তক সহ বিশুদ্ধ সাহিত্যিক এবং আলোচনাধর্মী পদ্ধতিগুলিকে, পর্যায়-ক্রমিক ও ক্রমপুঞ্জিত ক্রিয়া-কলাপের বুদ্ধিগম্য বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়ক সাধকের স্থানে স্থানান্তরিত করবে।

কিন্তু আমাদের আলোচনা এই বিষয়টির উপর জোর দেয় যে, শিক্ষার এই পুনর্গঠন বিভিন্ন শ্রমশিল্প ও ব্যবসা বর্তমানে যে ভাবে কাজ করছে, তার জন্য কারিগরি প্রস্তুতি দিতে চেষ্টা করলে সম্পাদিত হবে না; এবং স্কুলে শুধু উপস্থিত শ্রমশিল্পীয় অবস্থাগুলির প্রবর্তন করে তো নয়ই। সমস্যাটি, বিদ্যালয়কে বৃহৎ মানে উৎপাদন ও ব্যবসায়ের আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান করা নয়। সেটি হল স্কুল-জীবনকে অধিকতর কর্মশীল, অধিকতর অব্যবহিত রূপে অর্থপূর্ণ এবং স্কুল-বহির্ভূত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অধিকতর যোগ-স্থাপনের জন্য শ্রমশিল্পের উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার করা। সমস্যাটির মীমাংসা সহজ নয়। এর স্থায়ী বিপদ এই যে, শিক্ষাব্যবস্থা, বাছাই করা কয়েকজনের স্বার্থে প্রাচীন ঐতিহ্যকে চিরস্থায়ী রাখবে, এবং আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিল্পসংস্থার পরিবর্তনহীন, যুক্তিহীন ও সমাজতন্ত্রহীন পর্যায়গুলির কাছে কমবেশী নতি স্বীকার করার ভিত্তিতেই নবতর অর্থনীতিক ব্যবস্থার সহিত শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয় বিধান করে নেবে। ঠিক ঠিক ভাবে বলতে গেলে, বিপদ এই যে, বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকরূপে ব্যাপারী শিক্ষা বলে ব্যাখ্যা করা হবে,—গণ্য করা হবে বিশেষ প্রকারের ভবিষ্যৎ পেশার জন্য কারিগরি কর্মকুশলতা পাবার উপায়রূপে।

এ অবস্থায়, শিক্ষাব্যবস্থা, বর্তমান শিল্পভিত্তিক সমাজ বিন্যাসের রূপান্তর ঘটানোর মাধ্যমরূপে কাজ করার পরিবর্তে, বর্তমান ব্যবস্থাকেই চিরায়ত করার কোনো যন্ত্রে পরিণত করবে। বাঞ্ছিত রূপান্তরকে বিধিবদ্ধভাবে সংজ্ঞায়ন করা কঠিন নয়: রূপান্তরিত সমাজ এমন একটি সমাজ সূচিত

করে, যার মধ্যে প্রতিটি লোকই এমন কিছুতে নিযুক্ত থাকবে যা অন্যান্যের জীবন যাত্রাকে অধিকতর সার্থক করবে, এবং তদনুযায়ী, যে সকল গ্রন্থি লোককে গ্রথিত করে সেগুলি অধিকতর বোধগম্য হবে, এবং যা, লোকের মধ্যে দূরত্বের প্রতিবন্ধকগুলি ভেঙে ফেলবে; আরও এমন একটি অবস্থা সূচিত করে যার মধ্যে প্রত্যেকেই তার কাজের উৎসাহ পাবে বাধ্যতাহীন এবং বুদ্ধিগম্য ভাবে। এর ভিত্তি থাকবে নিজের রুচির উপযোগিতার উপর। বলা বাহুল্য যে, আমরা এ রকমের একটি সামাজিক রাষ্ট্র থেকে বহুদূরে আছি; আক্ষরিক ভাবে ও পরিমাণগত অর্থে আমরা এতে না পৌঁছাতেও পারি। কিন্তু নীতিগত ভাবে, যে সামাজিক পরিবর্তনটি এর মধ্যেই সাধিত হয়েছে, সেটির গতি এই দিকেই। পূর্বের যে কোনো কালের তুলনায়, বর্তমান কালে এই পরিবর্তন সাধনের অনুকূলে অনেক বেশী এবং প্রচুর পরিমাণ সঙ্গতি বর্তমান। বৌদ্ধিক সঙ্কল্প থাকলে একে বাস্তবে পরিণত করার পক্ষে কোনো অলঙ্ঘনীয় বাধা থাকে না।

একে বাস্তবে পরিণত করার সাফল্য বা ব্যর্থতা আর যে কোনো কিছু থেকে বেশী নির্ভর করে, পরিবর্তন সাধনের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের উপরে। কারণ মূলতঃ, পরিবর্তনটি হল মানস-প্রকৃতির গুণগত পরিবর্তন —একটি শিক্ষামূলক পরিবর্তন। তাতে অবশ্য এটা বোঝায় না যে, শ্রমশিল্পীয় ও রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে পৃথকভাবে, সরাসরি আদেশ উপদেশ দিয়ে আমরা মন ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে পারি। সে রকমের কোনো ধারণা আমাদের এই মৌলিক ধারণাটিরই প্রতিবাদ করে যে, সামাজিক বিষয়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারী সাড়ার মনোভাবই হল,—চরিত্র ও মন। তাতে অবশ্য এটা বোঝায় যে, আমরা যে নমুনার সমাজকে বাস্তবে পরিণত করতে চাই, বিদ্যালয়ে আমরা তারই একটি অভিক্ষেপণ সৃষ্টি করতে পারি, এবং সেই অনুযায়ী মন গঠন করে নিয়ে, ক্রমে ক্রমে সাবালক সমাজের বৃহত্তর এবং অধিকতর অপরিণামদর্শী রূপকে বদলাতে পারি।

ভাবাবেগের দিক দিয়ে কথাটা কটু শোনাতে পারে যে, বর্তমান আমলের বৃহত্তম দোষ দারিদ্র ও তার সঙ্গে জড়িত দুর্ভোগের মধ্যে দেখা যাবে না, দেখা যাবে এই বিষয়টির মধ্যে যে, বহু লোকের পেশাই তাদের মনে কোনো সাড়া জাগায় না, এবং তাতে যে আর্থিক পুরস্কার আনে, কেবল তার জন্যেই

তারা তাতে লেগে থাকে। কারণ এই ধরনের পেশা অনবরত বিরক্তির সঞ্চার করে, অসদ্ভাব সৃষ্টি করে, এবং উপেক্ষা করা ও এড়িয়ে যাবার প্রবৃত্তি জাগায়। লোকের কাজে তাদের মনও থাকে না, ও প্রাণও থাকে না। পক্ষান্তরে, যাঁরা বিষয়-আশয়ের দিক দিয়ে খুব সচ্ছল, এবং অত্যধিকরূপে, প্রায় একচেটিয়া ভাবে বহু লোকের ক্রিয়া-কলাপকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরাও সামাজিক আদান-প্রদানের সমতা ও সর্বজনীনতা থেকে রুদ্ধ থাকেন। তাঁরা অসংযম ও আড়ম্বরের প্রতি প্ররোচিত হন; তাঁরা অন্যান্য লোকের উপর শক্তি, বৃহত্তর সম্পদ ও ভোগবিলাসের ছায়ামূর্তি রচনা করে লোকের কাছ থেকে তাঁদের দূরত্বের ব্যবধানটি পূরণ করতে চেষ্টা করেন।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোনো সঙ্কীর্ণরূপে পরিকল্পিত প্রকল্প এই বিভেদকে দৃঢ়ভাবে চিরস্থায়ী করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব করতে পারে। সামাজিক নিয়তি সম্বলিত কোনো অনুশাসনের উপর দাঁড়িয়ে, এই প্রকল্প এটাই ধরে নেবে যে, বর্তমানের মতো অর্থনীতিক অবস্থায় কতক লোককে দিন-মজুর হয়েই থাকতে হবে; সে প্রকল্প এই সব লোককে কেবল কোনো একটা ব্যাপারী শিক্ষা, অর্থাৎ বেশী কারিগরি কর্মকুশলতা দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখবে। অবশ্য, কারিগরি উৎকর্ষ অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না, এবং সব দিক দিয়েই তা থাকা নিশ্চিতরূপে বাঞ্ছনীয়,—তা কেবল কম খরচে ভালো জিনিস তৈরী করার জন্যই নয়, কাজের মধ্যে যে বেশী পরিতুষ্টি পাওয়া যায় তার জন্যেও বটে। কারণ যার কোনো কাজের যোগ্যতা নেই তাঁর কোনো আগ্রহও থাকে না। কিন্তু অব্যবহিত কাজের মধ্যে উৎকর্ষ সীমিত থাকা, এবং কাজের সামাজিক সংশ্লিষ্টতার মধ্যে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিকে প্রসারিত করার পারদর্শীতা,—এ দুটির মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য থাকে,—পার্থক্য থাকে অন্যের পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার, আর নিজের পরিকল্পনাকে গঠন করার কর্মকুশলতার মধ্যে। বর্তমানে, বুদ্ধি ও প্রক্ষোভগত সীমাবদ্ধতা নিয়োজক ও নিযুক্ত উভয় শ্রেণীকেই সুচিহ্নিত করে। নিযুক্ত শ্রেণীর যেমন টাকা পাওয়া ছাড়া তাদের নিয়োজনের সঙ্গে সচরাচর আর কোনো সম্পর্ক থাকে না, তেমনি নিয়োজক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী কেবল মুনাফা ও ক্ষমতাতেই নিবদ্ধ থাকতে পারে। শেষোক্ত স্বার্থের মধ্যে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিধর্মী উদ্যোগ ও অবস্থাদির ব্যাপকতর নিরীক্ষা থাকে। কারণ তার মধ্যে বহুসংখ্যক

বিচিত্র উপকরণের পরিচালন ও সমাবেশ থাকে,—মজুরির স্বার্থটি সীমাবদ্ধ থাকে সরাসরি কতকগুলি পেশী সঞ্চালনের মধ্যেই। তা সত্ত্বেও, উদ্যোগের মধ্যে সামাজিক সংশ্লিষ্টতা যতোদূর কম থাকে, বুদ্ধিবৃত্তিও ততোদূরই যন্ত্রবৎ, অমানবিক ও অনুদার ধারাতে সীমাবদ্ধ থাকে। এবং যখন অনু-প্রাণিত হওয়ার মতলবটি ব্যক্তিগত মুনাফা ও ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাসনা মাত্র হয়ে থাকে, তখন এই সীমাবদ্ধতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, যাঁরা অর্থের দিক দিয়ে হতভাগ্য, যাঁদের অপর লোকের বিষয়াদির একতন্ত্রী নিয়ন্ত্রণের নির্মমকারী প্রতিফলের অভিজ্ঞতা হয়নি, অব্যবহিত সামাজিক সমবেদনা ও মনুষ্যত্বপূর্ণ মানসত্ত্বের সুবিধা অনেক সময় তাঁদের মধ্যেই থাকে।

বর্তমান শ্রমশিল্পীয় জমানা থেকে শুরু করলে, যে কোনো শিক্ষাপ্রকল্পই এই জমানার ভেদ-বিভেদ ও দুর্বলতা মেনে নেওয়ার ও তাকে চিরস্থায়ী করার সম্ভাবনা আনবে, এবং এইভাবে, সামাজিক নিয়তিমূলক সামন্ত-তান্ত্রিক নীতি-নিয়মকে কাজে পরিণত করার যন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে। যাঁরা তাঁদের ইচ্ছা সফল করার মতো পদে অধিষ্ঠিত, তাঁরা কোনো উদার ও কৃষ্টিমূলক নিয়োজন দাবি করবে; সে হবে এমন কোনো নিয়োজন যা, তাঁরা যে সব যুবকের ব্যাপারে আগ্রহশীল, তাদিকে পরিচালনকারী ক্ষমতার উপযুক্ত করবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে অন্যান্য কম ভাগ্যবান লোককে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপারী প্রস্তুতির জন্য শিক্ষা দেওয়ার অর্থ দাঁড়ায়, বিদ্যালয়-গুলিকে, শ্রম ও বিশ্রাম, কৃষ্টি ও সেবা, মন ও দেহ, পরিচালিত ও পরি-চালক শ্রেণী সম্বলিত প্রাচীন বিভেদকে নামেমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে স্থানান্তরিত করার যন্ত্র বলে গণ্য করা। এ ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও ক্রিয়া-প্রণালীর বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক, মানবীয় যোগসূত্রাদির মূল্যকে অবশ্যম্ভাবীরূপে বাদ দেয়। সঙ্কীর্ণ ব্যাপারী শিক্ষার মধ্যে এ সব বিষয়কে ধরা কেবল সময় নষ্ট করা। কারণ এ সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো "ব্যবহারে" লাগবে না। এ সব বিষয় তাঁদের জন্য জমা থাকবে যাঁদের হাতে সময় আছে—অর্থাৎ উত্তম আর্থিক সঙ্গতি থাকার দরুন অবকাশ আছে। এমন কি, এ সব জিনিস পরিচালক শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষেও বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ যাঁরা অন্যের পরিচালনাধীনে কাজ করে, এতে তাদের মনে অসন্তোষ বা 'পদের অতিরিক্ত' উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাতে

পারে। কিন্তু যে শিক্ষা কোনো নিয়োজনের বুদ্ধিধর্মী ও সমাজধর্মী তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দেয়, তার মধ্যে হালের অবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমির শিক্ষা থাকা চাই—থাকা চাই বিজ্ঞান শিক্ষা, যাতে জিনিসপত্র ও উৎপাদন-সূত্রগুলি নিয়ে কাজ করার মধ্যে বোধবুদ্ধি ও উদ্যোগ জাগতে পারে। এতে রাখতে হবে অর্থনীতি, পৌরনীতি ও রাষ্ট্রনীতির শিক্ষা, যাতে ভবিষ্যৎ কর্মী, সমসাময়িক সমস্যা ও তার উন্নতি-কল্পে যে সব পদ্ধতির প্রস্তাব ওঠে, তার সংস্পর্শে আসতে পারে। সর্বোপরি, এই শিক্ষা পরিবর্তনশীল অবস্থাদির প্রতি পুনর্যোজনা করার ক্ষমতা লাভের শিক্ষা দেবে, যাতে ভবিষ্যৎ কর্মীরা তাদের উপর চাপিয়ে-দেওয়া নিয়তির কাছে অন্ধভাবে হার না মানে। এই আদর্শকে কেবল বর্তমান শিক্ষাসংক্রান্ত ঐতিহ্যের জড়ত্বের সঙ্গেই যুঝতে হয় না, পরন্তু যাঁরা শ্রমশিল্পের কল-কবজার উপর সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে আসীন, যাঁরা বোঝেন যে, এ রকমের শিক্ষাব্যবস্থা যদি সর্বজনীন করা হয় তাহলে তা তাঁদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অন্যান্য লোককে ব্যবহার করার ক্ষমতার প্রতিও হুমকি দেখাবে, আদর্শটিকে তাঁদের বিরোধিতার সঙ্গেও যুঝতে হয়।

কিন্তু ঠিক এই সত্যটিই একটি অধিকতর সাম্যবাদী ও সংস্কার-বিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার পূর্বলক্ষণ ইঙ্গিত করে। কারণ তা শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের উপরে সমাজ ব্যবস্থার পুনঃসংগঠনের নির্ভরশীলতার সাক্ষ্য দেয়। কাজেই যাঁরা কোনো উন্নততর ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, এই অবস্থাটি তাদিকে এমন একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষার পৃষ্ঠপোষণে উৎসাহিত করে, যা যুবগণকে বর্তমান ব্যবস্থার দাবি ও মানদণ্ডের বশবর্তী করবে না, পরন্তু যেটি এর বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার করবে, সৎসাহসিক বুদ্ধির বিকাশসাধন করবে, এবং বুদ্ধিকে ব্যবহারিক ও কর্মকুশল করবে।

সারাংশ

যে কোনো ধরনের নিরবচ্ছিন্ন কর্মশীলতাই অন্যান্যকে সেবাদান করে এবং কোনো ফল সৃষ্টি করার পক্ষে ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে নিয়োজিত করে, তাই বৃত্তি শব্দটির তাৎপর্যকে সূচিত করে। চিন্তনের সঙ্গে দৈহিক কর্ম তৎপরতার সম্পর্কে

ইতিপূর্বে যে সমস্ত সমস্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে, শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তির সম্পর্কের প্রশ্নটি সেই সমস্যাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে; যেমন, সঙ্ঘবদ্ধ জীবন-যাত্রার সঙ্গে প্রাতিস্বিক সচেতন বিকাশের সম্বন্ধ; নির্দিষ্ট পরিণাম সম্বলিত ব্যবহারিক আচরণের সঙ্গে তাত্ত্বিক কৃষ্টির সম্বন্ধ; বিশ্রামের সার্থক উপভোগের সঙ্গে জীবিকা অর্জনের সম্বন্ধ। শিক্ষা ক্ষেত্রে (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া-লেখা—গণনার উপযোগিতা ছাড়া) জীবনের বৃত্তিমূলক পর্যায়গুলির প্রতি বিরোধিতা, অতীত কালের অভিজাত আদর্শকে সংরক্ষণ করার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বর্তমান সন্ধিক্ষণে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামে একটা-কিছুর জন্য যে আন্দোলনটি চলছে, তা যদি কার্যে পরিণত হয়, তা হলে ঐ সব আদর্শই বর্তমান শ্রমশিল্পীয় বিধিব্যবস্থার উপযোগী কোনো একটা আকারে কাঠিন্য লাভ করবে। এই আন্দোলন, অল্পসংখ্যক সচ্ছল লোকের ভোগের উপযুক্ত কোনো ঐতিহ্যগত উদার বা কৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থাটিকে চালু রাখবে; এবং জনসাধারণকে দেবে,—অন্যের শাসনাধীনে পরিচালিত বিশিষ্ট পেশার জন্য কোনো সঙ্কীর্ণ, কারিগরি, ব্যাপারী শিক্ষা। অবশ্যই, এরূপ প্রকল্প কেবল প্রাচীন সামাজিক বিভেদের,—তার প্রতিরূপ বুদ্ধি ও নীতি সম্বলিত দ্বৈতবাদ সহ,—চিরস্থায়িত্ব সূচিত করে। কিন্তু এর অর্থ দাঁড়ায়, যে অবস্থায় একে রাখার ন্যায্যতা অনেক কমে গেছে সেই অবস্থাতেই এর ক্রমগতিকে বজায় রাখা। কারণ শ্রমশিল্পীয় জীবন এখন বিজ্ঞানের ওপর এত নির্ভরশীল, এবং তা সর্বপ্রকারের সামাজিক আদান-প্রদানকে এত নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করে যে, মন ও চরিত্রের বিকাশকল্পে শিল্পের সদ্ব্যবহার করার একটা সুযোগ এসেছে। অধিকন্তু, শিল্পের যথাযথ শিক্ষামূলক প্রয়োগ, বোধশক্তি ও আগ্রহের উপর এমনভাবে প্রতিক্রিয়া করবে যে, আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের সম্পর্কে, সেটি বর্তমান শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের বিধি-ব্যবস্থার সমাজগত কুৎসিত দিকগুলির পরিবর্তন সাধন করবে। শিক্ষায় শিল্পের প্রয়োগ, সামাজিক সমবেদনার বর্ধনশীল ভাণ্ডারকে কোনো অন্ধ লোকহিতের ভাবরসে ফেলে না রেখে, তাকে গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত করবে। যারা শ্রমশিল্পীয় পেশায় নিযুক্ত হবেন, এই শিক্ষা তাদিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা ও যোগ্যতা দেবে। যে সমস্ত কারিগরি ও যান্ত্রিক রূপরেখা আমাদের উৎপাদন ও বণ্টনের কল-কৌশলী ব্যবস্থার একটা সুনির্দিষ্ট রূপকে চিহ্নিত

করে, এই শিক্ষা সেগুলিকে তাৎপর্য দিয়ে পরিপৃক্ত করতে সমর্থ হবে। যাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধাদি এখন কম, এই তো গেল তাদের কথা। সমাজের বিশেষ সুবিধাসম্পন্ন অংশের প্রতিনিধিদের পক্ষে এই শিক্ষা শ্রমিকদের প্রতি সমবেদনা বৃদ্ধি করবে,—মনের এমন কোনো প্রবণতা সৃষ্টি করবে যে তাতে প্রয়োগমূলক কর্মশীলতার মধ্যেই কৃষ্টিসাধক উপাদান-গুলিকে আবিষ্কার করতে, এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে। অন্য কথায়, বর্তমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশ্নটি এই কারণে সমস্যাকীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এটি দুটি মৌলিক প্রশ্নকে একটি সুনির্দিষ্ট বিচার্য বিষয়ের মধ্যে একত্র করে:—এর একটি হল, যে কর্মশীলতা ভৌত প্রকৃতিকে মানুষের ব্যবহারে নিয়োগ করে, সেই কর্মশীলতা থেকে পৃথক হয়ে, না, তার ভিতরে থেকে, বোধশক্তিকে সর্বোত্তমরূপে খাটানো যায়; এবং ব্যক্তিগত কৃষ্টি, স্বয়ংগত ভাবে, না সমাজগত ভাবে, সর্বোত্তমরূপে লাভ করা যায়। এই অধ্যায়ে সে সূক্ষ্ম বিবরণের আলোচনা করা হয়নি, কারণ এই সিদ্ধান্তটি পূর্ববর্তী পঞ্চদশ থেকে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের আলোচনারই সার সংক্ষেপ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শিক্ষা দর্শন

১। সমীক্ষা

শিক্ষা দর্শন নিয়ে বিচার-বিবেচনা করলেও এ পর্যন্ত দর্শনের কোনো সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়নি; এবং শিক্ষা দর্শনের স্বরূপও পরিষ্কার করে তুলে ধরা হয়নি। বিচার্য দার্শনিক বিষয়গুলির উদ্‌ঘাটন উদ্দেশ্যে, আগেকার আলোচনার মধ্যে যে অব্যক্ত যৌক্তিক ধারাটি রয়েছে, এখন তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গটির সূত্রপাত করা হচ্ছে। পরে, শিক্ষার বিভিন্ন আদর্শ যেভাবে ক্রিয়া করে—তার স্বরূপ নির্ণয়ে তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও নীতিতত্ত্বগুলিকে বিশিষ্ট দার্শনিক ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা করব।

যুক্তির বিচারে, পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি তিন অংশে পড়ে। (১) প্রথম দিকের অধ্যায়গুলিতে, সামাজিক প্রয়োজন ও সামাজিক কর্তব্য হিসাবে শিক্ষার বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হ'ল, যে ক্রিয়া-প্রণালী অবলম্বন করে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, তাদের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায় রাখে, তার অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ রূপরেখা অঙ্কিত করা। এতে দেখান হয়েছে যে, শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার তাৎপর্যগুলির এক প্রকারের নবীকরণ ক্রিয়া-প্রণালী, এবং সেটি সম্পাদিত হয় কোনো এক প্রবহণ ক্রিয়া-প্রণালীর ভিতর দিয়ে। তা আংশিকভাবে আনুষঙ্গিক,—সাবালক ও নাবালকদের নিত্যকার আদান-প্রদানের মাধ্যমে ঘটে। আর আংশিক ভাবে তা মনস্থকরা,—খাটানো হয় সামাজিক নিরবচ্ছিন্নতা সাধনের জন্য। দেখা গেছে যে, এই ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে অপরিণত লোকটি এবং তাঁর সহবাসী গোষ্ঠী উভয়েরই নিয়ন্ত্রণ ও ক্রমবিকাশ থাকত।

এই বিবেচনা কিন্তু বহিরঙ্গের ব্যাপার। কারণ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমাজটির গুণের কোনো বিশিষ্ট বর্ণনা ছিল না,—অর্থাৎ যে "জাতীয়" সমাজ শিক্ষার মাধ্যমে তার চিরস্থায়িত্ব কামনা করে এতে তার কোনো বর্ণনা

ছিল না। তারপরে, এই সাধারণ আলোচনাটিকে, সেই সব বিশিষ্ট সমষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যারা সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে উন্নতিগামী হতে থাকে, এবং যারা পারস্পরিক অংশীদারী স্বার্থের অধিকতর বিচিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখে; এবং যাদের সাথে অন্য যে সব সমষ্টি কেবল তাদের রীতিনীতির সংরক্ষণের প্রতিই লক্ষ্য রাখে, তাদের পার্থক্য থাকে। দেখা গেছে যে, ঐ জাতীয় সমাজের গণতান্ত্রিক গুণ থাকে। কারণ ওরূপ সমাজ কোনো উত্তমর্ণ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে প্রধানতঃ রীতির শাসনের উপর বিশ্বাস রাখার পরিবর্তে, তাদের নিজেদের লোকদের অধিকতর স্বাধীনতা দেয় এবং লোকের মধ্যে একটি সংজ্ঞাত সমাজধর্মী স্বার্থবোধ আনবার জন্য সংজ্ঞাত প্রয়োজনবোধকে ধরে রাখে। পরে আমরা, যে ধরনের শিক্ষা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত, তাকেই শিক্ষা ব্যবস্থার আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মানদণ্ডরূপে প্রকাশ্য ভাবে বিবেচনা করেছি। (২) দেখা গেছে যে, গণতান্ত্রিক মানদণ্ড-ভিত্তিক এই বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, বা পুনঃসংগঠনের একটি আদর্শ ইঙ্গিত বহন করে। এবং সেটির স্বরূপ হল এই যে, তা অভিজ্ঞতার স্বীকৃত অর্থকে, বা সামাজিক আধেয়কে বর্ধিত করে। শুধু তাই নয়, পরন্তু, সেটি এই পুনঃসংগঠনের নির্দেশকারী অভিভাবকরূপে লোকের কাজ করার সামর্থ্যকে বর্ধিত করে (৬ষ্ঠ-৭ম অঃ দেখুন)। অতঃপর আমরা এই পার্থক্যটিকে যথাক্রমে বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতির স্বরূপ অঙ্কনে প্রয়োগ করেছি। এই ভাবে বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতির একত্ব স্থির করা হয়েছিল, কারণ এই ভিত্তি অনুসারে পড়া ও শেখার ক্ষেত্রে পদ্ধতি হ'ল কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়-বস্তুর পুনঃসংগঠনের একটা সজ্ঞানে-পরিচালিত গতি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষালাভের পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তুর প্রধান প্রধান নিয়মগুলির বিকাশ সাধিত হয়েছিল (১৩শ-১৪শ অঃ)।

(৩) বৈসাদৃশ্যের ওপর জোর রেখে, মূল নিয়মগুলিকে চিত্রিত করার জন্য পরিকল্পিত আনুষঙ্গিক সমালোচনা ছাড়া, আলোচনাটির এই পর্যায়ে, গণতান্ত্রিক মানদণ্ডটিকে এবং বর্তমান সমাজে তার প্রয়োগকে, বিনা বিচারেই মেনে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে (১৮শ-২৩শ অঃ), একে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষেত্রে বর্তমানের সীমিত অবস্থাকে বিবেচনা করেছি। দেখা গেছে যে, সীমিতাবস্থা এই ধারণাটি থেকে উদয় হয় যে, অভিজ্ঞতা

কতকগুলো ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের, বা ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের বিচিত্র সমষ্টি। এদের প্রত্যেকটিরই এক একটি স্বতন্ত্র মূল্য, উপাদান ও পদ্ধতি থাকে, যার প্রতিটিই আবার অন্যটিকে সংযত রাখে, এবং যখন প্রতিটিকে আর সব ক'টি দিয়ে যথা নিয়মে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, কেবল তখনই শিক্ষাক্ষেত্রে এক রকমের "শক্তিসাম্য" গঠিত হয়। তারপরে, এই পৃথকীকরণের মূলে যে সব অঙ্গীকার রয়েছে, সেগুলিরও বিশ্লেষণ করেছি। আমরা দেখেছি যে, ব্যবহারিক দিক থেকে এর কারণ রয়েছে সমাজকে কম-বেশী দৃঢ়রূপে সুচিহ্নিত কতকগুলি শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগত ভাগ-বিভাগ করার মধ্যে ;—অন্যভাবে বললে বলতে হয় যে, পরিপুর্ণ ও নমনীয় সমাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও আদান-প্রদানের প্রতিবন্ধকের মধ্যেই এর কারণ রয়েছে। দেখা গেছে যে, নিরবচ্ছিন্নতার এই সামাজিক ছেদ-ভেদ তার বুদ্ধিগত সূত্রায়ন পেয়েছে নানাবিধ দ্বৈতবাদ বা বিরোধাভাসের মধ্যে,—যেমন, শ্রম ও বিশ্রাম, ব্যবহারিক ও বুদ্ধিশীল কর্মশীলতা, মানুষ ও প্রকৃতি, প্রাতিস্বিকতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা, এবং কৃষ্টি ও বৃত্তি ইত্যাদির বিরোধের মধ্যে। এই আলোচনার মধ্যে আমরা দেখেছি যে, এই সব বিভিন্ন উপফলের প্রতিরূপ রয়েছে সেই সব সূত্রায়নের মধ্যে, যেগুলি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিভিন্ন দার্শনিক তন্ত্র অনুযায়ী করা হয়েছে। এবং এগুলির মধ্যেই রয়েছে দর্শনের বিভিন্ন সমস্যা—যেমন মন (বা আত্মা) ও বস্তু, দেহ ও মন, মন ও জগৎ, ব্যক্তি ও তার লোক-সম্পর্ক, ইত্যাদি। আরও দেখেছি যে, এই সব বিভেদের পিছনে যে মৌলিক অঙ্গীকারটি রয়েছে, সেটি হ'ল এই যে, যে কর্মশীলতার মধ্যে ভৌত অবস্থা, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বৈষয়িক সাধক ও প্রাকৃতিক বস্তু থাকে, মন তার থেকে স্বতন্ত্র। কাজেই এমন একটি দর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল, যা মনের জন্ম, স্থান ও ধর্মকে এমন একটি ক্রিয়াশীলতার মধ্যে দেখতে পায় যে, সেটি পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবে আমরা আবর্তন সম্পূর্ণ করে, এই গ্রন্থের প্রথমাংশের যে ধারণাবলীতে প্রত্যাবর্তন করেছি তা হ'ল,—ভৌতপ্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের সহিত মানবপ্রকৃতির প্রবণতা ও সহজ প্রবৃত্তির জৈব নিরবচ্ছিন্নতা; সার্বিক উদ্দেশ্য সম্বলিত যৌথ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে অংশ গ্রহণ করার উপর মনের ক্রমবিকাশের নির্ভরশীলতা; সমাজ মাধ্যমের ক্ষেত্রে ভৌত পরিবেশটির যে ব্যবহার করা হয়, তার ভিতর দিয়ে ভৌত পরিবেশের প্রভাব; কোনো

একটি উত্তরোত্তর বিকাশমান সমাজের স্বার্থে, ইচ্ছা ও চিন্তনের ক্ষেত্রে প্রাতিস্বিক বৈচিত্র্যকে কাজে লাগানোর অত্যাবশ্যকতা; পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তুর মৌল একত্ব; উদ্দেশ্য ও উপায়ের অন্তর্নিহিত নিরবচ্ছিন্নতা, এবং যে চিন্তনটি আচরণের অর্থকে উপলব্ধি করে ও পরীক্ষা করে, তাকেই মন বলে স্বীকৃতি দেওয়া। যে দর্শন বুদ্ধিকে কর্মের ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তুর পুনঃসংগঠনরূপে দেখে, উক্ত ধারণাবলী সেটির সাথে সুসঙ্গতিপূর্ণ; এবং যে দ্বৈতবাদী দর্শনগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির সাথেই উক্ত ধারণাবলী অসঙ্গতিপূর্ণ।

২। দর্শনের স্বরূপ

এই সমস্ত বিচার-বিবেচনার অন্তর্গত অব্যক্ত ধারণাটিকে নিষ্কাশিত ও ব্যক্ত করা আমাদের অন্যতম কাজ। দর্শন যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করে তার বর্ণনা সূত্রে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিপূর্বে দর্শনেরই বর্ণনা করেছি, যদিও তার সংজ্ঞায়ন করিনি; আমরা দেখিয়েছি যে, এ সব সমস্যা জন্ম নেয় সমাজ জীবনের নানাবিধ বিরোধ ও বাধা-বিপত্তির মধ্যে। সমস্যাগুলি হল এই সব বিষয়ের সম্পর্ক নিয়ে, যেমন মন ও পদার্থ, দেহ ও আত্মা, মানুষ ও ভৌতপ্রকৃতি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থ, তত্ত্ব বা জ্ঞান এবং বৃত্তি বা কর্মের সম্বন্ধ ইত্যাদি। যে সব দার্শনিক তন্ত্র এই সব সমস্যার সূত্রায়ন করে, সেগুলি সমসাময়িক সামাজিক প্রথার মুখ্য রূপরেখা ও বাধাবিঘ্নকে লিপিবদ্ধ করে। লোকে তাদের চলিত অভিজ্ঞতার গুণ অনুযায়ী, প্রকৃতির, নিজেদের এবং যে আনুমানিক চিরসত্য এগুলিকে ধারণ বা শাসন করে, সে সম্বন্ধে যা ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে, ঐ সব লিপি সেগুলিকে স্পষ্ট চেতনায় আনে।

কাজেই যেমন আশা করা যায়, দর্শনকে এমন সব পন্থায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতি উভয়ের ক্ষেত্রেই এক ধরনের সামগ্রিকতা, সাধারণত্ব ও চূড়ান্ততা নির্দেশিত হয়ে থাকে। বিষয়-বস্তু সম্পর্কে দর্শন হ'ল কোনো "সম্যক উপলব্ধির" প্রয়াস,—অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষুদ্র-বৃহৎ অংশগুলিকে একটি মাত্র অন্তরাশ্রিত পূর্ণতার মধ্যে সংগৃহীত বা

সংগ্রথিত করার প্রয়াস। এই পূর্ণতা হয় কোনো একত্ব হবে, নয়তো, দ্বৈতবাদী দর্শনগুলির মতো, বহু বিবরণকে মাত্র অল্প কয়েকটি তত্ত্বে পরিণত করবে। কোনো দার্শনিকের এবং তাঁর সিদ্ধান্ত যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁদের ভঙ্গীর দিক থেকে, অভিজ্ঞতার প্রতি যতোদূর সম্ভব একটি একীভূত, সুসঙ্গতিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রাখার প্রচেষ্টা থাকে। "ফিলজফি" শব্দটিতে যে অর্থ প্রকাশ পায় তা হল জ্ঞানের তৃষ্ণা। যখনই দর্শনকে চিন্তাশীল অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে তখনই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দর্শন এমন কোনো একটা প্রজ্ঞা সূচিত করে যা জীবন-চর্যাকে প্রভাবিত করবে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে প্রাচীন কালের সকল দার্শনিক গোষ্ঠীই জীবনযাত্রার একটি সংগঠিত প্রণালী অনুসৃত ছিল, অর্থাৎ যাঁরা সেখানকার বিশ্বাস বা মতকে গ্রহণ করতেন, তাঁরা কোনো না কোনো নির্দিষ্ট আচরণ বিধিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতেন। দর্শনের সঙ্গে মধ্যযুগীয় "রোমান চার্চের" ব্রহ্মবিদ্যার সংযোগ লক্ষ্য করলে এবং নানাবিধ ধর্মীয় স্বার্থের সহিত দর্শনের যোগসূত্র, এবং জাতির সঙ্কটকালে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সহিত দর্শনের অনুষঙ্গতা লক্ষ্য করলেও সেই একই ইতিবৃত্তের সন্ধান মেলে।

জীবনের প্রতি কোনো দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দর্শনের এই সরাসরি ও অন্তরঙ্গ সংযোগ স্পষ্টতই বিজ্ঞান থেকে দর্শনকে পৃথক ভাবাপন্ন করে তোলে। সহজেই দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের বিশেষ প্রকারের তথ্য ও সূত্র, আচরণকে প্রভাবিত করে। তারা কোনো কিছুকে করা বা না করা সম্বন্ধে যুক্তি দেয়, এবং তা কাজে পরিণত করার উপায় যোগায়। যখন বিজ্ঞান কেবল পৃথিবী সম্বন্ধে আবিষ্কৃত বিশেষ বিশেষ তথ্যের বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, পরন্তু পৃথিবীর উপর কোনো "সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীরও" ইঙ্গিত দেয় এবং সেই ইঙ্গিত যদি কোনো বিশিষ্ট প্রকারের কাজ করা থেকে পৃথক হয়, তা হলে তখন বিজ্ঞান দর্শনের মধ্যে ডুবে যায়। কারণ কোনো অন্তর্নিহিত মানসতা, এ জিনিস, সে জিনিস, বা সকল জিনিসের মোট ফলের প্রতি কোনো ভঙ্গীর প্রতীক নয়, পরন্তু তা সেই সব বিচার-বিবেচনারই প্রতীক, যা আচরণকে শাসন করে।

কাজেই শুধু বিষয়-বস্তুর দিক দিয়েই দর্শনের সংজ্ঞা নিরূপণ করা চলে না। এই কারণে, সাধারণত্ব, সামগ্রিকতা ও চূড়ান্ততা ইত্যাদি ধারণাগুলির

সংজ্ঞা, এরা পৃথিবীর প্রতি যে মানসতা প্রকাশ করে, তার দিক থেকেই সর্বাধিক সহজে পাওয়া যায়। কোনো আক্ষরিক বা পরিমাণগত অর্থেই এই শব্দগুলি জ্ঞানের বিষয়-বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য নয়, কারণ সেখানে সম্পূর্ণতা ও শেষ মীমাংসার প্রশ্নই ওঠে না। অভিজ্ঞতার চলমান ও পরিবর্তমান প্রকৃতিই তাকে নিষিদ্ধ করে দেয়। কিছু নমনীয় অর্থে, এ শব্দগুলি বরং দর্শনের পরিবর্তে বিজ্ঞানেই খাটে। কারণ স্পষ্টতঃই, পৃথিবীর তথ্যাবলীর উদ্‌ঘাটনের জন্য, দর্শনের পরিবর্তে, আমাদিকে যেতে হবে গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, নৃবিদ্যা, ইতিহাস, ইত্যাদির কাছে। পৃথিবীর সম্পর্কে কোন্ কোন্ সাধারণ সূত্র খাটে, আর সেগুলো ঠিক ঠিক কি, তা বিজ্ঞানেরই বক্তব্য বিষয়। কিন্তু যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, বিশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি আমাদের কাছ থেকে কি "রকমের" স্থায়ী মানসতা দাবি করে, তখন অবশ্য আমরা একটা দার্শনিক প্রশ্নই তুলি।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে "সামগ্রিকতা" অর্থে কোনো একটা পরিমাণগত সঙ্কলনের অসম্ভব কাজটি বোঝায় না। বরং বোঝায়, ঘটনাবলীর বহুলতার সম্পর্কে সাড়ার ধরনটির সুসঙ্গতি। সুসঙ্গতি অর্থে আক্ষরিক একত্ব বোঝায় না। কারণ, যেহেতু একই ঘটনা দুবার ঘটে না সেইহেতু কোনো প্রতি-ক্রিয়ার ঠিক ঠিক পুনরাবৃত্তির মধ্যে কিছুটা অসঙ্গতি থাকেই। সামগ্রিকতার অর্থ নিরবচ্ছিন্নতা, অর্থাৎ কোনো পূর্ববর্তী কর্মাভ্যাসকে আবশ্যকীয় পুনর্যোজনা সহকারে চালানো,—যাতে করে অভ্যাসটি জীবন্ত ও ক্রমোন্নতিশীল থাকতে পারে। কোনো পূর্ব-প্রস্তুত গোটা কর্ম প্রকল্প সূচিত করার পরিবর্তে, এর অর্থ হল স্তূপীকৃত ভিন্ন ভিন্ন কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, যাতে করে প্রতিটি কাজই অন্য কাজের থেকে ধার করে, আর অন্য সব কাজকে তাৎপর্য দান করে। যে কোনো ব্যক্তিই নতুন উপলব্ধির প্রতি বিমুক্তচিত্ত ও সুবেদী, এবং ঐগুলি সংযোজিত করার প্রতি মনোযোগী ও দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন তিনিই সেই অনুপাতে দার্শনিক ভাবাপন্ন। দর্শনের একটি জনপ্রিয় অর্থ হল, বাধাবিঘ্ন ও ক্ষয়-ক্ষতির মুখে শান্তভাব ও সহনশীলতা; এমন কি একে নির্বিবাদে বেদনা সহ্য করার ক্ষমতা বলেও ধরা হয়। এই অর্থটি দর্শনের কোনো সাধারণ গুণ বলে ধরার পরিবর্তে বরং নির্বিকারবাদী (স্টোয়িক) দর্শনের প্রভাবের গুণগান বিশেষ বলেই ধরা যেতে পারে।

কিন্তু অর্থটি যে মাত্রায় এই ইঙ্গিত করে যে, দর্শনের চারিত্রিক পূর্ণত্ব হল, অভিজ্ঞতার অপ্রীতিকর উত্থান-পতন থেকেও শিক্ষালাভ করা বা অর্থ বের করার ক্ষমতা, এবং তার থেকে যে শিক্ষা আসে তাকে আরও শিক্ষালাভ করার সক্ষমতায় অঙ্গীভূত করা, সেই মাত্রাতেই কথাটি যে কোনো প্রকল্পের ক্ষেত্রেই খাটে। দর্শনের সাধারণত্ব ও চূড়ান্ততা সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যাখ্যা খাটে। আক্ষরিক অর্থে নিলে এগুলি নিরর্থক ভণ্ডামি, বা বাতুলতাসূচক। শেষ মীমাংসার অর্থ এ নয় যে, অভিজ্ঞতা শেষ ও নিঃশেষ হয়েছে, পরন্তু তার অর্থ হল, অর্থোপলব্ধির গভীরতর স্তরে প্রবেশ করার ইচ্ছা,—নিম্নতলে যাওয়া এবং কোনো বস্তু বা ঘটনার যোগসূত্র বার করা, এবং এই কাজে লেগে থাকা। অনুরূপভাবে, দার্শনিক ভঙ্গীটি এই অর্থে সাধারণধর্মী যে, সেটি কোনো কিছুকে ভিন্ন বলে মানতে নারাজ। দর্শন একটি কর্মকে তার "প্রসঙ্গে" স্থাপিত করতে চেষ্টা করে, এবং এটাই হল দর্শনের তাৎপর্য।

জ্ঞান থেকে দর্শনের পার্থক্যের ক্ষেত্রে দর্শনকে চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত করলে সুবিধা হয়। যে জ্ঞান যুক্তিনিষ্ঠ, তাই হল বিজ্ঞান। যে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হয়েছে, সুশৃঙ্খলা এসেছে এবং যুক্তিপূর্ণ ভাবে সমাপ্ত হয়েছে, জ্ঞান সেই সমস্ত বিষয়কেই উপস্থাপিত করে। পক্ষান্তরে, চিন্তন হল ভবিষ্যাপেক্ষ প্রসঙ্গ। চিন্তনের উদয় হয় অব্যবস্থা দেখা দিলে, এর লক্ষ্য থাকে বিক্ষেপকে জয় করার মধ্যে। জানা বিষয়গুলি আমাদের কাছ থেকে যা দাবি করে, যে প্রতিবেদনশীল ভঙ্গী আদায় করে, দর্শন হল সেই চিন্তন। যা সম্ভাব্য, এটি তারই কোনো ধারণা, কোনো সংসাধিত কার্যের বিবরণী নয়। কাজেই সকল চিন্তনের মতো দর্শনও অনুমানের বিষয়। এটি কোনো কিছু করার, কোনো কিছু চেষ্টা করে দেখার কর্মভারকেই উপস্থাপিত করে। দর্শনের মূল্য মীমাংসার মধ্যে থাকে না; তা কেবল কার্যক্ষেত্রেই সাধিত হতে পারে। এর মূল্য থাকে বাধা-বিপত্তিগুলি নিরূপণ করার মধ্যে, এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করার পদ্ধতির অভিভাবনের মধ্যে। দর্শনকে প্রায় এমন এক ধরনের চিন্তন বলেও বর্ণনা করা যায়, যা নিজের বিষয়ে সচেতন, এবং যা অভিজ্ঞতার মধ্যে তার নিজের স্থান, কর্তব্য ও মূল্যকে সাধারণধর্মী করেছে।

আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, একটা সামগ্রিক ভঙ্গীর দাবি এই

কারণে ওঠে যে, কার্যক্ষেত্রে জীবনের নানাবিধ পরস্পরবিরোধী স্বার্থের একীকরণের প্রয়োজন থাকে। যখন স্বার্থগুলি এত ভাসা ভাসা যে তারা সহজেই পরস্পরের মধ্যে মিলে যায়, অথবা যখন তারা ততো পর্যাপ্তরূপে সংগঠিত হয়নি যাতে তারা পরস্পরের সংঘর্ষে আসতে পারে, তখন দর্শনের প্রয়োজন অল্পই হয়। কিন্তু, ধরা যাক যখন বৈজ্ঞানিক স্বার্থ ধর্মীয় স্বার্থের সংঘাতে আসে, কিংবা অর্থনীতিক স্বার্থ বৈজ্ঞানিক বা সৌন্দর্যবোধীয় স্বার্থের সঙ্ঘর্ষে আসে, অথবা শৃঙ্খলাবোধীয় সংরক্ষণশীল স্বার্থ স্বাধীনতার প্রগতিশীল স্বার্থের বিরোধিতা করে, কিংবা প্রতিষ্ঠানবাদিতা ব্যক্তিবাদিতার প্রতিবাদ করে, তখনই উদ্দীপনা আসে কোনো একটা ব্যাপক দৃষ্টিকোণের আবিষ্কার যাতে করে বিভিন্নতাকে একত্রে আনা যায়, এবং অভিজ্ঞতার সুসঙ্গতি ও নিরবচ্ছিন্নতাকে পুনরুদ্ধার করা যায়। অনেক সময় একজনে নিজেই এই সংঘাতগুলির মীমাংসা করে নিতে পারে; বিভিন্ন লক্ষ্যের সংগ্রামের ক্ষেত্র সীমিত থাকে, এবং ব্যক্তি নিজেই তার মোটামুটি সমুপ-যোগিতা ঠিক করে নেয়। এ রকমের ঘরোয়া দর্শনগুলি খাঁটি, এবং অনেক সময়েই খেটে যায়। কিন্তু এ রকম করার ফলে দর্শনের কোনো পদ্ধতি গঠিত হয় না। তার উদ্ভব তখনই হয়, যখন আচরণের বিভিন্ন আদর্শগুলির নানা ঐক্যহীন দাবি সমগ্র সমাজটিকে ক্ষুণ্ণ করে, এবং পুনঃসমন্বয়ের প্রয়োজন একটা সার্বিক রূপ ধারণ করে।

বিভিন্ন দর্শনের বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি তোলা হয় এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তার কিছু কিছু ব্যাখ্যা আছে। যেমন, ব্যক্তিগত জল্পনা-কল্পনা দর্শনের মধ্যে যে ভূমিকা নেয়, এবং সেগুলির বিতর্কমূলক বিচিত্রতা; আবার, দর্শন যেন প্রায় একই প্রশ্নাবলীকে ভিন্নরূপে বর্ণনা করে এবং তাতেই পুনঃ পুনঃ নিবিষ্ট হয়। নিঃসন্দেহে, ঐতিহাসিক দর্শনগুলির চরিত্র কম বেশী এই রকমেরই। কিন্তু এ সব আপত্তি দর্শনের বিরুদ্ধে ততোটা নয় যতোটা মানুষের স্বভাবের বিরুদ্ধে, এবং এমন কি যে পৃথিবীর মধ্যে মানুষের স্বভাব অবস্থিত তারও বিরুদ্ধে। যদি জীবনের মধ্যে যথার্থ অনিশ্চয়তা থাকে, তাহলে দর্শনকেও সে অনিশ্চয়তাগুলির প্রতিফলন দেখাতে হবে। কোনো একটা কাঠিন্যের হেতু যদি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হয় এবং তার প্রতিবিধানের জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব থাকে,—অর্থাৎ বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ যদি বিভিন্ন

দলের মধ্যে কম বেশী মূর্ত থাকে, তাহলে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিশীল দর্শনও অবশ্যই থাকবে। যে ঘটনা ঘটে গেছে, সে সম্পর্কে মতৈক্য ও নিশ্চয়তা আনবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা হল যথেষ্ট প্রমাণ। ঘটনা তো ঠিকই আছে। কিন্তু একটা জটিল পরিস্থিতিতে কি করা উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা ওঠা অবশ্যম্ভাবী। সেটা ঠিক এই কারণে ওঠে যে, বিষয়টি এখনও অনির্ধারিত। এটা কেউ আশা করে না যে, একটি আয়েশী শাসক শ্রেণী, আর স্থিতির জন্য যাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হচ্ছে, তাদের জীবন দর্শন একই হবে। যদি অধিকারী ও অধিকারচ্যুত লোকদের জগতের প্রতি একই মৌলিক মানসতা থাকতো, তাহলে, তা হয় কপটতা, নয় ঐকান্তিকতার অভাবের যুক্তিই হতো। যে সমাজ শ্রমশিল্পীয় অনুধাবনে ব্যাপৃত হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সক্রিয় হয়েছে, তারা জীবনের প্রয়োজন ও সম্ভাবনাদির যে রূপটি দেখবে, উচ্চমানের সৌন্দর্যবোধীয় কৃষ্টিসম্পন্ন আর একটি দেশ, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে যন্ত্রকৌশলী তহবিলে পরিণত করার কর্ম প্রচেষ্টা যাদের খুব কমই আছে, তারা তার সে রূপটি দেখবে না। যে সমাজের একটি মোটামুটি নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস আছে, আর যে সমাজ আকস্মিক ভাঙনের একাধিক ঘা খেয়েছে, সঙ্কটকালে তাদের মানসিক সাড়া ভিন্ন রকমের হবে। এমন কি, যদি এক তথ্যাবলীও উপস্থিত থাকে, সে গুলির মূল্যায়ন হবে ভিন্ন রকমের। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জীবনের সঙ্গে যে সব বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা জড়িত থাকে, তা ঠিক একই তথ্যাবলীর উপস্থাপনকে প্রতিরোধ করে, এবং মূল্যবোধকে কোনো বিভিন্ন প্রকল্পে পরিচালিত করে। সমস্যাগুলির সাদৃশ্যের বিষয়ে বলা যায় যে, পুরানো আলোচনাকে সমসাময়িক বিভ্রান্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য তার অধিকাংশই ঘটনাগত না হয়ে আকৃতিগত হয়। কিন্তু কোনো কোনো মৌলিক বিষয়ে সময়ান্তরে একই দশা ফিরে ফিরে আসে, এবং তার মধ্যে সেইরূপ পরিবর্তনই থাকে যা সামাজিক প্রসঙ্গের পরিবর্তনের জন্য ঘটে, এবং তার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসারও একটি প্রসঙ্গ।

সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে, সুদূরপ্রসারী এবং ব্যাপকভাবে অনুভূত বাধা-বিপত্তির সময়েই দার্শনিক সমস্যাদির উদ্ভব হয়। কিন্তু এই সত্যটি ছদ্ম-বেশে থাকে। কারণ দার্শনিকগণ একটি বিশেষজ্ঞ শ্রেণী হয়ে পড়েন, এবং এমন একটি কারিগরি ভাষা ব্যবহার করেন, যার ধরন বাধা-বিপত্তির সরাসরি

বিবরণের ভাষা থেকে পৃথক। কিন্তু যখন কোনো একটা পদ্ধতি বা ব্যবস্থা-বিধি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, তখন তার সাথে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষের যোগ-সূত্র, এবং সামাজিক সমন্বয়ের জন্য কোনো কার্যক্রমকে আহ্বান করার যোগসূত্র সকল সময়েই আবিষ্কার করা যায়। এই অবস্থাতেই দর্শন ও শিক্ষার নিবিড় সংযোগ দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা এমন একটি অনুকূল ভূমি যোগায়, যেখানে দার্শনিক আলোচনাদির তাৎপর্যের কারিগরি দিক থেকে পৃথকভাবে, মানবিক দিকটির মধ্যে প্রবেশ করা যায়। "দর্শনের স্বার্থেই", দর্শন শিক্ষাকারীর পক্ষে, দর্শনকে কতিপয় নমনীয় বা কঠিন বুদ্ধিধর্মী ব্যায়াম বলে গ্রহণ করার বিপদ আছে। দর্শন যেন কেবল দার্শনিকের বক্তব্য ও তাঁদেরই নিজস্ব ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু যখন দার্শনিক বিতর্ককে মানসিক ধাতের প্রতিরূপ, বা, তাকে কাজে লাগালে শিক্ষাবৃত্তির মধ্যে যে পার্থক্য ঘটায়, সেই দিক থেকে বিচার করা যায়, তখন ঐ বিতর্ক যে সব জীবন-পরিস্থিতিকে সূত্রবদ্ধ করে, সেগুলি দৃষ্টির বেশী দূরে থাকতে পারে না। যদি কোনো (দার্শনিক) তত্ত্ব শিক্ষাসংক্রান্ত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য না ঘটায়, তা হলে তা অবশ্যই মেকী। শিক্ষাশ্রয়ী দৃগভঙ্গী দার্শনিক সমস্যা-গুলি কোথায় জন্মায়, কোথায় ফলন দেয়, কোথায় ঘরোয়া হয়, এবং কোথায় তাদের গ্রহণ বা ত্যাগে কার্যক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটায়, তার ধারণা দিতে সমর্থ হয়।

আমরা যদি শিক্ষাকে ভৌতপ্রকৃতির এবং সহযাত্রী মানুষের প্রতি বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত মৌল মানসতা গঠনের ক্রিয়া-প্রণালীরূপে ধারণা করতে রাজী হই, তাহলে দর্শনকে, "শিক্ষারই সাধারণ তত্ত্ব" বলেও সংজ্ঞায়িত করতে পারি। যদি দর্শনকে কেবল প্রতীকগত বা শব্দগত বা অল্প কয়েক জনের ভাবরসের চরিতার্থতা, বা কেবল কোনো খেয়ালখুশির তন্ত্র হয়ে না থাকতে হয়, তা হলে তার অতীত অভিজ্ঞতার খতিয়ানকে, তার মূল্যবোধীয় কার্যক্রমকে, আচরণের ক্ষেত্রে ফলাতে হবে। গণ-আন্দোলন, প্রচার, সাং-বিধানিক এবং প্রশাসনিক কাজ, মানসতার সেই রকম পরিবর্তন আনতে কার্যকরী হয়, দর্শন যে রকমের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। কিন্তু তা সেই মাত্রাতেই সাধিত হয়, যে মাত্রায় ঐ পদ্ধতিগুলি শিক্ষামূলক—অর্থাৎ, যে মাত্রায় ঐগুলি মানসিক ও নৈতিক ভঙ্গীকে অন্যরূপ করে। এবং

সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও যাদের অভ্যাস প্রায় কঠিন হয়ে গেছে তাদের প্রতি ঐ সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় বলে ওগুলি কম কার্যকারী হয়, কিন্তু কিশোর-দের শিক্ষার একটি অধিকতর প্রাঞ্জল ও বিমুক্ত কার্যক্ষেত্র থাকে। অন্যদিকে, অধ্যাপনার কাজটি রুটিনমাফিক ও হাতুড়ে ব্যাপার হয়ে পড়তে চায়, যদি সে কাজের লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে সমসাময়িক জীবন-যাত্রায় অধ্যাপনার স্থানটিকে প্রশস্ত ও সমবেদী নিরীক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত করা না হয়; এরূপ নিরীক্ষার যোগান দেওয়াই হল দর্শনের কাজ।

জন-সমষ্টি যে সব উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সদর্থক বিজ্ঞান সর্ব ক্ষেত্রেই "কার্যত" সেই সব উদ্দেশ্যই নির্দেশ করে। এরূপ উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হলে বিজ্ঞানের প্রকাশিত বিষয়গুলি, রোগ সারাবে না রোগ ছড়াবে. জীবন বজায় রাখার উপায় বাড়বে না তাকে মুছে ফেলার জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরী করবে, সে সম্বন্ধে নির্বিকার থাকে। যদি এর একটি জিনিসের ওপরে নির্ভর না করে আর একটি জিনিসের উপর সমাজের স্বার্থ নির্ভর করতে চায়, তা হলে বিজ্ঞান সেটিকে পাওয়ার জন্য পথ দেখাবে। কাজেই দর্শনের দুটো কাজ : বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান লক্ষ্যগুলোর সমালোচনা করা; নতুন নতুন সঙ্গতি লাভ করার ফলে যে সব মূল্যবোধ অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেগুলো দেখিয়ে দেওয়া: এবং কোন্ কোন্ মূল্যবোধ শুধুই ভাবরসাত্মক— কারণ সেগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার কোনো উপায় নেই, তাও দেখিয়ে দেওয়া। দর্শনের অন্য কাজটি হ'ল, ভবিষ্যৎ সামাজিক প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানের ফলাফলের ব্যাখ্যা করা। কি করা যায় আর কি না করা যায় তার অনুরূপ শিক্ষাগত মূল্যবোধ ছাড়া, দর্শনের পক্ষে এ সব কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয়। কারণ দার্শনিক তত্ত্বে এমন কোনো আলাদিনের প্রদীপ নেই, যা দিয়ে বুদ্ধিগম্যরূপে যে মূল্যবোধ গঠন করা যায়, তাকে হাতে হাতে হাজির করানো যায়। যন্ত্রকৌশলী কলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান পদার্থ নিয়ে কাজ করার এমন সব পদ্ধতিতে পরিণত হয়, যাতে পদার্থের শক্তিকে স্বীকৃত লক্ষ্যের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। শিক্ষামূলক কলা দ্বারা, দর্শন, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তাশীল ধারণাবলী অনুযায়ী মানুষের শক্তিকে ব্যবহার করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের পথ দেখাতে পারে। শিক্ষা যেন একটা শ্রমশালা; এখানেই দার্শনিক বৈশিষ্ট্য মূর্ত ও পরীক্ষিত হয়।

এটা ভেবে দেখবার জিনিস যে, ইউরোপীয় দর্শন জন্ম নিয়েছিল (এথেন্স্ বাসীদের মধ্যে) শিক্ষাসংক্রান্ত প্রশ্নাদির সরাসরি চাপে পড়ে। গ্রীকেরা এসিয়া মাইনরে ও ইটালীতে দর্শনের যে পূর্বতন ইতিহাসের বিকাশ করেছিলেন, তার আলোচ্য বিষয়ের সীমা, বর্তমানে দর্শন বলতে যা বোঝায়, তা না হয়ে, বরং তা বিজ্ঞানের ইতিহাসেরই একটি অধ্যায় হয়েছিল। তার বিষয়-বস্তু ছিল ভৌতপ্রকৃতি ; এবং তার জল্পনার বিষয় ছিল, কি করে বস্তুর সৃষ্টি ও পরিবর্তন হয়। পরে, সোফিস্ট নামক ভ্রমণরত শিক্ষকেরা প্রাকৃতিক দার্শনিকদের ফলাফল ও পদ্ধতিগুলোকে মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছিলেন।

যখন ইউরোপের প্রথম পেশাদারী শিক্ষক-মণ্ডলী সোফিস্টরা কিশোর ও যুবজনকে নৈতিক উৎকর্ষ, রাষ্ট্রকলা, এবং নগর ও গৃহস্থালি ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন, তখনই দর্শন, ব্যক্তিগত বিষয়ের সঙ্গে বিশ্বগত বিষয়ের এবং কোনো ব্যাপক শ্রেণীর বা দলের সম্পর্ক নিয়ে বিচার আরম্ভ করল। আরম্ভ করল মানুষের সঙ্গে ভৌতপ্রকৃতির, ঐতিহ্যের সঙ্গে চিন্তনের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক নিয়ে। তাদের জিজ্ঞাসা ছিল, নৈতিক উৎকর্ষ,—যে কোনো স্বীকৃত ক্ষেত্রে উৎকর্ষ,—কি শিক্ষাদ্বারা অর্জন করা যায়? শিক্ষা কি? তার সাথে জ্ঞানের কি সম্পর্ক রয়েছে? তবে জ্ঞান কি? কি করে তা লাভ করা যায়? তা কি ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে, না কোনো রকম কাজে শিক্ষানবিশির মাধ্যমে, না বুদ্ধির মাধ্যমে,—যে বুদ্ধিকে প্রথমে যৌক্তিক শৃঙ্খলায় আনা হয়েছে? যে হেতু শিক্ষা হল জানবার "উপক্রম করা", সেইহেতু গ্রীক-ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় যে, তার মধ্যে অজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞতায়, ত্রুটি থেকে পূর্ণতায়, অসত্তা থেকে সত্তায়, নাস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসবার পথ রয়েছে। কি করে এরূপ পরিবৃত্তি সাধিত হয়? পরিবর্তন হওয়া, পরিণত হওয়া, বিকাশ হওয়া কি সত্য সত্যই সম্ভবপর, এবং যদি তা হয়, তা হলে তা কি করে হয়, এবং যদি এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়, তা হলে নৈতিক উৎকর্ষের সঙ্গে শিক্ষাদানের, জ্ঞানের, সম্পর্কটি কি?

শেষোক্ত প্রশ্নটি বুদ্ধির সঙ্গে কর্মের, তত্ত্বের সঙ্গে বৃত্তির সম্পর্কের প্রশ্নটি উত্থাপন করল। কারণ নৈতিক উৎকর্ষ স্পষ্টতঃই কর্মের মধ্যে বাস করে।

জানা, যা বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতা, তাই কি মানুষের মহোত্তম গুণ নয়, এবং কাজেকাজেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্য ক্রিয়াশীলতাই কি সকল উৎকর্ষের শীর্ষস্থানীয় নয়, যার তুলনায় প্রতিবেশীসুলভতা ও নাগরিক জীবনের উৎকর্ষ গৌণ? কিংবা, পক্ষান্তরে, দাম্ভিক বুদ্ধিগম্য জ্ঞানটি কি শূন্যগর্ভ ব্যর্থ ছলনারও বাড়া, এবং চরিত্রের পক্ষে হানিকর, এবং সেই সব সমাজ গ্রন্থির পক্ষে ধ্বংসমূলক যা মানুষকে সমষ্টিগত জীবনে একসূত্রে বাঁধা রাখে? একমাত্র সত্যিকার জীবন যেহেতু একমাত্র নৈতিক জীবন, তা কি রীতিগত সামাজিক প্রথা-গুলির প্রতি বাধ্যতার অভ্যাস গঠনের মধ্যে দিয়েই লাভ করা যায় না, এবং এই নতুন শিক্ষাটি কি উত্তম নাগরিকতার শত্রু নয়? কারণ সেটি যে সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের প্রতি একটা প্রতিদ্বন্দ্বী মানদণ্ড স্থাপিত করে।

দুই বা তিন পুরুষের মধ্যে এই ধরনের প্রশ্নাবলী শিক্ষার উপরে তাদের আদি ব্যবহারিক বন্ধন থেকে শিথিল হয়ে নিজ নিজ হিসাবেই আলোচিত হতে লাগল। আলোচিত হতে লাগল, জিজ্ঞাসার একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে, দর্শনের বিষয়-বস্তুরূপে। কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনের চিন্তাধারা যে শিক্ষার কার্যক্রমের একটি তত্ত্বরূপে উত্থিত হয়েছিল,—এই সত্যটি শিক্ষার সঙ্গে দর্শনের নিবিড় সংযোগের ভূয়সী সাক্ষ্য দেয়। "শিক্ষা দর্শন," কোনো সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক মূল ও উদ্দেশ্য সম্বলিত ব্যবস্থার উপরে পূর্ব-প্রস্তুত ধারণাবলীর বাহ্যিক প্রয়োগ নয়। এটি কেবল সমকালীন সমাজ-জীবনের বাধা-বিপত্তি সম্পর্কে যথাযথ মানসিক ও নৈতিক অভ্যাস গঠন সংক্রান্ত সমস্যাগুলির স্পষ্ট রূপায়ণ। কাজেই দর্শনের যে সূক্ষ্মতম সংজ্ঞাটি দেওয়া যায়, তা এই যে, সেটি শিক্ষার সর্বাধিক সাধারণ পর্যায় সম্বলিত শিক্ষাতত্ত্ব।

কাজেই দর্শন, শিক্ষা, এবং সামাজিক আদর্শ ও পদ্ধতিগুলির পুনর্গঠন, হাতে হাত বেঁধে চলে। বর্তমানে যদি শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের বিশেষ প্রয়োজনবোধ হয়ে থাকে, যদি এই প্রয়োজনবোধ চিরাচরিত দার্শনিক তন্ত্র-গুলির মৌলিক ধারণাদির পুনর্বিবেচনাকে ত্বরান্বিত করে থাকে, তার কারণ হল বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শ্রমশিল্পীয় বিপ্লব এবং গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী পরিবর্তন। এই সব পরিবর্তনের সম্মুখীন হওয়ার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের দাবি না তুলে, এই সব

সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে কোন্ কোন্ ধারণা ও আদর্শ নিহিত রয়েছে, মানুষের মনে সে জিজ্ঞাসা না জাগিয়ে, এবং পুরাতন ও বিসদৃশ্য কৃষ্টিগুলির থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধারণা ও আদর্শের কি কি সংশোধন তাঁরা চান, তা না জেনে, উক্ত প্রকারের ব্যবহারিক সংশোধন সংসাধিত হতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে, সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যেই এবং স্পষ্ট করে শেষের কয়েকটি অধ্যায়ে ঠিক এই প্রশ্নগুলিই যে ভাবে মন ও শরীর, তত্ত্ব ও বৃত্তি, মানুষ ও প্রকৃতি এবং প্রাতিস্বিক ও সামাজিক বিষয়ের সম্বন্ধগুলিকে প্রভাবিত করে, সেই সব কথা নিয়েই আমরা আলোচনা করেছি। সমাপ্তি-সূচক অধ্যায় দুটিতে আমরা প্রথমে জ্ঞানের দর্শন এবং পরে নীতির দর্শন সম্বন্ধে পূর্ববর্তী আলোচনাগুলির সার সংক্ষেপ করব।

সারাংশ

পূর্ববর্তী আলোচনার অন্তর্নিহিত দার্শনিক বিচার্য বিষয়গুলিকে বার করার প্রকল্প নিয়ে সমীক্ষা করার পরে, দর্শনকে শিক্ষারই সামান্যীকৃত তত্ত্বরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দর্শন এক প্রকারের চিন্তন। সকল চিন্তনের মতোই, অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তুর মধ্যে যা-কিছু অনিশ্চিত, এটি তার থেকে উদ্ভূত। তার লক্ষ্য হল জটিলতার প্রকৃতিকে চিহ্নিত করা; এবং তাকে স্পষ্ট করার জন্য অনুমান গঠন করা, এবং সেই অনুমানকে কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা। দার্শনিক চিন্তনের জাতিগত বৈশিষ্ট্য এই যে, সেটি যে সমস্ত অনিশ্চয়তা বিচার-বিবেচনা করে, সেগুলি দেখা যায় সুদূরপ্রসারী সামাজিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে; এবং তার মধ্যে বিভিন্ন সংগঠিত স্বার্থ ও প্রাতিষ্ঠানিক দাবির পারস্পরিক সংঘর্ষ থাকে। যেহেতু প্রক্ষোভগত ও বুদ্ধিগত মানসতার সংশোধনই পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন প্রবণতার পুনঃ সমন্বয় করার একমাত্র পথ, সেইহেতু দর্শন একই সঙ্গে জীবনের নানাবিধ স্বার্থের সুস্পষ্ট সূত্রায়ন, এবং সেই সমস্ত দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতির উপস্থাপন, যার মধ্যে দিয়ে নানা স্বার্থের একটি উৎকৃষ্টতর ভারসাম্য স্থাপিত হতে পারে। যেহেতু, যার ভিতর দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হতে পারে এবং যা কাম্য বলে মনে হয়, তার অনুমান

হয়ে না থাকে, তাই হল শিক্ষার ক্রিয়া-প্রণালী, সেই হেতু আমরা এই উক্তিটির সমর্থনে পৌঁছাই যে, বিবেচনার সহিত পরিচালিত বৃত্তিরূপে যে শিক্ষাতত্ত্ব, তাই হ'ল দর্শন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জ্ঞানের তত্ত্বাবলী

১। নিরবছিন্নতা বনাম দ্বৈতবাদ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে অবগতির কয়েকটি তত্ত্বের সমালোচনা করা হয়েছে। পারস্পরিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি মৌলিক বিষয়ে এরা একমত। দ্ব্যর্থহীনভাবে যে তত্ত্বটি আমরা উপস্থাপিত করেছি, তার সাথে উক্ত মৌলিক বিষয়টির পার্থক্য আছে। আমাদের তত্ত্বটি নিরবচ্ছিন্নতাকে স্বীকৃতি দেয়। অন্য তত্ত্বক'টি কোনো মৌলিক বিভাজন, বিচ্ছেদ বা বিরোধাভাসের উল্লেখ বা ইঙ্গিত করে। কারিগরি পরিভাষায় একে দ্বৈতবাদ বলা হয়। যে সুকঠিন ও সুদৃঢ় প্রাচীর বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, এবং একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীকে চিহ্নিত করে, তার মধ্যেই আমরা এই ভাগ-বিভাগের উৎপত্তি দেখেছি। এগুলো দেখা যায় ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও নারী, অভিজাত ও অনভিজাত, এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে। এ সব প্রতিবন্ধকের অর্থ হ'ল, স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত আদান-প্রদানের অভাব। সেই অভাব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীবন-অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠার তুল্য। এর প্রতিটি ধরনেরই পৃথক বিষয়-বস্তু, পৃথক লক্ষ্য ও পৃথক মূল্যবোধীয় মানদণ্ড থাকে। যদি দর্শনের অর্থ হয় অভিজ্ঞতার অকপট বর্ণনা, তাহলে এ রকমের প্রতিটি সামাজিক অবস্থাকেই কোনো দ্বৈতবাদী দর্শনে সূত্রবদ্ধ করতে হয়। যে ক্ষেত্রে সে সূত্র দ্বৈতবাদ থেকে দূরে যায়—আকারগত ভাবে বহু দর্শন যেরূপ করে থাকে—সে ক্ষেত্রে, কেবল কোনো অতিপ্রাকৃতিক রাজ্যে উড়ে গিয়ে অভিজ্ঞতার মধ্যে যা-কিছু দেখা যায় তার থেকে উচ্চতর কোনো কিছুর প্রতি আবেদন করেই সেরূপ করা যেতে পারে। এই সকল সূত্র বা তত্ত্ব দ্বৈতবাদকে নামেমাত্র অস্বীকার করে নিয়ে কার্যতঃ তাকেই পুনঃস্থাপিত করে, কারণ এদের পরিণতি ঘটে শুধুই-মায়ারূপী পার্থিব বস্তু, এবং বাস্তবতার অনধিগম্য সার-বস্তুর মধ্যের বিভাজনে।

এই সব ভাগ-বিভাগ যতোদূর বজায় থাকে এবং তার সঙ্গে আরও ভাগ-বিভাগ যতো জড়ো হয়, এদের প্রতিটি অংশই শিক্ষাব্যবস্থার উপরে তার দাগ রেখে যায়, এবং পরিশেষে সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পটি নানাবিধ উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের একটি আমানত হিসাবে জমা হয়। তার পরিণতি দাঁড়ায়, পৃথক পৃথক উপকরণ ও মূল্যবোধের এক ধরনের ভারসাম্য—প্রতিরোধ ও প্রতিমান ; সে কথা পুর্বে বলা হয়েছে (১৮শ অধ্যায় দেখুন)। অবগতি-তত্ত্বের মধ্যে যে সমস্ত নানাবিধ বিরোধাভাসমূলক ধারণা রয়েছে, তাদিকে দার্শনিক পরিভাষায় সূত্রবদ্ধ করাই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য।

প্রথমে ধরা যাক অভিজ্ঞতালব্ধ, এবং উচ্চতর যৌক্তিক অবগতির মধ্যের বিরোধিতার কথা। প্রথমটি নিত্যকার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। যাঁর কোনো বিশিষ্ট বুদ্ধিধর্মী অনুধাবন নেই, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সেই সাধারণ লোকটিরই উদ্দেশ্য পূরণ করে, এবং তাঁর অভাবকে অব্যবহিত পরিবেশটির সঙ্গে এক ধরনের কার্যকারী সংযোগের মধ্যে আনে। এ ধরনের অবগতির অবচয় করা হয়, হয়তো একে অবজ্ঞাও করা হয়। কারণ এটি অবিমিশ্র উপযোগিতা-মূলক, এবং এতে থাকে কৃষ্টির তাৎপর্যের অভাব। যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানকে এমন কিছু বলে মনে করা হয়, যা বাস্তবতাকে চূড়ান্তরূপে, বুদ্ধিগম্যরূপে স্পর্শ করে ; সে জ্ঞানকে তার নিজ কারণেই অনুধাবন করতে হবে, এবং সে অনুধাবনের যথার্থ পরিণতি ঘটবে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক পরিজ্ঞানে,—আচরণে প্রয়োগ দ্বারা সে জ্ঞান কলুষিত হবে না। সামাজিকরূপে, এই পার্থক্যটি, শ্রমিক শ্রেণী যেভাবে বুদ্ধি খাটায়, আর, জীবিকার উপায়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে দূরে থেকে পণ্ডিত শ্রেণী যেভাবে বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটায়—তার অনুরূপ পার্থক্য।

দার্শনিকভাবে এই বিভেদ অনন্যসাধারণের সঙ্গে সার্বিকের পার্থক্যসূচক। অভিজ্ঞতা হ'ল, কম-বেশী বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট বিষয়গুলির সমষ্টি, যার প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে পরিচিতি হতে হবে। যুক্তি (বা বুদ্ধি) কাজ করে সার্বিক বিষয় নিয়ে, সাধারণ নিয়ম-নীতি নিয়ে এবং বিধান নিয়ে ; এ সব জিনিস, মূর্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলির বিশৃংখলতার উর্ধ্বে বিচরণ করে। শিক্ষার সংগঠিত অধঃক্ষেপের মধ্যে শিক্ষার্থীকে একদিকে এমন অনেক সুনির্দিষ্ট খবরের তালিকা থেকে শিখতে হবে, যার প্রতিটি

জিনিসই স্বতন্ত্র; এবং অন্যদিকে কিছু সংখ্যক বিধান ও সাধারণ সম্পর্কাদির সঙ্গেও সুপরিচিত হতে হবে। অনেক সময়, ভূগোল যেভাবে শেখান হয় তা প্রথম পদ্ধতির, আর প্রাথমিক আঁক কষার পরে, গণিতশাস্ত্র যেভাবে শেখান হয় তা দ্বিতীয় পদ্ধতির দৃষ্টান্তস্থল। ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে এরা দু'টি পৃথক জগৎকে উপস্থাপিত করে।

আর একটি বিরোধাভাস আসে "বিদ্যা" শব্দটির দু'টি অর্থ থেকে। একদিকে বিদ্যা হল যা-কিছু জানা আছে তার মোটফল, অর্থাৎ পুস্তক ও বিদ্বান লোকের কাছ থেকে যা হস্তান্তরিত হয়। এটি হল বাহ্যিক কোনো কিছু, জ্ঞানের পুঁজিপাটা—অর্থাৎ পণ্য দ্রব্যাদিকে যে ভাবে মালগুদামে মজুত রাখা হয় এটা তারই মতন—সত্য যেন কোথাও পূর্বপ্রস্তুত হয়ে আছে। এখানে, লেখাপড়া করা মানে সেই ক্রিয়া-প্রণালী অনুসরণ করা যা করে লোকে গুদামে যা আছে তাই আহরণ করে। অন্যদিকে, লেখাপড়ার সময় একজনে যা "করে," বিদ্যা হল সেই ধরনের বস্তু। এটি ক্রিয়াশীল এবং ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত বিষয়। এ ক্ষেত্রে দ্বৈতত্ব হল, একদিকে জ্ঞানকে বাহ্যিক কোনো-কিছু বলে ধরা, যাকে অনেক সময় বিষয়মুখী জ্ঞান বলা হয়; অন্যদিকে অবগতিকে ধরা হয় বিশুদ্ধ অভ্যন্তরীণ অন্তর্মুখী ও মনোগত কোনো-কিছু বলে। একদিকে থাকে একরাশ সত্য, যা পূর্বপ্রস্তুত হয়ে আছে; আর একদিকে থাকে একটি পূর্বপ্রস্তুত মন, যা অবগতির শক্তি দিয়ে সজ্জিত—যে শক্তিকে ইচ্ছা করলেই খাটানো যায়, কিন্তু খাটাবার বেলায় থাকে অদ্ভুত অনিচ্ছা। বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতির মধ্যে বিচ্ছেদ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা এই দ্বৈতবাদেরই শিক্ষাগত প্রতিরূপ। জীবনের যে অংশটি অনুশাসনের উপর নির্ভরশীল, আর যেখানে লোকের এগিয়ে যাবার স্বাধীনতা আছে, সমাজগতভাবে এই পার্থক্যটি তার সাথেই সংশ্লিষ্ট।

আর একটি দ্বৈতবাদ হল অবগতির ক্ষেত্রে সক্রিয়তা ও নিক্রিয়তা। অনেক সময় এই ধরে নেওয়া হয় যে, অবিমিশ্র অভিজ্ঞতালব্ধ ও ভৌত পদার্থ জানা হয় তাদের ছাপ গ্রহণ করে। ভৌত পদার্থগুলি কোনো এক প্রকারে মনের উপরে তাদের ছাপ দেয় বা ইন্দ্রিয়-অঙ্গাদির মাধ্যমে চেতনার ক্ষেত্রে নিজেদের বহন করে আনে। বিপরীত পক্ষে, যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞানের উদ্গম হয় মনোমধ্যে ক্রিয়াশীলতা

সঞ্চারিত হয়ে, এবং সে ক্রিয়াশীলতা উত্তমরূপে চলে যদি তাকে ইন্দ্রিয় ও বাহ্যিক পদার্থের বিরূপ স্পর্শ থেকে দূরে রাখা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে একদিকে ইন্দ্রিয়-প্রশিক্ষণ, বস্তু-পাঠ ও শ্রমশালার অনুশীলন, অন্যদিকে মানসিক শক্তির কোনো অলৌকিক উৎপাদন দ্বারা পুস্তকে লিখিত ধারণাবলী যেভাবে আয়ত্ত করা হয় বলে মনে হয়—এ দু'টি দিকের প্রভেদ উল্লিখিত পার্থক্যকেই মোটামুটি প্রকাশ করে। সমাজের ক্ষেত্রে, যাঁরা পদার্থের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, আর যাঁরা নিজেদের কৃষ্টি কর্ষণ করার জন্য মুক্ত থাকেন, উল্লিখিত পার্থক্যটি তাদের মধ্যেকার প্রভেদকে প্রতিফলিত করে।

আর একটি চলিত বিরোধ ধরে নেওয়া হয় বুদ্ধি ও প্রক্ষোভের মধ্যে। বিভিন্ন প্রক্ষোভকে একান্ত প্রাতিজনিক ও ব্যক্তিগত বলে ধারণা করা হয়। মনে করা হয় যে, একমাত্র বুদ্ধিধর্মী কৌতূহলের প্রক্ষোভটি ছাড়া তথ্য ও সত্য অবধারণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বুদ্ধির ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য প্রক্ষোভের কিছুই করার থাকে না। বুদ্ধি যেন একটা নির্মল জ্যোতি, আর প্রক্ষোভগুলি যেন গোলমেলে উত্তাপ। মন সত্যের সন্ধানে বহির্মুখী। আর প্রক্ষোভ হল ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির বিবেচনাতে অন্তর্মুখী। তাই, শিক্ষাক্ষেত্রে, স্বার্থবোধের নিয়মিত অবচয় করা হয়। আমরা সে সম্বন্ধে পূর্বে বলেছি। কার্যতঃ, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে ওঠে সেটি হল বাহ্যিক ও অবান্তর পারিতোষিক ও শাস্তির আশ্রয় নেওয়া। এর উদ্দেশ্য,—যে লোকটির একটি মন থাকে (জামায় যেমন পকেট থাকে) তাকে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করা। এইভাবে আমরা সেই দৃশ্যটি দেখি, যেখানে পেশাদারী শিক্ষকেরা স্বার্থবোধের প্রতি আবেদন করার নিন্দা করেন, অথচ পরীক্ষা, নম্বর, প্রমোশন ও প্রক্ষোভ, পুরস্কার, এবং পারিতোষিক ও শাস্তির ঝাড়-ঝালরের উপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তাকে সসম্ভ্রমে সমর্থন করেন। শিক্ষকের রসবোধ খর্বকারী এই পরিস্থিতির যে ফল হয়, তাতে এখনও যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া হয় নি।

এর সবগুলি বিচ্ছেদই জ্ঞান ও কর্ম, তত্ত্ব ও বৃত্তি, কর্মের উৎস ও উদ্দেশ্যরূপে মন, এবং কর্মের সাধক ও উপায়রূপে শরীর, ইত্যাদির বিচ্ছেদকে

চরমে নিয়ে যায়। এক শ্রেণীর পক্ষে পেশী খাটিয়ে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করা, আর এক শ্রেণীর পক্ষে আর্থিক চাপ থেকে মুক্ত থেকে ব্যঞ্জনা ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের কলায় ব্রতী থাকা,—সমাজের এই ছেদ-ভেদের মধ্যে যে দ্বৈতবাদ রয়েছে তার উৎস সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, আমরা তার পুনরুক্তি করব না। এই ভেদাভেদ থেকে শিক্ষায় যে দোষ আসে তার পুনরুক্তিরও আবশ্যকতা নেই। যে সকল শক্তির প্রভাব এই ধারণার অযৌক্তিকতাকে স্পষ্ট করতে সহায়তা করে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলে নিয়ে, নিরবচ্ছিন্নতার ধারণা দিয়ে এই ধারণাটিকে প্রতিস্থাপিত করেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব।

(১) শারীরবৃত্ত এবং তার সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতি, নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াশীলতার সহিত মানসিক ক্রিয়াশীলতার যোগসূত্র ব্যক্ত করে। এই যোগসূত্রের স্বীকৃতি অত্যধিক ক্ষেত্রে এখানেই থেমে গেছে। আত্মা ও দেহের প্রাচীন দ্বৈতবাদটি মস্তিষ্ক, এবং দেহের অবশিষ্ট অংশের দ্বৈতবাদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, নার্ভতন্ত্রটি সমগ্র দৈহিক ক্রিয়া-প্রণালীকে একসঙ্গে কাজে নিযুক্ত রাখার একটি সুবিশিষ্ট যান্ত্রিক গড়ন মাত্র। অবগতির অঙ্গরূপে, ক্রিয়াবাহী প্রতিবেদনের অঙ্গাঙ্গি থেকে পৃথক হওয়ার পরিবর্তে, নার্ভতন্ত্র হল সেই বিশিষ্ট গড়ন যা দিয়ে ঐ অঙ্গাঙ্গি পরস্পরের সহিত বেদন-প্রতিবেদনশীল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। পরিবেশ থেকে যে সকল উদ্দীপক গৃহীত হয়, এবং পরিবেশের প্রতি যে সকল সাড়া নির্দেশিত হয়, মস্তিষ্ক প্রধানতঃ সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ঘটানোর একটি অঙ্গ। লক্ষ্য করা দরকার যে, সমন্বয়টি পারস্পরিক। মস্তিষ্ক কোনো সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনার প্রত্যুত্তরে পরিবেশের জিনিসের উপরে কেবল দৈহিক কর্মতৎপরতাকে খাটাতেই সমর্থ করে না, পরন্তু পরবর্তী উদ্দীপক কি হবে তাও ঠিক করে। যখন একজন কাঠের মিস্ত্রি একখানা তক্তার উপরে কাজ করছেন, বা একজন খোদাইকার একখানা থালার উপরে কাজ করছেন, বা এইরূপ যে কোনো একটি ধারাবাহিক কাজ চলছে, তখন ঠিক ঠিক কি ঘটছে তা দেখুন। একদিকে যেমন প্রতিটি ক্রিয়াবাহী প্রতিবেদন ইন্দ্রিয়-নির্দেশিত অবস্থার প্রতি সমন্বিত হয়, অন্যদিকে তেমনি এই ক্রিয়াবাহী প্রতিবেদনই পরবর্তী সংজ্ঞাবহ উদ্দীপকটির ধরন ঠিক করে

দেয়। এই দৃষ্টান্তকে একটি সাধারণ সূত্রে পরিণত করলে এই দাঁড়ায় যে, মস্তিষ্কই হল সেই কল-কবজা, যা কর্মতৎপরতার নিরবচ্ছিন্নতাকে বজায় রাখার জন্য তার নিরন্তর পুনঃসংগঠন করতে থাকে; অর্থাৎ পূর্বে যা করা হয়েছে তার প্রয়োজন অনুসারে ভবিষ্যৎ কাজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। কাঠের মিস্ত্রির কাজের এই নিরবচ্ছিন্নতা তাঁর কাজটিকে সর্বতোভাবে সমান অন্য একটি গতির রুটিনমাফিক পুনরাবৃত্তি থেকে, এবং যেখানে ক্রমপুঞ্জিত কোনো কিছু নেই, সে রকমের এলোপাতাড়ি কাজ থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে। যা-কিছু এই কাজটিকে ধারাবাহিক, ক্রমিক ও সারবান করে তা এই যে, প্রতিটি পূর্ববর্তী কর্মাংশ পরবর্তী কর্মাংশগুলির জন্য পথ তৈরী করে দেয়; আবার এই পরবর্তী কর্মাংশগুলি পূর্বে যে সব ফল পাওয়া গেছে সেগুলোর হিসাব রাখে বা তাদিকে গণ্য করে,—এবং এটাই হল সকল দায়িত্বের বনিয়াদ। যিনিই অবগতির সঙ্গে নার্ভতন্ত্রের সংযোগের, এবং নার্ভতন্ত্রের সঙ্গে নতুন অবস্থাগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্য কর্মতৎপরতার নিরবচ্ছিন্ন পুনঃসমন্বয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীকে সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁরই এ কথায় কোনো সন্দেহ থাকবে না যে, অবগতির সঙ্গে কর্মতৎপরতার পুনঃসংগঠনের যোগ থাকেই,—এবং অবগতি সকল রকমের কর্মতৎপরতা থেকে আলাদা তেমন কিছু নয় যা নিজ হিসাবেই পূর্ণ।

(২) জীববিদ্যার বিকাশ তার জীব-অভিব্যক্তির আবিষ্কার দ্বারা এই শিক্ষাটিকেই দৃঢ়সম্বদ্ধ করে। কারণ মনুষ্যাকৃতিতে না পৌছানো পর্যন্ত সহজ ও জটিলতর জৈব-আকৃতিগুলির নিরবচ্ছিন্নতার উপর অভিব্যক্তিবাদ যে গুরুত্ব দেয়, প্রকৃতপক্ষে তারই মধ্যে অভিব্যক্তিবাদের দার্শনিক তাৎপর্যটি নিহিত। যেখানে জীবের সঙ্গে পরিবেশের সমন্বয়সাধন সহজ, এবং যা-কিছুকেই মন বলা যায় তার মাত্রা ন্যূনতম, সেই ধরনের গড়ন থেকেই জীবাকৃতির বিকাশ আরম্ভ হয়েছে। ক্রিয়াশীলতা স্থানে ও কালে অধিকতর সংখ্যক উপকরণের সহিত সুসমন্বিত হয়ে যতো বেশী জটিল হতে থাকে, বোধবুদ্ধি ততোই অধিকতর সুচিহ্নিত ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। কারণ, কোনো বৃহত্তর বিস্তারের পূর্বাভাস ও পরিকল্পনা, বোধবুদ্ধিকেই দিতে হয়। অবগতি তত্ত্বের যে ধারণা অনুযায়ী অবগতি হল শুধু একজন দর্শক বা ভূ-দর্শকের সক্রিয়তা, এবং যে ধারণা অবগতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো-

কিছু বলে ধরে নেওয়ার সঙ্গে জড়িত, জীব-অভিব্যক্তিতে বিকাশের ধারাটি সে সব ধারণাকে দূর করে। কারণ জীববিকাশবাদের অর্থ এই যে, জীবিত সত্তাটি পৃথিবীরই একটি অংশ, পৃথিবীর ভাগ্য ও তার উত্থানপতনের মধ্যেই সে অংশ গ্রহণ করে, এবং যে মাত্রায় সত্তাটি তার পারিপার্শ্বিক জিনিসগুলির সঙ্গে বুদ্ধিগম্যরূপে নিজেকে একাত্ম করে, এবং যা চলছে তার ভবিষ্যৎ পরিণামের পূর্বাভাস পেতে সমর্থ হয়, এবং সেই অনুযায়ী তার ক্রিয়া-কলাপকে রূপ দেয়, সেই মাত্রাতেই সে পৃথিবীর উপর অনিশ্চিত নির্ভরশীলতার মধ্যে নিজের স্থানকে সুনিশ্চিত করে নেয়। জীবন্ত, অভিজ্ঞতা-লাভরত সত্তাটি যে জগতের অন্তর্গত, সে যদি সে জগতের ক্রিয়া-কলাপের ক্ষেত্রে একজন ঘনিষ্ঠ অংশীদার হয়, তাহলে জ্ঞানের অর্থ দাঁড়ায় এক ধরনের অংশগ্রহণ করা, এবং যে মাত্রায় সে অংশগ্রহণ ফলপ্রসূ হয়, সেই মাত্রাতেই জ্ঞান মূল্যবান। জ্ঞান কোনো নির্লিপ্ত দর্শকের অলস দৃষ্টি হতে পারে না।

(৩) জ্ঞানলাভের পদ্ধতিরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির বিকাশ, এবং তা দিয়ে এটা সুনিশ্চিত করা যে, লব্ধ জিনিসটি জ্ঞানই বটে, শুধু অভিমত নয়,—অর্থাৎ যে পদ্ধতির মধ্যে আবিষ্কার ও প্রমাণ উভয়ই আছে—সেরূপ পদ্ধতির বিকাশই হল জ্ঞানতত্ত্বের রূপান্তর ঘটানোর অন্যতম বৃহৎ শক্তি। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির দু'টি দিক থাকে। (ক) একদিকে এর অর্থ এই যে, যেসব ক্ষেত্রে আমাদের কর্মশীলতা জিনিসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো ভৌত পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এবং সে পরিবর্তন আমাদের ধারণার সঙ্গে মেলে ও তাকে সুনিশ্চিত করে, সে ক্ষেত্র ছাড়া, আর কিছুকে আমাদের জ্ঞান বলার অধিকার নেই। এ রকমের সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন ছাড়া আমাদের বিভিন্ন ধারণা শুধুই প্রকল্প, তত্ত্ব, অভিভাবন ও অনুমান মাত্র। এ সব ধারণাকে পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করতে হবে, এবং যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে তার সূচনারূপে কাজে লাগাতে হবে। (খ) অন্যদিকে, চিন্তনের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি সূচিত করে যে, চিন্তন কাজে লাগে, এবং তা ঠিক সেই মাত্রাতেই কাজে লাগে যে মাত্রায় তাকে বর্তমান অবস্থাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ পরিণামের পূর্বানুমানের কাজে লাগানো হয়। অন্য কথায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকা, অন্ধ প্রতিক্রিয়ার তুল্য নয়। এ রকমের উদ্বৃত্ত ক্রিয়াশীলতা,—অর্থাৎ যা কিছু

পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং এখন যা পূর্বানুমান করা যায় সেই প্রসঙ্গে উদ্বৃত্ত —আমাদের সকল আচরণের ক্ষেত্রেই একটা অনিবার্য উপাদান বিশেষ। কিন্তু যদি পরিণাম লক্ষ্য করা না হয় এবং এই পরিণামকে ভবিষ্যতের সদৃশ অবস্থার ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করা না হয় তা হলে ঐ উদ্বৃত্ত কর্মশীলতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির অর্থ যতো বেশী উপলব্ধি করা যায়, আমাদের সম্মুখস্থ বাস্তব সঙ্গতি ও প্রতিবন্ধকগুলি নিয়ে কাজ করার চেষ্টার মধ্যে বোধশক্তির পূর্ববর্তী প্রয়োগ ততোই বেশী থাকে। আমরা যাকে যাদু বলি, তা অনেক ব্যাপারেই বন্য লোকের কাছে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি ছিল। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে, পরীক্ষা করে দেখার অর্থ ছিল তাদের ভাগ্যের পরীক্ষা,—ধারণার পরীক্ষা নয়। বিপরীতপক্ষে, বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতিটি হল,—ধারণাবলীর পরীক্ষা। সুতরাং কার্যতঃ, বা তখনকার মতো অকৃতকার্য হলেও, এই পরীক্ষা বুদ্ধিগম্য ও ফলপ্রসূ; কারণ যখন আমাদের প্রচেষ্টা গভীর চিন্তায় রত থাকে তখন আমরা বিফলতা থেকেও শিক্ষালাভ করি।

বৈজ্ঞানিক সঙ্গতিরূপে, জ্ঞান নির্মাণের একটি সুসম্বন্ধ পদ্ধতি হিসাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতিটি নতুন হলেও, ব্যবহারিক কৌশলরূপে সেটি জীবনের মতোই প্রাচীন। কাজেই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, লোকে এর সম্পূর্ণ সম্ভাবনাদি উপলব্ধি করেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর তাৎপর্যকে কোনো কোনো কারিগরি ও নিছক্ ভৌত ব্যাপারেরই অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়। পদ্ধতিটি যে সমভাবেই সামাজিক ও নৈতিক ধারণা গঠন করার ও তা পরীক্ষা করে দেখার পক্ষেও প্রযোজ্য, সে উপলব্ধি আসতে নিঃসন্দেহে বহুদিন লাগবে। মানুষ এখনও চিন্তনের ক্লেশ থেকে, এবং চিন্তন দ্বারা কর্মতৎ-পরতাকে পরিচালিত করার দায়িত্ব থেকে ত্রাণ পাবার জন্য মতবাদ ও অনু-শাসন শাসিত খঞ্জের যষ্টি পেতে চায়। প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদগুলির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য সেই বিবেচনার মধ্যেই তাঁরা তাদের নিজ নিজ চিন্তনকে কয়েদ রাখে। কাজেই—জন্ স্টুয়ার্ট মিল যেমন বলেছেন—বিদ্যাপীঠগুলি অনুসন্ধিৎসু তৈরী করার চেয়ে শিষ্য তৈরী করারই বেশী উপযোগী। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রভাবের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ নিশ্চিতরূপেই বিশ্বাস গঠনের সেই সব পুঁথিগত আলোচনাধর্মী ও অনুশাসনিক পদ্ধতিকে

নীতিবহির্ভূত করতে সাহায্য করবে, যেগুলি অতীতের বিদ্যাশ্রম শাসন করত ; এবং ঐ পদ্ধতিগুলির মর্যাদা সেই সব পদ্ধতির মধ্যে স্থানান্তরিত করবে যা ক্রমবর্ধনশীল বৈষয়িক নাগালের বিভিন্ন লক্ষ্য দিয়ে পরিচালিত ; এবং জ্ঞানের প্রসরে দীর্ঘতর পাল্লায় জিনিসের উন্মেষ করতঃ সামগ্রী ও সমাজের সঙ্গে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা স্থাপন করবে। কালক্রমে, যে কর্মবিধি জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলপ্রসূ হবে, অবগতি-তত্ত্ব তার থেকেই আহৃত হবে। তারপরে, এই জ্ঞানতত্ত্বই, যে সব পদ্ধতি সফল হয়েছে, সেগুলির উন্নতি বিধানের কাজে নিয়োজিত হবে।

২। পদ্ধতি সম্বন্ধীয় মতবাদ

অবগতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন চরিত্রের ধারণা সহ নানাবিধ দার্শনিক মতবাদ রয়েছে। এদের কয়েকটির নাম যথাক্রমে, বিদ্যাবাদ, সংবেদনবাদ, যুক্তিবাদ, আদর্শবাদ, বাস্তববাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, তুরীয়বাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি। কয়েকটি শিক্ষা-সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে এদের অনেকগুলোর সমালোচনাও করা হয়েছে। যে পদ্ধতিটি জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত, সেটির সাথে উক্ত মতবাদগুলির যে যে স্থানে ব্যতিক্রম রয়েছে আমরা এখানে তাই বিবেচনা করব। কারণ ব্যতিক্রম-গুলির বিচার-বিবেচনাই অভিজ্ঞতার মধ্যে জ্ঞানের যথার্থ স্থানটিকে স্পষ্টতর করতে পারে। সংক্ষেপে, জ্ঞানের ধর্ম হল কোনো একটি অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য অভিজ্ঞতার মধ্যে স্বচ্ছন্দরূপে প্রাপ্তব্য করা। "স্বচ্ছন্দরূপে" শব্দটি জ্ঞানের মূল নিয়ম ও অভ্যাসের মূল নিয়মের মধ্যকার পার্থক্যটিকে চিহ্নিত করে। অভ্যাসের অর্থ এই যে, একজনে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কোনো একটা পরিবর্তন ভোগ করে, এবং ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনটি সদৃশ ক্ষেত্রে সহজতর ও অধিকতর ফলপ্রসূ কাজের প্রবণতা গঠন করে। সুতরাং অভ্যাসেরও, একটি অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাপ্তব্য করার ধর্ম থাকে। কোনো একটি সীমার মধ্যে অভ্যাস তার এই কর্তব্যটিকে কৃতকার্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। কিন্তু জ্ঞান-বর্জিত অভ্যাস শর্তাবলীর পরিবর্তনের জন্য, অভিনবত্বের জন্য, কোনো বরাদ্দ রাখে না। পরিবর্তনের

অগ্রদর্শন অভ্যাসের এলাকার কোনো অংশ নয়, কারণ অভ্যাস পুরাতন পরিস্থিতির সঙ্গে নতুন পরিস্থিতির মোটামুটি একরূপতা ধরে নেয়। পরিণামে, অভ্যাস অনেক সময় বিপথে চালায়, কিংবা ব্যক্তি এবং তার কাজের কৃতকার্য সম্পাদনের মাঝ পথে দাঁড়ায়,—ঠিক যেমন করে কল চালানোর কালে অপ্রত্যাশিত কোনো কিছু ঘটলে মিস্ত্রির অভ্যাসভিত্তিক দক্ষতা তাকে পরিত্যাগ করে। যে লোকটি কলের গড়ন বোঝে, সে জানে যে, তার কি করতে হবে। যে সব শর্তাধীনে কোনো একটি অভ্যাস কাজ করে সে তা জানে, এবং যে সকল পরিবর্তন নতুন অবস্থায় তার অভ্যাসকে পুনরুপযোগী করতে পারে সে তার ব্যবস্থা করতেও সমর্থ হয়।

অন্য কথায় জ্ঞান হল কোনো বিষয়ের সেই সব যোগসূত্রের উপলব্ধি, যা কোনো এক পরিস্থিতিতে বিষয়টির প্রযোজ্যতাকে স্থির করে দেয়। একটি চরম দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। অসভ্য জাতিরা, তাদের নিরাপত্তা বিপন্ন করে,—এ রকমের ঘটনাবলীর প্রতি যেরূপ প্রতিক্রিয়া করতে অভ্যস্ত, একটি জলন্ত ধূমকেতুর প্রতিও সেইরূপ প্রতিক্রিয়া করে। যেহেতু তাঁরা তারস্বরে চিৎকার করে, কাঁসর পিটিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র ঘুরিয়ে বন্য পশু বা শত্রুদলকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করে, ধূমকেতু তাড়ানোর জন্যও তারা ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করে। আমাদের কাছে ঐ পদ্ধতি একেবারেই অর্থহীন,—এত অর্থহীন যে আমরা এটা দেখতে অক্ষম হই যে তারা কেবল তাদের অভ্যাসেরই এমন করে আশ্রয় নিচ্ছে যা অভ্যাসের সীমিতাবস্থাকেই প্রদর্শন করে। আমরা যে অনুরূপ কাজ করি না তার একমাত্র কারণ হল আমরা ধূমকেতুকে কোনো এক আলাদা অসংলগ্ন ঘটনা বলে ধরি না, পরন্তু তাকে বুঝি অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে তার সংযোগ-সূত্রে। আমরা তাকে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর গঠনতন্ত্রের মধ্যে রাখি। আমরা তার "যোগসূত্রগুলির" প্রতি সাড়া দেই, কেবল তার তৎক্ষণিক সংঘটনের প্রতি নয়। কাজেই তার প্রতি আমাদের দৃগ্‌ভঙ্গী অনেকটা স্বচ্ছন্দ থাকে। বলতে গেলে তার যোগসূত্রগুলি যে সব দৃষ্টিকোণ যোগায় তার যে কোনো একটি দিক থেকে আমরা বিষয়টির প্রতি অগ্রসর হতে পারি। আমরা আমাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী, সংযুক্ত যে কোনো একটি পদার্থের উপযুক্ত যে কোনো একটি অভ্যাস খাটাতে পারি। এইভাবে আমরা উদ্‌ভাবন, অভিনবত্ব ও উপস্থিত-বুদ্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও,

পরোক্ষভাবে কোনো ঘটনার নিকটবর্তী হতে পারি। কোনো আদর্শানুরূপ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পারস্পরিক যোগাযোগের এমন একটি বুনানির অনুরূপ যে, যে কোনো অতীত অভিজ্ঞতাই একটি সুবিধার ক্ষেত্র যোগাবে, এবং এই স্থান থেকে নতুন অভিজ্ঞতাতে-উপস্থাপিত সমস্যাটির নিকটবর্তী হওয়া যাবে। সংক্ষেপে, যেখানে জ্ঞান-বর্জিত অভ্যাস আমাদের হাতে আক্রমণের একটি মাত্র অনড় পদ্ধতি যোগায়, সেখানে জ্ঞান, অনেক প্রশস্ত পাল্লার বিভিন্ন অভ্যাসের মধ্যে থেকে নির্বাচন করতে সাহায্য করে।

পরবর্তী অভিজ্ঞতার জন্য পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার এই অধিকতর সাধারণ ও স্বচ্ছন্দ প্রাপ্তব্যতার দু'টি ধরনকে চিহ্নিত করা যায় (পূর্বে দেখুন, ১০০ পৃঃ)। (১) যেটি অধিকতর স্পষ্ট সেটি হল, নিয়ন্ত্রণের বর্ধিত ক্ষমতা। প্রত্যক্ষভাবে যা ব্যবস্থা করা যায় না, তা নিয়ে পরোক্ষভাবেও কাজ করা যায়। কিংবা আমরা আমাদের এবং আমাদের অবাঞ্ছিত পরিণামের মধ্যস্থলে প্রতিবন্ধক স্থাপন করতে পারি। কিংবা যদি আমরা ওগুলো জয় করতে না পারি তাহলে ওগুলো এড়িয়ে যেতে পারি। যে কোনো ক্ষেত্রেই সুযোগ্য অভ্যাসের যে ব্যবহারিক মূল্য থাকে, খাঁটি জ্ঞানের মধ্যেও তার সবটাই থাকে। (২) পরন্তু কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে অর্থ জড়ানো থাকে, অভিজ্ঞতালব্ধ যে তাৎপর্যটি থাকে, জ্ঞান সেটিকেও বর্ধিত করে। যে পরিস্থিতির প্রতি আমরা এলোমেলোভাবে বা রুটিনমাফিক সাড়া দেই, তার কেবল একটা ন্যূনতম সংজ্ঞাত তাৎপর্যই থাকে; মানসিকভাবে আমরা তার থেকে কিছুই পাই না। কিন্তু যেখানেই একটি নতুন অভিজ্ঞতা নির্ধারিত করার মধ্যে জ্ঞানের লীলা থাকে, সেখানেই মানসিক পরিতোষ থাকে। এমন কি, যদি প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ পেতে আমরা কার্যতঃ বিফলও হই, তাহলেও কেবল দৈহিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে আমাদের তাৎপর্য উপলব্ধির একটা আনন্দ থাকে।

যদিও যা-কিছু হয়ে "গেছে," যা সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরা হয়, কাজেই যা মীমাংসিত ও সুনিশ্চিত, তাই জ্ঞানের আধেয়, জ্ঞানের সম্পর্কটি হ'ল ভবিষ্যৎ বা ভবিষ্যাপেক্ষ বিষয়ের সঙ্গে। যা-কিছু এখনো চলছে এবং যা করতে হবে, জ্ঞান তাকে বোঝবার বা তাকে অর্থ দেওয়ার উপায়ই বোঝায়। ব্যক্তিগত পরিচিতি দিয়ে সে যা বের করেছে, এবং অন্যে যা নির্ধারিত

করেছে বা লিখেছে তা পড়ে সে যা জেনেছে, একজন চিকিৎসকের জ্ঞান বলতে তাই বোঝায়। কিন্তু তার কাছে তা এই কারণে জ্ঞান যে, তা তাকে সেই সব সঙ্গতি যোগায় যা দিয়ে সে উপস্থিত অজানা বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করে, আংশিকভাবে-দৃশ্যমান তথ্যকে সংশ্লিষ্ট ধারণামূলক বিষয় দিয়ে পূরণ করে, তাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দেখতে পায়, এবং তদনুযায়ী পরিকল্পনা করে। যা-কিছু অন্ধ ও ব্যর্থকর, জ্ঞান যখন তাকে অর্থ সমন্বিত করতে প্রয়োগ-বিহীন হয়ে পড়ে তখন তা চেতনা থেকে পুরোপুরি লোপ পায়, নয়তো তা কোনো সৌন্দর্যবোধীয় ধ্যানের বিষয়-বস্তুতে পরিণত হয়। অধিকৃত জ্ঞানের সাম্য ও শৃঙ্খলার নিরীক্ষণ থেকে প্রচুর প্রক্ষোভগত পরিতুষ্টি পাওয়া যায়, এবং সে পরিতুষ্টি বৈধও বটে। কিন্তু এই ধ্যানশীল ভঙ্গী সৌন্দর্য-বোধীয়, বুদ্ধিবোধীয় নয়। একটি সুসমাপ্ত চিত্র বা সুরচিত ভূ-দৃশ্য থেকে যে পরিতৃপ্তি আসে, এ পরিতুষ্টি তারই মতো। বিষয়-বস্তুটি যদি সম্পূর্ণরূপে অন্য ধরনেরও হয়, কিন্তু তার সংগঠন সুসমন্বিত থাকে, তাহলে তাতেও সৌন্দর্যবোধের কোনো তারতম্য হবে না। আসলে, যদি এটি সম্পূর্ণরূপে মস্তিষ্কজাতও হয়—অতিকল্পনের কোনো লীলা হয়—তাতেও কোনো পার্থক্য হবে না। পৃথিবীর প্রতি প্রযোজ্যতার অর্থ, যা-কিছু অতীত, যা-কিছু বিগত, তার প্রতি প্রযোজ্যতা নয়; অতীতের কিছুর উপর কিছু প্রয়োগ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রযোজ্যতার অর্থ হল, আমরা যে চলমান দৃশ্যটির সঙ্গে জড়িত, তার মধ্যে এখনো যা চলছে, যা এখনো অমীমাংশিত, তার প্রতি প্রযোজ্যতা। আমরা যে এই লক্ষণটিকে এত সহজে উপেক্ষা করে চলি, এবং যা-কিছু অতীত ও নাগালের বাইরে তার বর্ণনাকে জ্ঞান বলে মনে করি, তার কারণ এই যে, আমরা অতীত ও ভবিষ্যতের নিরবচ্ছিন্নতা ধরে নিই। আমরা এমন একটি পৃথিবীর ধারণা পোষণ করতে পারি না, যেখানে তার অতীতের জ্ঞান তার ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিতে বা তাকে অর্থ দিতে সহায়তা করবে না; এত অবিচ্ছেদ্যরূপে সূচিত হয় বলেই আমরা ভবিষ্যাপেক্ষ সম্পর্কটিকে উপেক্ষা করি।

তা সত্ত্বেও পদ্ধতি সম্বন্ধীয় যে সব দার্শনিক বিশ্বাস বা মতবাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তার অনেক কটিই এই উপেক্ষাকে ফলতঃ অস্বীকৃতিতে রূপান্তরিত করে। যা-কিছু ভবিষ্য তা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে জ্ঞান

প্রাপ্তব্য কিনা সে কথার ধার না ধরেই জ্ঞানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো-কিছু বলে ধরে নেওয়া হয়। এই বাদ পড়ার ফলেই ঐ সব মতবাদ দোষদুষ্ট হয়, এবং তাদের উদ্যোগজনিত শিক্ষাপদ্ধতিগুলি জ্ঞানের পর্যাপ্ত ধারণার কাছে নিন্দিত হয়। বিদ্যালয়ে যাকে কখনো কখনো জ্ঞানার্জন বলে ধরা হয়, তা মনে করলেই বোঝা যাবে যে, তার সঙ্গে বিদ্যার্থীদের চলমান অভিজ্ঞতার ফলপ্রসূ সংযোগের কতো অভাব—কতো বেশী পরিমাণে বিশ্বাস করা হয় যে, কেবল পুস্তকে পুঞ্জিত বিষয়-বস্তুর আয়ত্তিই যেন জ্ঞান গঠন করে। যা-কিছু শিক্ষা করা হয়, তা যাঁরা বের করেছেন এবং যাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্যে তা ক্রিয়া করেছে, তাঁদের কাছে তা যতো সত্যই হোক না কেন, তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাকে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানে পরিণত করতে পারে। যদি তা ব্যক্তির নিজের জীবনের মধ্যে না ফলে, তাহলে জ্ঞান সমভাবেই মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধীয় বা কোনো কাল্পনিক রাজ্য সম্বন্ধীয় হতেও দোষ নেই।

যে কালে পণ্ডিতী পদ্ধতির বিকাশ হয়েছে সে কালে তা সামাজিক অবস্থার পক্ষে প্রাসঙ্গিক ছিল। সেটা কর্তৃত্ব সূত্রে গৃহীত বিষয়-বস্তুকে নিয়মাবদ্ধ করার ও তাকে যৌক্তিক সমর্থন দেওয়ার একটা পদ্ধতি বিশেষ ছিল। বিষয়-বস্তুটির এত গুরুত্ব ছিল যে, পদ্ধতিটি তার সংজ্ঞায়ন ও নিয়মাবদ্ধতাকে জীবন্ত করত। বর্তমান অবস্থায়, অধিকাংশ লোকের কাছেই পণ্ডিতী পদ্ধতির অর্থ এমন এক ধরনের অবগতি, যার সাথে "কোনো" বিশিষ্ট বস্তুর বিশিষ্ট সংযোগ নেই। এর মধ্যে থাকে পার্থক্য করা, সংজ্ঞা দেওয়া, ভাগ-বিভাগ করা এবং শ্রেণীবদ্ধ করা। এ সব কাজ কেবল কাজের স্বার্থেই করা হয়, —অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তার কোনো লক্ষ্য থাকে না। যে মত অনুযায়ী চিন্তনকে এমন কোনো অবিমিশ্র এবং নিজস্ব আকারগত মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াশীলতা বলে ধরা হয় যে, তাকে নরম জিনিসের উপর শীলমোহর করার মতো যে কোনো বিষয়-বস্তুর উপরেই প্রয়োগ করা যায়, এবং যে মতটির উপর বিধিবদ্ধ ন্যায়-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সে মতটি প্রধানতঃ সামান্যীকৃত পণ্ডিতী পদ্ধতি। শিক্ষায় বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলার মতটি পণ্ডিতী পদ্ধতিরই স্বাভাবিক প্রতিরূপ।

সংবেদনবাদ ও যুক্তিবাদ নামক জ্ঞান-পদ্ধতির বিপরীতমুখী তত্ত্বদ্বয় যথা-ক্রমে অনন্য-সাধারণ ও সাধারণ বিষয়ের উপর—বা একদিকে কেবল নগ্ন তথ্যের, অন্যদিকে কেবল নগ্ন সম্পর্কের উপর—একমুখী জোর দেওয়ার সদৃশ। বাস্তব

জ্ঞানের মধ্যে অনন্ত-সাধারণ ও সাধারণ বৃত্তি একই সঙ্গে কাজ করে। কোনো পরিস্থিতি যতোদূর বিভ্রান্তিকর থাকে তাকে ততোদূরই পরিষ্কার করতে হবে; তাকে সূক্ষ্ম বিবরণে বিভাজিত করতে হবে,—যতোদূর সম্ভব তীক্ষ্ণরূপে সংজ্ঞায়ন করতে হবে। কোনো সমস্যার বিভিন্ন উপাদান হল সুনির্দিষ্ট তথ্য ও গুণাবলী, এবং ইন্দ্রিয়-অঙ্গাদির মাধ্যমেই সেগুলি সুনির্দিষ্ট হয়। সমস্যাটির উপস্থাপনার দিক থেকে তথ্য ও গুণাবলীকেই বিবরণ বলা যেতে পারে, কারণ তারা টুকরো টুকরো সংবাদে বিভক্ত। যেহেতু আমাদের কর্তব্য হল এদের যোগসূত্রাদির আবিষ্কৃতি এবং সেগুলির পুনঃ-যোজনা, সেই হেতু "আমাদের কাছে ঐ সময়ে" ওরা আংশিক। এদের অর্থদান করতে "হবে," কাজেই যে "রূপ" নিয়ে এরা উপস্থিত হয় সেই "রূপে" এদের মধ্যে অর্থের অভাব থাকে। যা-কিছু জানতে "হবে," যা-কিছুর অর্থ তখনও বের করতে হবে, তা-ই নিজেকে বিশিষ্ট রূপে তুলে ধরে। কিন্তু যা-কিছু জানা হয়ে গেছে তার উপরে যদি এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা হয়ে থাকে যে, তাকে নতুন বিবরণ আয়ত্ত করার কাজে বুদ্ধি-গম্যরূপে প্রয়োগ করা যাবে, তবে তাকেই সামান্যধর্মী বলা যায়। যা-কিছু অন্যভাবে সংযোগহীন তার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার ধর্মই একে সামান্যধর্মী করে। যে কোনো সত্যই সামান্যধর্মী হতে পারে যদি আমরা তাকে কোনো নতুন অভিজ্ঞতার উপাদানগুলিকে অর্থদান করার কাজে প্রয়োগ করি। পূর্ব অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তুকে নতুন অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তুর তাৎপর্যকে উপলব্ধি করার কাজে প্রয়োগ করার যোগ্যতাই "যুক্তি।" যে মাত্রায় একজন লোক কোনো একটি ঘটনা ইন্দ্রিয়গোচর হওয়া মাত্রই সেটিকে কোনো বিচ্ছিন্ন জিনিস বলে ধরে না নিয়ে, তাকে মানবজাতির সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগসূত্রে দেখবার জন্য অভ্যাসগতভাবে মুক্ত থাকে, সেই মাত্রাতেই সে লোকটি যুক্তিযুক্ত।

ইন্দ্রিয়-অঙ্গাদির ক্রিয়াশীল সাড়ার মাধ্যমে বিশিষ্ট বিষয়-গুলির পার্থক্য-বোধ না হলে জ্ঞানের কোনো বস্তুই থাকে না, এবং বুদ্ধিগম্য ক্রমবিকাশও থাকে না। অতীতের বৃহত্তর অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সমস্ত তাৎপর্য নির্মিত হয়েছে তার প্রসঙ্গে এই বিশিষ্ট বিষয়গুলি স্থাপিত হওয়া ছাড়া—যুক্তি বা চিন্তনের সদ্ব্যবহার ছাড়া—বিশিষ্ট বিষয়গুলি কেবল উত্তেজনা বা বিরক্তি-স্বরূপ

হয়ে দাঁড়ায়। সংবেদনবাদী ও যুক্তিবাদী মতবাদের একই ভুল এই যে, এদের কোনটিই দেখতে পায় না যে, সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা ও চিন্তনের ধর্ম হল পুরাতনকে নতুনের প্রতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার পুনঃসংগঠন, এবং এইভাবে জীবনের নিরবচ্ছিন্নতা বা সুসঙ্গতি রক্ষণের আনুষঙ্গিকতা।

অবগতি পদ্ধতির যে তত্ত্বটি এই কটি পৃষ্ঠার মধ্যে পেশ করা হল, তাকে প্রয়োগবাদ বলা যেতে পারে। যে কর্মতৎপরতা, উদ্দেশ্য নিয়ে পরিবেশের রূপান্তর ঘটায়, তার সঙ্গে অবগতির নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখাই হল এই তত্ত্বটির মুখ্য রূপরেখা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যে নির্দিষ্ট অর্থে জ্ঞান কোনো কিছুর দখল দাবি করে, তা আমাদের বুদ্ধিগম্য সঙ্গতি দিয়ে গঠিত, এবং যে সব অভ্যাস আমাদের কাজকর্মকে বুদ্ধিধর্মী করে তার সবগুলি দিয়ে গঠিত। আমাদের মানসতার মধ্যে যা কিছু সংগঠিত হয়ে পরিবেশকে আমাদের প্রয়োজনে অভিযোজিত করতে সমর্থ করে, এবং যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বাস করি, আমাদের লক্ষ্য ও বাসনাকে তার উপযোগী করতে পারে, কেবল তাই হল প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞান বলতে শুধু আমরা যে বিষয়ে বর্তমানে সচেতন তাই বোঝায় না, পরন্তু বর্তমানে যে ঘটনা ঘটছে তা বোঝবার জন্য আমরা যে মানসতা প্রয়োগ করি তাও জ্ঞান। আমাদের নিজেদের এবং যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তার মধ্যকার যোগসূত্রকে ধারণায় এনে বিহ্বলকে সাবলীল করার উদ্দেশ্যে যা আমাদের মানসতাকে সচেতনতার স্তরে উন্নতি করে,—তাই হল জ্ঞানের কর্ম-রূপ।

সারাংশ

যে সামাজিক ভেদ-বিভেদ স্বচ্ছন্দ ও সম্পূর্ণ আদান-প্রদানকে ব্যাহত করে, তা পৃথক পৃথক শ্রেণীর সভ্যদের বোধশক্তি ও অবগতিকে একদেশদর্শী করার পক্ষে প্রতিক্রিয়া করে। যাঁদের অভিজ্ঞতা প্রয়োগশীল কাজের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু ঐ কাজের বৃহত্তর উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত, তাঁরা হলেন ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাবাদী। যাঁরা তাৎপর্যের রাজ্যে ধ্যান করাকে উপভোগ করেন কিন্তু সে তাৎপর্যের কর্মশীল গঠনের মধ্যে কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না তাঁরা হলেন ব্যবহারিক যুক্তিবাদী। যাঁরা সরাসরি জিনিসপত্রের সংস্পর্শে

আসেন, এবং যাঁদের ক্রিয়া-কলাপকে অনতিবিলম্বে সেগুলির উপযোগী করে নিতে হয়, তারা কার্যতঃ বাস্তববাদী। যাঁরা ঐ সকল জিনিসপত্রের তাৎপর্য আলাদা করে নেন এবং তাকে জিনিসপত্র থেকে আলগা কোনো ধর্মীয় বা তথাকথিত আধ্যাত্মিক জগতে স্থাপন করেন তাঁরা কার্যতঃ আদর্শবাদী। যাঁরা প্রগতির সহিত সংশ্লিষ্ট, যাঁরা প্রাপ্ত বিশ্বাসগুলির পরিবর্তন করতে সচেষ্ট, তাঁরা প্রগতির মধ্যের প্রাতিস্বিক উপাদানটির উপর জোর দেন। যাঁদের প্রধান কর্ম হল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং প্রাপ্ত সত্যকে সংরক্ষিত করা, তাঁরা সর্ব ও নিত্যের উপরে জোর দেন,—এবং এই রকম আরও। নানাবিধ দার্শনিক মতবাদ তাদের পরস্পরবিরোধী মতবাদগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতার এই সকল বিচ্ছিন্ন ও একদেশদর্শী খণ্ডগুলির চারিত্রিক লক্ষণের সুস্পষ্ট সূত্রায়ন উপস্থাপিত করে। এগুলি এই কারণে একদেশদর্শী যে, আদান-প্রদানের প্রতিবন্ধকগুলি একজনের অভিজ্ঞতাকে, ভিন্নরূপে অবস্থিত অন্যদের অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ ও সম্পূরিত হতে সহায়তা করে না।

অনুরূপভাবে, যেহেতু গণতন্ত্র নীতিগতরূপে স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদান ও সামাজিক নিরবচ্ছিন্নতার পক্ষপাতী, সেইহেতু তাকে এমন একটি জ্ঞানতত্ত্বের বিকাশ করতে হবে, যা জ্ঞানের মধ্যে সেই পদ্ধতি দেখতে পাবে,—যে পদ্ধতিতে একটি অভিজ্ঞতা আর একটি অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ ও তাৎপর্য দান করার জন্য প্রাপ্তব্য হয়। শারীরবৃত্ত, জীববিদ্যা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যুক্তির সাম্প্রতিক অগ্রগতি, এই ধরনের একটি তত্ত্বের আবিষ্কৃতি ও তার সূত্রায়নের জন্য যে সমস্ত নির্দিষ্ট ও বুদ্ধিগত সাধকের দাবি উঠেছে, তা যোগাড় করে দেয়। এদেরই শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিরূপ হল, একটি সঙ্ঘবদ্ধ পরিবেশের মাধ্যমে ক্রিয়া-কলাপ ও নিয়োজনকে বিদ্যালয়ের জ্ঞানার্জনের সঙ্গে যুক্ত করা।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

নীতি-তত্ত্বাবলী

১। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ

যেহেতু নীতি আচরণ-সংশ্লিষ্ট, সেই হেতু মন ও কর্মতৎপরতার মধ্যে কোনো দ্বৈতবাদ স্থাপিত হলে তা অবশ্যই নীতি-তত্ত্বের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। যেহেতু নীতির দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যস্থিত এই বিচ্ছেদের সূত্রায়নকে নীতি শিক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রথাকে সমর্থন ও আদর্শান্বিত করার জন্য প্রয়োগ করা হয়, সেই হেতু তার একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনামূলক আলোচনা স্থানোচিত হবে। শিক্ষাতত্ত্বের একটি সাধারণ উক্তি এই যে, চরিত্র গঠন করাই বিদ্যালয়ের নির্দেশ ও শৃঙ্খলার একটি ব্যাপক লক্ষ্য। কাজেই এটা দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে, চরিত্রের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্কের যে ধারণা এই লক্ষ্যটির বাস্তব রূপায়ণকে ব্যাহত করে, আমরা যেন সে ধারণার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকি ; এবং এই লক্ষ্যটিকে সফল করার জন্য যে সব শর্ত যোগাতে হবে আমরা যেন সেই সব শর্তের সন্ধানে থাকি।

আমরা সর্বপ্রথমে যে প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হই, তা হল সেই সমস্ত নৈতিক ধারণার প্রচলন, যেগুলি কোনো একটি কর্মতৎপরতার ধারাকে দু'টি বিরোধী উপকরণে বিভক্ত করে, এবং তাকে যথাক্রমে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, বা আধ্যাত্মিক ও দৈহিক আখ্যা দেয়। মন ও পৃথিবী, আত্মা ও দেহ, উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে যে দ্বৈতবাদের কথা আমরা এতবার বলেছি, এই বিভাজনটি তারই চরম ফল। নীতির ক্ষেত্রে এটি কর্মের প্রেষণা ও কর্মের পরিণাম, এবং চরিত্র ও আচরণের মধ্যে তীক্ষ্ণ সীমারেখা টেনে দেয়। প্রেষণা ও চরিত্রকে ধরে নেওয়া হয় বিশুদ্ধ "অন্তরঙ্গ" কোনো কিছু বলে, যা অনন্যরূপে কেবল চেতনার মধ্যেই থাকে ; আর, পরিণাম ও আচরণকে ধরে নেওয়া হয় মনের বহির্ভূত কোনো-কিছু বলে,—অর্থাৎ যে সমস্ত গতিবিধি প্রেষণাকে কার্যকারী করে, আচরণ যেন কেবল তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, আর এই গতিবিধির

যে ফল ঘটে পরিণাম যেন তাই। বিভিন্ন মতাবলম্বীরা নীতিকে, হয় মনের কোনো অভ্যন্তরীণ অবস্থা, নয় কোনো বহির্মুখী কাজ ও ফলের সঙ্গে একাত্ম করে, আর এদের একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক রাখে।

কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা ইচ্ছা প্রণোদিত; তার মধ্যে চেতনা-দৃষ্ট কোনো ফল থাকে, এবং পূর্বাপর বিবেচনার একটা তৌল থাকে। তার মধ্যে পরিণামটির জন্য সচেতন আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা থাকে। কোনো লক্ষ্যের সুবিবেচিত মনোনয়ন, এবং বাসনার কোনো মীমাংসিত ধাত স্থির-নিশ্চিত হতে সময় নেয়। এই মধ্যবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষ কাজকে স্থগিত রাখা হয়। যে লোকটি তার মন স্থির করেনি, সে জানে না সে কি করবে। কাজেই সে প্রকাশ্য কাজ যতোদূর সম্ভব স্থগিত রাখে। তার অবস্থাকে এমন এক জনের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় যিনি ভাবছেন যে, তিনি লাফ্ দিয়ে একটা খাল পার হবেন কিনা। তিনি তা পারবেন কি পারবেন না বলে যদি নিশ্চিত হতে পারতেন তাহলে এর একটা দিকে নির্দিষ্ট কাজ ঘটতো। কিন্তু তিনি যদি ভাবতে থাকেন তাহলে তাঁর সন্দেহ রয়েছে; তিনি ইতস্তত: করছেন। যে সময় পর্যন্ত তাঁর পক্ষে একটা কিছু প্রকাশ্য কাজ করা অনিশ্চিত থাকে, সে পর্যন্ত তাঁর ক্রিয়াশীলতা তাঁর অভ্যন্তরে শক্তির এরূপ পুনর্বণ্টনের কাজে নিযুক্ত থাকে, যা কোনো নিশ্চিত প্রকাশ্য কর্মধারাকে প্রস্তুত করবে। তিনি তার চোখ দিয়ে খালটা মাপেন; তাঁর নিজের মজুত শক্তির একটা ওজন পাবার জন্য নিজেকে আঁট-সাঁট করেন; পার হওয়ার অন্যান্য পন্থা খোঁজেন, এবং পার হওয়ার গুরুত্বের কথা চিন্তা করেন। এ সব করার অর্থ দাঁড়ায় চেতনাকে জোরাল করা; অর্থ দাঁড়ায় ব্যক্তির নিজের ভঙ্গী, ক্ষমতা ও বাসনাদির প্রতি মন নিবিষ্ট করা।

স্পষ্টত:ই, সচেতন পুনরভিজ্ঞার মধ্যে ব্যক্তিগত উপকরণগুলির এই তোলপাড়, সম্পূর্ণ ক্রিয়াটির বৈষয়িক বিকাশের এক অংশ। এর মধ্যে প্রথমে একটি অমিশ্র মনোগত ক্রিয়া-প্রণালী, পরে একটি মৌলিকরূপে বিভিন্ন দৈহিক ক্রিয়া-প্রণালী থাকে না। থাকে কোনো নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার,— কোনো অধিকতর অনিশ্চিত, বিভক্ত, সংশয়াপন্ন অবস্থা থেকে আরম্ভ করে, কোনো অধিকতর দৃষ্ট, স্থির ও সম্পূর্ণ অবস্থায় গমন। ক্রিয়াশীলতার মধ্যে প্রথমে সত্তাটির অন্তরে এক রকমের চাপা উত্তেজনা ও সমন্বয় বিধান থাকে;

এরা যখন একটি একীভূত ভঙ্গীতে সুসমন্বিত হয়, তখন পুরো সত্তাটি কাজ করে—কোনো নিশ্চিত কাজ হাতে নেয়। অবশ্য আমরা এই নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াটির অধিকতর স্পষ্টরূপে সংজ্ঞাত পর্যায়টিকে মানসিক বা আত্মিক বলে চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মানসিক বা আত্মিকের অর্থ হবে একটি ক্রিয়ার অনির্ধারিত ও গঠনমুখী অবস্থা, এবং এই ক্রিয়াটির পূর্ণতার মধ্যেই পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য প্রকাশ্য শক্তির নিয়োজন থাকে।

আমাদের বিভিন্ন সংজ্ঞাত চিন্তন, পর্যবেক্ষণ, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা আরম্ভক, জায়মান ক্রিয়া-কলাপের প্রতীক। পরে এরাই সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ কাজে প্রবাহিত হয়ে তাদের নিয়তি পূরণ করে। এবং এই সব আরম্ভক, উদীয়মান পুনঃসমন্বয় এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এরাই আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস ও অন্ধ আবেগের বশ্যতা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। বিকাশের ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে এরাই "নতুন" অর্থসম্বলিত ক্রিয়া-কলাপ। সুতরাং সাধারণতঃ যখনই আমাদের সহজ-প্রবৃত্তি ও সহজগঠিত অভ্যাস অভিনব অবস্থা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, তখনই ব্যক্তিগত চেতনা তীক্ষ্ণ হয়। তখন কোনো সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় কর্মধারায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে, আমাদের নিজেদের মানসতাকে পুনর্গঠন করার জন্য আমাদিকে ফিরে আসতে হয়। যদি আমরা নিছক পাশবিক শক্তি দিয়েই কর্মপথে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা না করি, তাহলে অবশ্যই আমাদিকে আমাদের দৈহিক সঙ্গতিগুলির রূপান্তর করতে হবে, যাতে, যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়ি, তার বিশিষ্ট চরিত্র অনুযায়ী ঐ সব সঙ্গতি অভিযোজিত হতে পারে। কাজেই প্রকাশ্য কাজ করার পূর্বে যে সব সংজ্ঞাত চিন্তন ও বাসনা আসে, তা হ'ল কোনো অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে যে ক্রিয়াশীলতার ইঙ্গিত আসে, তার একটা ব্যক্তিগত পুনঃসমন্বয় বিশেষ।

তাহলেও নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতার মধ্যে মনের এই ভূমিকাটি সব সময়ে বজায় থাকে না। বিভিন্ন কোনো কিছুর জন্য বাসনা, এবং সফল কর্মতৎপরতায় বাধার জন্য উপস্থিত অবস্থার প্রতি বিরূপ ভাব কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করে। বিভিন্ন অবস্থান্তরের চিত্র পথ খুঁজে নেওয়ার, এবং সে পথে চলবার জন্য উদ্ভাবনশীল পর্যবেক্ষণ ও অনুস্মরণের সহায়করূপে সব সময়ে ক্রিয়া করে না। যেখানে সুশৃঙ্খল মানসত্তা বর্তমান থাকে সেখানে

ছাড়া কল্পনাশক্তি বাঁধন ছিঁড়ে চলতে চায়। তার লক্ষ্যগুলি কার্যতঃ সাধন করার সম্পর্কে উপস্থিত অবস্থাদি দিয়ে সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখবার পরিবর্তে, তারা যে সব তাৎক্ষণিক প্রক্ষোভগত পরিতুষ্টি দেয় সে জন্যেই তাদের বাড়তে দেওয়া হয়। আমরা যখন দেখি যে, বিরূপ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিক দ্বারা আমাদের কর্মশক্তির ফলপ্রসূ প্রকাশ ব্যাহত হচ্ছে, তখন তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার সহজতম উপায় হল শূন্যে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করা বা আকাশ-কুসুম রচনা করা, এবং তাকেই একটা আসল কৃতির প্রতিকল্প ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা। কারণ, আসল কৃতির ক্ষেত্রে চিন্তন-প্রয়াস থাকে। কাজেই আমরা প্রকাশ্য কাজে সম্মত হই এবং মনোমধ্যে একটি অতিকল্পিত জগৎ গড়ে তুলি। চিন্তন ও আচরণের মধ্যে এই ভাঙন, যে সব তত্ত্ব মনকে অন্তরঙ্গরূপে এবং আচরণ ও পরিণামকে শুধুই বহিরঙ্গরূপে তীক্ষ্ণভাবে বিভক্ত করে, সেই সব তত্ত্বে প্রতিফলিত হয়।

কারণ এই ভাঙনটি কোনো একজন বিশেষ লোকের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ থেকে বেশী কিছু হতে পারে। সামাজিক পরিস্থিতি এরূপ হতে পারে যে, তা, যে শ্রেণী সুসম্বদ্ধ চিন্তনে অভ্যস্ত তাদিকে, যে সব উপায় অবলম্বন করে এই ধারণাবলী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পরিবেশের পুনঃসংগঠনের কাজে ব্যবহার করা যায়, সে সব উপায়ের পথ না দেখিয়েই তাদের নিজ নিজ চিন্তন ও বাসনার মধ্যে পুনরায় নিক্ষেপ করতে পারে। এরূপ অবস্থায় লোকে যেন তাদের বিজাতীয় ও বিরোধী পরিবেশের প্রতি ঘৃণ্যভাব পোষণ করে, সেটির বদনাম করে, এবং তার উপরে প্রতিশোধ নেয়। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ মানসিক অবস্থার মধ্যে,—নিজ নিজ কল্পনা ও বাসনার মধ্যে,—আশ্রয় ও সান্ত্বনা খোঁজে, এবং ঘৃণিত বহির্জগৎ থেকে এগুলিকে অধিকতর বাস্তব ও আদর্শান্বিত আখ্যা দিয়ে এদের গুণগান করে। ইতিহাসে এ রকমের অবস্থা পুনঃ পুনঃ ঘটেছে। খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম কয়েক শতকে নির্বিকারবাদ, মঠাশ্রয়ী ও লোকায়ত খ্রীষ্টধর্ম, এবং তৎকালীন অন্যান্য ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাবশালী নীতিতন্ত্রগুলি, এরূপ অবস্থার প্রভাবেই তাদের রূপ নিয়েছে। আদর্শগুলিকে প্রকাশ করতে পারে,—এ রকমের কাজ যতো বেশী প্রতিহত হতো, আদর্শগুলির অন্তরঙ্গ অধিকৃতি এবং কর্ষণকেও ততো বেশী স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নীতির সারমর্ম বলে জ্ঞান করা হতো। যে

বহির্জগতের সঙ্গে কর্মতৎপরতা সম্পর্কান্বিত, নীতির দিক দিয়ে তাকে নিঃসম্পর্ক বিবেচনা করা হতো। সব কিছুই থাকে ন্যায্য অভিপ্রায়ের মধ্যে, যদিচ সে অভিপ্রায় জগতের মধ্যে কোনো গতিশীল শক্তি নয়। প্রায় একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের ও উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের জার্মানীতে। এই পরিস্থিতি বশেই ক্যান্টের দর্শনে নিরবচ্ছিন্ন জোর পড়েছে সৎ-সঙ্কল্পের উপরে। সৎ-সঙ্কল্পই অদ্বিতীয় নৈতিক মঙ্গল; সঙ্কল্পকে এমন কিছু বলে ধরা হয়েছিল যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, যা বহির্জাগতিক কর্ম এবং পরিবর্তন বা পরিণাম থেকে স্বতন্ত্র। পরে এই পরিস্থিতিই উপস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্তির সশরীরী মূর্তিরূপে আদর্শান্বিত করতে পরিচালিত করেছিল।

"সদভিপ্রায়ের" বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ নীতিজ্ঞান—পরিণতি বিহীন উত্তম মানসতা,—স্বভাবতঃই একটি প্রতিক্রিয়া আনল। এটিই সাধারণতঃ আনন্দবাদ বা উপযোগবাদ নামে অভিহিত। মোটামুটি এই বলা হল যে একটি লোক তার নিজেরই চেতনার অভ্যন্তরে তিনি কি বস্তু, সেটি নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল তিনি যা "করেন" তাই—করা থেকে যে পরিণাম আসে,—ফলতঃ তিনি যে সব পরিবর্তন সাধন করেন,—তাই। অভ্যন্তরীণ নৈতিকতাকে ভাবরসাত্মক, স্বেচ্ছাচারী, গোঁড়ামি ও আত্মমুখী বলে আক্রমণ করা হয়েছিল। আক্রমণ করা হয়েছিল এই বলে যে, ঐ নীতি, যে কোনো অভিমতই লোকের আত্মস্বার্থের অনুকূল, বা যে কোনো খেয়ালই তার কল্পনায় খেলে, তাকেই স্বজ্ঞা বা বিবেকের আদর্শ বলে মহীয়ান ও সংরক্ষিত করার সুযোগ যোগায়। পক্ষান্তরে, যা কিছু ব্যাপার তা হল ফলাফল ও আচরণ; এরাই নীতির একমাত্র মানদণ্ড।

সাধারণ নীতি, কাজেই স্থুল কক্ষের নীতি, উক্ত দু'টি অভিমতের সামঞ্জস্যহীন আপসে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আনে। একদিকে কোনো কোনো অনুভূতির অবস্থাকে অতিরঞ্জিত করা হয়; ব্যক্তির অবশ্যই সদভিপ্রায় থাকতে হবে, এবং যদি তার মতলব ভালো হয়, যদি তার ন্যায্য প্রক্ষোভমূলক চেতনাটি থাকে, তাহলে আচরণের ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরি ফল পাবার দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে, যেহেতু তাঁকে অন্যান্যের সুবিধা ও প্রয়োজনাদির জন্য, এবং সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য

কোনো কোনো জিনিস করতে হবে, সেইহেতু কোনো কোনো বিষয়ের উপর প্রচণ্ড জোর দেওয়া হয়,—তা ঐ সব জিনিস করবার জন্য কোনো টান বা বুদ্ধি তার থাকুক আর নাই থাকুক। তাকে পায়ের দাগে পা ফেলে চলতেই হবে ; জাতার কলে নাক গলাতেই হবে ; আদেশ পালন করতেই হবে ; প্রয়োজনীয় অভ্যাস গঠন করতেই হবে, এবং তাকে আত্ম-সংযম শিখতেই হবে। এই সব অনুশাসন এমন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করানো হয়, যাতে জোর পড়ে অব্যবহিত বিষয়টিকে প্রত্যক্ষীভূত করার উপরে,—চিন্তন বা বাসনার যে প্রেরণা নিয়ে তা করা হয়, তা যাই হোক না কেন,—অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ক্রিয়াকর্মের উপরে তার যে ফল হয় তার অবস্থা যাই হোক না কেন।

আশা করি, যে পদ্ধতিতে এই দু'টি দোষই নিবারিত হতে পারে, পূর্ববর্তী আলোচনায় তা পর্যাপ্তরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যেখানেই লোকে, বড়োই হোক আর ছোটোই হোক, এমন কোনো অবস্থার অধীনে প্রগতিশীল ক্রমপুঞ্জিত কর্মে নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে না, যাতে তাঁদের উৎসাহ থাকে, এবং চিন্তনের দরকার হয়, সেখানেই এর একটি বা দু'টি দোষই ঘটে। কারণ কেবল ওরূপ কর্মেই এটা সম্ভবপর হয় যে, বাসনা ও চিন্তনের মানসতা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট আচরণের "মধ্যে" একটি অঙ্গাঙ্গিক উপকরণ হবে। যদি কোনো বিদ্যার্থীকে এমন একটা ধারাবাহিক কাজ দেওয়া হয়, যাতে সে উৎসাহ পাবে, কাজের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট ফল পাবে, এবং যেখানে রুটিন-মাফিক অভ্যাস, কর্তৃত্বমূলক নির্দেশ পালন বা খামখেয়ালী উপস্থিত-বুদ্ধি থাকাই যথেষ্ট হবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে সচেতন উদ্দেশ্য, সচেতন বাসনা ও সুবিবেচিত চিন্তন আসা অনিবার্য। একটি সুনির্দিষ্ট পরিণামসূচক কর্ম-তৎপরতার প্রেরণা ও গুণ হিসাবেই ওরা অনিবার্য,—কোনো অভ্যন্তরীণ চেতনার একটা বিচ্ছিন্ন রাজ্য গঠনের হিসাবে নয়।

২। কর্তব্য ও স্বার্থবোধের বিরোধ

নৈতিক আলোচনাতে "মূল-নীতি" ও "স্বার্থবোধ" অনুযায়ী কাজ করার মধ্যে যতো বিরোধাভাস দেখা দেয়, বোধ করি আর কোনো ক্ষেত্রেই তা

ততোটা থাকে না। মূলনীতি অনুযায়ী কাজ করা হল নিঃস্বার্থরূপে কাজ করা,—একটি সার্বিক বিধান অনুযায়ী কাজ করা, এবং তা সকল প্রকার ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার উর্ধ্বে। অভিযোগটি এই যে, স্বার্থবোধ অনুযায়ী কাজ করা হল স্বার্থপরভাবে কাজ করা, ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশে কাজ করা। এটি, অপরিবর্তনীয় নৈতিক বিধানের প্রতি ব্রতী হওয়ার পরিবর্তে একটা পরিবর্তনশীল সময়োপযোগী সুবিধাবাদকে প্রতিস্থাপিত করে। এই বিরোধের গোড়ায় স্বার্থবোধ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, পূর্বেই তার সমালোচনা করা হয়েছে (দশম অধ্যায় দেখুন)। এখন এই প্রশ্নটির কয়েকটি নৈতিক দিকের আলেচনা করা হবে।

এ বিষয়ে একটা সূত্র এই সত্যটির মধ্যে মেলে যে, বিতর্কটির "স্বার্থবোধ"-পক্ষীয় সমর্থকেরা রীতিগতভাবে "আত্ম-স্বার্থ" শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁরা এই অঙ্গীকার থেকে আরম্ভ করেন যে, একটি বিষয়ে বা ধারণাতে স্বার্থবোধ না থাকলে তার কোনো গতিদায়ক শক্তি থাকে না ; এবং তাঁরা এই সিদ্ধান্তে শেষ করেন যে, এমন কি, যখন কেউ মূল-নীতি বা কর্তব্যবোধ থেকে কাজ করছেন বলে দাবি করেন, তিনিও প্রকৃতপক্ষে এই কারণে সে কাজটি করেন যে, "তাঁর নিজের জন্য সেটির মধ্যে কিছু না কিছু থাকে।" অঙ্গীকারটি সুচিন্তিত, কিন্তু সিদ্ধান্তটি ভুল। এর উত্তরে অন্য পক্ষ তর্ক তোলেন যে, যেহেতু মানুষ উদারভাবে আত্ম-বিস্মৃতিমূলক, এমন কি আত্ম-ত্যাগমূলক কাজ করতেও সমর্থ, সেইহেতু সে স্বার্থবোধ ছাড়াই কাজ করতে সমর্থ। এখানেও অঙ্গীকারটি সুচিন্তিত, কিন্তু সিদ্ধান্তটি ভুল। উভয় পক্ষেই ভুলটি রয়েছে আত্ম ও স্বার্থের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে।

উভয় পক্ষই ধরে নেন যে আত্ম একটি অপরিবর্তনীয়, কাজেই পৃথক রাশি। এর ফলে আত্ম'র পক্ষে কাজ করা আর স্বার্থ ছাড়া কাজ করার মধ্যে একটি অনমনীয় উভয় সঙ্কট থাকে। যদি আত্ম, কর্মের পূর্ববর্তী অপরিবর্তনীয় কোনো কিছু হয়, তাহলে স্বার্থ বশতঃ কাজ করার অর্থ দাঁড়ায় আত্মর জন্য বেশী সম্পদ লাভের চেষ্টা করা,—তা সে যশ, অন্যান্যের পৃষ্ঠ-পোষকতা, অন্যান্যের উপর প্রতিপত্তি, আর্থিক লাভ বা সুখভোগ—যাই হোক না কেন। মানব-প্রকৃতির নিন্দাসূচক অবচয়কারী এই অভিমতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই অভিমত আসে যে, যাঁরা মহৎ কাজ করেন,

তাদের মোটেই স্বার্থবোধ থাকে না। তথাপি, নিরপেক্ষ বিচারে এটাই সহজে মনে হবে যে, একজনে যা করছে তাতে তার নিশ্চয়ই স্বার্থবোধ থাকবে, তা না থাকলে সে ওকাজ করবেই না। যে চিকিৎসক নিজের জীবন বিপন্ন করে প্লেগের সময় রোগীর সেবা করতে থাকেন, তাঁর পেশার কৃতী সম্পাদনের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁর স্বার্থবোধ থাকে,—তাঁর নিজের শরীরী জীবনের নিরাপত্তা থেকে সে কাজের মধ্যে তাঁর বেশী স্বার্থবোধ থাকে। কিন্তু এ কথা বললে সত্যকে বিকৃত করা হবে যে, এই স্বার্থবোধ অন্য এমন কিছুর প্রতি স্বার্থের মুখোশ, অর্থাৎ সেবা চালিয়ে গেলে সে যা পায়,—যেমন টাকা বা সুনাম বা সুকৃতি,—তার মুখোশ। যে মুহূর্তে আমরা স্বীকার করি যে, আত্ম কোনো পূর্বপ্রস্তুত ব্যাপার নয়, পরন্তু সেটি কর্ম নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে চিরগঠনমূলক থাকে, সেই মুহূর্তেই সমস্ত পরিস্থিতিটি পরিষ্কার হয়ে যায়। জীবনের বিপদ থাকা সত্ত্বেও কোনো একটি কাজে লেগে থাকার মধ্যে কারও স্বার্থ থাকার অর্থ যে, ঐ কাজটির মধ্যেই সে তার নিজেকে (আত্মকে) দেখে। যদি সে তা পরিত্যাগ করে, এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও আরাম বেছে নেয়, তাহলে তার এই অর্থ দাঁড়াবে যে, সে "সেই" ধরনের কোনো আত্মকে বেছে নিয়েছে। ভুলটি থাকে স্বার্থবোধ ও আত্মবোধকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে; এবং এই কথাটি ধরে নেওয়ার মধ্যে যে, আত্মবোধই হল সেই উদ্দেশ্য,—বস্তু, কর্ম ও অন্যান্য ঘটনার ক্ষেত্রে স্বার্থবোধ থাকা যেটির উপায় মাত্র। বস্তুতঃ, আত্ম ও স্বার্থ একই সত্যের দুটি নাম: কোনো বিষয়ে যে জাতীয় এবং যে পরিমাণ সক্রিয় স্বার্থবোধ থাকে, তা দিয়েই অধিষ্ঠিত আত্মত্বের গুণের বহিঃ প্রকাশ ও পরিমাপ হয়। যদি মনে রাখা হয় যে, স্বার্থ হ'ল কোনো বিষয়ের সঙ্গে আত্মর সক্রিয় ও চলমান "একাত্মতা", তাহলে তথাকথিত উভয়- সঙ্কটের সম্পূর্ণ অবস্থাটি ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, নিঃস্বার্থপরতা, যা করা হয়, তার প্রতি স্বার্থহীনতা বা স্বার্থ'বোধের অভাব সূচিত করে না; কারণ তার অর্থ হবে কেবল কলের মতো নিরপেক্ষতা। আবার তাতে স্বার্থহীনতাও বোঝায় না, কারণ তার অর্থ হবে তেজবীর্যের ও চরিত্রের অভাব। এই বিশিষ্ট তাত্ত্বিক বিতর্কের বাইরে যেখানেই "নিঃস্বার্থপরতা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়, সেখানেই তা দিয়ে সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেই বোঝায় যেগুলি মানুষের আগ্রহ

জাগায় ; এবং যে ধরনের আগ্রহ জাগে, আমরা যদি তার একটা মানসিক নিরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাব যে, তার মধ্যে দুটি নিবিড়ভাবে জড়িত গুণ থাকে। (ক) উদার আত্ম তার ক্রিয়াশীলতার সম্পর্কগুলির সম্পূর্ণ পাল্লার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ; সে নিজের এবং যে সমস্ত বিবেচনাকে বিজাতীয় বা নিরপেক্ষ বলে বাদ দেওয়া হয়, তার মধ্যে কোনো তীক্ষ্ণ সীমারেখা অঙ্কিত করে না। (খ) নতুন পরিণামগুলি যখন উপলব্ধ হয়, তখন সেগুলিকে আত্মীভূত করার জন্য, আত্ম তার নিজের "বিগত" ধারণাবলীর পুনঃসমন্বয় ও সম্প্রসারণ করে। পূর্বকথিত চিকিৎসকটি যখন তাঁর পেশা আরম্ভ করেছিলেন তখন তিনি হয়ত কোনো মহামারীর কথা চিন্তাও করেন নি ; ওরূপ অবস্থায় সেবা করার সঙ্গে তিনি হয়ত জ্ঞাতসারে নিজেকে একাত্মও করেন নি। কিন্তু যদি তাঁর কোনো স্বাভাবিকরূপে ক্রমবিকাশমান বা সক্রিয় আত্ম থাকে, তাহলে যখন তিনি দেখেন যে তাঁর বৃত্তির মধ্যে ওরূপ ঝুঁকি থাকে, তখন তিনি স্বেচ্ছায় তাকে তাঁর কর্মের অখণ্ড অংশরূপে গ্রহণ করবেন। যে ব্যাপক ও বৃহত্তর আত্ম সম্পর্কগুলিকে অস্বীকার করার পরিবর্তে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, আর যে আত্ম পূর্বে-অদৃষ্ট বন্ধনগুলি গ্রহণ করার জন্য নিজেকে পরিবর্ধিত করে, তাঁরা একাত্মক।

পুনঃসমন্বয়ের এরূপ সঙ্কটকালে—এবং সঙ্কট বেশীও হতে পারে, কমও হতে পারে—মূল-নীতির সঙ্গে স্বার্থবোধের কোনো পরিবর্তনকালীন সংঘাত হতে পারে। যে কোনো অভ্যাসেরই প্রকৃতি হল, অভ্যস্ত কর্মপথে ক্লেশহীন থাকা। কিন্তু অভ্যাসের যে কোনো পুনঃসমন্বয় করার প্রকৃতি হল এমন কোনো প্রয়াস বজায় রাখা যা অপ্রীতিকর হলেও তাতে লোককে কৃত-সংকল্প হয়ে লেগে থাকতে হবে। অন্য কথায়, একজনে যা-কিছুতে অভ্যস্ত হয়েছে তার সাথেই নিজেকে একাত্ম করার বা তাতেই উৎসাহিত হওয়ার ঝোঁক থাকে। আবার যখন অপ্রত্যাশিত এমন কিছু ঘটে, যার জন্যে তাঁকে অভ্যাসটির কোনো অপ্রীতিকর পরিবর্তন করতে হয়, তখন ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে মনটিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার ঝোঁক আসে। যেহেতু অতীতে এরূপ কোনো অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন না হয়েই একজনে তার কর্তব্য পালন করেছে,—যেমনটি ছিল, তেমনটিই চলুক না? এরূপ প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করার অর্থ দাঁড়ায়, আত্মনের চিন্তাকে সঙ্কীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন

করা—তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে জ্ঞান করা। অতীতে তা যতো কর্মকুশলই থাকুক না কেন, একটি অভ্যাস যখন জমাট বেঁধে যায়, তখন সেটি তার সঙ্গে সব সময়েই এ রকমের প্রলোভন আনতে পারে। এ রকমের কোনো জরুরী অবস্থায় মূলনীতি অনুযায়ী কাজ করার অর্থ দাঁড়ায় কোনো বিমূর্ত নীতি অনুযায়ী কাজ করা নয়, বা কোনো সাধারণ কর্তব্য পালনও নয়,—এর অর্থ দাঁড়ায় কোনো "কর্মধারার" মূলনীতি অনুযায়ী কাজ করা, সংশ্লিষ্ট অবস্থা-ধীনীর খেয়াল রেখে কাজ করা নয়। একজন চিকিৎসকের মূলনীতি হল তার প্রাণসঞ্চারী লক্ষ্য ও প্রেরণা,—রোগীর তত্ত্বাবধান। যা-কিছু কোনো কাজের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে তা তার মূলনীতি নয়, কারণ মূলনীতি হল কোনো কাজের নিরবচ্ছিন্নতার অপর একটি নাম। একটি কাজের যে পরিণাম প্রকাশ পায়, তা যদি অবাঞ্ছিত হয়, তখন নীতি অনুযায়ী কাজ করা মানে ঐ দোষটিকেই বাড়িয়ে তোলা। এবং যে ব্যক্তি মূলনীতি অনুযায়ী কাজ করছেন বলে গর্ব করেন তিনি হয়ত এমন একটি চরিত্রের লোক যে, যে পথটি উত্তম, অভিজ্ঞতা থেকে তার শিক্ষা না নিয়ে তিনি নিজের পথটি বজায় রাখতেই নাছোড়বান্দা থাকেন। তিনি ভাবেন যে, কোনো বিমূর্ত মূলনীতি তাঁর কর্মধারাকে ন্যায্যতা দিচ্ছে; তিনি এটা দেখতে পান না যে, তার মূলনীতিটারই ন্যায্যতা প্রমাণ করা প্রয়োজন।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমন যে সেখানে বিভিন্ন বাঞ্ছনীয় নিয়োজনের যোগাড় থাকে, তাহলে সে অবস্থাতেও সম্পূর্ণ নিয়োজন-টির মধ্যে থাকাই—অর্থাৎ সেটির নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের মধ্যে স্বার্থ থাকাই —সাময়িক চিত্তবিক্ষেপ ও অপ্রীতিকর বিঘ্ন সত্ত্বেও শিক্ষার্থীকে তার কাজে নিযুক্ত রাখে। যেখানে কোনো ক্রমবিকাশমান তাৎপর্যসহ ক্রিয়াশীলতা থাকে না, সেখানে মূলনীতির প্রতি আবেদন, হয় নিছক বাচনিক, নয়তো এক রকমের গোঁড়ামির গর্ব, আর তা না হলে, অবান্তর বিষয়গুলিকে মর্যাদার খেতাবে ভূষিত করে তারই দোহাই দেওয়া। অবশ্য নিঃসন্দেহে, এমন সব সন্ধিক্ষণ থাকে, যখন উৎসাহের বিরতি ঘটে, মনোযাগ শিথিল হয়, এবং নীতি বলবৎ করার দরকার হয়। কিন্তু যা-কিছু একটি লোককে এই সমস্ত কঠিন সময় অতিক্রম করতে সাহায্য করে, তা বিমূর্ত কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা নয়, তা হল নিয়োজনের মধ্যে তার স্বার্থবোধ। কর্তব্য হল, "পদা-

ধিকার”—কোনো ন্যস্ত কর্মভার সম্পাদন করার জন্য সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া, বা ঘরোয়া কথায়, নিজের কাজ করা। এবং যে মানুষটির তার ন্যস্ত কাজে খাঁটী উৎসাহ থাকে, তিনিই সাময়িক নিরুৎসাহ বরদাস্ত করতে, বাধাবিপত্তির মুখেও লেগে থাকতে, এবং চড়া-মন্দা বরণ করতে সমর্থ হন। নানা বিপত্তি ও বিক্ষেপ মেটানো, এবং অতিক্রম করাকেও তিনি একটা স্বার্থ করে নেন।

৩। বুদ্ধি ও চরিত্র

নীতি আলোচনার মধ্যে অনেক সময়েই একটি লক্ষণীয় কূটাভাস থাকে। এর একপ্রান্তে নৈতিক বিষয়ের সঙ্গে যৌক্তিক বিষয়ের একাত্মীকরণ থাকে ; এ ক্ষেত্রে যুক্তিকে এমন একটি ধীশক্তিরূপে দাঁড় করানো হয় যার থেকে চূড়ান্ত নৈতিক স্বজ্ঞা আসে, এবং কখনো কখনো, ক্যাণ্টের সূত্রে যেমন দেখা যায়, বলা হয় যে, যুক্তিই একমাত্র সঙ্গত নৈতিক প্রেষণা যোগায়। পক্ষান্তরে, মূর্ত নিত্যকার বোধবুদ্ধিকে অবমূল্যায়ন, এমন কি, ইচ্ছাপূর্বক অবচয়িতও করা হয়। নৈতিক চরিত্রকে সচরাচর এমন একটি ব্যাপার বলে বিবেচনা করা হয় যার সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। নৈতিক জ্ঞানকে কোনো বিভিন্ন জিনিস বলে মনে করা হয়, এবং বিবেককে চেতনা থেকে পুরোপুরি বিভিন্ন কোনো কিছু বলে ধরা হয়। এই বিচ্ছিন্নতা যদি বৈধ হয়, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে তার বিশেষ গুরুত্ব দেখা দেয়। যখন আমরা চরিত্রের বিকাশকে কোনো মহান আদর্শ বলে তুলে ধরি, এবং ঠিক একই সঙ্গে জ্ঞান অর্জন ও বোধবুদ্ধির বিকাশকে,—এই কাজটিই অবশ্য স্কুলের অধিকাংশ সময় নেয়,—এমন কিছু বলে ধরে নিই যার সঙ্গে চরিত্রের কোনো সম্পর্ক নেই, তখন স্কুলে নীতি শিক্ষা কার্যতঃ নিরর্থকই হয়। এ রকমের একটা ভিত্তির উপরে, নীতি-শিক্ষা এক রকমের প্রশ্নোত্তরের বিজ্ঞপ্তিতে, বা নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধীয় পাঠে পরিণত হয়। স্বভাবতঃই, অন্য লোকেরা সদগুণ ও কর্তব্য সম্বন্ধে যা-কিছু ভাবে, “নৈতিক সম্বন্ধীয়” পাঠ তারই পাঠমালা সূচিত করে। যে মাত্রায় বিদ্যার্থীরা অন্যলোকের ভাবরসের প্রতি সমবেদী ও মর্যাদাপূর্ণ শ্রদ্ধা দ্বারা ইতিপূর্বেই অনুপ্রাণিত হয়েছে, ঠিক সেই মাত্রাতেই এই পাঠমালা অর্থসমন্বিত হয়ে ওঠে। এ

রকমের শ্রদ্ধা ছাড়া, ঐ পাঠমালা এশিয়ার গিরিশ্রেণীর পাঠমালার চেয়ে চরিত্রের উপরে বেশী প্রভাব আনে না। দাসসুলভ শ্রদ্ধা পোষণ করিয়ে, ঐ পাঠমালা অপরের উপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তোলে, এবং যাঁরা কর্তৃত্বের আসনে আসীন তাঁদেরই উপরে আচরণের দায়িত্ব স্থাপন করে। বস্তুতঃ, নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সরাসরি শেখানো কেবল সেই সব সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়েছে যেখানে শিক্ষা অল্প সংখ্যক লোকের কর্তৃত্বাধীনে বহুসংখ্যক লোককে নিয়ন্ত্রণে রাখার একটা অংশ ছিল। ঠিক ঠিক পড়িয়ে নয়, পরন্তু এটি যে জমানার প্রাসঙ্গিক ছিল, তার মোট ব্যবস্থা দিয়েই একে বলবৎ করা হতো। নীতি সম্বন্ধে পড়িয়ে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে অনুরূপ ফল পাওয়ার চেষ্টা ভাবরসাত্মক ইন্দ্রজালের উপর নির্ভর করা মাত্র।

যা জ্ঞান ও সদ্‌গুণকে একাত্ম করে, সেই সক্রেটিক্-প্ল্যাটনিক্ প্রজ্ঞা রয়েছে তুলাদণ্ডের অন্যপ্রান্তে। এই সূত্র অনুসারে কোনো মানুষই জেনে শুনে দোষ করে না। দোষ করে, যা উত্তম তার অজ্ঞতা বশে। এই মতবাদকে সাধারণতঃ এই কারণে আক্রমণ করা হয় যে, যা ভালো তা জানা সত্ত্বেও মানুষে যে মন্দ কাজ করে তার দৃষ্টান্তই সব চেয়ে বেশী। এদের মতে, যা দরকার তা জ্ঞান নয়, তা হল অভ্যাস বা চর্চা এবং প্রেষণা। প্রকৃতপক্ষে, এ্যারিস্টোটেল প্ল্যাটোর শিক্ষাকে এই বলে আমক্রণ করলেন যে, নৈতিক সদাচার একটি কলাবিদ্যার মতো—যেমন ভেষজবিদ্যা। যাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞান আছে, কিন্তু রোগ ও রোগের নিরাময়ের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নেই, তাঁর চেয়ে বরং অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবী উত্তম। বিষয়টি অবশ্য নির্ভর করে, জ্ঞানের যে অর্থ ধরা হয় তার উপরে। এ্যারিস্টোটেলের আপত্তি, প্ল্যাটোর শিক্ষার এই সারবান উক্তিটিকে উপেক্ষা করেছিল যে, বহু বছরের ব্যবহারিক অভ্যাস ও একনিষ্ঠ শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে যাওয়া ছাড়া, লোকে যা-কিছু মঙ্গল, তার মধ্যে সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করতে পারে না। যা-কিছু মঙ্গল তার জ্ঞান শাস্ত্র থেকেও পাওয়া যায় না, আর, লোকের মুখ থেকেও পাওয়া যায় না; তার জ্ঞান পাওয়া যায় দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষালাভের মাধ্যমে। কল্যাণবোধ হ'ল পরিণত জীবন-অভিজ্ঞার চূড়ান্ত ও চরম আশীর্বাদ। প্ল্যাটোর অভিমত থেকে স্বতন্ত্রভাবেই এ কথা সহজে বোঝা যায় যে, জ্ঞান শব্দটিকে কতো দূরান্বিত অর্থে প্রয়োগ করা হয়। প্রগাঢ় ও প্রাণবন্ত

ব্যক্তিগত উপলব্ধি, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা সূত্রে জ্ঞাত ও পরীক্ষিত দৃঢ় প্রত্যয় থেকে আরম্ভ করে, লোকমুখে প্রাপ্ত, প্রধানতঃ সাঙ্কেতিক, সাধারণ জনশ্রুতি, অর্থাৎ প্রাণহীন পরোক্ষ সংবাদ পর্যন্ত,—সব কিছুকেই জ্ঞান বলা হয়। শেষোক্ত জ্ঞানটি যে আচরণের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ নয়, সেটি যে চরিত্রকে প্রভূতরূপে প্রভাবিত করে না, সে কথা না বললেও চলে। কিন্তু পরখ ও পরীক্ষা দ্বারা যেমন করে আমাদের প্রত্যয় জন্মে যে, চিনি মিষ্টি আর কুইনাইন তেতো, জ্ঞানের অর্থ যদি সে রকমের কিছু হয়, তা হলে ব্যাপারটি অন্য রকম দাঁড়ায়। একটি লোক প্রতিবারেই যখন একটি স্টোভের উপর না বসে চেয়ারের উপর বসে, বৃষ্টির সময় ছাতা নিয়ে বাইরে যায়, অসুখের সময় ডাক্তারের পরামর্শ নেয়, বা অল্প কথায়, তাঁর নিত্যকার জীবনের হাজার হাজার কাজের যে-কোনোটি করে, তখনই সে প্রমাণ করে যে, এক রকমের জ্ঞান আচরণের ক্ষেত্রটিতে সরাসরি ফল :ফলায়। এ রকম মনে করার সব কারণই আছে যে, মঙ্গল শব্দটি সম্বন্ধেও এই ধরনের জ্ঞান আছে, এবং তারও সদৃশ প্রকাশ আছে। বাস্তবপক্ষে, উল্লিখিত পরিস্থিতিগুলির মধ্যে যে সন্তুষ্টি থাকে, "মঙ্গল" শব্দটির মধ্যে যদি তা না থাকে তাহলে সেটি একটি ফাঁকা শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য লোকে তো জানেই—এই জ্ঞান নিয়ে কাজ করলে তাঁরা যে কাজের প্রশংসা করে সেই অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টাই আসে। কিংবা অন্ততঃ, তাদিকে এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা আসে যে, লোকটি তাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু এমন কোনো কারণ নেই, যে জন্যে এ ধরনের জ্ঞান অন্যান্যের প্রতি আরোপিত বিশ্বাসের সপক্ষে লোকটির ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নিষ্ঠা আনবে।

সুতরাং জ্ঞান শব্দটির সঙ্গত অর্থ নিয়ে তর্ক করা অনাবশ্যক। ঐ একটি নাম দিয়ে যে সব বিভিন্ন গুণ নির্দিষ্ট হয় তা লক্ষ্য করে, অভিজ্ঞতার জরুরী প্রয়োজনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভই যে তাৎপর্যপূর্ণরূপে আচরণকে প্রভাবিত করে সেটি হৃদয়ঙ্গম করাই শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট। যদি কোনো বিদ্যার্থী বই থেকে কেবল বিদ্যালয়ের পাঠ সম্পর্কিত বিষয় শিক্ষা করে, এবং জিজ্ঞাসা করলে যাতে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে সেই কারণেই সে তা শিক্ষা করে, তা হলেও তার জ্ঞান কোনো কোনো আচরণের ক্ষেত্রে ফল দেবে,—যেমন অন্যান্যের ফরমাশ মতো ঐ উক্তিগুলির পুনরুক্তি করা!

বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনে যে ওরূপ জ্ঞানের কোনো প্রভাব থাকবে না, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এটি জ্ঞান ও আচরণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কারণ নয়, পরন্তু এই জাতীয় জ্ঞানকে নিম্নমূল্যের জ্ঞান বলে মনে করার কারণ। যে জ্ঞান শুধু কোনো বিচ্ছিন্ন কারিগরি বিশেষজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত, তার বিষয়েও এই কথাই খাটে। সেটিও কর্মের রূপান্তর সাধন করে, কিন্তু তা কেবল তার সঙ্কীর্ণ কাজের ধারার মধ্যেই ঘটে। বস্তুতঃ, বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার সমস্যাও যা, জ্ঞানলাভের সমস্যাও তাই,—অবশ্য যে জ্ঞান আবেগানুভূতি ও অভ্যাসের বাঁধনের সঙ্গে যুক্ত, এ ক্ষেত্রে তাকেই ধরতে হবে। কারণ যে-কোনো একটি জানা বিষয়েরই প্রয়োগ নির্ভর করে বিষয়টির যোগসূত্রগুলির উপরে। কোনো সিন্দুক-ভাঙ্গা বোমার বিস্ফোরক শক্তির জ্ঞান মৌখিক আকারে একজন রাসায়নিকের জ্ঞানের মতোই হতে পারে। কার্যতঃ তা ভিন্ন জিনিস। কারণ সেটি বিভিন্ন লক্ষ্য ও অভ্যাসের যোগসূত্রে বুনানো নয়, এবং কাজেই তার একটা ভিন্ন অর্থ থাকে।

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাটি, অব্যবহিত লক্ষ্য সম্বলিত প্রত্যক্ষ কর্মের বিষয়-বস্তু থেকে শুরু করে প্রথমে তাকে ভূগোল ও ইতিহাসের সংস্পর্শের মধ্যে এবং পরে বৈজ্ঞানিক ধাতে সংগঠিত জ্ঞানের মধ্যে বিবর্ধিত করার কাজটি, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে কোনো জীবন্ত যোগসূত্র বজায় রেখে চলবার ধারণাটির উপর সংস্থাপিত হয়েছিল। যা-কিছু শেখা হয় এবং লক্ষ্য, ও অন্যান্যের সঙ্গে সহযোগ সম্বলিত বৃত্তির মধ্যে নিয়োগ করা হয়, তাই নৈতিক জ্ঞান,—জ্ঞাতসারে সেটিকে তা বলি আর নাই বলি। কারণ সে জ্ঞান একটা সামাজিক স্বার্থ সৃষ্টি করে এবং সে স্বার্থকে কার্যতঃ ফলপ্রসূ করার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় বোধবুদ্ধি প্রদান করে। ঠিক যেহেতু পাঠক্রমের পাঠ্য বিষয়গুলি সমাজ-জীবনের আদর্শগত উপকরণগুলির প্রতীক, সেইহেতু সেগুলি সামাজিক মূল্যবোধে ব্রতী করারও যন্ত্র বিশেষ। শুধু স্কুল পাঠ্য হিসাবে ওগুলিকে আয়ত্ত করলে তাতে কেবল কোনো কারিগরি মূল্যই থাকে। যে সব অবস্থায় ওগুলির সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি হয় তার অধীনে ওগুলি আয়ত্ত করলে তারা নৈতিক স্বার্থবোধের খোরাক যোগায়, এবং নৈতিক সূক্ষ্মদৃষ্টির বিকাশ সাধন করে। শিক্ষালাভের পদ্ধতি সম্বন্ধে মনের যে সব গুণের আলোচনা করা হয়েছে, তার সবগুলিই

মৌলিক নৈতিক গুণ। বিমুক্ত-চিত্ততা, একাগ্র-চিত্ততা, আন্তরিকতা, প্রশস্ত দৃগ্‌ভঙ্গী, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রযত্ন, গৃহীত ধারণাবলীর পরিণাম বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ,—এদের সবগুলিই নৈতিক প্রলক্ষণ। নৈতিক চরিত্রকে আনুশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি বাহ্যিক আনুগত্যের সঙ্গে একাত্ম করার অভ্যাস আমাদিকে এই সমস্ত বুদ্ধিগম্য দৃষ্টিভঙ্গীর নৈতিক মূল্য উপেক্ষা করতে পরিচালিত করতে পারে, কিন্তু এই একই অভ্যাস নীতি পাঠকে একটা প্রাণহীন যান্ত্রিক নিত্যকর্মপদ্ধতিতে পরিণত করার দিকে ঝোঁক আনে। সুতরাং যদিও ওরূপ ভঙ্গীর নৈতিক ফল থাকে, সে ফলটি নৈতিকরূপে অবাঞ্ছনীয়—সব চাইতে বেশী অবাঞ্ছনীয় একটি গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে,—কারণ, সেখানে অনেক কিছুই নির্ভর করে ব্যক্তিগত মানসতার উপরে।

৪। সমাজ ও নীতি

আমরা যে সকল বিচ্ছেদের সমালোচনা করছি, এবং যা এড়ানোর জন্য পূর্ব-পরিচ্ছেদগুলিতে বর্ণিত শিক্ষাচিন্তা পরিকল্পিত হয়েছে তার সবগুলিরই উদয় হয় নীতিকে অত্যধিক সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করার ফলে। একদিকে, যা-কিছু প্রয়োজন তা করবার কার্যকারী যোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেই নীতিকে একটা ভাবরসাত্মক ভালোমানুষী মোড় দেওয়া হয়। অন্যদিকে, প্রচলিত রীতি ও ঐতিহ্যের উপর অত্যধিক জোর দিয়ে নীতিকে কয়েকটি নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত কাজের তালিকাতে সীমিত করা হয়। আসলে, অন্যান্যের সঙ্গে আমাদের সংশ্রবজনিত কাজকর্ম যতো বিস্তীর্ণ, নীতির ক্ষেত্রও ততোই বিস্তীর্ণ। এবং সম্ভাব্যতা হিসাবে তার মধ্যে আমাদের সকল কাজই থাকে, যদিও সে সব কাজ করার সময়ে তাদের সামাজিক সংশ্লিষ্টতার কথা চিন্তায় না আসতেও পারে। কারণ অভ্যাসের নিয়মবশে প্রতিটি কাজই মানসতার রূপান্তর ঘটায় এবং এক ধরনের ঝোঁক ও বাসনা আনে। এবং এই ভাবে জোরদার হয়ে, অভ্যাসটি কখন যে অন্য সকলের সঙ্গে আমাদের মেলামেশার উপরে সরাসরি ও উপলব্ধিগত প্রভাব আনতে পারে তা বলা অসম্ভব। চরিত্রের কোনো কোনো প্রলক্ষণের সহিত সামাজিক সম্পর্কাদির এত স্পষ্ট সংযোগ রয়েছে যে, জোরাল অর্থে আমরা সেগুলিকে "নৈতিক" বলি,—

যেমন, সত্যবাদীতা, সততা, সতীত্ব, সৌজন্য ইত্যাদি। কিন্তু তার একমাত্র অর্থ এই যে, অন্য কতকগুলি মনোভাবের তুলনায় এরা কেন্দ্রগত; এদের সাথে অন্যান্য মনোভাবও থাকে। জোরাল অর্থে এদের এই কারণে নৈতিক বলা হয় না যে এরা একটি থেকে আর একটি বিচ্ছিন্ন এবং একতন্ত্রী, পরন্তু তার কারণ এই যে, এরা হাজার হাজার অন্যান্য মনোভাবের সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে জড়িত যে আমরা তাদের স্পষ্ট করে চিনতে পারি না, এমন কি, হয়ত আমাদের কাছে সেগুলির কোনো নামও জানা নেই। সংযোগবিচ্যুত অবস্থায় ঐগুলিকে সদ্‌গুণ বলার অর্থ জীবন্ত শরীরের বদলে কঙ্কালটি নেওয়া। হাড়-পাঁজরা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাদের গুরুত্ব থাকে এই সত্যের মধ্যে যে, তারা শরীরের অন্যান্য অঙ্গাবয়বকে এমন ভাবে রক্ষা করে যাতে তারা একযোগে অখণ্ড ও সফল ক্রিয়াশীলতায় সমর্থ হয়। এবং চরিত্রের যে সমস্ত গুণকে আমরা সদগুণ আখ্যা দেই তাদের ক্ষেত্রেও এই কথাই খাটে। নীতি অর্থে গোটা চরিত্রটি থেকে কোনোকিছু কম বোঝায় না; এবং গোটা চরিত্রটিই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মূর্ত গড়ন ও বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে একাত্ম। সদ্‌গুণ থাকা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও একতন্ত্রী প্রলক্ষণের কর্ষণকে সূচিত করে না; সূচিত করে জীবনের সকল কর্তব্যের ক্ষেত্রে অন্যান্যের সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে একজনে যা-কিছু হতে সমর্থ তাই হওয়া,—সম্পূর্ণভাবে ও পর্যাপ্তরূপে।

শেষ বিশ্লেষণে এই দাঁড়ায় যে, আচরণের নৈতিক ও সামাজিক গুণ পরস্পরের সহিত একাত্ম। সুতরাং বিদ্যালয়ের প্রশাসন, পাঠক্রম ও অধ্যাপনা পদ্ধতি যে পরিমাণে সামাজিক প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তাই হল তাদের মূল্যের পরিমাপ। শিক্ষার সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্বের অধ্যায়গুলিতে যা বলা হয়েছে এ কথা তারই সুস্পষ্ট পুনরুক্তি। এবং যে গুরুতর বিপদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকে বিপন্ন করে তা হল সেই সমস্ত শর্তের অভাব যা বিকিরণযোগ্য সামাজিক প্রেরণাকে সম্ভব করে। এই অবস্থাটাই হল ফলপ্রসূ নৈতিক শিক্ষার পরম শত্রু, কারণ এই প্রেরণা কেবল তখনই সক্রিয়ভাবে বর্তমান থাকতে পারে যখন কতিপয় শর্ত পূরণ করা হয়

(১) প্রথমতঃ, সমষ্টিগত জীবন বলতে যা-কিছু বোঝায় বিদ্যালয়টিকে

তাই হতে হবে। সামাজিক উপলব্ধি ও সামাজিক স্বার্থবোধের বিকাশ কেবল কোনো সামাজিক মাধ্যমেই করা চলে। সে মাধ্যম এমন হবে যেখানে কোনো যৌথ অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার মধ্যে দেওয়া-নেওয়া থাকে। যিনিই অন্যান্যের সঙ্গে পূর্বের মেলামেশাসূত্রে ভাষা শিখেছেন তিনিই অপেক্ষাকৃত আলাদাভাবে বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে সংবাদসূচক বর্ণনাও আয়ত্ত করতে পারেন। কিন্তু ভাষাগত চিহ্নাদির "অর্থোপলব্ধি" করা একেবারেই অন্য জিনিস। তাঁর মধ্যে থাকে অন্যান্যের সঙ্গে একযোগে কাজ ও খেলাধূলা করার প্রসঙ্গ। অবিরাম গঠনমূলক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে দিয়ে শিক্ষালাভের পক্ষে এই গ্রন্থে যে সব সাধ্য-সাধনা করা হয়েছে তা এই সত্যের উপর স্থাপিত যে, ঐ সকল কাজকর্ম একটি সামাজিক বাতাবরণের সুযোগ যোগায়। বিদ্যালয়কে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্যুত লেখাপড়া শেখার একটা জায়গা করার পরিবর্তে সেখানে থাকবে এমন একটি ক্ষুদ্রকায় সমাজ-সমষ্টি, যার মধ্যে লেখাপড়া এবং ক্রমবিকাশ হবে উপস্থিত অংশীদারী অভিজ্ঞতার আনুষঙ্গিক বিষয়। খেলার মাঠ, শিল্পশালা, কর্মশালা ও শ্রমশালা কেবল তরুণদের স্বাভাবিক কর্মতৎপর প্রবণতাকেই নির্দেশিত করে না, পরন্তু তার মধ্যে আদান-প্রদান, বাদ-বিতর্ক এবং সহকারিতাও থাকে, এবং এর সবগুলিই যোগসূত্রগুলির সম্বোধিকে বিবর্ধিত করে।

(২) বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন হওয়া কর্তব্য। দুটি শিক্ষার মধ্যে মুক্ত পারস্পরিক স্বচ্ছন্দবিহার থাকা কর্তব্য। তা কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন তার একটির সামাজিক স্বার্থ এবং অন্যটির স্বার্থের মধ্যে অসংখ্য সংযোগস্থল থাকে। এ রকমের একটি বিদ্যালয় ধারণা করা চলে, যার মধ্যে সাহচর্য ও অংশীদারী কর্মের প্রেরণা থাকবে, কিন্তু সেখানকার সামাজিক জীবনটি বিদ্যালয়ের পাঁচিলের বাইরের জগৎটার সামাজিক জীবনকে মঠাশ্রয়ী জীবন থেকে বেশী মাত্রায় উপস্থাপিত বা আদর্শান্বিত করবে না। এখানেও সামাজিক সংশ্লিষ্টতা ও বোঝাবুঝি বিকশিত হবে, কিন্তু তা বাইরের জগতে প্রাপ্তব্য হবে না—তা বাইরের জগতে উপচে পড়বে না। টাউন ও গাউনের প্রবাদ প্রসিদ্ধ বিচ্ছেদ এবং কেতাবী নির্জনতার উপকর্ষণ এই দিকে ক্রিয়া করে। আবার এই ভাবেই ক্রিয়া করে প্রাচীন কালের কৃষ্টির প্রতি সেই দৃঢ় বন্ধন যা স্মৃতিমূলক সামাজিক প্রেরণার জন্ম

দেয়। কারণ তাতে লোকে তাদের নিজের কালের জীবন যাত্রার চেয়ে আর এক কালের জীবন যাত্রার মধ্যে অধিকতর ঘরোয়া ভাব বোধ করে। স্বীকৃত কৃষ্টিমূলক শিক্ষা অদ্ভুত রকমে এই বিপদের প্রভাবাধীন। একটি আদর্শান্বিত অতীতকাল আত্মার আশ্রয় ও সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়ায় ; এ কালের সংশ্লিষ্টতাগুলি নিকৃষ্ট, ও প্রণিধানের অযোগ্য বলে মনে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ, যে সামাজিক পরিবেশের সম্পর্কে শিক্ষালাভ একাধারে প্রয়োজন ও পুরস্কার সেই পরিবেশের অভাবই বিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্ন অবস্থার মুখ্য কারণ। এবং এই বিচ্ছিন্নতাই বিদ্যালয়ে আহৃত জ্ঞানকে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য করে, এবং কাজেই চরিত্রের ক্ষেত্রেও দেখা দেয় তার ঊষরতা।

নীতি সম্বন্ধে একটা সঙ্কীর্ণ ও নৈতিকতাবাদী অভিমত এই কথা বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায়ী যে, শিক্ষাক্ষেত্রে যতো সমস্ত লক্ষ্য ও মূল্যবোধ বাঞ্ছনীয় তারা নিজ নিজ গুণেই নৈতিক। শৃঙ্খলা, স্বাভাবিক বিকাশ, কৃষ্টি, সামাজিক কর্মকুশলতা, এর সবই নৈতিক প্রলক্ষণ। যে সমাজটির সম্প্রসারণ করা শিক্ষার ন্যস্তভার, উক্ত সব ক'টি গুণই একজনকে সেই সমাজের একজন সুযোগ্য সভ্য বলে চিহ্নিত করে। এই মর্মে একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, একজন লোকের পক্ষে ভালো হওয়াই যথেষ্ট নয়, তাকে কোনো কিছুর জন্যে ভালো হতে হবে। যে "কোনো কিছুর" জন্যে একজনকে ভালো হতে হবে, তা হল সমাজের সভ্যরূপে তার বসবাস করার সামর্থ্য, যাতে সে অন্যান্যের সঙ্গে বসবাস করা থেকে যা-কিছু পায়, তার সঙ্গে সে নিজে যা-কিছু দেয় তার একটা ভারসাম্য থাকে। সে, মানুষ হিসাবে—বাসনা, প্রক্ষোভ ও ধারণা সম্বলিত মানুষ হিসাবে—যা পায় ও দেয় তা বাহ্যিক সম্পদ নয়, পরন্তু তা চেতনাময় জীবনের একটা বিস্তৃতি ও গভীরতা—জীবনের তাৎপর্যগুলির একটা অধিকতর তীক্ষ্ণ, শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও প্রসারণশীল উপলব্ধি। সে বৈষয়িকরূপে যা-কিছু পায় ও দেয় তা, খুব বেশী হলে, চেতনাময় জীবনের অভিব্যক্তির বিভিন্ন সুযোগ ও উপায় মাত্র। অন্যথায়, তা দেওয়াও নয়, নেওয়াও নয় ; পরন্তু তা কাঠি দিয়ে জল-বালি ঘোটাই করার মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে জিনিসপত্রের গতায়তি। শৃঙ্খলা, কৃষ্টি, সামাজিক কৃতি, ব্যক্তিগত পরিশোধন, চরিত্রের উন্নতি হল, এ রকমের কোনো সুষম অভিজ্ঞতার মধ্যে উদারভাবে অংশীদার হওয়ার সামর্থ্যের ক্রমবিকাশের ক্রমপর্যায় মাত্র। এবং শিক্ষা কেবল এ রকমের একটি

জীবন গড়ে তোলার উপায়ই নয়, পরন্তু এরূপ একটি জীবনই হ'ল শিক্ষা। এরূপ শিক্ষার জন্য সামর্থ্য বজায় রাখাই মুখ্য নীতিসার। কারণ চেতনাময় জীবন হ'ল এক নিরন্তর নবীকরণ বিশেষ।

সারাংশ

বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি জ্ঞান ও আচরণের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। কারণ নিয়মিত শিক্ষাধারায় যে শিক্ষা পুঞ্জিত হয় তা যদি চরিত্রকে প্রভাবিত না করে, তাহলে নৈতিক উদ্দেশ্যকে শিক্ষার ঐক্য সাধনকারী ও চরম উদ্দেশ্য বলে ধারণা করা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে জ্ঞান লাভের পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তু এবং নৈতিক ক্রমবিকাশের মধ্যে কোনো নিবিড় অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক থাকে না, সেখানে বিশিষ্ট পাঠ এবং শৃঙ্খলাবোধের বিশিষ্ট ধরন অবলম্বন করতে হয়; কর্মের স্বাভাবিক উৎস-গুলির মধ্যে এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে জ্ঞান অঙ্গীভূত হয় না,—আর নীতি হয়ে দাঁড়ায় নীতিবাচক- হয়ে দাঁড়ায় আলাদা একটি সদাচার প্রকল্প।

যে দু'টি তত্ত্ব বিদ্যার্জনকে কর্মতৎপরতা থেকে, কাজেই নৈতিক আচরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে প্রধানতঃ জড়িত তারা একদিকে অভ্যন্তরীণ প্রবণতা ও প্রেষণা (যা ব্যক্তিগত উপকরণ), এবং অন্যদিকে কাজকর্ম (যা কায়িক ও বাহ্যিক প্রকাশ)—এ দুটি দিকের বাঁধনকে ছিন্ন করে। আবার এরাই স্বার্থবোধজাত কর্মকে নীতিবোধজাত কর্মের বিরুদ্ধে স্থাপিত করে। যে শিক্ষা-প্রকল্পের মধ্যে নমুনাগত সামাজিক পরিস্থিতির বিষয়-বস্তুর ব্যবহারযুক্ত এবং সামাজিক লক্ষ্য সমন্বিত নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ বা নিয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালাভ করার বন্দোবস্ত থাকে, সে শিক্ষাপ্রকল্পটি এই উভয়বিধ বিচ্ছেদকে দূর করে। কারণ এ অবস্থায় বিদ্যালয়ই হয়ে দাঁড়ায় এক রকমের সামাজিক জীবন,—হয়ে দাঁড়ায় এক রকমের একটি ক্ষুদ্রকায় সমষ্টি; এবং তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঁচিলের বাইরের অন্য প্রকারের সমষ্টি-গত অভিজ্ঞতারও নিবিড় ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলতে থাকে। যে শিক্ষা সামাজিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সফলতার সহিত অংশগ্রহণের ক্ষমতাকে বিকশিত করে,

সে শিক্ষার সকল কিছুই নৈতিক। এতে এমন একটি চরিত্র গঠিত হয়, যা কেবল সামাজিকরূপে অভ্যাসবশায় বিশিষ্ট কাজই করে না, পরন্তু যে নিরবচ্ছিন্ন পুনঃসমন্বয় ক্রমবিকাশের জন্য অপরিহার্য, তাতেও উৎসাহ যোগায়। বস্তুতঃ, জীবনের যাবতীয় যোগসূত্র থেকে শিক্ষালাভ করার উৎসাহই মুখ্য নৈতিক স্বার্থ।

অনুক্রমণী